দিনাজপুর ব্যাঙ্ক

লি মি টে ড্

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত

স্থাপিত—১৯১৪

কলিকাতা আফিস—১১নং ক্লাইভ রো,

ফোন কলিঃ ৬৫১৭

হেড্ আফিস—দিনাজপুর শাখা—রাজসাহী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

জনাব সাহেব কে. এম. সেন এম. এল. সি.

শনিবারের চিঠি
৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৪৮

রবীন্দ্রপরিবেশ

গুণী ব্যক্তির স্বহস্তরচনা সঞ্চয় করতে আমরা সম্প্রতি শিখেছি। পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রসিদ্ধ প্রাচীন চিত্রকরের চিত্র, লেখকের হস্তলিপি, শিল্পীর হস্তকর্ম্ম প্রভৃতি বহুকাল থেকে সমাদর পেয়ে আসছে। প্যারিসের লুভর প্রাসাদে বিস্তর প্রাচীন চিত্রাদি জাতীয় ঐশ্বর্য্যরূপে সঞ্চিত হয়েছে। যন্ত্রও বাদ যায় নি, স্টিভেনসনের উদ্‌ভাবিত রেলগাড়ির আদিম এঞ্জিন 'রকেট' নির্ম্মাতার মৌলিক কৌশলের নিদর্শনরূপে বিলাতের এক মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। অসংখ্য লোকে এইসকল বস্তু পরম শ্রদ্ধায় দেখে এবং রচয়িতাকে স্মরণ করে।

স্টিভেনসনের পর লক্ষ লক্ষ এঞ্জিন তৈরী হয়েছে এবং বারে বারে এত পরিবর্ত্তন হয়েছে যে এখনকার মহাকায় খর্ব্বচোঙ গম্ভীরনাদী এঞ্জিন দেখলে মনে হয় না যে এদের মূল আদর্শ সেই ক্ষুদ্রকায় দীর্ঘচোঙ শ্বাসগ্রস্ত রকেট। এই পরিবর্ত্তনে এঞ্জিনের উপযোগিতা ক্রমশ বেড়েছে, এবং এমন আপত্তি শোনা যায় নি যে এতে স্টিভেনসনের কিছুমাত্র অমর্য্যাদা ঘটেছে। পক্ষান্তরে কীর্তিমান চিত্রকরদের মূলচিত্রের অসংখ্য প্রতিলিপি এবং লেখকদের রচনার অসংখ্য সংস্করণ প্রচারিত হয়েছে, মুদ্রণেরও ক্রমোন্নতি হয়েছে, কিন্তু রচনার পরিবর্ত্তন ঘটে নি। বিজ্ঞানী ও যন্ত্রী অবাধে অপরের উদ্‌ভাবিত বস্তুর উন্নতিচেষ্টা করতে পারেন, সফল হ'লে প্রশংসাও পান। কিন্তু কোনও পণ্ডিত বা চিত্রবিশারদ যদি পূর্ব্বগুণীদের রচনার সংস্কার করতে চান তো সে চেষ্টা মহাপাতকতুল্য হেয় গণ্য হবে।

যন্ত্র, শিল্পজ বস্তু, সাহিত্য, চিত্র — সমস্তই আমাদের প্রয়োজন সাধন করে, কিন্তু সমান মর্য্যাদা পায় না। যেসব বস্তু জীবনযাত্রার প্রধান

সহায় তাদের উদ্‌ভাবক বা নির্মাতা মহাপ্রতিভাশালী হ'লেও নিতান্ত পরোক্ষ, তাঁরা একবারেই আড়ালে থাকেন, ভোগের সময় আমরা তাঁদের কথা ভাবি না। অথচ যে বস্তু স্থূল সাংসারিক ব্যাপারে অনাবশ্যক, কিন্তু আনন্দ দেয় বা রসোৎপাদন করে, তার রচয়িতা রচনার সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকেন, ভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা রচয়িতাকেও স্মরণ করি। রচনা থেকে রচয়িতার তিলমাত্র বিচ্ছেদ আমরা সইতে পারি না, তাই এমন স্পর্ধা কারও নেই যে দা ভিঞ্চি শেকস্পীয়ার রবীন্দ্রনাথের উপর কলম চালাবেন—যদিও সমালোচনা যত খুশি করতে পারেন।

রসসৃষ্টি ও রসস্রষ্টার এই যে অঙ্গাঙ্গিভাব, এরও ইতরবিশেষ আছে। রচয়িতার পরিচয় আমরা যত বেশী জানি ততই রচনার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্বন্ধ উপলব্ধি করি। যাঁরা বেদ বাইবেল রচনা করেছেন তাঁরা অতিদূরস্থ নক্ষত্রতুল্য অস্পষ্ট, তাঁদের পরিচয় শুধু বিভিন্ন ঋষি আর প্রফেটের নাম। বেদ বাইবেল অপৌরুষেয়, অর্থাৎ রচয়িতারা অজ্ঞাতপ্রায়। বাল্মীকি কালিদাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কিংবদন্তী আছে ব'লেই পাঠকালে আমরা তাঁদের স্মরণ করি। শেকস্পীয়ার সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাই সম্বল ক'রে পাঠক তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, যদিও তিনিই তন্নামে খ্যাত নাটকাদির লেখক কিনা সে বিতর্ক এখনও থামে নি। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি সম্বন্ধে লোকের যতটুকু জ্ঞান ছিল সম্প্রতি তাঁর নোটবুক আবিষ্কৃত হওয়ায় তা অনেক বেড়ে গেছে, এখন তাঁর অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে তাঁর অজ্ঞাতপূর্ব বহুমুখী প্রতিভার ইতিহাস জড়িত হয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে স্পষ্টতর করেছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আমরা যত এবং যে ভাবে জানি, আর কোনও রচয়িতার পরিচয় কোনও দেশের লোক তেমন ক'রে জানে কিনা সন্দেহ। আমাদের রবীন্দ্রপরিচয় কেবল তাঁর সাহিত্যে সংগীতে

শিক্ষায়তনে আবদ্ধ নয়, তাঁর আকৃতি প্রকৃতি ধর্ম কর্ম অনুরাগ বিরাগ সমস্তই আমরা জানি এবং ভবিষ্যদ্‌বংশীয়রাও জানবে। এই সর্বাঙ্গীণ সপ্রেম পরিচয়ের ফলে তাঁর রচনা আর ব্যক্তিত্বের যে সংশ্লেষ ঘটেছে তা জগতে দুর্লভ।

ইওরোপ আমেরিকায় এমন লেখক অনেক আছেন যাঁদের গ্রন্থ-বিক্রয়সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাঁদের রচনা যে মাত্রায় জনপ্রিয় তাঁরা স্বয়ং সে মাত্রায় জনহৃদয়ে প্রতিষ্ঠা পান নি। বাইরনের অগণিত ভক্ত ছিল, তাঁর বেশভূষার অনুকরণও খুব হ'ত, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে প্রীতিলাভ হয় নি। বার্নার্ড শ বই বেচে কোটিপতি হয়েছেন, কিন্তু তাঁর রচনাই জনপ্রিয় হয়েছে, তিনি হ'তে পারেন নি।

এদেশে একাধিক ধর্মনেতা ও গণনেতা যশ ও প্রীতি একসঙ্গেই অর্জন করেছেন, যেমন চৈতন্য রামকৃষ্ণ মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু নেতা না হয়েও যে লোকচিত্তে দেবতার আসন পাওয়া যায় তা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্ভব হয়েছে। কেবল রচনার প্রতিভা বা কর্মসাধনার দ্বারা এই ব্যাপার সংঘটিত হয় নি, লোকোত্তর প্রতিভার সঙ্গে মহানুভাবতা মিলে তাঁকে দেশবাসীর হৃদয়াসনে বসিয়েছে। এ দেশে তিনি যা পেয়েছেন তা শুষ্ক সম্মান নয়, যথার্থই পূজা।

গুরু বললে আমরা সাধারণত যা বুঝি—অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষাদাতা—তার জন্য যে বাহ্য ও আন্তর লক্ষণ আবশ্যক তা সমস্তই তাঁর অমিতমাত্রায় ছিল। কিন্তু যিনি লিখেছেন—'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি' যোগাসন, সে নহে আমার'—তাঁর পক্ষে সামান্যগুরু হওয়া অসম্ভব। যে অগুহ্য মন্ত্র তিনি দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন তার সাধনা আসনে ব'সে জপ করলে হয় না, ভক্তিতে বিহ্বল হ'লেও হয় না। তার জন্য যে জ্ঞান ও কর্ম আবশ্যক তা তিনি নিজের আচরণে দেখিয়ে গেছেন। তাই তিনি অগণিত ভক্তের প্রশস্ত অর্থে গুরুদেব। তাঁর লোকচিত্তজয়ের ইতিহাস

অলিখিত কিন্তু অজ্ঞাত নয়। কৃতী গুণীকে তিনি উৎসাহদানে কৃতিতর করেছেন, ভীরু নির্বাক অনুরাগীকে সাদরে ডেকে এনে অভয়দানে মুখর করেছেন, ভক্ত প্রাকৃতজনকে বোধগম্য সরস আলাপে কৃতার্থ করেছেন। মূঢ় অসূয়ক তাঁর সৌজন্যে পদানত হয়েছে, ক্রূর নিন্দক তাঁর নীরব উপেক্ষায় অবলুপ্ত হয়েছে।

বুদ্ধচৈতন্যাদিতে কালক্রমে দেবত্বারোপ হয়েছে। কালিদাস শুধুই কবি, তথাপি নিস্তার পান নি, কিংবদন্তী তাঁকে বাগ্‌দেবীর সাক্ষাৎ বরপুত্র বানিয়েছে। রবীন্দ্রচরিতের এরকম পরিণাম হবে এমন আশঙ্কা করি না। সর্ববিধ অতিকথার বিরুদ্ধে তিনি যা লিখে রেখেছেন তাই তাঁকে অমানবতা থেকে রক্ষা করবে।

রবীন্দ্ররচনা অতি বিশাল, রবীন্দ্রবিষয়ে যে সাহিত্য লিখিত হয়েছে তাও অল্প নয়, কালক্রমে তা আরও বাড়বে। কবির সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে তাঁদের অনেকে আরও চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বাঁচবেন এবং তাঁদের দ্বারা রবীন্দ্রতত্ত্ব বিবর্ধিত হবে। তা ছাড়া কবির সহস্র পত্র, অসংখ্য প্রতিকৃতি, স্বরচিত অনেক চিত্র বিকীর্ণ হয়ে আছে, তাঁর গানে দেশ প্লাবিত হয়েছে, তাঁর কণ্ঠস্বরও যন্ত্রধৃত হয়ে স্থায়িত্ব পেয়েছে। এই সমস্তের সমবায়ে যে বিপুল রবীন্দ্রপরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে রবীন্দ্রাত্মার নিবিড় সংযোগ অক্ষয় ক'রে রাখবে। তিনি মহা অজানায় প্রস্থান করলেও আমাদের কাছে চিরকাল জীবিতবৎ প্রত্যক্ষ থাকবেন।

যে মহৎ উত্তরাধিকার তিনি আমাদের জন্য রেখে গেলেন তা কি আমরা ধনীর জড়সন্তানের মত পরম আলস্যে শুধুই হাত পেতে নেব? কবির কাছে আমাদের যে ঋণ তা শাস্ত্রোক্ত ত্রি-ঋণের তুল্য গুরুভার, কেবল ভাবের উচ্ছ্বাসে তা শোধ হবে না। যে কর্ম তাঁর জীবনের ব্রত ছিল, যার জন্য তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না, বিশ্বভারতী-রূপ তাঁর সেই আরব্ধ কর্ম যদি অবিসংবাদে সমবেত চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয় তবেই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সার্থক হবে, নতুবা প্রমাণ হবে — কবি অযোগ্য দেশে জন্মেছিলেন।

৫।১০।৪১ রাজশেখর বসু

রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ

১৩০৭, ১৩০৮ সালের কথা। শিলাইদহে বাস করিয়া রবীন্দ্রনাথ তখন 'চিরকুমার সভা' ও 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলি রচনা করিতেছেন। সাহিত্যে যখন হালকা হাসির বান ডাকিয়াছে, জীবন তখন খুব লঘুপক্ষ বিস্তার করিয়া চলিতেছে না। কবি রবীন্দ্রনাথ যে এককালে আরও পাঁচজনের মত সাধারণ গৃহস্থ মানুষ ছিলেন, সংসারের তাড়নায় তাঁহাকেও যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইত এবং মারাত্মক চাপে পড়িয়াও যে তিনি পিতার প্রতি পুত্রের এবং পুত্রকন্যার প্রতি পিতার কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিয়া চলিয়াছিলেন, এ কথা জানিলে অনেকে বিস্ময় বোধ করিবেন। নিম্নের পত্রগুলিতে রবীন্দ্রনাথের এই পারিবারিক পরিচয় আছে।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয় তখন পরিকল্পনায় মাত্র নাই। কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং অশেষ বাধার মধ্য দিয়া তিনি অগ্রসর হইতেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিয়াছেন—

> তখন কেবল আমার দুই একজন মাত্র সহায়কারী সুহৃৎ ছিলেন; তখন অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা এবং বিঘ্নে আমার এই কর্ম্মের ভার আমার পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল।
> —'বিচিত্র প্রবন্ধ', ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩১৭।

ওদিকে ১৩০৮-এর গোড়া হইতে তাঁহার সম্পাদনায় 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন' প্রকাশ শুরু হইয়াছে। মোটের উপর এই সময়টায় রবীন্দ্রনাথ কষ্ট ও দৈন্যভারে পীড়িত। এই অবস্থার মধ্যেই মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় সত্যই বিস্ময়কর। প্রভাতবাবুর 'রবীন্দ্র-জীবনী'র ১ম খণ্ডের ৩৭৫-৭৬ পৃষ্ঠায় "পারিবারিক কথা" শিরোনামায় এই সময়ের কথা এইরূপ আছে।—

১৩০৮ সালের মাঝামাঝি সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বসবাস করেন। এইখানে আসিবার পূর্বে ১৩০৭ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা বা বেলার বিবাহ হয়। বেলার বয়স তখন চৌদ্দ। বিবাহ হইল শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু বিহারীলালের চতুর্থ পুত্র।...বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আসেন ও দ্বিতল গৃহে বাস করিতে থাকেন; ইতিমধ্যে 'নূতন বাড়ী'র পত্তন হইল। ইতিপূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষার জন্য শিবধন বিদ্যার্ণব, জগদানন্দ রায় ও লরেন্স নামে এক সাহেব নিযুক্ত হইয়াছিলেন।... শান্তিনিকেতনে বাসকালে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কন্যা রেণুকারও বিবাহ হয়—বিবাহ হয় সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত ১৩০৮এর শ্রাবণে।...কন্যার বয়স মাত্র এগারো ছিল।

নীচের পত্র ছয়টিতে উপরে উদ্ধৃত সংবাদের পরিপূরক এবং তাহার অতিরিক্ত খবরও আছে। রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ হিসাবে এইগুলি অতিশয় মূল্যবান পত্র। পত্রগুলি স্বর্গীয় বসন্তকুমার গুপ্ত মহাশয়কে লিখিত। তিনি স্বাধীন ত্রিপুরা (আগরতলা) রাজ্যের রাজকুমারদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহার উপরে রথীন্দ্রনাথের শিক্ষার ভার কিছুকাল ন্যস্ত করিয়াছিলেন। পত্রগুলি আমরা গুপ্ত মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা সুধা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি।

ওঁ

শিলাইদহ [১৩০৭]
কুমারখালি

প্রিয়বরেষু

আগামী মঙ্গলবারে মহারাজের নিমন্ত্রণে দার্জ্জিলিং যাইতেছি—সেখানে কিরূপ স্থির হয় জানিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে শিলাইদহে আসিলে অল্প দিনের মধ্যেই চলিয়া আসিতে হইবে। দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইবে না।

শরতের সহিত বিবাহ প্রস্তাব এখনো সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই।——বিবাহ হইয়া গেছে খবর পাইয়াছি।

নিশিকান্তের পীড়ার সংবাদে দুঃখিত হইলাম—দেখা হইলে সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিব।

যদি সৎপাত্রের সন্ধান থাকে খবর দিতে ভুলিবেন না। ইতি

১৯শে বৈশাখ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[১৩০৭]

প্রিয়বরেষু

আমার ছেলেদের শিক্ষাভার গ্রহণ করিতে যদি প্রস্তুত থাকেন তবে আমার পত্র পাইয়া বোলপুরে চলিয়া আসিবেন।

আশা করি ভাল আছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[১৩০৭]

প্রিয়বরেষু

সোমবার প্রাতে শিলাইদহে রওনা হইতেছি। শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। আপনাকে অধিক কি আর বলিব রথীকে সর্ব্বতোভাবে দেখিবেন। আপনাকে স্পষ্টই বলিয়া রাখিতেছি——এর moral influence আমি শ্রেয়স্কর মনে করি না।

বাসা হইতে আপনার যাহা আনাইয়া লওয়া প্রয়োজন হয় জোড়াসাঁকোয় জগন্নাথ বিশ্বাসকে লিখিবেন। জগদানন্দের খবরের জন্য উৎসুক আছি। ইতি শনিবার রাত্রি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[১৩০৮]

প্রিয়বরেষু

এখানে আসিয়া শুনিলাম শ্যামপুকুরে আপনার একটি কাজ হইয়াছিল। আমি ত তাহা জানিতাম না। শুনিতেছি তাহাতে আপনার অনেকগুলি সুবিধার কারণ ছিল। কেন নিলেন না? আমার মনে হয় এখনো এ বিষয়ে আপনার সচেষ্ট হওয়া উচিত।

বাবামশায়ের সঙ্গে স্কুল সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। তিনি শান্তি-নিকেতনে অতিথিদের থাকা সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছেন। আমরাই নীচে উপরে বাহিরে সমস্ত স্থান জুড়িয়া থাকিব ইহা বোধকরি তাঁহার ভাল লাগে নাই। অথচ অতি শীঘ্রই আরো মাষ্টারের আমদানি হইবে। আপনি এক কাজ করিতে পারেন। আমার এখানকার বাড়ি খালি পড়িয়া আছে। আপনি ইচ্ছা করিলে ইহার একতলার পশ্চিমদিকের ঘরটা আপনার পড়াশুনার জন্য ঠিক করিয়া লইতে পারেন। সম্পূর্ণ নির্জ্জন পাইবেন। কোন ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা দেখি না। বোলপুরে আপনি অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে পড়াশুনা করিতে পারিতেন কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করিয়া সেখানকার সুবিধামত ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না। দ্বিপু শীঘ্র শান্তিনিকেতনে যাইবেন তখন স্থানের টানাটানি দেখিলে তাঁহার হয় ত বিরক্তি বোধ হইবে—এই সকল চিন্তা করিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইয়াছি। বোধহয় স্থানের অকুলান লইয়া এখানে আলোচনা হইয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

প্রিয়বরেষু

আগরতলা এখনো জলমগ্ন। জল অল্প অল্প করিয়া কমিতেছে সংবাদ পাইয়াছি—কিন্তু লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আর সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করিয়া চিঠি পাঠাইবেন।

এখানকার পুণ্যাহ সমাধা হইয়া গেছে—ইতিমধ্যে যদি বেলাকে মজঃফরপুরে পৌঁছিয়া দিবার জন্য ডাক না পড়ে তবে কালিগ্রামের পুণ্যাহ সম্পন্ন করিবার জন্য সেখানে রওনা হইব। সেখানে ২৪শে আষাঢ় দিনস্থির হইয়াছে। ইতি ১৪ই আষাঢ় ১৩০৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[১৩০৮]

প্রিয়বরেষু

অত্যন্ত ব্যস্ত। অদ্যই রেণুকার বিবাহ। আপনি আসিতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম। পাত্রটির নাম সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—ডাক্তার। স্বভাব নির্দ্দোষ। দেখিতেও প্রিয়দর্শন।

প্রিয়র সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। বোধহয় তাঁহারা লোক রাখিবেন না। প্রিয় নিজেই তাঁহার ছেলেকে পড়াইতেছেন। ত্রিপুরার কোন খবর নাই। মহিম আসিয়াছে। সুস্থ হইলেই আসিবেন। ২৪শে শ্রাবণ—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম দর্শন

আজ প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বছর আগের কথা।

কলকাতায় সবে এসেছি কলেজে পড়তে, রাস্তাঘাট তখনও ভাল চিনি না, একদিন দুপুরবেলা কলেজে কে বললে, আজ সেণ্ট পল্‌স কলেজ হোস্টেলে রবিবাবু আসবেন—দেখতে যাবে ?

রবি ঠাকুর! ইন্দ্রজাল ছিল ও নামে মাখানো আমার বাল্যকাল থেকে। কারণ বলছি। আমার বয়েস যখন আট কিংবা নয়, পাঠশালায় পড়ি আপার প্রাইমারি—তখন আমাদের হেড-মাস্টার গগনচন্দ্র পাল একদিন একখানা শিশুপাঠ্য বই থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির ধ্বনি ও ছন্দ কানে যেতেই মন্ত্রমুগ্ধের মত গগন পালের মুখের দিকে চেয়ে থেকে শেষ পর্য্যন্ত শুনলাম। দাশু রায়ের পাঁচালি শুনেছি, কবি জারি গান শুনেছি, কাশীরাম দাসের মহাভারত নিজেও পড়েছি, গুরুজনদের মুখেও শুনেছি, কিন্তু এমন সুললিত কবিতা কখনও শুনি নি। যেন একটি অপূর্ব্ব সঙ্গীত—অশ্রুতপূর্ব্ব বাণী। হেড-মাস্টারের মুখে শুনলাম কবিতার নাম 'বঙ্গে শরৎ'—লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের নাম সেই প্রথম শুনলাম জীবনে। এবং এই নামটির সঙ্গে বাল্যকালে শ্রুত সেই কবিতাটির অপরিচিত সৌন্দর্য্য মিশে গিয়ে ওই নামটির চারিপাশে একটি মায়ালোক গ'ড়ে উঠল আমার মনে সেই দিন থেকেই। কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই মায়ালোকের মানুষ। যখন আমি হাই-স্কুলের ছাত্র, তখন তিনি নোবেল-প্রাইজ পান, তাঁর কবিখ্যাতির কথা তখন যথেষ্ট শুনলেও, তাঁর রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ঘটে নি তখনও, কারণ যে সময়ের কথা বলছি, মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র শহরে রবীন্দ্রনাথের রচনা তত প্রসার

লাভ করে নি সে সময়ে। মনে আছে, সে সময়ে গর্ব্ব অনুভব করেছিলুম এই ভেবে যে, আমাদেরই একজন আজ বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন, সাহেবেরা দেখুক আমরা ছোট নই। রবীন্দ্রনাথের সম্মান সারা বাংলা দেশের তথা সারা ভারতবর্ষের সম্মান—আমাদের সম্মান।

সেই রবীন্দ্র ঠাকুর এলেন সেণ্ট পল্‌স কলেজের হোস্টেলের সামনের মাঠে—ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, বেলা বিশেষ পড়ে নি—তিনটে হবে। মাঠে তাঁর জন্যে চেয়ার টেবিল পড়েছে। আমরা সেই টেবিলের দুই পাশে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় রবীন্দ্রনাথ ঢুকলেন পেছনে ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যেকার সরু পথ দিয়ে। দীর্ঘদেহ, দীর্ঘশ্মশ্রু, সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তি। তার আগে ছবিতে তাঁর চেহারা দেখেছি অনেক বার, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হ'ল কোন ফোটোই তাঁর প্রতি সুবিচার করে নি। কি দীপ্ত দৃষ্টি চোখে, চিবুকের নীচে শ্মশ্রুরাজির একটি অনন্যসাধারণ বাঁকা ভাব। একেবারে তাঁর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি, তাঁর অতটা নিকটসান্নিধ্য-লাভের আনন্দে তখন আমি আত্মহারা। দেশে গিয়ে গল্প করবার মত একটা ঘটনা ঘটল বটে আজ। সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! ছেলেবেলায় তাঁর কবিতা গগন পালের মুখে প্রথম শুনে মুগ্ধ হই।

বেশ মনে আছে, হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেনেডি সাহেব রবীন্দ্রনাথের সামনের টেবিলে বড় একটা কাঁচের জগ ভর্ত্তি ক'রে জল ও একটা গ্লাস রাখলেন। দেখে সকৌতুকে ভাবলাম, দেখ কেনেডি সাহেবের কাণ্ড! অতটা জল কি খাওয়ার দরকার হবে ওঁর?

রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর কানে যেতে যেন চমকে উঠলাম, তারপর যতই শুনি, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর মুখের দিকে

চেয়ে রইলাম। এমন কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনি নি, মনে হ'ল এ কণ্ঠস্বর অসাধারণ, জীবনে এই এমন একটা কণ্ঠস্বর কানে গেল, যা হাজার লোকের মধ্যেও পৃথক ক'রে চিনে নেওয়া চলবে।

তাঁর বক্তৃতার আর কোন কথা আমার মনে নেই, বহু দিনের কথা—কেবল মনে আছে, তিনি বক্তৃতার মধ্যে একটা অনবদ্য ভঙ্গিতে ডানহাত নেড়ে চাঁপার কলির মত অঙ্গুলির সাহায্যে (যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, সবাই জানেন তাঁর আঙুল দেখলে চাঁপাকলির কথা মনে হ'ত) একটি সুশ্রী মুদ্রা রচনা ক'রে বললেন, "কল্পলোক···কল্পলোক"—কয়েকবার তিনি কথাটি ব্যবহার করলেন বক্তৃতার মধ্যে, আরও অনেক কিছু বলেছিলেন, কিন্তু ওই "কল্পলোক" কথাটি ছাড়া আমার আর কিছু মনে নেই।

একটা কথা মনে আছে। সেদিন সেণ্ট পল্‌স হোস্টেলের মাঠে কিন্তু তেমন ভিড় হয় নি, অন্তত যেমন ভিড় দেখেছিলুম ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে তাঁর বক্তৃতার সময়, ইউরোপ থেকে তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই। কৌতূহলী জনতার চাপে ইন্‌স্টিটিউটের দরজা ও রেলিং সেদিন ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। হোস্টেলের মাঠে ক্রমে ছায়া প'ড়ে এল। বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল। আমরা সবাই ঠেলাঠেলি ক'রে তাঁর পায়ের ধূলো নিলাম, পায়ে তাঁর চকচকে বাদামী চামড়ার জুতো ছিল—সে কথা আজও ভুলি নি।

পরবর্ত্তী কালে যখন তাঁর কাছে ব'সে কথাও বলেছি, তখনও তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কখনই মনে করতে পারি নি, ইনি আমাদের পাঁচ-জনের মত মানুষ। আমার বাল্যমনের রঙে রাঙানো কল্পলোকের দেবতা হয়ে তিনি চিরদিন রইলেন আমার কাছে—তিনি সাধারণ লোক নন, তিনি অতিমানব, তিনি রবি ঠাকুর।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী

এবারেও স্থান এবং সময়াভাবে কালানুক্রমিক রচনাপঞ্জী প্রকাশ সম্ভব হইল না। এই সংখ্যায় ছাপার হরপে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য-রচনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব, এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত রচনা পুনর্মুদ্রিত করিব। এই রচনাটি তাঁহার 'প্রাচীন সাহিত্যে' নিঃসন্দেহে স্থান পাইতে পারিত; আমাদের মনে হয়, অনবধানতাবশতই এটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধটি ১৩০৮ বঙ্গাব্দে একটি অধুনাবিস্মৃত মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩৪৬ সালের কার্তিক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র (পৃ. ১৪৭-৪৮) "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী"তে জ্যোতিষ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার উল্লেখ করিয়াছিলাম। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ড্যালহৌসি পাহাড়ে অবস্থানকালে জ্যোতিষ-বিষয়ে নানা কথা পিতার মুখে মুখে শ্রবণ করিয়া বালক রবীন্দ্রনাথ তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন এবং প্রক্টরের রচিত সহজপাঠ্য ইংরেজী জ্যোতিষগ্রন্থের সহজ অংশগুলি বাংলায় অনুবাদ করিতেন। এই সংবাদ আমরা তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি' ও 'বঙ্গভাষার লেখকে' প্রকাশিত তাঁহার জীবনীতে পাই। এগুলি প্রকাশের কোনও উল্লেখ 'জীবন-স্মৃতি'তে নাই। বরঞ্চ ঐ পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠায় (প্রথম সংস্করণ) তিনি ১২৮৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' (পৃ. ৫৪৩-৫০) প্রকাশিত "ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখ সঙ্গিনী" নামক সমালোচনা-প্রবন্ধকেই তাঁহার প্রথম গদ্য-রচনা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার রচনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং জ্যোতিষ-বিষয়ে তাঁহার কিছু রচনার খবরও আমরা পাইতেছি। সুতরাং অনুমান করিয়াছিলাম, উক্ত প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তাঁহার ধারণা, উক্ত প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ঘাঁটিয়া দেখিয়াছিলাম, ১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায় "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র" নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্রনাথের কোনও হাত থাকিলে নিঃসংশয়ে ইহাই ছাপার অক্ষরে

মুদ্রিত তাঁহার সর্ব্বপ্রথম লেখা। কিন্তু প্রবন্ধটি পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছিল, উহা ভারতীয় জ্যোতিষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোনও বিচক্ষণ লোকের লেখা। সুতরাং আমরা তখন প্রবন্ধটি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি নাই। আমাদের সন্দেহ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ সেই মন্তব্য পাঠ করিয়া স্বয়ং যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালের তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্য্যন্ত আমার মনে ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালক শেষ পর্য্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোনো যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সঙ্গত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোন অন্যায় করা হয় নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার আমার মনে থাকতে পারত না। ইতি ১৫।১০।৩৯

আমাদের মনে হয়, ইহার পর আর কাহারও মনে এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

নিম্নে "জাল কুমারসম্ভব" নামক প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হইল। আশা করি, 'প্রাচীন সাহিত্যে'র পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে।

জাল কুমারসম্ভব

কুমারসম্ভবের প্রথম সাতটি সর্গের পরে আরো দশটি সর্গ বাজারে চলিয়াছে। উক্ত দশ সর্গকে কালিদাসের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করেন, আমাদের দেশে এমন লোকের অভাব নাই। লোকমুখে কবিবরের অনেক দুর্গতি হইয়াছে, ইহাও তাহার মধ্যে একটা।

কবিত্বের তুলনা করিয়া খুঁটাসাঁচ্চার প্রভেদ দেখান যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা অষ্টম সর্গ হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্য্যন্ত কালিদাসের বলিয়া গলাধঃকরণ করিয়াছেন, সম্ভবত তাঁহারা কাব্যের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে পরমযোগীর ন্যায় ভেদজ্ঞানরহিত।

সেইজন্য আমরা একটা অপেক্ষাকৃত সহজ প্রমাণের আশ্রয় লইব। কালিদাসের কাব্যের মধ্যে মুদ্রাদোষ দেখা যায় না। এমন কোন ভঙ্গিমা নাই, যাহাকে রচনাগত অভ্যাসদোষ বলা যাইতে পারে।

কিন্তু অষ্টম হইতে সপ্তদশ সর্গের মধ্যে একপ্রকার প্রশ্নাশ্রিত ভঙ্গী বারংবার দেখা যায়, যাহা প্রথম সাত সর্গের মধ্যে দুর্লভ। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

দশম সর্গের নবম শ্লোকে অগ্নি বলিতেছেন, আমার স্তব শুনিয়া মহাদেব প্রীতিমান্ হইলেন।—স্তোত্রং কস্য ন তুষ্টয়ে? স্তোত্রে কে না তুষ্ট হয়? উক্ত সর্গেই :—

অথ দিব্যাং নদীং দেবীম্ অভ্যনন্দন্ বিলোক্য তাঃ।
কং নাভিনন্দয়ত্যেষা দৃষ্ট্বা পীযূষবাহিনী॥

দিব্যা নদীদেবীকে দেখিয়া তাঁহারা অভিনন্দিত হইলেন। এই পীযূষবাহিনীকে দেখিলে কে অভিনন্দিত না হয়?

ইন্দ্র মহাদেবকে দেখিয়া—

আসীৎ ক্ষণং ক্ষোভপরো, নু কস্য
মনো নহি ক্ষুভ্যতি ধামধাম্নি?

ক্ষণকাল ক্ষোভপর হইয়া রহিলেন, তেজোধামকে দেখিয়া কে না ক্ষোভপর হইয়া থাকে?

প্রভুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া

প্রাপোপবিশ্য প্রমদং সুরেন্দ্রঃ
প্রভুপ্রসাদো হি মুদে ন কস্য?

উপবেশনপূর্ব্বক সুরেন্দ্র প্রমোদিত হইলেন, প্রভুপ্রসাদে কাহাকেই বা প্রমোদিত না করে?

কার্ত্তিককে প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাভিলাষ ইন্দ্র প্রমোদপরায়ণ হইলেন—

ধ্রুবমভিমতে পূর্ণে কো বা মুদা ন হি মাদ্যতি? অভিলাষ পূর্ণ হইলে আমোদে কে না মত্ত হয়?

শৈলসুতা আর কাহাকে লক্ষ্য না করিয়া পুত্রের সমীপস্থ হইলেন—

পুত্রোৎসবে মাদ্যতি কা ন হর্ষাৎ

পুত্রোৎসবে কে না হর্ষে মত্ত হয়?

পুত্রকে দেখিয়া পার্ব্বতী সহস্র চক্ষু পাইতে ইচ্ছা করিলেন—ন নন্দনালোকনমঙ্গলেষু ক্ষণং ক্ষণং তৃপ্যতি কস্য চেতঃ—পুত্রদর্শনমঙ্গলব্যাপারে কাহার চিত্ত প্রতিক্ষণে তৃপ্ত না হয়?

কুমার বাললীলা দ্বারা গিরিশ-গৌরী উভয়ের হৃদয় হরণ করিলেন—

মুদে ন হৃদ্যা কিমু বালকেলিঃ?

হৃদ্যা বাল্যলীলা কাহাকে না আমোদ দেয়?

মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কুমারকে দেখিয়া যুদ্ধে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন—ন, কস্য বীর্য্যায় বরস্য সঙ্গতিঃ? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গলাভ কাহার না বীর্য্যের কারণ হয়?

আরো কি প্রমাণের প্রয়োজন আছে? কাব্যে উপমা-তুলনা দ্বাঁরা ভাবকে পরিস্ফুট ও পাঠকের কল্পনাকে উত্তেজিত করা হইয়া থাকে, কিন্তু বারংবার এমন অনাবশ্যক প্রশ্নের খোঁচা মারিয়া পাঠককে ব্যস্ত করিয়া তোলা কালিদাসে কোথাও ত দেখি নাই। কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গের মধ্যে এমন মূঢ়ের মত প্রশ্ন একটিও কেহ বাহির করিতে পারিবেন না। উপরি উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে দেখা যাইবে, প্রশ্নের দ্বারা কথাগুলাকে আলোড়িত করিয়া তোলা হইয়াছে, সে কথাগুলা অতি সামান্য, তাহাতে কোন পাঠকের সংশয়ের অবকাশমাত্র থাকিতে পারে না। মা ছেলেকে দেখিয়া খুসি হইলেন,—ইহার পরে যদি কোন কবি প্রশ্নস্বরূপে পুনর্ব্বার লেখেন, কোন্ মা ছেলেকে দেখিয়া খুসি না হন? তবে তিনি কালিদাসের সিংহচর্ম্ম পরিয়া আসিলেও কণ্ঠস্বরেই ধরা পড়েন। উপরের প্রশ্নমালা যদি কালিদাসের রচনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহার কাব্য হইতে আরো এমন সহস্র প্রশ্ন হারাইয়া গেছে—সেগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যেমন হরকোপানলে—ভস্মাবশেষং মদনং চকার,—এইখানে থাকা উচিত ছিল, অনলে কে না ভস্ম হয়? যেখানে রতি বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা সেখানে লেখা উচিত, বিলাপকালে কোন্ রমণীর মাথার চুল ঠিক থাকিতে পারে?

সনাতন

শিবনাথ প্রশ্ন করিল, রোগটা কি ?

ননীবাবু প্রবীণ চিকিৎসক, চিকিৎসাবিদ্যা বংশগত বিদ্যা, তিন পুরুষ ধরিয়া এ বংশের প্রত্যেকেই চিকিৎসক হিসাবে শুধু জীবিকাই নয়, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তিও যথেষ্ট পরিমাণে অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে। এই বিদ্যার সঙ্গে ইহাদের একটা যেন জন্মগত পরিচয় আছে। বাড়ির মেয়েরা পর্য্যন্ত নাড়ী দেখিতে জানে, আকস্মিক আপদে-বিপদে দুই-চারিটা টোটকার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তাহারা দিয়া থাকে। ননী ডাক্তার কবিরাজি এবং ডাক্তারি দুই জানেন, ধীর গম্ভীর লোক, এ অঞ্চলে লোকে বলে—ধন্বন্তরি। অবশ্য ননী ডাক্তারের হাতে সকল রোগীই যে বাঁচে তাহা নয়, তবে ননীবাবু ভুল করেন না; ক্ষেত্রবিশেষে সসম্ভ্রমে মৃত্যুকে অভিবাদন করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ান।

ননীবাবু হাসিয়া বলিলেন, রোগটা ? কালরোগ, আর কি ?

কালরোগ !

হ্যাঁ। বয়স যে অনেক। পঁচাশির কম নয়। কাল—মানে বয়সই এখন ব্যাধি। ননীবাবু আবার একটু হাসিলেন।

* * *

শিবনাথদের বাড়ির চার পুরুষের চাকর।

শিবনাথের প্রপিতামহের আমলে এ বাড়িতে বাহাল হইয়াছিল। দশ বছর বয়সের হাড়ীর ছেলে, মোটাসোটা চেহারা, থ্যাবড়া নাক, কুতকুতে চোখ, মাথায় একমাথা কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বলিষ্ঠ গঠন; গরুর রাখালি করিবার জন্য বাহাল হইয়াছিল। নাম সনাতন, কিন্তু মোটাসোটা চেহারার জন্য কর্ত্তা নাম দিয়াছিলেন, কুমড়ো।

ছোট ছোট চোখে অনেকক্ষণ কর্ত্তার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, বাবু মশায়! কত্তাবাবু!

কি রে?

কর্ত্তার পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাবভঙ্গি, কথাবার্ত্তা কুমড়োর মনে কেমন যেন ভয়ের সঞ্চার করিতেছিল; অদ্ভুত, বিস্ময়কর, দুর্ব্বোধ্য! কুমড়ো বিহ্বল করুণ ভাবে সভয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল, আমাকে মারবা না কত্তাবাবু?

বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াও সস্নেহে হাসিয়া কর্ত্তা বলিয়াছিলেন, না, মারব কেন?

ঘরের ভেতর ভ'রে রাখবা না?

না, না। বরং ভাল ক'রে কাজ করলে বকশিশ দেব।

বসকিস দেবা? কি দেবা?

কি নিবি?—কর্ত্তা হাসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

চাপরাসীর লাল শালুর পাগড়িটা দেখাইয়া কুমড়ো বলিয়াছিল, অমুনি লাল টুপি একটো আমাকে দিও।

ঠিক সেই সময়েই বাড়ির ঝি আসিয়া কর্ত্তাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে ঘোমটা টানিয়া মৃদুস্বরে জানাইয়াছিল, বাজার যাইবার জন্য লোকের প্রয়োজন, লবঙ্গের অভাব পড়িয়াছে, পান সাজা বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

চাকরটা কার্য্যান্তরে গিয়াছিল, চাপরাসীরও কার্য্যভার লইয়া বাহিরে যাওয়ার কথা, কর্ত্তা কুমড়োকেই পাঠাইয়াছিলেন, লবঙ্গ নিয়ে আয় চার পয়সার, বুঝলি?

কিছুক্ষণ পর প্রকাণ্ড একটা ঠোঙা হাতে কুমড়ো বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঠোঙাটা নামাইয়া দিয়াছিল, এই ল্যান গো।

ঠোঙায় একঠোঙা নুন।

বাড়িতে হাসির ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। গিন্নী সেবার বুঝাইয়া

দিয়াছিলেন, খেতে ঝাল-ঝাল লাগে, লবঙ্গ, লবণ নয়, বুঝলি? লঙ্গ। লঙ্গ।

দ্বিতীয় বারে আরও একটা বড় ঠোঙা হাতে কুমড়ো ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবার ঠোঙায় একঠোঙা লঙ্কা।

সেবার আর হাসির ধ্বনি বাড়ির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, কাছারি-বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, কুমড়ো বিব্রত এবং বিরক্ত হইয়া লিয়াছিল, বললা যি, ঝাল!

কর্ত্তার খড়ম বাজিয়া উঠিয়াছিল, তিনি এত উচ্চ হাসির জন্য বিরক্ত হইয়াই আসিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত শুনিয়া উচ্চ হাসিতে তিনি গোটা পাড়াখানা সচকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

দীর্ঘ পঁচাত্তর বৎসর পরেও সনাতনের সে কথা এ বাড়িতে সকলেই জানে; পরিবারের ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আরও একটা কথা—সেই প্রথম দিনেরই কথা—বাঁচিয়া আছে। বাড়ির গরু-বাছুর গোঁয়ালে বন্ধ করিয়া, সনাতন বাড়ি যাইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া সরবে কাঁদিয়াছিল, ও—মা গো! ওগো—মা গো!

কর্ত্তা নিজে বাহির হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কে মেরেছে?

হাতের মুঠায় চোখ মুছিতে মুছিতে কুমড়ো বলিয়াছিল, 'আনার' হয়ে যেল যি!

কি?

আঁদার।

আঁধার!

হ্যাঁ। আমি কি ক'রে বাড়ি যাব? 'মোলকিনী' পুকুরের পাড়ে ভূত আছে যি! ভাগাড়ে গো-দানা আছে গো!

কর্ত্তা হাসিয়া চাপরাসী সঙ্গে দিয়া কুমড়োকে বাড়ি পাঠাইয়া

দিয়াছিলেন। সনাতনের সঙ্গে সে কথা আজও বাঁচিয়া আছে। সে তাহার দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য ভূতের আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করিয়াছে।

•

শুধু ভূত নয়, দেবস্থান এবং দেবতাকেও তাহার ভয় ছিল বিষম, সে ভয় আজও তাহার যায় নাই। আর একটা নূতন ভয় তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইল চাকরির কয়েক দিন পরেই।

বড়বাবু অর্থাৎ কর্ত্তাবাবুর বড় ছেলে শিবনাথের পিতামহ কাছারিতে বসিয়া একজন প্রজার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন; মাতব্বর প্রজাটি কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া ফেলিল। কুমড়ো কয়েক আঁটি খড় লইয়া সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা না বুঝিলেও ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত উত্তেজনা গুপ্ত বহ্নির উত্তাপের মত তাহাকে স্পর্শ করিল। বড়বাবুর থমথমে মুখ, মোড়ল মহাশয়ের সোজা বসিবার ভঙ্গি এবং সতেজ কণ্ঠস্বর তাহাকেও উত্তেজিত এবং কৌতূহলী করিয়া তুলিল। সকল কথা মনে নাই, কিন্তু ঘটনাটার শেষ দুইটা কথা সনাতনের বার্দ্ধক্যজনিত বধির কানে আজও বাজে—পারবে না?

সমান তেজে প্রজাটি উত্তর দিল, না।

সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবুর এক লাথিতে এত বড় মানুষটা উল্টাইয়া দাওয়া হইতে একেবারে নীচে আসিয়া পড়িল।

কুমড়োর সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে পলাইয়া আসিল। বড়বাবুর প্রতি দুরন্ত একটা ভয় তাহার বুকে চিরদিনের মত বাসা বাঁধিয়া বসিল। দীর্ঘ দিন চাকরির মধ্যে সে ভয় তাহার আর যায় নাই।

এই কয়টি ভয় বাদ দিয়া কিন্তু সনাতনের দুর্দ্দান্ত সাহস। বাবুদের

'উদাসীর ডাঙা'য় বিস্তীর্ণ জঙ্গলাবৃত প্রান্তরে গো-চারণের মাঠ—সেখানে গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া সাপ যথেষ্ট। গো-চারণের ছোট পাচনি লাঠি ও ঢেলার সাহায্যে কত সাপ যে সে মারিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। শুধু মারাই নয়, সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সে নিজেই সাপকে বন্দী করার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। নেকড়ে জাতীয় হিংস্র হেঁড়োলের বাসস্থান আবিষ্কার করিয়া হেঁড়োলের বাচ্চাও সে ধরিয়া আনিয়াছে। একবার বড় একটা নেকড়ে একটা বাছুর আক্রমণ করিয়াছিল; তখন অবশ্য কুমড়ো আর কুমড়ো নয়, সে তখন আঠারো-উনিশ বছরের কাঁচা জোয়ান; দৈর্ঘ্যে প্রায় সাধারণ মানুষের হাতের সওয়া চার হাত অর্থাৎ ছয় ফিটেরও বেশি। পাচনটা লইয়াই সে নেকড়েটার উপর লাফাইয়া পড়িয়াছিল। নেকড়েটার টুঁটির উপর যখন সে পা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত; সে ক্ষতচিহ্ন তাহার লোলচর্ম্ম দেহে আজও অক্ষয় হইয়া আছে।

জানোয়ারটাকে সে কাঁধে তুলিয়া লইয়া আসিল। চামড়াটা ছাড়াইয়া লইবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু মনিব-বাড়ির চাপরাসীটা সেটাকে লইয়া গিয়া হাজির করিল কাছারিতে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাক পড়িল।

কর্ত্তাবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন, বলিলেন, বেটা অসুর! সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন নায়েবকে, বেটাকে একটা পাগড়ি কিনে দাও তো। আমার মনে আছে, প্রথম দিনই বেটা আমার কাছে লাল পাগড়ি চেয়েছিল।

বড়বাবু গম্ভীরভাবে হুকুম দিলেন, আগে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাক, যে রকম কেটে গেছে, আর নেকড়ে-টেকড়ের দাঁতে বিষ আছে শুনেছি।

সনাতন প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কিন্তু একটু একটু করিয়া সরিয়া আসিয়া আড়াল পড়িতেই একেবারে সোজা দৌড় মারিল। বাপ রে! ডাক্তার ছুরি চালাইয়া দিবে, আষ্টেপৃষ্ঠে ন্যাকড়ার ফালি দিয়া বাঁধিয়া দিবে, বাপ রে! পলাইয়া আসিয়া সে একেবারে গোয়াল-ঘরের মাচায় উঠিয়া বসিয়া রহিল। চাপরাসীটা বার দুয়েক ডাকিয়া ফিরিয়া গেল। পাখির কলরবে সন্ধ্যা আসন্ন বুঝিয়া মাচা হইতে চুপি চুপি নামিয়া গরুগুলাকে গোয়ালে পুরিয়া দিয়া বাড়ি পলাইল। কিন্তু কিছুদূর আসিয়াই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে, সম্মুখে মোলকিনী পুকুরের পাড়ের বটগাছটায় ভূত আছে। ঝাঁকড়া অন্ধকার বটগাছটার পাশেই বাঁশের ঝাড়, ভূত বাঁশ হইয়া রাস্তার উপর পড়িয়া থাকে, কেহ সেটাকে পার হইতে গেলেই তড়াক করিয়া বাঁশটা সোজা উপরে উঠিয়া যায়; বাঁশের সঙ্গে মানুষটাও ওই উপরে উঠিয়া ঘাড় গুঁজিয়া মাটিতে পড়িয়া মরে। শতেক ছলনা ভূতের, ভাদ্রমাসে পাকা তাল হইয়া গাছ হইতে একেবারে নির্ঘাত ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। কখনও বা হঠাৎ একেবারে তালগাছের মত আকাশে মাথা ঠেকাইয়া পথের উপর দাঁড়ায়। এই তালগাছের মত মূর্ত্তিকেই সনাতনের বেশি ভয়। কিন্তু উপায়ই বা কি? এ পথে তো তাহাদের জাতি-জ্ঞাতি ছাড়া বড় কেহ যায় না। আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ এই অংশটা পার হইয়া তবে তাহাদের পল্লী। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সনাতন কাহারও সঙ্গ পাইল না। তাহাদের অন্য সকলে এতক্ষণে বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মরাজতলার বটগাছটির নীচে ঢোল লইয়া গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বৈশাখে বোলান গান, জ্যৈষ্ঠে পাঁচালি, আষাঢ়ে পঞ্চমী হইতে নাগপঞ্চমী পর্য্যন্ত মনসার ভাসান, ভাদ্রে ভাদু, আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত পাঁচমিশালী, চৈত্রে ঘেঁটু।

সনাতন নিজে গান গাহিতে পারে না। কর্কশ মোটা কণ্ঠস্বর, কিন্তু উৎসাহ তাহার প্রবল। কোনরূপে সে বুক বাঁধিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ঠিক করিল, বটগাছতলাটার আগে হইতেই সে চোখ বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবে।

মোলকিনীর পাড়ে আসিয়া সে চোখ বন্ধ করিল। কিন্তু চোখ সে আপনার অজ্ঞাতসারেই বার বার খুলিয়া ফেলিতেছিল।

ও কে? বুকের ভিতরটায় যেন ঢেঁকি দিয়া কেহ হৃৎপিণ্ডটাকে কুটিতেছে! সাদা-কাপড়-পরা ছোট আকারের ও কে ওখানে ঘুরিতেছে! সে অদ্ভুত একটা বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, কে? মূর্ত্তিটা এতক্ষণ তাহাকে বোধ হয় দেখে নাই, তাহার অদ্ভুত বিকৃত স্বরের সাড়ায় এবার সে ঘুরিয়া খানিক আগাইয়া আসিয়া খিলখিল শব্দে হাসিয়া উঠিল। সনাতনের চেতনা লোপ পাইতেছিল, প্রাণপণে সে চেতনাকে জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা করিল।

মূর্ত্তিটা আরও খানিকটা আগাইয়া আসিয়া নাকী সুরে বলিল, আঁমি ভূঁত। সঙ্গে সঙ্গে আবার সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এবার সনাতনের সর্ব্বাঙ্গে একটা অতি উত্তেজনাময় উষ্ণ চেতনার প্রবাহ ভয়ের হিমশীতল অন্ধকারের মধ্যে অগ্নিগর্ভ বিদ্যুৎ চমকের মত খেলিয়া গেল।

নন্দ! ভূত নয়, নন্দরাণী—তাহাদেরই সেই ডাকাবুকো মেয়েটা—কষ্টিপাথরের মত কালো, শ্যাওলার মত নরম—সেই মেয়েটা! ভয় সনাতনের কোথায় চলিয়া গেল, সে বুঝিল না, বুঝিতেও চাহিল না; বিপুল উত্তেজনাময় উল্লাসে সেও হো-হো করিয়া হাসিয়া নন্দর দিকে ছুটিল। মুহূর্ত্তে মেয়েটাও ছুটিল। সুদীর্ঘ সনাতন, আর নন্দ ছোটখাটো

মেয়েটি, সে কতক্ষণ তাহার আগে আগে ছুটিবে! সনাতন লম্বা হাত বাড়াইল। কিন্তু অদ্ভুত কৌশল মেয়েটার—চট করিয়া পাশ কাটাইয়া এমন মোড় ফিরিল যে, সনাতন শূন্য হাত বাড়াইয়া গতির আবেগে চলিয়া গেল—নন্দ অন্য দিকে সরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল। এমনই একবার নয়, বার বার। ভাদ্রমাসের অন্ধকার সে হাসিতে যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে নন্দকে সে যখন ধরিল, তখন নন্দ এলাইয়া পড়িয়াছে। সনাতনও হাঁপাইতেছিল। তবুও সে শিশুর মত নন্দর ছোট দেহখানি দুই হাতে তাহার মাথার উপরে তুলিয়া বলিল, দি, ফেলে দি আছিড়ে?

সুকৌশলে ঈষৎ ঝুঁকিয়া নন্দ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কই, দে দেখি!

ভাদ্র-সন্ধ্যায় নন্দ তালের খোঁজে আসিয়াছিল।

এই নন্দকেই সে বিবাহ করিল। সেও একটা কাণ্ড। নন্দর বাপ পণের দাবি করিল অনেক—এক কুড়ি পাঁচ টাকা।

পরের দিন নন্দকে আর পাওয়া গেল না। সে এক হৈ-চৈ ব্যাপার। সনাতন কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে মনিব-বাড়িতে কাজ করিতেছিল। ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে থানা-পুলিসকে লোকে এড়াইয়াই চলিত, আইন কানুনও জানিত না। নন্দর বাপ-মা বড়বাবুর কাছে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বড়বাবু কড়া লোক, সূক্ষ্ম বিচারক; কর্ত্তাবাবুর সবতাতেই হাসি।

আজ্ঞে হুজুর, ওই—ওই শালারই কাজ।

বড়বাবু হুকুম দিলেন, ডাক তো বেটাকে। কিন্তু সনাতন তথ-

অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। চাপরাসীটা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ্ঞে, কোথাও পেলাম না।

সবিস্ময়ে বড়বাবু বলিলেন, আরে, এই তো ছিল!

একান্ত নিরুপায় ভঙ্গিতে চাপরাসীটা বলিল, আজ্ঞে, তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলাম।

ঠিক এই সময়ে কর্ত্তাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি হাসিলেন, বলিলেন, সে বেটা অসুর গেল কোথায়?

এই ছিল, কিন্তু আর পাওয়া যাচ্ছে না।

কর্ত্তাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাড়ির বাগানের গাছগুলার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর চলিয়া গেলেন গোয়াল-বাড়ির দিকে। সেখানে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, গোয়াল-ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, এই ব্যাটা অসুর!

গোয়ালের মাচার উপরে খসখস শব্দ হইতেছিল, শব্দটা থামিয়া গেল।

এবার কর্ত্তা ঈষৎ কঠোর স্বরে ডাকিলেন, সনাতনে!

মাচার উপর হইতে ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সনাতন দাঁড়াইল।

কর্ত্তা আবার একবার উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই হারামজাদী হাড়িনী, নাম মাচা থেকে।

বিড়ালীর মত কড়িকাঠ আঁকড়াইয়া ঝুলিতে ঝুলিতে এবার নন্দ লাফাইয়া নামিল।

কর্ত্তা বলিলেন, আয়।

নিঃশব্দে পোষা জানোয়ারের মত কর্ত্তাবাবুর পিছনে পিছনে কাছারিতে আসিতেই নন্দর বাপ-মা দারুণ ক্রোধে উচ্চ চীৎকার আরম্ভ

করিয়া দিল। বড়বাবুর চোখ দুইটাও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ভয়ে সনাতন যেন অসাড় পঙ্গু হইয়া গেল। কর্ত্তাবাবু গম্ভীর স্বরে নন্দর বাপ-মাকে বলিলেন, চেঁচাস নি। তারপর নায়েবকে বলিলেন, পঁচিশটা টাকা আমাকে দাও তো।

বড়বাবু প্রশ্ন করিলেন, আজ্ঞে?

পঁচিশটা টাকা। কর্ত্তাবাবু নায়েবের দিকে চাহিলেন। নায়েব বিনা বাক্যব্যয়ে পঁচিশটা টাকা বাহির করিয়া দিল। কর্ত্তাবাবু নন্দর বাপকে ডাকিয়া বলিলেন, নে, গুনে নে। আজ রাত্রেই বিয়ে দিতে হবে, বুঝলি?

বিবাহের পর সনাতন গোল বাধাইল। যে সনাতন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মনিব-বাড়িতে পড়িয়া থাকিত, সেই সনাতন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ি পলাইতে আরম্ভ করিল। সনাতন এই আছে, এই নাই। শুধু তাই নয়, সেদিন চাপরাসীটা সনাতনকে ডাকিতে গিয়াছিল, সনাতন তাহাকে বেশ ঘা-কতক লাগাইয়া দিল। ইহার পর তিন চার জন চাপরাসী গিয়া সনাতনকে বাঁধিয়া লইয়া আসিল। বড়বাবু তাহাকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। কিন্তু কর্ত্তাবাবু কি সুনজরেই তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি সে দণ্ড মাপ করিয়া বলিলেন, দে, নাকে খত দে বেটা শুয়ার।

মাটির উপরে নাক ঘষিয়া সনাতন চামড়া পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিল। রক্তাক্ত নাকটা দেখিয়া এবার বড়বাবুও হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, খবরদার, এমন কাজ আর যেন করবি না।

সনাতন কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, আমি ছেলাম না বাড়িতে, প্যায়দা কেনে উঠোনে দাঁড়িয়ে হাসছিল মাশায়?

বড়বাবু এবার কঠিন দৃষ্টিতে চাপরাসীটার দিকে চাহিলেন। কর্ত্তাবাবু বিচিত্র মানুষ, তিনি এক কথায় ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া বলিলেন, তোর বউকেও আজ থেকে কাজ করতে হবে এখানে, বুঝলি? সকালবেলা থেকে খোকাকে নিয়ে থাকবে। আর দুপুরবেলায় তুই গরু নিয়ে যাবি মাঠে, ঝুড়ি নিয়ে বউ যাবে তোর সঙ্গে, গোবর কুড়িয়ে মাঠে জড়ো করবে। বুঝলি? দুবেলা খেতে পাবে, বছরে পূজোর সময় একখানা কাপড়।

সনাতন উল্লাসে যে কি করিবে খুঁজিয়া পাইল না। গোয়াল-বাড়িতে আসিয়া বড় মহিষটার গলা ধরিয়া দশটা চুমা খাইল, খানিকটা নাচিল, ভেড়ার পালের মেড়াটার সঙ্গে চুঁ খেলিয়া উপর-হাতের পেশীতে কালসিটে পড়াইয়া ফেলিল। আঃ, কর্ত্তাবাবুকে কাঁধে করিয়া সে যদি নাচিতে পাইত! অথবা বাবুর পায়ের তলাটা যদি জিব দিয়া চাটিতে পাইত! সে ছুটিয়া গিয়া নন্দকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিল।

অতর্কিত আকর্ষণে নন্দ বিব্রত এবং বিরক্ত হইয়া গালিগালাজ আরম্ভ করিল, কিন্তু সনাতন সে গ্রাহ্যই করিল না।

ইহার পর নন্দ সকাল হইতে বড়বাবুর খোকাকে—শিবনাথের বাপকে লইয়া বসিয়া থাকিত, খেলা দিত। সনাতন কাজ করিত, মধ্যে মধ্যে খোকাকে কাঁধে লইয়া নাচিত, কখনও কখনও খোকার পিঠে মৃদু মৃদু কিল চড় মারিত, কান মলিয়া দিত, বলিত, দু-চার ঘা মেরে রাখি নন্দ; বড় হ'লে তখন তো চোখ লাল করবে, দেবে ক'ষে জুতোর বাড়ি।

নন্দ হাসিত মৃদু হাসি, সনাতনের হাসি অট্টহাসি।

দুপুরে নির্জ্জন উদাসীর প্রান্তরে সনাতন বটগাছতলায় বসিয়া থাকিত; নন্দ তাহার পাচনি লাঠিটা লইয়া গরু-মহিষগুলাকে

আগলাইয়া ফিরিত। লাঠি হাতে নন্দকে এমন সুন্দর মানাইত! খাটো মোটা কাপড় পরা, মাথায় খাটো নন্দর হাতে সনাতনের লাঠি-গাছটা নন্দর মাথার উপরেও খানিকটা উঠিয়া থাকিত। নন্দ নির্ভয়ে প্রকাণ্ড কালো মহিষ দুইটাকে দুমদাম করিয়া পিটিত। কখনও কখনও সে সুকৌশলে উঠিয়া বসিত মহিষের পিঠে, মহিষটা চলিত, নন্দ এমন দুলিত সেই চলার সঙ্গে সঙ্গে যে, সনাতনও ছুটিয়া গিয়া চড়িয়া বসিত অন্য মহিষটার পিঠে।

মহিষের পিঠের উপর হইতেই নন্দ প্রথম দিনই চীৎকার করিয়া উঠিল, সাপ! আলান!

প্রকাণ্ড বড় এক আলান—অর্থাৎ আল কেউটে চলিয়া যাইতেছিল, নন্দর চীৎকারে সেটা অল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সনাতন দেখিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে হাসিয়া বলিল, ওর নাম কালকুটি, কিচ্ছু বলে না বুড়ী। বুঝলি, ওকে যেন মারতে-টারতে যাস না। তারপর সে হাতে তালি দিয়া বলিল, যা যা বুড়ী, চলে যা।

সাপটা আর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সনাতন এখানকার কীট-পতঙ্গটিকেও চেনে। ওই প্রকাণ্ড বড় কেউটেটার রীতিনীতি, গতিবিধি সব তাহার সুবিদিত, এমন কি কালকুটির গর্ত্তটাও সে চেনে। কালকুটির বহু শাবককে সে হত্যা করিয়াছে। সেগুলার স্বভাব মায়ের মত নয়। সনাতন জানে, বয়স হইলে উহারাও এমনই ধীর স্থির হইবে, কিন্তু বয়স হইতে হইতে যে কত জীবজন্তু মানুষ মারিবে তাহার কি ঠিক আছে? আষাঢ় মাসের প্রথম হইতেই সে সন্তর্পণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে গর্ত্তটার আশে-পাশে। সহসা একদিন দেখা যায়, কালো কালো সর্পশিশুতে চারিপাশ ভরিয়া গিয়াছে। সাপের ডিম, গরম-খোলায়-দেওয়া ধান হইতে খইয়ের

নত ফোটে যে! ডিম ফাটিয়া ছটকাইয়া বাহির হয় সাপের বাচ্চা। রহিলে উহাদের মা ওই কালকুটিই যে খাইয়া ফেলিবে উহাদের। গর্তের ভিতরে উদ্যত গ্রাসে বসিয়া থাকে কালকুটি, উপরে থাকে সনাতন লাঠি লইয়া। তবুও যাহারা বাঁচিয়া যায়, তাহারা বড় হইয়াও প্রাণ দেয় সনাতনের হাতে।

নন্দ সেদিন কালকুটিকে চিনিল, ক্রমে ক্রমে আরও অনেককে চিনিল, কত নূতনকে অবিষ্কার করিল, প্রজাপতির ডিম সনাতন চিনিত না, সে জানিত সেগুলা মরা কাচপোকা, নন্দ সনাতনকে চিনাইয়া দিল। দুইজনে মিলিয়া গোবর কুড়াইয়া বানাইয়া তুলিল প্রায় একটি পাহাড়।

কর্তাবাবু খুশি হইয়া গোটা একটা টাকা বকশিশ দিলেন। সনাতন সেদিন নন্দকে আদর করিল, তু আমার আনার ঘরের আলো!

নন্দ অবাক হইয়া গেল।

সনাতন সেই দিনই কথাটা শিখিয়াছে বড়বাবুর কাছে। পূজার কাপড়ের প্রকাণ্ড গাঁটরি মাথায় সনাতন বড়বাবুর সঙ্গে বাড়ির ভিতর গিয়াছিল। বড়গিন্নী অন্ধকার বড়ঘরের দরজা খুলিয়া বলিয়াছিলেন, দাঁড়াও, আলো জ্বেলে দিই।

বড়বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, দরকার নেই, তুমি আমার আঁধার ঘরের আলো!

কথাটা সনাতনের বড় ভাল লাগিয়াছে।

*　　　*　　　*

বছর দশেক পরে সেই নন্দ একদিন সনাতনকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল; সন্তান প্রসব করিতে গিয়া মারা পড়িল। সনাতনের সে অবস্থা বর্ণনার অতীত; কর্কশ উচ্চকণ্ঠের কুণ্ঠাহীন আর্ত্ত চীৎকারে সমস্ত গ্রামখানাকে নিশীথরাত্রে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কর্ত্তাবাবু তখন মারা গিয়াছেন, বড়বাবু তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়াছিলেন, সেই লোকের সঙ্গে শিবনাথের বাবাও গিয়াছিলেন। সনাতনকে তিনি বড় ভালবাসেন, সে তাঁহাকে মানুষ করিয়াছে। শবদেহের পাশে একটি কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল, উঠানে সে আলো বিশেষ আসিয়া পড়ে নাই, অন্ধকার উঠানে অসুরের মত প্রশস্ত প্রকাণ্ড বুকে বাঘের থাবার মত হাত চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে সনাতন, চোখের জলে চোখ মুখ ভাসিয়া যাইতেছে।

সৎকার করিয়া পরদিন সে যখন মনিব-বাড়িতে আসিল, তখন চোখ দুইটা তাহার কুঁচের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সকলে ভাবিল, সনাতন পাগল হইয়া যাইবে।

সেইদিন গভীর রাত্রে সে যখন ছুটিয়া আসিয়া কাছারির দাওয়ায় চাপরাসীটার পাশে আসিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল, তখন পাগল হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া চাপরাসীটা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সনাতন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, নন্দ, প্যায়দা, নন্দ বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াইছে।

মাস-খানেক পরেই একদিন সকালে চাপরাসীটা বলিল, সনাতন আসে নাই।

বড়বাবু বলিলেন, ডেকে নিয়ে আয়।

চাপরাসীটা বলিল, আজ্ঞে, রাত্রে উঠে সে কোথা চ'লে গিয়েছে। এইখানে আমার কাছেই তো শোয় এখন, ভোররাত্রে উঠে গেল, তারপর আর আসে নাই।

কড়া মেজাজের মানুষ বড়বাবুও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।—

নন্দর শোকে সনাতন দেশত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু পরের দিনই সনাতন ফিরিয়া আসিল।

চাপরাসীটা প্রশ্ন করিল, কোথায় গিয়েছিলি?

সনাতন জবাব দিল, গেয়েছিলাম যেথানে মন হলছিল।

আবার দিন দুই পরে দেখা গেল, সনাতন নাই। সেদিন সন্ধ্যা হইতেই সে নিখোঁজ। যে সনাতন নন্দর প্রেতাত্মার ভয়ে সন্ধ্যাতেই ভয়কাতর শিশুর মত অসহায় হইয়া পড়ে, সে রাত্রির অন্ধকারেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

চার দিন পর সে ফিরিল। বড়বাবু এবার রুষ্টভাবেই বলিলেন, এমন করবি তো কাজে জবাব দে। সন্ন্যাসী হতে চাস তো সন্ন্যাসীই হয়ে যা। আর নয় তো আবার বিয়ে-থা ক'রে ঘরসংসার কর, কাজকর্ম্ম কর।

সনাতন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বড়বাবু বলিলেন, কি বলছিস?

নখ দিয়া দেওয়াল খুঁটিতে খুঁটিতে সনাতন বলিল, আজ্ঞে—

বুঝলি আমার কথা?

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া সনাতন আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। একেবারে সটান অন্দরে আসিয়া বড়গিন্নীর সম্মুখে জোড়-হাত করিয়া দাঁড়াইল।

দু কুড়ি টাকা আপুনি দ্যান। লইলে বড়বাবুকে ব'লে দ্যান।

বড়গিন্নী সবিস্ময়ে বলিলেন, দু কুড়ি টাকা নিয়ে কি করবি তুই? তীর্থ যাবি নাকি?

সনাতন মাথা চুলকাইয়া বলিল, বড়বাবু বলছেন বিয়ে করতে।

বিয়ে করতে?—সস্নেহে হাসিয়া বড়গিন্নী বলিলেন, ভালই বলেছেন

রে। মরণকে ঠেকিয়ে তো সংসার করা যায় না বাবা, তার জন্যে বিবাগী হ'লে কি চলে?

পরম আগ্রহে সম্মতি জানাইয়া সনাতন বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

খুশি হইয়াই গিন্নী বলিলেন, বেশ, কনে ঠিক কর, টাকার জন্যে বলব আমি বড়বাবুকে।

আজ্ঞে, কনে আমি ঠিক করেছি, টাকা হ'লেই হয়।

বাড়ির মেয়েরা বিস্ময়ে খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া কলরব করিয়া উঠিল, ও মাগো!

কোথায় রে, কোথায়? কবে ঠিক করলি রে এর মধ্যে?

কেমন কনে রে? কত বড়? দেখতে কেমন?

সনাতন বসিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পুলকিত লজ্জার সহিত সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল।

মেয়েটির বাড়ি ক্রোশ খানেকের মধ্যেই—যুগলপুরে। অনেক দিন হইতেই সনাতন চেনে। হাটে সে নিয়মিত আসে। সনাতন বলিল, কনে আজ্ঞে ভারী সোন্দর। আর বয়েস, তা খানিক হবে বইকি!

সনাতন বর্ণনায় অতিরঞ্জন করে নাই। মেয়েটি সত্যই সুন্দর দেখিতে। বর্ণে সে গৌরী, মুখশ্রীতে লাবণ্যময়ী, কেবল চোখ দুইটি খয়রা রঙের; গঠনে সে দীর্ঘাঙ্গী, বয়সে বাইশ-চব্বিশ। সনাতন বৈরাগ্যের বশে মধ্যে মধ্যে নিখোঁজ হয় নাই, মেয়েটির প্রেমের আকর্ষণেই সেখানে ছুটিয়া গিয়া পড়িতেছিল। মেয়েটি সধবা। অনেক কাণ্ডের পর তাহার স্বামী দুই কুড়ি টাকার বিনিময়ে তাহাকে ছাড়পত্র দিতে রাজী হইয়াছে। সেদিন রাত্রে তাহাদের দুইজনকে একত্র পাকড়াও করিয়া সনাতনকে তাহারা দুরন্ত প্রহার দিয়াছিল। সনাতন সে গ্রাহ্য করে নাই, মার খাইয়াও স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে, ছেড়ে দিস তো

দে, নইলে আমি নিয়ে পালাব। শুধো কেনে ওকে—উ-ও থাকবে না তোর কাছে।

মেয়েটার লজ্জার আবরণ নিঃশেষে খসিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর মার খাইয়া সে উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেও বলিয়াছিল, আজই যাব আমি উয়োর সঙ্গে।

শেষ পর্য্যন্ত দুই কুড়ি টাকায় সনাতন রফা করিয়া আসিয়াছে।

* * *

আবার সনাতন ঘর বাঁধিল, সংসার পাতিল। নিজের ঘর ছাড়িয়া সে নূতন ঘর তৈরি করিল বাবুদের গোয়াল-বাড়ির পাশেই। পুরানো বাড়িতে নন্দ ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন দিন রাত্রে কড়িকাঠে বসিয়া সে যদি তালগাছের মত মোটা পা বাহির করিয়া ঘুমন্ত অবস্থায় বুকে চাপাইয়া দেয়, তবে—! ঝাঁকড়া চুল ভর্ত্তি মাথাটা বারবার নাড়িয়া সনাতন আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠে। তাই সে নূতন করিয়া ঘর গড়িল—সে ঘরে নন্দর এতটুকু জিনিসও সে রাখিল না, আপনার সামগ্রীর লোভে নন্দ যে নিশ্চয় এখানে আসিয়া হাজির হইবে।

নূতন বউয়ের নামটিও বড় ভাল, পেরভাতী, অর্থাৎ প্রভাতী। মেয়েটি কিন্তু বিলাসিনী। চলনে-বলনে, আহারে-রুচিতে, পোশাকে-প্রসাধনে সনাতনের বিপরীত। মেয়েটি চলে হেলিয়া দুলিয়া, কথা কহিতে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়ে, পোড়ানো সামগ্রী তাহার মুখে রোচে না, সে পান খায়, দোক্তা খায়, কাপড় পরে পা ঢাকিয়া পরিপাটী ছাঁদে, চুল বাঁধে বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মত 'আলবোট' কাটিয়া। অথচ সনাতন ভালবাসে পোড়ানো জিনিস খাইতে, সে ভালবাসে খাটো মোটা কাপড় আঁটসাঁট করিয়া পরিতে, রুক্ষ চুল টানিয়া মাথার উপর ঝুঁটি-খোঁপা তাহার সবচেয়ে ভাল লাগে। নন্দর মত গোবর প্রভাতী

ফুড়াইবে না। ছেলের ঝি হইতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাবুদের বাড়িতে শিশু ছেলেও কেহ নাই।

তবুও সনাতন অবনত মস্তকে মন্ত্রমুগ্ধের মত পেরভাতীর আনুগত্য স্বীকার করিল। প্রভাতীর মনোরঞ্জনের জন্য এখানে ওখানে সে ঋণ করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে মনিব-বাড়ির কাজের উপর আর একটা কাজ লইল; ও-পাড়ার হীরু চাটুজ্জে বিদেশে চাকরি করে, এবার সে মেয়েছেলে লইয়া গিয়াছে, রাত্রে তাহার বাড়িতে পাহারা দিবার কাজ লইল সনাতন। প্রভাতীকে সঙ্গে লইয়া সে সন্ধ্যার পর চাটুজ্জের বাড়ি যাইত। আবার ভোরবেলায় উঠিয়া চলিয়া আসিত।

মাস কয়েক পর—

সেদিন পেরভাতী কোন ভদ্রলোকের বধূ বা কন্যার পরনের শাড়ি দেখিয়া বলিল, ওই শাড়ি আমার চাই।

সনাতন মাথায় হাত দিয়া বসিল। মনিব-বাড়িতে বিবাহের ঋণ জমিয়া আছে, এখানে ওখানে যে ঋণ করিয়াছে সেও শোধ হয় নাই, এখন টাকা কোথায় মিলিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আসিল ছোটবাবু অর্থাৎ শিবনাথের বাপের কাছে। ছোটবাবুকে নন্দ ও সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, আর ছোটবাবু এখনও পুরা বাবু হইয়া উঠে নাই, জুতা মারিবার বয়স হয় নাই, সনাতন ছোটবাবুর পায়ের কাছে বসিয়া পা টিপিতে টিপিতে সলজ্জভাবেই কথাটা ব্যক্ত করিল।

ছোটবাবুও একটু লজ্জিত হইলেন, টাকা তো আমার কাছে নেই সনাতন।

গিন্নীমাকে চাও। নয়তো বউরাণীর কাছে নাও। আমাকে কিন্তুক দিতে হবে ছোটবাবু। ছোটবাবুর তখন বিবাহ হইয়াছে, দশ-এগারো বছরের বধূ।

আচ্ছা, কাল বলব তোকে।

সনাতন খুশী হইয়া আসিয়া পেরভাতীকে বলিল, কাল।

পরদিন সকালেই ছোটবাবু টাকা লইয়া গিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সনাতন বসিয়া আছে, তাহার সে মূর্ত্তি অদ্ভুত। চোখ দুইটা রাঙা, মুখখানা ভীষণ, আর প্রভাতী দাওয়ার উপর পড়িয়া আছে উপুড় হইয়া অসম্বৃত বেশে, অনাবৃত গৌরবর্ণ পিঠখানায় প্রহার-চিহ্ন রক্তমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছোটবাবু প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে সনাতন?

সনাতন গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আজ আধ-মরা ক'রে ছেড়েছি, এক-দিন কিন্তুক নিদ্দম মেরে ফেলাব ছোটবাবু।

প্রভাতীর পিঠের প্রহার-চিহ্নগুলি দেখিয়া ছোটবাবু সনাতনকেই তিরস্কার করিলেন, ছিঃ, এমনই ক'রেই কি মারে রে!

প্রভাতী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সনাতন গর্জ্জন করিয়া বলিল, রেতের বেলায় চাটুজ্জের বাড়িতে আমাকে একখানা বস্তা দিয়ে বলে কি, বাখার থেকে ধান বার ক'রে লে। আমি চুরি করব ছোটবাবু!

ছোটবাবুর মনে পড়িল ছেলেবেলার কথা। তাঁহাদের বাড়ির আমগাছটায় আম পাকিত সকল গাছের আগে। যতটি আম গাছ হইতে পড়িত সনাতন কুড়াইয়া বাড়িতে দিয়া আসিত, কখনও তিনি সনাতনকে কুড়াইয়া লইয়া আম খাইতে দেখেন নাই। একবার তিনি চাহিয়াছিলেন একটা আম। সনাতন বলিয়াছিল, বাড়িতে লেবা।

ছোটবাবু কাপড়ের টাকা দিতে গেলে সনাতন লইল না, বলিল, এক ছুঁচ ওকে আমি দোব না।

প্রভাতীও সহ্য করিবার মেয়ে নয়; মাস খানেক পরে সে পলাইয়া গেল। বাবুদের বাড়ির চাপরাসীটার সঙ্গে—সনাতনের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া

নিরুদ্দেশ হইল। শুধু তাই নয়, ঘরের মধ্যে সনাতনকে পাওয়া গেল আহত রক্তাক্ত অবস্থায়। বঁটির একটা কোপ তাহার ঘাড়ে বসাইয়া দিয়াছিল। দশ দিন অচেতন অবস্থায় থাকিয়া সনাতন বাঁচিল। সে দশ দিন অচেতন সনাতনের কি চীৎকার!

নিশীথরাত্রে ঘুমন্ত মানুষ শিহরিয়া জাগিয়া উঠিয়া শুনিত, সনাতন যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে—আঁ—আঁ—আঁ—।

দশ দিন পর চেতনা পাইয়া সনাতন বড়বাবুকে সম্মুখে দেখিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওগো বড়বাবু গো! আমি আর বাঁচব না গো!

তাহার সে কাতরতায় বড়বাবুও বিচলিত হইলেন, সনাতন তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করে, আজ সে তাঁহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে একান্ত আপন জনের মত।

ছোটবাবুকে সে বলিল, বাঁচি তো আর মেয়ের মুখ দেখব না ছোটবাবু।

সনাতন বাঁচিল।

সনাতন বাঁচিল এবং মাস খানেক না যাইতেই আবার সে বিবাহ করিল। অত্যন্ত কুৎসিতদর্শনা একটা মেয়ে। অতুল স্বাস্থ্য এবং আকারে সে সনাতনেরই যোগ্যা। কর্ত্তাবাবু সনাতনের নাম দিয়াছিলেন—অসুর, এবার ছোটবাবু সনাতনের নূতন বধূর নাম দিলেন—হিড়িম্বা।

সনাতন অতি সলজ্জভাবে পুলকিত হইয়া হাসিল।

নূতন বধূটিও হাসিল—হি-হি করিয়া হাসিল—নির্ব্বোধের মত; সে

হাসি দেখিয়া ছোটবাবুর গা-ঘিনঘিন করিয়া উঠিল—হাসির সঙ্গে মেয়েটার মুখ দিয়া লালা গড়াইয়া পড়ে। কিন্তু হিড়িম্বা অদ্ভুত, কিছু-দিনের মধ্যেই সে সনাতনকে ঠাকুর করিয়া তুলিল। সনাতনকে সে সকালবেলায় গোয়াল পরিষ্কার করিতে গোবর ঘাঁটিতে দেয় না, নিজেই সে গোবর পরিষ্কার করে ; নন্দর মত সেও ঝুড়ি লইয়া সনাতনের সঙ্গে মাঠে যায়, সেখানে সনাতন ঘুমায়—একা হিড়িম্বা গরু মহিষ আগলায়, গোবর কুড়ায়, কুঁচিকাঠি সংগ্রহ করে, জ্বালানী কাঠ জড়ো করে। জ্বালানী কাঠের জন্য অবলীলাক্রমে সে তালগাছে উঠিয়া যায়। কুঁচি-কাঠি বিক্রি করিয়া সে পয়সা আনে, বাড়িতে ঘুঁটে দিয়া—ঘুঁটে হইতেও মাসে এক টাকা দেড় টাকা হয়।

সনাতনের অদৃষ্ট! এই হিড়িম্বাও তাহার অদৃষ্টে সহ্য হইল না ; অদৃষ্টের তাড়নায় সে নিজেই একদিন দুর্দ্দান্ত প্রহার দিয়া শেষে গলায় হাত দিয়া হিড়িম্বাকে বাহির করিয়া দিল।

হিড়িম্বার সে কি কান্না!

ছোটবাবু মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হিতে বিপরীত হইয়া গেল।

সনাতন বলিল, সন্দেশের রস রাক্ষুসী চুষে মেরে দিলে!

সনাতন কয়েকটা রসগোল্লা কিনিয়া আনিয়াছিল, হিড়িম্বা লোভের বশে গোপনে রসগোল্লাগুলি চুষিয়া খাইতেছিল, সনাতন সেটা দেখিয়া ফেলিয়াছে।

ছোটবাবু হাসিয়া ফেলিলেন।

সনাতন বলিল, ভাত ডাল যা হয় ঘরে আগে-ভাগে চুরি ক'রে খায়! মারের চোটে আজ নিজেই বলেছে।

ছোটবাবু বলিলেন, আচ্ছা, আর খাবে না।

তবুও সনাতন অটল। বলিল, উওর এত বড় বাড়, আমাকে 'মর' বলে! আমি মরব! আমি ম'রে যাব ছোটবাবু!

ছোটবাবু হাসিলেন, আবার খানিকটা বিরক্তও হইলেন, 'মর' বললেই কি মানুষ মরে সনাতন?

বার বার ঘাড় নাড়িয়া সনাতন তবুও বলিল, আজ্ঞে না। আমাকে 'মর' বললে উ!

এবার ধমক দিয়া ছোটবাবু বলিলেন, 'মর' বললে তো হ'ল কি? তুই অমর নাকি? মরবি না তুই?

ছোটবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া সনাতন বলিল, আপুনি আমাকে 'মর' বলছ ছোটবাবু!

সে এত দিনের মনিব-বাড়ির কাজে জবাব দিয়া সেই দিনই কোথায় চলিয়া গেল।

ফিরিল সে দীর্ঘ দিন পর। আজ হইতে বৎসর খানেক আগে। তখনও সে সমর্থ, এত বড় দেহ আশির উপর বয়সেও প্রায় সোজাই আছে; অল্প একটু নমিত হইয়াছে মাত্র, আর চলিবার গতি মন্থর হইয়াছে।

এক মাথা পাকা চুল, প্রকাণ্ড বড় পাকা গোঁফ, স্থবির অসুরের মত দেহ, সনাতন একেবারে মনিব-বাড়ির অন্দরে আসিয়া ঢুকিয়াছিল। কাছারিতে যাইতে সাহস হয় নাই। এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির কি কৈফিয়ৎ দিবে বড়বাবুর কাছে! ছোটবাবুর সম্মুখে মুখ দেখাইবে কি করিয়া!

শিবনাথের বধূ, শিবনাথের ভগ্নী সকলে বিস্ময়ে ভয়ে চকিত হইয়া

উঠিল। সনাতনও হতভম্ভ হইয়া গেল। কাহাকেও সে চেনে না, ইহারা সব কে?

শিবনাথের মা আসিয়া, অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি সনাতন? বালিকা-বয়সে তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি এ বাড়িতে আসিবার পর, বৎসর দুয়েক সনাতন এ বাড়িতে ছিল; কিন্তু তবু তিনি তাহাকে চিনিলেন, সনাতনের আকৃতির জন্য।

সনাতন একমুখ হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকরুন। একবার গিন্নীমাকে আর বউ-ঠাকরুনকে ডেকে ছ্যান তো। বলেন—সনাতন আইচে।

শিবনাথের মা অল্প হাসিয়া বলিলেন, আমিই বউ-ঠাকরুন সনাতন। গিন্নীমা তো নেই।

সনাতন নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই প্রৌঢ়া বিধবা—তাহার ছোটবাবুর কচি বউটি! গিন্নীমা নাই! তবে কি, তবে কি—! সে দ্রুত উঠিয়া কাছারি-বাড়িতে আসিল।

শিবনাথ নূতন, নায়েব নূতন, চাপরাসী নূতন, চাকর নূতন—সকলে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কে তুমি?

সনাতন চারিদিক খুঁজিতেছিল। কোন উত্তরই সে দিল না। উত্তর দিলেন শিবনাথের মা। তিনি তাহার পিছন পিছন আসিয়াছিলেন। সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, শিবু, এই সনাতন। সনাতনকে বলিলেন, সনাতন, এই আমার ছেলে।

সনাতন এতক্ষণে প্রশ্ন করিল, বড়বাবু নাই? ছোটবাবু নাই?

* * *

গোয়াল-বাড়ির একখানা খালি ঘরে সনাতন আশ্রয় লইল। শিবনাথের বাড়িতেই অন্নের বরাদ্দ করিয়া দিলেন শিবনাথের মা।

প্রথম দিনই পাচিকা ভাত দিয়া গালে হাত দিল। সনাতন ভাত লইল তিন বার। শিবনাথের মা হাসিলেন। সনাতনের আহার এখনও প্রায় সমানই আছে। খাইতে বসিলে শিবনাথের মা প্রশ্ন করিলেন, কোথায় ছিলে সনাতন?

প্রকাণ্ড হাতে বিপুল এক গ্রাস ভাত তুলিয়া সনাতন বলিল, দু তিন জায়গায় মা।

ছেলেপুলে কি? ঘরকন্না করেছ?

বাঁ হাতে মাথা চুলকাইয়া সনাতন বলিল, ছেলে অ্যানেকগুলান মা। তিনটে পরিবারের ছেলে।

আরও তিনবার বিয়ে করেছিলে?

মেয়েরা সকৌতুকে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সনাতন বলিল, হঁ্যা মা। তা সে সব চুক্রিয়ে দিয়েছি। ছাড়পত্ত ক'রে সব তাড়িয়ে দিয়েছি।

সনাতনের এখানকার ইতিহাস এ বাড়ির সকলেই জানে; সনাতন এ বাড়ির কাহিনীর মানুষ। শিবনাথের বোন মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিয়া বলিল, এইবার আবার ঘর-দোর পাতাও সনাতন। আপন ভিটেতে ঘর কর, বিয়ে কর।

সনাতন নির্ব্বোধের মত খানিক হাসিয়া বলিল, আর লয় মা। সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বউদের তাড়িয়ে দিলে কেন বাবা?

আর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সনাতন বলিল, সবাই মরণ তাকায় মা। মর, মর, মর—ছাড়া বাক্যি নাই, তিনটে বউয়েরই ওই এক রা।

সনাতন তৃতীয় বারের ভাতটা আর শেষ করিতে পারিল না।

ভাতের অপচয়ে লজ্জিত হইয়া সে বলিল, খেতে পারি মা। ই ভাত কটা আমি খাই। তা আজ লারলাম।

সনাতন বাড়িতে থাকিলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; মধ্যে মধ্যে গ্রামপ্রান্তর ঘুরিয়া আসিত।

উদাসীর ডাঙায় দীর্ঘ দিন ঘুরিয়াও সে কালকুটিকে দেখিতে পাইল না।

মধ্যে মধ্যে ডাক্তারখানায় গিয়া ওষুধ লইয়া আসিত। তাহার ক্ষুধা হয় না।

আজ কয়েক দিন সনাতন বিছানাতেই শুইয়া আছে। খাবার পাঠাইয়া দিলে অল্প-স্বল্প খায়, না পাইলেও চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। অভাবও বোধ করে না।

শিবনাথের মা এ অঞ্চলের প্রবীন বিচক্ষণ ডাক্তার ননীবাবুকে ডাকাইয়াছিলেন। ননীবাবু হাসিয়া বলিলেন, কালরোগ।

শিবনাথ দেখিতে গেল।

কঙ্কালসার সনাতন জীর্ণ পরিত্যক্ত ঐতিহাসিক পাষাণ-দুর্গের মত পড়িয়া আছে। মোটা মোটা হাড়গুলা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সে দিগন্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চাহিয়া আছে। শিবনাথের মা সেখানে ছিলেন, তিনি ডাকিতেছিলেন, সনাতন! সনাতন!

সনাতন যেন শুনিতে পাইতেছে না।

শিবনাথ কাছে আসিয়া কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া ডাকিল, সনাতন! সনাতন!

এবার সনাতনের দৃষ্টি ফিরিল, সে দৃষ্টি যেন কিছু খুঁজিতেছে, কিন্তু খুঁজিয়া পাইতেছে না।

সনাতন!

এবার দৃষ্টি শিবনাথের দিকে রাখিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, দেখতে পেছি না। সে হাতের ক্ষীণ ইঙ্গিতে ডাকিল, আরও কাছে এস। শিবনাথ সরিয়া গেল।

খোকাবাবু!

হ্যাঁ। কেমন আছ ?

ভাল আছি।

কি কষ্ট হচ্ছে তোমার ?

ঘাড় নাড়িয়া সনাতন জানাইল, কিছু না। তারপর ক্ষীণস্বরে বলিল, দেখতে পেছি না ভাল, শুনতে পেছি না।

শিবনাথের মা এবার বলিলেন, ভয় নেই সনাতন। সেখানে তোমার নন্দ আছে, কর্ত্তাবাবু আছেন, বড়বাবু আছেন, গিন্নীমা আছেন, ছোটবাবু আছেন—

সনাতন কাহারও সন্ধানে কোন দিকে চাহিল না—শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, অন্নকার !

অর্থাৎ অন্ধকার।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপান্তরিতা

এ-বাড়ির বউ তুমি, ও-বাড়ির মেয়ে—
আমারি সুমুখ দিয়া কর যাতায়াত ;
মাঝখানে ব'সে আমি দেখি চেয়ে চেয়ে,
তোমার এ দুটি রূপে কতটা তফাৎ।
এ-বাড়িতে, আছ ব'লে পাই নাকো টের,
সরমে ওঠে না মুখ, মুখে নাহি রা ;
বুঝে চল, চপলতা অপরাধ ঢের ;
শাশুড়ীর চোখে তুমি 'লক্ষ্মী' 'হীরা'।
ও-বাড়িতে গেলে দেখি বেঁধেছে বিপ্লব—
কোমরে আঁচল বেঁধে উঠে গেছ গাছে ;—
ধর্ ধর্ মার্ মার্ খাব খাব রব ;
শশব্যস্ত ভাই বোন ছোটে আগে পাছে।
এখনি ছলনা তুমি এতখানি পার !—
বয়স তো সবেমাত্র এগারো কি বারো !

জগদীশ গুপ্ত

মনঃসমীক্ষণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মনের গঠন ও ক্রমবিকাশ

দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি এবং স্বপ্ন বিশ্লেষণ দ্বারা মন কি ভাবে কার্য্য করে, তাহার কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। নানাবিধ মানসিক ব্যাধির উৎপত্তির কারণ ও লক্ষণ সমূহ অধ্যয়ন করিয়া সমীক্ষকেরা মনের প্রকৃতি ও তাহার কার্য্যের রীতিনীতি সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। ব্যাধিগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণ এখানে করিব না। এরূপ সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ পত্রিকায় ব্যাধির ন্যায় নীরস ব্যাপারের অবতারণা না করাই বাঞ্ছনীয়।* অবশ্য ইহাই একমাত্র কারণ নহে, অন্য কারণও আছে। যে কোন বস্তুই আলোচনার বিষয় হউক না কেন, ক্রমাগত বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিলে একটি বিশেষ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন দিক হইতে আবিষ্কৃত বিভিন্ন তথ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে না পারিলে বস্তুটি সম্বন্ধে একটি অসম্বদ্ধ খাপছাড়া রকমের ধারণার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং বিশ্লেষণের পথে আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া যে সকল সূত্র সমীক্ষকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের ফলে মনের গঠন ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কি নূতন জ্ঞান আমরা লাভ করিলাম, তাহার বরং একটি যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ ও সুসম্বদ্ধ বিবরণ দিবার চেষ্টা করা যাউক।

---

* সাহিত্যের ভিতর দিয়া মানসিক বিকার কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহার উদাহরণ সম্পাদক মহাশয় "সংবাদ-সাহিত্যে" মধ্যে মধ্যে আমাদের দিয়া থাকেন।

মন বলিতে আমরা সাধারণত কি বুঝি, মন সম্বন্ধে আমরা কি জানি? নিজেকে যদি এই প্রশ্ন করেন ও একটু ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে সহজেই উপলব্ধি করিবেন যে, যাহাকে পূর্ব্বে সংজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহার কার্য্যাবলীকেই আমরা মনের কাজ বলিয়া বুঝি। অর্থাৎ যে সমস্ত চিন্তা, ইচ্ছা, বিক্ষোভ প্রভৃতি বিষয়ে আমরা সচেতন, সেইগুলিকে আমরা মানসিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করি, সেইগুলিকেই মনের অস্তিত্বের পরিচয় বলিয়া ধরিয়া লই। মনোবিদ্যার চর্চ্চা না করিয়াও মন সম্বন্ধে আরও একটি কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সেটি এই যে, মনের সহিত দেহের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বস্তুত দেহের ভিতর দিয়াই মন আপনাকে প্রকাশ করে। (বলিয়া রাখা প্রয়োজন, মন-বিষয়ক কোন দার্শনিক তথ্যের আলোচনা করা উপস্থিত আমার উদ্দেশ্য নয়। দার্শনিকই হউন, বৈজ্ঞানিকই হউন, অথবা মুটে বা মজুর বা সাধারণ স্ত্রীলোক বা পুরুষ হউন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই মন সম্বন্ধে যে সহজ ও সাক্ষাৎ (immediate) অভিজ্ঞতা আছে, আমি এখানে তাহার কথাই বলিতেছি।) সংজ্ঞান ও দেহের সহিত নিকট-সম্পর্ক—এই দুইটিই হইল মন-বিষয়ক সমস্ত জ্ঞানের প্রথম সোপান। তারপর শিশুমন ও তাহার ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করিলে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। দেখিতে পাই, প্রত্যেক শিশুই কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, বয়োবৃদ্ধির সহিত যেগুলির লক্ষ্যের ও কার্য্যক্ষেত্রের কিছু কিছু রূপান্তর ঘটিতে থাকে। এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলির ইংরেজী নাম—Instincts। এই প্রবৃত্তিগুলিই শিশুমনের একমাত্র সম্বল ও মানসিক জীবনের আদি উপকরণ। ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না, কিন্তু কার্য্যের ভিতর দিয়া ইহাদের শক্তির (energy) বিকাশ দেখিতে পাই ও ইহাদের যথেষ্ট পরিচয় পাই। প্রথম অবস্থায় সমস্ত

মনটির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ইহারা সম্পূর্ণভাবে মনটিকে অধিকার করিয়া থাকে। মনের এই আদি অবস্থার ফ্রয়েড নাম দিয়াছেন অদস্ (Id. Id ল্যাটিন কথা, ইহার ইংরেজী প্রতিশব্দ It)। তাহা হইলে অদস্ বলিতে আমরা বুঝিব, মনের সেই প্রাচীনতম অবস্থা যখন অজ্ঞাতস্বরূপ সহজাত প্রবৃত্তি ভিন্ন মনে আর কিছুই নাই। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত প্রবৃত্তিগুলি সমস্ত মানসিক বৃত্তির উপর আধিপত্য বজায় রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে ইহাদের নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। জীবনে অদসের প্রভাব তাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

অন্তরের প্রবৃত্তিগুলি মাত্র সম্বল করিয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, স্থান হয় তাহার এই বাস্তব জগতের মধ্যে। বাহিরের জগতের আকাশ, আলো, বাতাস, জল, পরিবারবর্গের আদর, অনাদর, ভালবাসা, বিরক্তি শিশু জন্ম লইবার পর হইতেই তাহার মনের উপর স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহাদের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দেয়। কাজেই অদস্ অবিচলিত থাকিতে পারে না। বহির্জগতের সহিত আপস মীমাংসা করিবার জন্য এবং বহির্জগতের অত্যধিক উত্তেজনার হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অদসের এক অংশের পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। অদসের যে অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া আপনাকে রক্ষা করিবার কার্য্যভার গ্রহণ করে, তাহার নাম অহম্ (Ego)। সুতরাং অদস্ এবং বহির্জগৎ এই উভয়ের মধ্যে অহমের স্থান। শরীরের কার্য্যকলাপ প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রিত করিয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া এবং সুবিধামত বহির্জগতের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া অহম্ আপনাকে বাঁচাইয়া রাখে। সহজাত প্রবৃত্তিগুলির উপর ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করিয়া, কোন প্রবৃত্তিকে কার্য্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়া, কোনটিকে দমন করিয়া ইহা অদস্‌কে বশীভূত করিবার

প্রয়াস পায়। যে কোন কারণবশতই হউক, অত্যধিক আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে অ-সুখ অনুভূত হয়, উত্তেজনার উপশমে সুখবোধ হয়। অ-সুখ দূর করিয়া সুখ আনিবার চেষ্টা অহমেরই কাজ। বহির্জগৎ এবং অদস্ দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের অবিরাম পরিশ্রম হইতে অহম্ মধ্যে মধ্যে অবসর গ্রহণ করিয়া কূর্ম্মের মত আপনার মধ্যে আপনি গুটাইয়া আসে। বাহিরের সহিত সম্বন্ধ তখন তাহার ক্ষীণ হইয়া আসে, নিদ্রাবস্থা ইহারই একটি দৃষ্টান্ত।

মানুষের শৈশবকাল অন্যান্য সমস্ত জন্তুর শৈশবকাল হইতে দীর্ঘতর। এই দীর্ঘ শৈশবকাল শিশু তাহার মাতাপিতা প্রভৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়াই অতিবাহিত করে। তাঁহাদের আদেশ, নিষেধ, ধরনধারণের দ্বারাই শিশুর প্রায় প্রত্যেক কার্য্যই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁহাদের শাসন চিরকাল সমভাবে চলে না, বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশু নিজেই নিজেকে শাসন করিবার ভার গ্রহণ করে। অহমের যে অংশ এই শাসনের ভার গ্রহণ করে, ফ্রয়েড তাহার নাম দিয়াছেন—অধিশাস্তা (Super-ego)। মনের ক্রমপরিণতি যখন এই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়, তখন কোন্ ক্ষেত্রে কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয়, শিশু নিজেই সাব্যস্ত করিয়া লয়, বাহির হইতে বিধি-নিষেধ আসিবার প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ তাহার অধিশাস্তা তাহার অহম্‌কে বলিয়া দেয়। তাহার কোন আদেশ অমান্য করিলে অধিশাস্তা অহম্‌কে যথেষ্ট শাস্তি দেয়। অনুতাপ উদ্বেগ প্রভৃতি এই শাস্তিরই প্রকারভেদ।

তাহা হইলে দেখা গেল, তিনটি জিনিসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অহম্‌কে চলিতে হয়। বহির্জগৎ, অদস্ এবং অধিশাস্তা। সকলের দাবি যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণভাবে মিটাইয়া চলিতে পারিলেই অহমের কার্য্য সন্তোষজনক হয়। নতুবা সামান্য খামখেয়ালী ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া

গুরুতর মানসিক ব্যাধি পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। যে ভাবে অধিশাস্তা গঠিত হয়, তাহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাহার প্রকৃতি পিতামাতার আদর্শের দ্বারাই নিরূপিত হয়। শুধু তাহা বলিলেই যথেষ্ট হয় না। পিতা মাতা শিক্ষক প্রভৃতি অন্যান্য যে সমস্ত ব্যক্তির উপর মানুষ শৈশবে নির্ভরশীল থাকে, তাঁহাদের মনের গতি, চিন্তাধারা, যে দেশে, যে সমাজে তাহার জন্ম, সেই দেশের, সেই সমাজের আদর্শ, রীতিনীতি, ঐতিহ্য (traditions) প্রভৃতি দ্বারাই অধিশাস্তার প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হয়। অধিশাস্তার মধ্যে তাই, অদসের মতই, অতীত ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। অহমের রূপ কিন্তু প্রধানত তাহার নিজের অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করে।

অদস্, অহম্ এবং অধিশাস্তার (যথাক্রমে Id, Ego এবং Super-ego) পরিচয় মোটামুটিভাবে কিছু দেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে অদস্ই যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা অন্যায় হইবে না। অদস্ কত প্রকারে নিজের শক্তি প্রকাশ করে, তাহা বুঝাইয়া বলিবার জন্য মনোবিদ্‌গণ সহজাত প্রবৃত্তিগুলির নানারূপ প্রকারভেদের কল্পনা করিয়াছেন, যেমন খাদ্যপ্রবৃত্তি (Food instinct), যৌনপ্রবৃত্তি (Sex instinct) প্রভৃতি। জন্মাইবার পরই জন্তরা খাদ্যের অন্বেষণ করে, স্তন্য পান করে, উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সঙ্গম করে, এই সমস্ত কার্য্য তাহাদের শিখাইয়া দিতে হয় না। এই ধরনের কতগুলি সহজাত প্রবৃত্তি মানুষের আছে, মনোবিদ্‌দের মধ্যে সে বিষয়ে মতের ঐক্য নাই। যতগুলিই হউক, ফ্রয়েডের মতে সমস্তগুলিকেই মূলত দুইটি শ্রেণীর ভিতর আনা যায়। আমাদের কার্য্যাবলীর ফলাফল দুই রকমের হইতে পারে, হয় তাহাদের দ্বারা নিজের সহিত অন্য কোন বস্তু বা

ব্যক্তির কিংবা বস্তু ও ব্যক্তিদিগের পরস্পরের মধ্যে নূতন বন্ধনের সৃষ্টি হয়, অথবা যে বন্ধন পূর্ব্বে ছিল তাহা ছিন্ন হইয়া বস্তু বা ব্যক্তি পুনরায় অসংবদ্ধ যোগাযোগহীন অবস্থায় ফিরিয়া যায়। বন্ধন স্থাপন করার প্রবৃত্তি এবং বন্ধন ছিন্ন করার প্রবৃত্তি—এই দুইটি মূল প্রবৃত্তির কল্পনা করিয়া লইলে ফ্রয়েডের মতে মানসিক জীবনের সমস্ত ঘটনাবলীই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায়। বন্ধন-স্থাপনের প্রবৃত্তি হইতে আসে—পরকে আপন করিবার চেষ্টা, ঐক্য-স্থাপনের প্রয়াস, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে এক বিরাট গণ্ডির মধ্যে আনিবার উদ্যম। প্রত্যেকেই বিভিন্ন উপায়ে আমাদের এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা অহরহ করিতেছি। পাঁচজনের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া, পরকে ভালবাসিয়া, সাহিত্যের ভিতর দিয়া, দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, আরও কত উপায়ে অন্যের সহিত অনবরত যোগ স্থাপন করিতেছি। ফ্রয়েড এই বন্ধন-স্থাপনের প্রবৃত্তির নাম দিয়াছেন—এরস (Eros, গ্রীকদিগের ভালবাসার দেবতার নাম)। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, সামাজিক জীবনেও তেমনই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর অনুষ্ঠানগুলিকেও একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করি। এখন শুধু সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঐক্য আমাদের লক্ষ্য। জাতিসমূহের সংঘ (League of Nations) বিশ্বপ্রেম প্রভৃতির কল্পনা এরসের প্রেরণা হইতেই আসে।

এরসের ঠিক বিপরীত ফলপ্রসূ আর একটি যে প্রবৃত্তির উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি—বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রবৃত্তি, ফ্রয়েড তাহাকে আক্রমণ-প্রবৃত্তি (aggressive instinct) এই আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রবৃত্তি হইতে আসে ধ্বংস করার আবেগ, বন্ধন ছিন্ন করিয়া একত্ব নষ্ট করার প্রয়াস। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে,

তাঁহাকে অনুরোধ করি পশ্চিমে ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে। আমাদের জাতীয় জীবনের গতি লক্ষ্য করিলেও এই প্রবৃত্তির যথেষ্ট মূর্ত্ত পরিচয় পাইবেন। তথাপিও মনে হইতে পারে, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে আক্রমণ-প্রবৃত্তির সাক্ষাৎকার মিলিলেও ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো ইহার সাক্ষাৎ না মিলিতেও পারে। উত্তরে বলা যায়, ব্যক্তির মধ্যে না থাকিলে সামাজিক জীবনে ইহার বিকাশ সম্ভব হইত না। ব্যক্তির সমষ্টি লইয়াই তো সমাজ। উপরন্তু নিজেদের কার্য্যকলাপগুলি একটু মনোযোগ সহকারে দেখিলেই সন্দেহ আপনা-আপনি ভঞ্জন হইয়া যাইবে। সেদিন যে পাকড়াশী চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ফণীর নাকে ঘুষি মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই কার্য্যটির প্রেরণা কোন্ প্রবৃত্তি হইতে আসিয়াছিল? চিঠিখানির পরিণাম কি হইয়াছিল? হিংসা-দ্বেষের বশীভূত হইয়া অপরের ক্ষতি করার দৃষ্টান্ত কি এতই বিরল? শিশুও নবজাত ভাইটিকে সুবিধা পাইলেই চিমটি কাটিয়া বা তাহার হাত পা টানিয়া কিংবা চোখে আঙুল দিয়া কাঁদায়। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ধ্বংসবাদীদের মনের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে আক্রমণ-প্রবৃত্তির প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, কোন একটি প্রচণ্ড রকমের কার্য্যের ভিতর দিয়াই যে সব সময়ে এই প্রবৃত্তির প্রকাশ হইতে হইবে এরূপ নহে, বহু আপাত-নির্দ্দোষ কথাবার্ত্তায়, যেমন ঠাট্টা বিদ্রূপ প্রভৃতির ভিতর দিয়াও ইহার সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে প্রাণহীন অচেতন পদার্থ হইতেই সচেতন প্রাণবান পদার্থের সৃষ্টি হয়। প্রাণবান সক্রিয় পদার্থকে পুনরায় নিষ্ক্রিয় প্রাণহীন অবস্থায় লইয়া যাওয়া আক্রমণ-প্রবৃত্তির কাজ, সেইজন্য ইহার আর একটি নাম দেওয়া হইয়াছে মরণ-প্রবৃত্তি (death instinct)।

দুইটি প্রবৃত্তির লক্ষ্য এবং কার্য্যধারা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরবিরোধী হইলেও ইহারা সব সময়েই যে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করে তাহা নহে, মিলিয়া মিশিয়াও চলিয়া থাকে। যেমন মনে করুন, 'খাওয়া' কাজটিতে একটি দ্রব্যের (খাদ্যের) ধ্বংস হইতেছে বটে, কিন্তু শরীরের সহিত তাহার যোগাযোগ স্থাপিত হইতেছে। সেইরূপ সুরতক্রিয়া এক প্রকার আক্রমণ বটে, কিন্তু তাহার সাহায্যেই নিবিড় মিলন সংঘটিত হয়। এই দুইটি প্রবৃত্তির মিলন ও বিরোধই আমাদের জীবনের সকল প্রকার বৈচিত্র্যময় লীলার আদি উৎস।

এরসের শক্তির ফ্রয়েড নামকরণ করিয়াছেন কামশক্তি—(libido)। আক্রমণ-প্রবৃত্তির শক্তির ঐরূপ উপযুক্ত নাম কিছু নাই। উভয় শক্তিই প্রথমে অদসের ভিতর অবস্থিত থাকে। অধিশাস্তা যখন রূপ ধরিতে আরম্ভ করে, আক্রমণ-প্রবৃত্তির বহু পরিমাণ শক্তি তখন অহমের ভিতর আসিয়া পড়ে। ধ্বংস করা ইহার কাজ, সুতরাং স্বধর্ম্ম অনুসারে ইহা অহম্‌কে নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। নিজের মাথার চুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে, নিজের গালে চড় মারিতেছে, এরূপ ব্যাপার মানসিক রোগীদিগের মধ্যে তো যথেষ্টই দেখা যায়, প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও ইহার অসদ্ভাব নাই। কিন্তু আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টাও অহমের আছে, তাই অধিক পরিমাণে আক্রমণ-শক্তি আপনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হইলে অহম্ তাহাকে বহির্মুখী করিয়া দেয়। তখন রাগান্বিত হইলে আমরা দ্রব্যাদি ছুঁড়িয়া ফেলি, এটা ভাঙি, ওটা নষ্ট করি, অথবা শিশুপুত্রকে অযথা প্রহার করিয়া বসি। প্রধানত বহির্মুখী হইলেও এই শক্তির কিয়ৎ পরিমাণ কিন্তু চিরকালের জন্য অহমের ভিতর থাকিয়া যায়। নানাবিধ ব্যাধিজনিত কষ্টভোগ তাহার প্রমাণ। মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়া সকল অহম্‌কেই একদিন এই শক্তির নিকট শেষ পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

কামশক্তিও অদস্ হইতে আসিয়া প্রথমে অহম্‌কে ব্যাপিয়াই থাকে। সেই অবস্থায় শিশু শুধু নিজেকেই ভালবাসে, নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর নার্‌সিসাসের গল্প আপনারা সকলেই জানেন, নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজেই বিভোর। অহমের মধ্যে কামশক্তির অধিষ্ঠানের ফল ঐ ধরনেরই হইয়া থাকে, অহম্ আপনাকেই ভালবাসে, আপনাতেই আপনি বিভোর হইয়া থাকে, তাই ফ্রয়েড এই অবস্থার নাম দিয়াছেন—স্বকাম (narcissism)। ক্রমে বহির্জগতের অন্যান্য বস্তুর উপর কামশক্তি আরোপিত হইতে থাকে, তখন অহমের আদি স্বকামের (primary narcissism) অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। কামশক্তি গতিশীল, এক বস্তু হইতে অপর বস্তুতে, এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে চলাচল করা ইহার একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আক্রমণ-প্রবৃত্তির শক্তির ন্যায় কিয়ৎপরিমাণ কামশক্তিও চিরকাল অহমের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। যদি কেহ কখনও সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইয়া ভালবাসিতে পারে, তবেই কামশক্তির সমস্তটিই অহম্ ছাড়িয়া ভালবাসার বস্তুর উপর যাইতে পারে।

শরীরের সহিত কামশক্তির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মোটামুটিভাবে সমস্ত শরীরটিকেই কামশক্তির উৎস বলিয়া ধরা যাইলেও কয়েকটি অঙ্গের সহিত ইহা বিশেষভাবে বিজড়িত, যেমন—ওষ্ঠ, উরু, জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি। এই অঙ্গগুলিকে তাই কামস্থান (erotogenic zones) বলা হয়। পর্য্যবেক্ষণের ফলে সমীক্ষকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কামবাসনা (sexual desire) ও তজ্জনিত ক্রিয়াকলাপের ভিতর দিয়াই কামশক্তির (libido) সমধিক ও সুস্পষ্ট প্রকাশ হয়। সেইজন্যই মানবজীবনে কাম বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি, তাহারই এত প্রতাপ। এই প্রতাপ লক্ষ্য করিয়াই

ফ্রয়েড মানুষের কামজীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর বিশেষভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন এবং সকলের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অনুসন্ধানের ফলে কামজীবন সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা ফ্রয়েড জানিতে পারিলেন। বার বার পরীক্ষার দ্বারা নূতন তথ্যগুলির সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে যখন আর কোন সংশয় রহিল না, তখন তিনি সেগুলি প্রচার করিলেন। প্রচার করিবামাত্র কিন্তু সমাজের মধ্যে ঘোরতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তথ্যগুলি এতই অভিনব এবং আবহমানকাল-প্রচলিত ধারণাসমূহের এতই বিরোধী যে, কেহই সেগুলি সহ্য করিতে পারিল না। নীতিবাদী এবং সমাজনেতাদের মনে বিশেষ বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যেও কেহই বৈজ্ঞানিকভাবে তথ্যগুলি পরীক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন না; সকলের সহিত একমত হইয়া তাঁহারাও তথ্যগুলিকে নাকচ করিয়া দিলেন এবং ফ্রয়েডকে কার্য্যত বিদ্বদ্‌সমাজে 'একঘরে' করিলেন। ফ্রয়েড আজ বাঁচিয়া নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহার বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষভাব এখনও যে একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু কেন এই বিদ্বেষ? তথ্যগুলির নূতনত্বই কি শুধু ইহার কারণ? অনেকেই তো অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সকল আবিষ্কারকই তো বিদ্বেষের পাত্র হইয়া উঠেন নাই। নিউটন, আইনস্টাইনকে লোকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়া থাকে। ৺জগদীশচন্দ্র, মেঘনাথ সাহা, ভেঙ্কটারমন প্রভৃতিকে তাঁহাদের আবিষ্কারের জন্য কোথাও তো লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই, বরং সকলেই তাঁহাদের সম্মান প্রদান করিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব। তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হইবে না যে, ফ্রয়েডের প্রতি বিদ্বেষের মূলে অন্য কোন নিগূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। কি সে কারণ?

স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি কোন প্রকারে আমার আত্মগরিমায় আঘাত দেয়, সেই ব্যক্তিই আমার বিদ্বেষের পাত্র হয়। যেটি আমার প্রধান গর্ব্বের বিষয়, সেই সম্বন্ধে কেহ কোন রকমে আভাসে ইঙ্গিতে, কথায় ব্যবহারে আমায় হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলে আমি প্রথমেই তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি, এবং সে আমার বিরাগভাজন হইয়া পড়ে। এইরূপই একটি ব্যাপার ফ্রয়েডের আবিষ্কার-ফলে ঘটিয়াছিল। তাঁহার নূতন তথ্যগুলি আইন্‌স্টাইন প্রভৃতির তথ্যের ন্যায় শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকেই নাড়া দেয় নাই, তাহারা আমাদের গর্ব্বে আঘাত দিয়াছিল। তাই ফ্রয়েডের প্রতি এত বিদ্বেষ।

আমাদের গর্ব্ব, আমরা সভ্য, আমরা সংস্কৃতিসম্পন্ন। পৃথিবীর আদিকালের অসভ্য জাতির লোকের অপেক্ষা আমাদের মন নীতি বুদ্ধি প্রভৃতি সব দিক দিয়াই অত্যন্ত উন্নত। অন্যান্য পরিচয়ের মধ্যে আমাদের সংস্কৃতির একটি পরিচয় এই যে, আমরা সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে, বিশেষত কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়াছি, সভ্যসমাজে তাহাদের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা পর্য্যন্তও দোষ বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি। নির্ম্মলচিত্ত শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন করি, যাহাতে যৌবনে তাহার মনে কামবাসনার প্রথম উন্মেষের সময়েই সে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এবং তাহার মন আমাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হয়। অন্যান্য প্রবৃত্তিও তাহাকে দমন করিতে শিখাই, কিন্তু কাম সম্বন্ধেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করি; কারণ কামপ্রবৃত্তিই সংস্কৃতির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়, সংস্কৃতি বজায় রাখিতে হইলে উহার নিগ্রহই বিশেষ প্রয়োজন।

যে হীন প্রবৃত্তিকে বিতাড়িত করিতে পারিয়াছি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করি, ফ্রয়েড সেই কামপ্রবৃত্তিকেই আবার সভ্যসমাজের আলোচনার

কেন্দ্রস্থলে লইয়া আসিলেন। শুধু তাহাই নহে, বিতাড়িত করা দূরে থাকুক, বহু ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কার্য্য যে আমরা ওই প্রবৃত্তির প্ররোচনাতেই করিতেছি, তাহা দেখাইয়া দিলেন। উপরন্তু শিশুকে যেরূপ নির্ম্মলচিত্ত, নির্দ্দোষ, কামবাসনাহীন মনে করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকি, শিশু যে তাহা নহে, উদাহরণের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইলেন। আমাদের গর্ব্বে আঘাত লাগিল, আমরা ক্রুদ্ধ হইলাম, ফ্রয়েডের শাস্তির ব্যবস্থা করিলাম। ব্যাপার হইতেছে এই, আমাদের সংস্কৃতি যে স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না, ইহার বহু পরিমাণই যে কৃত্রিম এবং ইহার মূলে যে কামসম্বন্ধীয় একটি দৌর্ব্বল্য আছে, এ ভয় আমাদের মনের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল। আত্মপ্রবঞ্চনার শরণ লইয়া উটপক্ষীর মত বালিরাশির মধ্যে মুখ লুকাইয়া আমরা বেশ সুখে কালাতিপাত করিতেছিলাম। ফ্রয়েড সেই সুখ নষ্ট করিয়া দিবার উপক্রম করিলেন। তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া, তিনি ভুল বলিতেছেন ধরিয়া লওয়া ভিন্ন নিজের সুখ বজায় রাখিবার আর কি প্রকৃষ্ট উপায় হইতে পারে?

প্রবৃত্তিমাত্রেরই লক্ষ্য নিজেকে চরিতার্থ করিয়া আনন্দ উপভোগ করা। কামপ্রবৃত্তির লক্ষ্যও তাহাই, কিন্তু এখানে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, কাম বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি, libido শব্দটি তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফ্রয়েড বলেন, আমরা কাম শব্দটির অর্থ অন্যায়ভাবে সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছি। সুরত-ক্রিয়াকেই আমরা কামবাসনা চরিতার্থ করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করি। এ ধারণা কিন্তু সঙ্গত নয়। এমন অনেক বৈকৃতকাম ব্যক্তি (perverts) আছেন, যাঁহারা সুরতক্রিয়ার সাহায্য না লইয়া অস্বাভাবিক উপায়ে তাঁহাদের বাসনার তৃপ্তিসাধন করেন। সমলিঙ্গ-

কামীরা (homosexuals) অসমলিঙ্গ ব্যক্তিদিগের সহিত সহবাস সহ্য করিতে পারে না। তাই বলিয়া তাহাদের বাসনা কি কামবাসনা নয়? অন্য দিকে আবার দেখা যায়, জননেন্দ্রিয় ভিন্ন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও (পূর্ব্বে যাহাদের কামস্থান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে) কামবাসনা চরিতার্থ করিবার সহায়তা করে। এ ক্ষেত্রেও বহুপ্রকারের বিকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন বস্তুকামী (fetichists), দর্শনকামী (peepers voyeurs) প্রভৃতি। এক ব্যক্তি সর্ব্বদা একখানি কাঁচি লইয়া বেড়াইত এবং সুবিধা পাইলেই স্ত্রীলোকের মাথার চুল কাটিয়া লইত। তাহাতেই তাহার চরম সুখভোগ হইত; স্ত্রীসঙ্গম কখনও সে করে নাই। এই জাতীয় ব্যক্তিদিগের বাসনা কি কামবাসনা বলিয়া বর্ণিত হইবে না? অতএব দেখা যাইতেছে, কামবাসনার সহিত জননেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইলেও একেবারে অচ্ছেদ্য নয়। ফ্রয়েডের মতে কামবাসনা প্রথমত নানা ভাবে নানা অঙ্গে ছড়াইয়া থাকে। শিশুমনের পরিণতি যথাযথ-ভাবে হইয়া আসিলে ক্রমশ জননেন্দ্রিয়ই এই বাসনার প্রধান বাহক হইয়া উঠে। যথাযথভাবে না হইলে কোন না কোন প্রকার বিকৃতির সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। মুখই প্রথম আনন্দ-প্রদানের অঙ্গ। স্তন্যপানে তৃপ্তিলাভ করিয়া শিশু আনন্দ উপভোগ করে। শীঘ্রই কিন্তু স্তন্যপানের প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও শুধু আনন্দ-লাভের জন্যই শিশু মাতৃস্তন চুষিয়া থাকে। এই সময়ে সে সকল দ্রব্যই মুখে দিবার চেষ্টা করে। পরিণতির এই অবস্থাকে ফ্রয়েড 'মুখকাম' অবস্থা (oral phase) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আরও একটি অবস্থা—যাহাকে 'পায়ুকাম' অবস্থা (anal phase) বলা হয়—অতিক্রম করিয়া কৈশোরে শিশু 'লিঙ্গকাম' অবস্থায় (genital phase) আসিয়া পৌছায়। এই সময় হইতেই জননেন্দ্রিয় কামজীবনে প্রাধান্য লাভ করে।

আর এক দিক হইতে বিবেচনা করা যাউক। মাতার নিকট হইতেই শিশু তাহার প্রথম আনন্দ-উপভোগের উপকরণ প্রাপ্ত হয়, তিনিই তাহার প্রথম বাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। তিনিই তাই শিশুর প্রথম ভালবাসার পাত্র হন। অহম্ হইতে কামশক্তি তাঁহার দিকেই সর্ব্বপ্রথম চালিত হয়। মাতার নিকট হইতে আনন্দ পাইবার পথে ক্রমশ বাধা আসিতে থাকে, পিতা প্রধান অন্তরায় হন। তখন পিতার অভিমুখে আক্রমণশক্তি পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। এই যে অবস্থা—মাতার প্রতি আকর্ষণ এবং পিতার প্রতি বিদ্বেষ—ফ্রয়েড ইহাকে ঈডিপাস অবস্থা (Œdipus situation) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (গ্রীকদিগের পুরাতত্ত্বে ঈডিপাসের একটি গল্প আছে। তিনি একবার না জানিয়া মাতৃগমন করিয়াছিলেন। পরে যখন জানিতে পারেন, তখন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি তাঁহার চক্ষুদ্বয় উপড়াইয়া ফেলেন।) এই অবস্থা হইতে অনেক স্তর পার হইয়া অবশেষে শিশু কৈশোরে উপনীত হয়। কৈশোরপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই যে সমস্ত অভিজ্ঞতা শিশু অর্জ্জন করে, তাহা হইতেই তাহার ভবিষ্যৎ চরিত্রের ভিত্তি গঠিত হয়।

মনের গঠন ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সমীক্ষকেরা যেরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহার বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। পরিণতির সকল অবস্থার ও স্তরের বিস্তৃত বর্ণনা করা এরূপ ক্ষেত্রে সম্ভব নহে এবং আমার উদ্দেশ্যও নহে। মনঃসমীক্ষণের শুধু কয়েকটি মূল কথার অবতারণা করিয়া আপনাদের দৃষ্টি যাহাতে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করাই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য, সাধ্যমত তাহাই করিলাম। জটিলতর সমস্ত সমস্যাই তাই বর্ত্তমান আলোচনার বাহিরে রহিল।

বর্ণনা মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আর একটি বিষয় সম্পর্কে

কিছু বলা আবশ্যক। মনের সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান এই তিনটি স্তরের কল্পনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। অধুনা অদস্, অহম্ প্রভৃতির কথা বলিলাম। এখন পূর্ব্ববর্ণিত স্তরগুলির সহিত ইহাদের সম্পর্ক কিরূপ দেখা যাউক। সংজ্ঞান যে অহমেরই গুণ, এ কথা না বলিলেও চলে। বিবিধ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া বহির্জগতের বস্তুসমূহের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (perception) আমাদের হয়, তাহা সংজ্ঞানেরই বিষয়। সংজ্ঞানকে তাই মনঃসমীক্ষকেরা অহমের একেবারে বহির্তম প্রদেশে, বহির্জগতের সন্নিকটেই অবস্থিত বলিয়া কল্পনা করেন। কিন্তু বহির্জগতের বস্তু ভিন্ন অন্য বিষয়ও আমাদের সংজ্ঞানে আসিতে পারে। পূর্ব্বে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার স্মৃতি, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহার কল্পনা, এ সম্বন্ধেও আমরা সচেতন হইতে পারি। সুতরাং সংজ্ঞানের বিষয়বস্তু শুধু বাহির হইতেই আসে না। অহমের ভিতর হইতেও আসে। যেখান হইতে আসে, তাহাকে আমরা আসংজ্ঞানের স্তর বলিয়াছি। এই আসংজ্ঞানের স্তর কেবলমাত্র অহমেরই বিশেষ গুণ, অহমেতেই ইহা বিদ্যমান, অন্য কোথাও নাই। আসংজ্ঞান যেমন অহমের, নির্জ্ঞান তেমনই অদসের নিজস্ব গুণ। অদসের ভিতর যাহা কিছু আছে, সবই আমাদের চেতনার বাহিরে। প্রথমে শুধু অদস্‌ই ছিল। বহির্জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে ইহার এক অংশ ক্রমে অহমে পরিণত হয়। অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়, সেই অজ্ঞাত অংশই নির্জ্ঞান। অহম্ বহির্জগৎ এবং অদস্ হইতে যাহা পায়, নানা কারণে সবই ধরিয়া রাখিতে পারে না, বাধ্য হইয়া বহু বিষয় অদসের ভিতর পাঠাইয়া দেয়। অহম্ হইতে ফিরিয়া অদসে যাহা যায়, তাহাকে আমরা পূর্ব্বে অবদমিত (repressed) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। সুতরাং অদসের ভিতর দুই জাতীয় সরঞ্জাম আছে, সহজাত অপরিবর্ত্তিত আদি সরঞ্জাম এবং অহম্ কর্ত্তৃক অর্পিত অবদমিত সরঞ্জাম।

পরিশেষে একটি সতর্কবাণীর উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে ভাবে স্তর, অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে ধারণা হইতে পারে যে, মন যেন বিস্তৃতি প্রভৃতি গুণসম্পন্ন একটি দ্রব্যবিশেষ। মনঃসমীক্ষকেরা মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আদৌ ঐরূপ ধারণা পোষণ করেন না। মানসিক ক্রিয়াকলাপের ধারা, পরস্পরের সম্পর্ক প্রভৃতি ব্যাপার বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করে বলিয়াই ঐরূপ কল্পনাসমূহের সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন, পদার্থবিদ্‌রা যেমন বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপার একটি বিরাট শক্তির (energy) খেলা বলিয়া ধরিয়া লন, মনটিকেও সেইরূপ একটি বিশেষ শক্তির আধার এবং মানসিক ঘটনাবলী সেই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মনে করিয়া লইলে নব-আবিষ্কৃত তথ্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করা আরও সহজ হইবে। মনের যে একটি অন্তর্নিহিত গতির আবেগ আছে, অর্থাৎ মন যে গত্যাত্মক (dynamic) তাহা আমরা সকলেই অনুভব করি, সেই হিসাবে মনকে শক্তির আধার বলিয়া কল্পনা করিলে অসঙ্গত হয় না। সেই শক্তির প্রকৃত রূপ কি, তাহা আমরা জানি না। পদার্থবিদ্‌রাও তো তাঁহাদের কল্পিত আদি শক্তির স্বরূপের বিষয় অবগত নন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের ব্যাখ্যা অর্থহীন বা তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ, এ কথা কেহ মনে করিতে পারেন না। মনঃসমীক্ষকদিগের সমস্ত ব্যাখ্যার মূলে বাস্তবিকই এই শক্তির কল্পনা বিদ্যমান আছে। সেই কল্পিত শক্তির স্বরূপ জানা নাই—শুধু এই অজুহাতেই ব্যাখ্যাগুলির কোন দাম নাই মনে করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। তবে শুধু তর্কের খাতিরে ফ্রয়েডের কোন তথ্যই কাহাকেও মানিয়া লইতে আমি বলি না, মানিয়া লওয়া উচিতও নয়। কিন্তু এ বিশ্বাস আমার যথেষ্টই আছে, একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজেদের কার্য্যাবলী, অনুভূতি, ইচ্ছা, বিক্ষোভ প্রভৃতি বিধিমতভাবে অর্থাৎ নিজের অহম্‌কে যতদূর সম্ভব স্বকাম

হইতে মুক্ত করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে তথ্যগুলির সত্যতা স্বতই প্রতীয়মান হইবে। বিজ্ঞানের দিক হইতে বিচার করিলে এ কথা স্বীকার করিতেই হয়, মানসিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করিবার যত তথ্য এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে, ফ্রয়েডের তথ্যগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও কার্য্যকরী এবং সেইজন্য সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। আজ না হইলেও ফ্রয়েড-আবিষ্কৃত নির্জ্ঞান তথ্য যে অচিরভবিষ্যতে বিবর্ত্তনবাদের ন্যায়ই বিজ্ঞান-জগতে সর্ব্ববাদীসম্মত এবং সভ্যসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

প্রশ্নোত্তর

আকাশের পানে চাহিয়া কন্যা মোর—
এক দুই করি গনিতেছিল সে তারা।
সহসা কহিল, মা আছে কোথায়, বাবা ?
মা-মরা মেয়েরে বুঝাব কি ব'লে আমি,
মানুষ মরিলে বাড়ে না আকাশে তারা!
চুপ ক'রে থাকি চাপিয়া দীর্ঘশ্বাস।
আবদার করে মেয়ে,
বল না গো বাবা, অত তারা মাঝে মায়েরে আমার চিনিব কেমন ক'রে ?
বলিলাম তারে, যে তারাটি দেখ সবচেয়ে জোরে জ্বলে,
মা যে হ'ল সেই তোর।
শুনে মেয়ে কয়, ওই তারা বাবা, না না ওগো, ওটা নয়,
ওইটি ওধারে, উঁহু,
ওটাও তো নয়, এ যে দেখি বাবা, সবচেয়ে জোরে অনেক তারাই জ্বলে!
আমি বলি, হ্যাঁ রে, মা তোর সকলগুলি।
মেয়ে বলে, বাবা, কি ক'রে তা হয় বল,
এক মা আমার অতগুলি হ'ল কিসে ?

গঙ্গার কূলে নিয়ে গিয়ে তারে দেখাই জলের মাঝে—
এক চাঁদ সেথা শতখানা হয়ে গেছে।

শ্রীগণেশ

স্বভাব-ধর্ম্ম

নীতিবিদ্‌রা বলেন, প্রেমের গল্প আর লিখিও না, যথেষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা অনুভব করিতে শিখ, হৃদয় দিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর, তাহাতে জাতির এবং সমাজের সত্যকারের উন্নতি হইবে। প্রেমের নিগূঢ়-তত্ত্ব কতই তো শুনাইলে, কতই তো শুনিলাম, উই আর টায়ারড্‌ অব দ্যাট।

সত্য কথা, স্বীকার করি। শুনি, যুগ যুগ ধরিয়া ক্ষুধিতেরা হাহাকার করিতেছে; দেখি, অনশনক্লিষ্ট নর-নারীরা প্রেত-কঙ্কালের ন্যায় নাচিয়া বেড়াইতেছে; বুঝি, আর্ত্ত মানবের অন্তঃস্থল হইতে একটা বিরাট বেদনা মুহুর্মুহু গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া হঠাৎ ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছে; জানি, শোষিত কৃষকের বুকের রক্ত জল হইয়া ধনীর তৃষ্ণা নিবারণ করাইতেছে; এবং হৃদয় দিয়া সত্যই অনুভব করি, দেশের বিরাট অংশটা নিশিদিন চোখের জল ফেলিয়া মাঝে মাঝে হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

সে কান্না আমার হৃদয়কেও আঘাত করে, আমিও অসহায়ভাবে কাঁদি। বুঝি, ঐ প্রপীড়িত ক্ষুধিত-ক্ষুব্ধ জনসাধারণের ন্যায় আমাকেও একদিন ছটফট করিয়া কাঁদিতে হইবে, ভাতের পরিবর্ত্তে হয়তো রাস্তার কলের জল খাইয়াই জীবনধারণ করিতে হইবে। তবুও, যেমন করিয়া ঐ বিরাট অংশটাকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি, তেমনই করিয়াই নিজেকেও উপেক্ষা করিয়া যাইতেছি। নিজেকে অবহেলা করিতে পারি বলিয়াই জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশাকে অবহেলা করিতে শিখিয়াছি। যেমন করিয়া ভুলিয়া থাকি নিজেকে, তেমন করিয়াই

চোখের সম্মুখের অনশনক্লিষ্ট কঙ্কালদিগকে ভুলিয়া যাই। তাহাদের পাণ্ডুর মুখ ক্ষণিকের তরে আমার মনকে আঘাত করিয়াই আবার নিঃশেষে মিলাইয়া যায়।

নিজেকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই ভাবিতেছি, কোন মেয়ের সুডৌল কমনীয় একখানা বাহু যদি আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদার করিত, তো কত সুখী হইতাম! কাহারও কাজল-আঁকা চোখের উপর যুগ যুগ ধরিয়া নিমেষহারা পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে পারিতাম তো কত খুশি হইতাম আমি! এমনই ধারা কাব্য রচনা করিতেছি মনে মনে অহর্নিশি। অথচ নিজের অবস্থার দিকে চাহিয়া ভাবিতে গেলে, এক টাকা-পয়সা ছাড়া আর কিছুর চিন্তা করা আমার পক্ষে পাপ—মহাপাপ। শুধু নীতিবিদ্‌রা কেন, আমিও সেই কথাই বলিব। তবুও চিন্তা করিতেছি, মনকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছি না, জো নাই। এমন করিয়াই ক্ষুধিত শোষিতদের আমরা ভুলিয়া আছি, এবং প্রেমের কাব্য রচনা করিতেছি।

প্রেমের ক্ষেত্র ছাড়া এ রকম সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আমাদের দেশে আর কিছুই নাই। উপন্যাস রচনা কর, গল্প লিখ—প্রেম ছাড়া কিছুই নাই। প্রেম মুখ্য, আর সব-কিছুই গৌণ। আমাদের দেশের কন্‌ষ্টিটিউশনই এই। মেয়েরা দূরে দূরে আছে, সুতরাং তাহাদিগকে দেবী বানাও, হৃদয় ডিভাইন-স্নেহে ভরপুর করিয়া দাও; বেশ, তারপর সেই কাহিনী পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন কর। পাশ্চাত্য-প্রথায় মেয়ে-পুরুষের ঘেঁষাঘেঁষি মেশামেশি যদি আমাদের দেশে থাকিত, তবে গল্পে সাহিত্যে প্রেম এমনভাবে জাঁকিয়া উঠিত না। আমার চারিপাশে যদি মেয়েরা অবিরল কিলবিল করিত, তাহা হইলে হয়তো কোন সুডৌল বাহুর আলিঙ্গন লাভের জন্য আমাকে এমনভাবে হা-হুতাশ করিয়া মরিতে

হইত না, আমাকে তখন টাকার সন্ধানেই প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে হইত। আমার উন্নতি হইত, আমার জাতির উন্নতি হইত, আমার দেশের উন্নতি হইত। তখন অভাব হইত শুধু টাকার; এখন অভাব দুইটার—টাকার এবং মেয়ের। কিন্তু টাকার চেয়ে মেয়েরাই বেশি লোভনীয়। তাই আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া তন্বী যুবতীর কথা ভাবিতেছি।

ভাবিতেছি, কোন জমিদারের রূপসী মেয়ে আমার গল্প পড়িয়া অতি অমায়িকভাবে মুগ্ধ এবং আত্মহারা হইয়া তাহার সঙ্গে বিকালে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছে; ভদ্রতার খাতিরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া মেয়ের মায়ের পাল্লায় পড়িয়া গিয়াছি; আমাকে ছাড়া মেয়ে কাহাকেও বিবাহ করিবে না—পটাসিয়াম সায়েনাইড খাইয়া মরিলেও না; মেয়েটির রক্তিম সলজ্জ স্বল্পানত অপূর্ব্ব মুখের দিকে চাহিয়া আমি রায় দিয়াছি, এ আর বেশি কি কথা, এ আমার ভাগ্য, কিন্তু একটি কথা, আমাদের সংসারে চাকর-বাকর নাই, মেয়েটিকে নিজ হাতে রান্না-বাড়ার কাজ করিতে হইবে, জমিদারি চাল চলিবে না। এবার হয়তো মেয়েটি হুমকি ছাড়িয়া লড়াই করিতে আসিবে—ইয়ার্কি নাকি? শুধু তুমি আর আমি ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে—সংসার কি আবার? ড্যাম ইওর মা, ড্যাম ইওর বাবা—ওন্‌লি ইউ অ্যাণ্ড আই—অ্যাণ্ড দিস ইওর আর্থলি প্যারাডাইজ—অল লাভার্স হোয়াইট ভিলা। হোয়াট মোর? নো। নাথিং এল্‌স। হয়তো মেয়েটি এবার বক্সিং খেলিতে শুরু করিবে, এবং হয়তো করিতও; কিন্তু—

হরিহর আসিয়া পড়ায় মেয়েটি আর বক্সিং শুরু করিল না, কল্পনার রাজ্যে ডুব মারিয়া তলাইয়া গেল।

হরিহর কহিল, চলুন মিস্টার ভদ্র।

আমি এ পাড়ায় মিস্টার ভদ্র অথবা মাস্টার মহাশয় নামে বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত।

হরিহরকে কথা দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে সিনেমায় যাইব। বাজে লোকের সঙ্গে আমি সিনেমায় যাই না। কিন্তু হরিহরের সঙ্গে না যাইয়াও উপায় নাই। তাহার সম্ভ্রম থাকে না। মানুষকে আপনার করিয়া লইবার একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা নাকি হরিহরের আছে, সুতরাং সে যদি নবাগত আমাকে লইয়া একদিন সিনেমায় না যাইতে পারিল তো এ পাড়ায় তাহার স্বতন্ত্র মর্য্যাদার অস্তিত্ব থাকে না।

সুতরাং গেলাম।

মফস্বলের সিনেমা-হলে বেঞ্চ্-সিস্টেম আছে। তাহাতে অসুবিধা ভয়ানক। পয়সা বাহির করিয়া চেয়ারের টিকিট করিতে গেলাম। হরিহর কহিল, আমার কাছে কিন্তু চেয়ারে বসবার মত পয়সা নেই।

মুশকিলে পড়িলাম। আমার কাছেও যাহা আছে, তাহা দিয়া দুইজনের চেয়ারে বসিয়া দেখা চলে না। হরিহর কহিল, আপনি চেয়ারেই যান তা হ'লে, আমি বেঞ্চিতেই যাই।

কহিলাম, তা হয় না। আচ্ছা, চলুন, দুজনেই বেঞ্চিতে যাই। বেঞ্চিতে বসা আমি অপমান মনে করি না, তবে অত সামনে থেকে ছবিটা একটু কেমন যেন দেখায়, তা দেখাক—চলুন।

পরদিন হরিহরের এক বন্ধুকে হরিহরকে জিজ্ঞাসা করিতে শুনিলাম, কি রে, তুই নাকি সিনেমা-হলে চেয়ারে ছাড়া ঢুকিস না? কাল তবে বেঞ্চিতে দেখলাম কেন?

শুনিলাম—হরিহর কহিল, কি করব ভাই? মাস্টার মশায়কে নিয়ে গেছি, তাকে ফেলে তো আর একা একা চেয়ারে বসা যায় না।

মাস্টার মশায়ের কাছে চেয়ারে বসবার মত পয়সা ছিল না, তাই—বুঝলি না?

হরিহরের বন্ধু না বুঝিলেও আমি বুঝিলাম। বুঝিলাম, নিজের দৈন্য কেহই প্রকাশ করিতে চায় না। সবাই সবাইকে ফাঁকি দিতেছে, নিজেকেও ফাঁকি দিতেছে। তাই নীতিবিদ্‌দের মাথা-চুলকানি সত্ত্বেও প্রেমের সাহিত্যে বাজার ছাইয়া যাইতেছে। হুহু করিয়া চুম্বন-আলিঙ্গন চাঁদের আলোয় নিবিড় জড়াজড়ি-মেশামেশি, যুদ্ধ-শেষের ক্লান্তি-অবসাদ, শ্রান্তি-জড়িত ভাঙা গলার মধুর গুঞ্জন—বাংলার গল্পে নাটকে উপন্যাসে ঢুকিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে লাঠি সড়কি ঢাল তরোয়ালের কড়া পাহারা সত্ত্বেও অতি আশ্চর্য্যজনকভাবে এগুলি গায়ের উপর পড়িয়া দুরন্তপনা করিয়া যাইতেছে। সুতরাং এই কথাই আজ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—হে দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ডগণ, সংখ্যায় তোমরাই বেশি, অথচ মুষ্টিমেয় সাধুরা তোমাদিগকে শাস্তি দিতে চাহিতেছে—গণতন্ত্রে এ নিয়ম খাটে না। তোমরা আর একটু খাঁটি অসৎ হইয়া সাধুদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দাও, তাহারা ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিয়া পড়ুক। আমি পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তোমাদের জয়-ধ্বজা আকাশের বুকে উড়াইতে থাকিব—তাহার পতপত-ধ্বনি বাঙালীর কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিবে।

"সব্যসাচী"

বিজয়া

এবার বিজয়া হ'ত সার্থক যদি হ'ত কোলাকুলি
মুসোলিনি-চার্চিলে, কম্‌রেড ষ্টালিনে ও হিট্‌লারে।
ক্ষতি ছিল নাকো অসুরে সিংহে চলিলেও চুলাচুলি,
ভাত কাপড়ের দামটা চড়িয়ে আমাদেরো প্রাণে মারে।

বিদ্যাসাগর

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার নূতন বাসা। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাসা বদলাইয়াছেন। বসিবার ঘরটি একটু বেশি প্রশস্ত, আসবাবপত্রও কিছু বেশি, নিখুঁত পরিচ্ছন্নতাই বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। ডাক্তার দুর্গাচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন, একটু ব্যস্তবাগীশ ভাব

দুর্গাচরণ। ঈশ্বর! ঈশ্বর!

অনুজ দীনবন্ধু প্রবেশ করিলেন

দীনবন্ধু। দাদা, বাড়ি নেই।

দুর্গাচরণ। কোথা গেছে?

দীনবন্ধু। ডোমপাড়ায় একজনের কলেরা হয়েছে, তিনি সেইখানেই গেছেন।

দুর্গাচরণ। কখন গেছে?

দীনবন্ধু। কাল রাত থেকে গেছেন, এখনও ফেরেন নি।

দুর্গাচরণ। তাই নাকি! তা হ'লে তো— আচ্ছা, আমি পরে আসব এখন। তাকে ব'ল, আমি এসেছিলাম।

দীনবন্ধু চলিয়া গেলেন। দুর্গাচরণও চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া থামিয়া গেলেন

দুর্গাচরণ। মদন নাকি?

মদনমোহন। নিঃসন্দেহে।

দুর্গাচরণ। কখন এলে?

মদনমোহন। এইমাত্র।

দুর্গাচরণ। হঠাৎ?

মদনমোহন। ঈশ্বরের চিঠি পেয়ে।

দুর্গাচরণ। বিধবা-বিবাহ আইন পাস হয়ে গেছে, জান তো?

মদনমোহন। খুব জানি, বিধবা-বিবাহের পাত্রীর খবর নিয়েই এসেছি।

দুর্গাচরণ। তাই নাকি! কিন্তু পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না যে, ঈশ্বর তো শ্রীশকে ধরেছে, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হতে চাইছে না।

মদনমোহন। ঈশ্বর কোথা?

দুর্গাচরণ। সে বাড়ি নেই, কলেরা-রোগীর সেবা করতে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই।

মদনমোহন। এস, তা হ'লে উপবেশন করা যাক।

দুর্গাচরণ। আমি আর উপবেশন করব না, আমার কল সারা হয় নি এখনও। তুমি উপবেশন কর, আর ঈশ্বর এলে এইটে দিও তাকে, ব'ল—কালীপ্রসন্ন সিংহ এই পত্রিকাখানি তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, একটু পরে সে নিজেও আসছে।

মদনমোহনকে একটি পত্রিকা দিলেন

মদনমোহন। সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা!

দুর্গাচরণ। সব রকম তত্ত্বই আছে ওতে। প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য—কিছু আর বাকি রাখে নি ছোকরা।

মদনমোহন। [সবিস্ময়ে] তাই নাকি!

দুর্গাচরণ। আমি চলি তা হ'লে।

মদনমোহন। আচ্ছা।

দুর্গাচরণ চলিয়া গেলেন

মদনমোহন। দীনু! ও ছিরু!

দীনবন্ধুর প্রবেশ

দীনবন্ধু। আপনি কখন এলেন? [প্রণাম করিলেন]

মদনমোহন। এখনই।

দীনবন্ধু। দাদা বাড়ি নেই।

মদনমোহন। তা শুনেছি, তুমি এক কলকে তামাকের ব্যবস্থা কর দিকি ভাই।

দীনবন্ধু। আপনি একবারে ভেতরেই চলুন না, হাত পা ধুয়ে কিছু খান আগে, দাদা আপনার জন্যে মতিচুর আনিয়ে রেখেছেন কাল থেকে।

মদনমোহন। খাব না এখন, মুখটা ধুইগে চল।

সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা টেবিলের উপর রাখিলেন ও টেবিল হইতে এক গোছা মনি-অর্ডার ফর্ম তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন

মদনমোহন। এত মনি-অর্ডার কোথায় যাচ্ছে?

দীনবন্ধু। দাদা প্রত্যেক মাসে মাসে পাঠান চারদিকে। সব টাকাকড়ি তো এই ক'রেই গেল, অথচ কিছু বলবার জো নেই।

রামগোপাল ঘোষের খানসামা প্রবেশ করিল, তাহার পিছনে বাক্স মাথায় একজন কুলী, বাক্সটি সুন্দর

খানসামা। [সেলাম করিয়া] হুজুর, ঘোষ সাহেব এই বাক্স আর চিঠি দিয়েছেন।

দীনবন্ধু। কোন্ ঘোষ সাহেব?

খানসামা। রামগোপাল ঘোষ।

দীনবন্ধু। আচ্ছা, বাক্সটা কোণে নামিয়ে রাখ।

দীনবন্ধু পত্রখানি টেবিলে রাখিলেন। বাক্সটি যথাস্থানে রাখিয়া খানসামা ও কুলী চলিয়া গেল

মদনমোহন। বাক্স কিসের?

দীনবন্ধু। জানি না।

মদনমোহন। চল।

চলিয়া গেলেন। দীনবন্ধুও অনুসরণ করিতেছিলেন, এমন সময় শৌখিন পাঞ্জাবি-পরিহিত একটি যুবক আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দীনবন্ধু। ও, আপনি আবার এসেছেন! দাদা এখনও ফেরেন নি কিন্তু।

যুবক। আমার কালই কলেজে মাইনে দেবার দিন, এখানেই তা হ'লে একটু অপেক্ষা করি।

দীনবন্ধু। করুন। দাদার ফেরবার কিন্তু ঠিক নেই।

চলিয়া গেলেন, যুবক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। এই যে ঠিক এসেছ দেখছি?

যুবক। আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল কলেজে মাইনে দেবার দিন।

বিদ্যাসাগর। আতরের দর আজকাল কত ক'রে?

যুবক। [বিস্মিত] আতরের দর!

বিদ্যাসাগর সহসা যেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন

বিদ্যাসাগর। বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে, তোমাদের মুখদর্শন করলেও পাপ হয়।

যুবক। আমি—

বিদ্যাসাগর। কাল তোমাদের কলেজে গিয়ে শুনলাম, ছ মাস আগে তুমি কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে স'রে পড়েছ, অথচ আমার কাছে প্রতি মাসে এসে মাইনেটি নিয়ে যাচ্ছ। তোমরা কি!

যুবক অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন

দাঁড়িয়ে রইলে যে, দূর হয়ে যাও আমার সাম্‌নে থেকে, কোন দিন আর এস না।

যুবক। আমার বাবা মারা গেছেন ব'লে পড়া ছাড়তে হয়েছে, আপনি কলেজের মাইনের জন্যে যা দেন, তাইতেই সংসার চলছে কায়ক্লেশে, পাছে আপনি টাকা দেওয়া বন্ধ করেন, সেইজন্যে—[কাঁদিয়া ফেলিলেন]

বিদ্যাসাগর। [পাঞ্জাবি দেখাইয়া] এই কি কায়ক্লেশের নমুনা ?

যুবক। [অশ্রু মুছিয়া] ওটা শ্বশুর-বাড়ির।

বিদ্যাসাগর। ও, বিয়েও করা হয়েছে !

যুবক অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বিদ্যাসাগর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন

পাঁচটা টাকা নিয়ে তা হ'লে আর কি হবে ? কাল বরং কলেজে দেখা ক'র, দেখি যদি চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি একটা। এতদিন সত্যি কথাটা বলতে কি হয়েছিল ?

যুবক নিরুত্তর

আচ্ছা, যাও এখন, কাল কলেজে এস।

যুবক প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার আসিয়া প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। [সোচ্ছ্বাসে] তুই এসে গেছিস, আমি জানতাম ঠিক তুই আসবি, কখন এলি ?

তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন

মদনমোহন। ছাড় ছাড়, এ বুড়ো বয়সে আর চুম্বনটা ক'র না, আলিঙ্গন পর্য্যন্তই থাক।

বিদ্যাসাগর। ব'স, তারপর ওদিকের খবর কি ?

মদনমোহন। স্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্ক লক্ষ্মীং
কামঞ্চ হংসবচনং মণিনূপুরেষু

বন্ধূক কান্তিমধরেষু মনোহরেষু
ক্বাপি প্রয়াতি সুভগা শরদাগমশ্রীঃ।

বিদ্যাসাগর। তার মানে! তুই যে—

মদনমোহন। কলকাতা ব'লে বুঝতে পারছ না তুমি, কিন্তু সত্যই শরৎকাল গতপ্রায়, হেমন্তের আভাস দেখা দিয়েছে।

বিদ্যাসাগর। কি বিপদ, আমি জিগ্যেস করছি পাত্রীটির খবর, আর তুই ঋতুসংহার আওড়াচ্ছিস!

মদনমোহন। বিধবাদের প্রসঙ্গে ঋতুসংহারের প্রয়োগ এখন তো আর অপপ্রয়োগ নয় ভাই। তোমার কলেরা-রোগী কেমন আছে আগে বল।

বিদ্যাসাগর। অনেকটা ভাল, কিন্তু এখনও বিপদ কাটে নি, আবার যাব একটু পরে।

দ্বারপ্রান্তে কালীপ্রসন্ন সিংহ আসিয়া দাঁড়াইলেন। তরুণকান্তি প্রিয়দর্শন কিশোর, বয়স ষোল-সতেরো, পরিধানে মূল্যবান চোগা-চাপকান, মাথায় জরির কাজ-করা টুপি

বিদ্যাসাগর। এস এস কালীপ্রসন্ন, কি মনে ক'রে?

কালীপ্রসন্ন প্রবেশ করিয়া উভয়কে প্রণাম করিলেন

কালীপ্রসন্ন। আমাদের বিদ্যোৎসাহিনীর আজ একটা মীটিং হবে, আপনি আসবেন কি?

বিদ্যাসাগর। মদন এসেছে, আজ আর বোধ হয় পারব না।

কালীপ্রসন্ন। সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা দেখেছেন?

মদনমোহন। তোমার কাগজ যখন এল, ও তখন ছিল না। এই নাও, রামগোপাল ঘোষের ওখান থেকে একখানা চিঠি আর একটা বাক্স এসেছে—এই সেই চিঠি আর ওই বাক্স।

বিদ্যাসাগর। কি চিঠি?

চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন

এদের ডেঁপোমিটা দেখ একবার।

মদনমোহন। কি, ব্যাপার কি?

বিদ্যাসাগর। পড়ছি শোন,—হে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বিদ্যাসাগর, অদূর-ভবিষ্যতে যে বিধবা-বিবাহটি সংঘটিত হইবেক তাহাতে তুমিই যে একাধারে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার পদ অলঙ্কৃত করিবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই, সেইজন্য এতৎসহ বিধবা-বিবাহের প্রথম দম্পতীকে যৎসামান্য উপহার তোমার সকাশেই প্রেরিত হইল। হে উদার-হৃদয় ব্রাহ্মণ, এই সামান্য উপহার পরিগ্রহণ করতঃ তোমার অযোগ্য বন্ধুগণকে দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করহ ইহাই তাহাদের একান্ত অনুরোধ। ইতি শ্রীরাধানাথ শিকদার, শ্রীরসিককৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরামগোপাল ঘোষ।

মদনমোহন। ঠিক মনে হচ্ছে, যেন তুমি নিজে লিখেছ।

বিদ্যাসাগর। লিখেছে রাধানাথ শিকদার, আমার ভাষার নকল ক'রে।

মদনমোহন। কি কি জিনিস দিয়েছে দেখি—

বাক্সের ডালা তুলিয়া দেখিলেন, কৌতূহলী কালীপ্রসন্নও দেখিতে লাগিলেন

খুব দামী দামী জিনিস দিয়েছে হে, রূপোর বাসন, বেনারসী শাড়ি, ভাল ভাল রেশমের জামা কাপড়। ও বাবা, আতর, গোলাপ-জল—এখানা কি—আচ্ছা, কি ফাজিল দেখ দিকি—জয়দেবের গীতগোবিন্দ একখানা দিয়েছে!

বিদ্যাসাগর। ওসব রাখ তুই, আসল কথাটা বল আগে। এত সব কাণ্ডের পর একটা বিয়ে দিতে না পারলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমার।

মদনমোহন। বিধবা পাত্রী ঠিক করেছি, নাম কালীমতি, কিন্তু তার মাকে হাজার টাকা দিতে হবে, তা না হ'লে তিনি রাজি হবেন না।

বিদ্যাসাগর। হাজার টাকা! কেন?

মদনমোহন। গরজ আমাদের, তাঁর নয়।

বিদ্যাসাগর। অত টাকা তো আমার হাতে নেই ভাই।

মদনমোহন। টেবিলের ওপর অনেকগুলি মনি-অর্ডার লেখা রয়েছে দেখলাম, ওগুলি কি—

বিদ্যাসাগর। আজই পাঠাতে হবে। তারপর আমার হাতে আর একটি পয়সা থাকবে না।

অপ্রত্যাশিতভাবে কালীপ্রসন্ন কথা কহিলেন

কালীপ্রসন্ন। আমি দেব হাজার টাকা, ব্যবস্থা করুন আপনি।

বিদ্যাসাগর। তুমি দেবে!

কালীপ্রসন্ন। দেব।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল

কালীপ্রসন্ন। আমি যাই এবার, মীটিঙের আর দেরি নেই বেশি। টাকাটা কালই আমি পাঠিয়ে দেব।

প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। এ যে তাক লাগিয়ে দিয়ে গেল রে!

মদনমোহন। শ্রীশ কি বিয়ে করতে রাজি হয়েছে?

বিদ্যাসাগর। চাকরি-টাকরির লোভ দেখিয়ে অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি। এখনই আসবে সে। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতি বাগড়া লাগাতে চেষ্টা করছেন।

মদনমোহন। তাই নাকি?

বিদ্যাসাগর। এ দেশে কোন একটি সৎকার্য্য করবার কি জো আছে! তোর মেয়ে ভুটোর নামের সঙ্গে বিটন সায়েবের নাম জড়িয়ে কি কুৎসাটা রটাচ্ছে শুনেছিস তো?

মদনমোহন। শুনেছি। [হাসিলেন]

বিদ্যাসাগর। হাসছিস যে?

মদনমোহন। ভয় কি, অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে—

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।

শ্রীশ বিদ্যারত্ন প্রবেশ করিলেন

শ্রীশ। আমি ভেবে দেখলাম ভাই, আমি পারব না। আমার আত্মীয়-স্বজনরা—

বিদ্যাসাগর। এখন পেছনো অসম্ভব, মদন পাত্রী ঠিক ক'রে এসেছে।

শ্রীশ। আমার ভাই, কেমন যেন—মানে ভয় করছে।

বিদ্যাসাগর। আইনসঙ্গতভাবে একটি মেয়েমানুষকে বিয়ে করবে তাতে ভয়টা কি?

শ্রীশ। আমার আত্মীয়স্বজনরা রাজি হবে কেন?

বিদ্যাসাগর। তাদের রাজি করবার ভার আমি নিচ্ছি, তুমি ঠিক থাক।

শ্রীশ। আরে দূৎ, পাগল নাকি, কি যে বল!

মদনমোহন। পাত্রীটি পরমাসুন্দরী।

বিদ্যাসাগর। এ বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

শ্রীশ। [বিব্রত] পাগল নাকি!

বিদ্যাসাগর। [সানুনয়ে] অমত করিস না ভাই, লক্ষীটি, তোর পায়ে ধরছি আমি।

পায়ে ধরিতে গেলেন

শ্রীশ। আঃ, কি কর তুমি!

বিদ্যাসাগর। [সহসা উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ঝাঁকি দিতে দিতে] এ বিয়ে তোমাকে করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে—

মদনমোহন স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সম্মুখ-ভাগের খানিকটা অংশ। এই অংশটুকুতে যদিও চার পাঁচ জনের বেশি লোক দেখা যাইতেছে না, কিন্তু একটা কলগুঞ্জন হইতে বেশ বোঝা যাইতেছে যে, অদৃশ্য অংশ জনবহুল। ভিতরে সানাই বাজিতেছে। ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৮৫৬ সাল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে

১ম ব্যক্তি। উঃ, রাস্তায় ভিড় হয়েছে দেখেছিস, বড় রাস্তাটাতে তো পা ফেলবার জায়গা নেই!

২য় ব্যক্তি। শুনছি নাকি পুলিস ফোর্স এসেছে কেল্লা থেকে।

এ কথার কেহ জবাব দিল না

১ম ব্যক্তি। বিধবার বিয়ে দিলে, তবে ছাড়লে! বাহাদুর লোক বটে বাবা এই বিদ্যাসাগর!

২য় ব্যক্তি। শুনছি নাকি লাটসায়েব বরযাত্রী এসেছে।

৩য় ব্যক্তি। ওটা একদম বাজে কথা।

১ম ব্যক্তি। কিচ্ছুই অসম্ভব নয়। এ দেশে বিধবার যে বিয়ে হতে পারে, তাই বা কে ভেবেছিল বল আগে?

৪র্থ ব্যক্তি। বিদ্যেসাগর অত কাঁচা ছেলে নয় যে, এ বিয়েতে সায়েবকে নিয়ে আসবে। সায়েব আসতে চাইলেও বাধা দিত বিদ্যাসাগর।

৩য় ব্যক্তি। কেন, তাতে ক্ষতিটা কি?

৪র্থ ব্যক্তি। ক্ষতি এই যে, দেশের লোকে তা হ'লে বলবে—ও সায়েবী বিয়ে হয়েছে, হিন্দু বিয়ে হয় নি। সেটি তোমাদের বলতে দেবে না বিদ্যাসাগর, হুঁ হুঁ।

১ম ব্যক্তি। তা বটে, যা বলেছ।

৪র্থ ব্যক্তি। সেদিকে ও ঠিক আছে। হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুসারে পুরো হিঁদুয়ানি মতে বিয়েটি দেবে ও। খুঁতটি রাখবে না।

ব্যস্তসমস্তভাবে পঞ্চম ব্যক্তির প্রবেশ

৫ম ব্যক্তি। বর এসে গেছে?

৩য় ব্যক্তি। কোন্ কালে।

১ম ব্যক্তি। শুধু এসে গেছে! বাজনা বাজিয়ে, তুবড়ি ফুটিয়ে, আলোর বাহার দিয়ে, দস্তরমত সমারোহ ক'রে এসে গেছে। দেখবার মত প্রসেশন হয়েছিল একটা, মল্লিকদের বাড়ির প্রসেশনের পর এমন প্রসেশন আর দেখি নি আমি।

৫ম ব্যক্তি। আহা, আমার দেখা হ'ল না হে!

৩য় ব্যক্তি। তুমি এতক্ষণ ছিলে কোন্ চুলোয়?

৫ম ব্যক্তি। আমার বেরুতে একটু দেরি হয়ে গেল। জানই তো, আমার ছোট ছেলেটা যেমন ন্যাওটো, তেমনই বায়নাদার। তাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে এলাম। জেগে থাকলেই সঙ্গে আসতে চাইত।

১ম ব্যক্তি। সঙ্গে আনলেই পারতেন, প্রসেশনটা দেখা উচিত ছিল।

৫ম ব্যক্তি। এক বায়নাদার কাঁদুনে ছেলে ঘাড়ে ক'রে প্রসেশন দেখতে আসব! কি যে বলেন আপনারা!

২য় ব্যক্তি। আমি শুনছি, বরের আপনার লোক কেউ আসে নি।

৩য় ব্যক্তি। তুমি তো অনেক খবরই শুনেছ দেখছি। লাট সায়েব এসেছে শুনেছ, পুলিস ফোর্স এসেছে শুনেছ, বরের আপন লোক

আসে নি শুনেছ, আর কি কি শুনেছ বল দেখি? ঝেড়ে কাস না বাবা!

২য় ব্যক্তি। কানে আঙুল দিয়ে থাকব বলতে চাও?

৫ম ব্যক্তি। ওর কথাবার্ত্তাই ওই রকম।

৪র্থ ব্যক্তি। না না, এ খবরটা আপনি ঠিকই শুনেছেন। বরের আত্মীয়স্বজন কেউ এ বিয়েতে যোগ দেন নি।

১ম ব্যক্তি। বিয়ের দিনই পেছিয়ে গেল ওই হাঙ্গামায়। আগে দিন হয়েছিল, ১৫ই অগঘান, একটি হপ্তা পেছিয়ে গেল।

৫ম ব্যক্তি। [সবিস্ময়ে] তাই নাকি!

২য় ব্যক্তি। শুনছি নাকি শেষ মুহূর্ত্তে বরও বেঁকে দাঁড়িয়েছিল।

৫ম ব্যক্তি। [আরও বিস্মিত] তাই নাকি, তার পর?

৪র্থ ব্যক্তি। বিদ্যাসাগর সোজা ক'রে দিলে আবার।

৫ম ব্যক্তি। তা তো হবেই, বিধবাকে বিয়ে করা কি একটা সামান্য কর্ম্ম, বুকের পাটা চাই!

১ম ব্যক্তি। কি রকম?

৫ম ব্যক্তি। চাই না! ও তো হাড়কাঠে মাথা গলানোর সামিল। বৈধব্য যোগ আছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েও তাকে বিয়ে করা—

চোখ ও ভ্রূর এমন একটা ভঙ্গি করিলেন, যদ্দারা এ কার্য্যের দুরূহতা ও এ প্রকার বিবাহকারীর অসমসাহসিকতা সূচিত হইল

১ম ব্যক্তি। যা বলেছেন, না জেনে শুনে অন্ধকারে সাপের ঘাড়ে পা দেওয়া যায়, কিন্তু চোখে প্রত্যক্ষ ক'রে তার কাছে ঘেঁষা শক্ত। ঠিক।

৫ম ব্যক্তি। নয়?

৩য় ব্যক্তি। কিন্তু ওস্তাদ যারা, তারা সাপ নিয়ে খেলাও তো করে!

৫ম ব্যক্তি। কিন্তু মেয়েমানুষ আর সাপ এক জিনিস নয়। [৪র্থ

ব্যক্তিকে হাস্য গোপন করিতে দেখিয়া] আমি বলছি, এক জিনিস নয়। আমার অভিজ্ঞতা আছে ব'লেই বলছি। এই ধরুন না, আমি বিবাহই করেছি চারটি। বর্ত্তমানে আমার চতুর্থ সংসার চলছে।

৪র্থ ব্যক্তি। তা হ'লে আপনিও একটি হাড়কাঠ বলুন!

৫ম ব্যক্তি। তা যা বলেন। [হাসিলেন]

২য় ব্যক্তি। শুনছি নাকি বর এসে হোটেলে উঠেছিল।

৪র্থ ব্যক্তি। এটা ভুল শুনেছেন, বর এসে উঠেছিল রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে।

৩য় ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, রামগোপাল ঘোষই প্রসেশনের সব খরচা দিয়েছে, বরাভরণ, বরসজ্জা সবই তার খরচায়।

৫ম ব্যক্তি। বটে!

২য় ব্যক্তি। ভাটও শুনছি নাকি এসেছে অনেকগুলি।

৫ম ব্যক্তি। বিয়ে কি সত্যিই হিন্দুমতে হবে—পুরুত ডেকে মন্তর প'ড়ে?

৪র্থ ব্যক্তি। হ্যাঁ, মায় 'হাতে দিলাম মাকু, ভ্যা করত বাপু' পর্য্যন্ত সব হবে। কোন খুঁত রাখবে না বিদ্যাসাগর। টকটকে লাল কাগজে ছাপানো নিমন্ত্রণপত্রের বাহারটা দেখেছিলেন?

৫ম ব্যক্তি। না, দেখি নি।

৪র্থ ব্যক্তি। এই দেখুন না, আমার কাছে রয়েছে।

বাহির করিয়া দিলেন এবং সকলে তাহা সাগ্রহে দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন ভদ্রলোক একতাড়া ছাপানো কাগজ লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং সকলের হাতে একখানি করিয়া দিলেন

ভদ্রলোক। আপনারা এই প্রতিজ্ঞাপত্রটি পড়ুন। যদি কারও এতে

স্বাক্ষর করবার অভিরুচি হয়, স্বাক্ষর ক'রে বিদ্যাসাগর মশায়কে দিয়ে আসবেন, বা পাঠিয়ে দেবেন।

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন

১ম ব্যক্তি। কি প্রতিজ্ঞাপত্র আবার?

৫ম ব্যক্তি। ও সব সই-টইয়ের মধ্যে আমি নেই মশাই।

২য় ব্যক্তি। ও বাবা, এ যে ভয়ানক ব্যাপার দেখছি!

১ম ব্যক্তি। রমেন, তুমি পড় না হে শুনি, আমি আবার চশমাটা আনি নি।

৪র্থ ব্যক্তি পড়িতে লাগিলেন—

প্রতিজ্ঞাপত্র

১। কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইব।

২। একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দিব না।

৩। কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয় অথবা মৌলিক ইত্যাদি গণনা না করিয়া স্বজাতীয় সৎপাত্রে কন্যাদান করিব।

৪। কন্যা বিধবা হইলে এবং তাহার সম্মতি থাকিলে পুনরায় তাহার বিবাহ দিব।

৫। অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না।

৬। এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে আর বিবাহ করিব না।

৭। যাহার এক স্ত্রী বিদ্যমান আছে তাহাকে কন্যাদান করিব না।

৮। যেরূপ আচরণ করিলে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে তাহা করিব না।

৯। মাসে মাসে স্ব স্ব আয়ের পঞ্চাশত্তম অংশ নিয়োজিত ধনাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিব।

১০। এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া কোন কারণেই উপরিনির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইব না।

৩য় ব্যক্তি। ওরে বাবা, এ যে 'টেন কমাণ্ড্মেণ্ট স' দেখছি।

৪র্থ ব্যক্তি। হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরী সংস্করণ।

১ম ব্যক্তি। ওই টাকাকড়ির ব্যাপারটা কি, তা ঠিক বুঝলাম না। নিয়োজিত ধনাধ্যক্ষটাই বা কে?

৫ম ব্যক্তি। আজ ধনাধ্যক্ষ আছে, কাল দেখবেন জুড়ি হাঁকাচ্ছে। অনেক দেখলুম।

২য় ব্যক্তি। লগ্ন কটায়?

৪র্থ ব্যক্তি। সেটা ঠিক জানি না।

১ম ব্যক্তি। বেশি রাত্তিরে যদি হয়, তবে আমি আর থাকব না।

৫ম ব্যক্তি। আমিও না। ছেলেটা উঠে যদি না আমায় দেখতে পায়—

ভিতর হইতে উলুধ্বনি ও শঙ্খরব শোনা গেল

২য় ব্যক্তি। বিয়ে শুরু হ'ল বোধ হয়।

৩য় ব্যক্তি। পাশের এই সরু গলিটার ভেতর ঢুকে সোজা গিয়ে হরিশদের ছাতটায় চড়া যাক, চল। সেখান থেকে বাড়ির ভেতরটা বেশ দেখা যাবে।

২য় ব্যক্তি। আচ্ছা, বরকে কোথায় বসিয়েছিল, বল তো? বাইরের ঘরে তো দেখতে পেলাম না!

৪র্থ ব্যক্তি। বাইরের ঘরে বরকে বসাক আর তোমরা সব ঢিল ছোঁড়, অত কাঁচা ছেলে বিদ্যাসাগর নয়।

৩য় ব্যক্তি। যাবে তো এস।

৪র্থ ব্যক্তি। হ্যাঁ চল, বিয়েটা দেখতে হবে।

সকলে চলিয়া গেল। কপাট খুলিয়া বিদ্যাসাগর বাহির হইয়া আসিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক হইতে ডাক্তার দুর্গাচরণও প্রবেশ করিলেন

দুর্গাচরণ। এই যে, আমি একটা কেসে এমন আটকে পড়লুম ভাই যে, দেরি হয়ে গেল। বিয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে নাকি?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

দুর্গাচরণ। যাক, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু আমার ভাই, কান্না পাচ্ছে।

দুর্গাচরণ। কান্না পাচ্ছে! কেন? তোমারই তো জিত হ'ল, সমস্ত কলকাতা শহর জুড়ে তোমার জয়জয়কার। রাধাকান্ত দেবের ওপর টেক্কা দিয়েছ তুমি।

বিদ্যাসাগর। এর নাম কি জিত? বরপক্ষ কন্যাপক্ষ—দু পক্ষকে ঘুষ দিয়ে এ বিয়ে দেওয়ার সার্থকতা কি? আমি তো এ চাই নি, আমি সবাইকে বোঝাতে চেয়েছিলুম, কারও ওপর টেক্কা দেওয়া তো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। দুর্গাচরণ, মনে হচ্ছে—

দুর্গাচরণ। কি আবোলতাবোল বকছ! চল, বিয়েটা দেখা যাক। এস।

বিদ্যাসাগরকে টানিয়া লইয়া গেলেন

পট-পরিবর্ত্তন

বাড়ির ভিতরকার প্রাঙ্গণ। চারিদিকে বারান্দায় সারি সারি চেয়ার। রামগোপাল, রসিককৃষ্ণ, রাধানাথ, রামতনু প্রমুখ দেশের শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁহাদের সম্মুখে বহু লোক বসিয়া আছেন, পিছনে বহু লোক দাঁড়াইয়া আছেন। বিবাহ-মণ্ডপ হিন্দু-সংস্কৃতি অনুযায়ী সুসজ্জিত ও সুশোভিত। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে হোমশিখার সমক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীশ বিদ্যারত্ন শ্রীমতী কালীমতি দেবীর পাণিগ্রহণ করিতেছেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। বিবাহের সংস্কৃত মন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না। বিদ্যাসাগর ও দুর্গাচরণ এক কোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ক্রমশ

"বনফুল"

চণ্ডীদাসের ভাষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'উনমত নহ কাহ্নাঞি মন কর থীর' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, দানখণ্ড) পদে আছে,—'এড়হ বাগড় কাহ্নাঞি জাইতেঁ দেহ ঘর'; বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তাঁহার টীকাতে 'বাগড়' শব্দের অর্থ 'আয়ত্তিচেষ্টা' লিখিয়াছেন; টানিলে কোন গতিকে হয়তো অর্থটা আসিতেও পারে; কিন্তু 'বাগড়' শব্দ 'বাধা' অর্থে বীরভূমের সর্ব্বত্রই প্রচলিত; লোকে বলে, 'তু সব কাজে এমন বাগড় মারিস কেনে?' 'পায়ে পায়ে বাগড় ঘুরে বেড়াইচে', 'বাগড় যত যাবার বেলা' ইত্যাদি। সংস্কৃত 'বাগুড়া' শব্দ হইতে 'বাগড়' শব্দের উৎপত্তি।

'জিতে পরকার নাহীঁ বোল মাহাদানী' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, দানখণ্ড) পদে আছে,—'হোর আইসে আইহন গোআল'; 'হোর' মানে 'ওখানে'; বীরভূমের সব লোকই কথায় কথায় বলে, 'হোঁরো মরগা যা!' বড়ু একাধিক স্থানে এই 'হোর' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—

'হোর আছে ঘাটোআল লৰ্আা নাওখানি' ('আগুজাএ বড়ায়ি'-পদ, নৌকাখণ্ড);

'হোর সব সখী জন' ('দধি দুধ নঠ কৈলেঁ'-পদ, নৌকাখণ্ড);

'হের ভাল ফুল হোর ভাল ফল' ('সুণ গোপী আহ্মার বচন'-পদ, বৃন্দাবনখণ্ড) ইত্যাদি।

'বিচিত্র খোঁপার উপরে রাধা' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, দানখণ্ড) পদে আছে,—'পালাইলেঁ দান এড়ান না জাএ পাইলেঁ মূল আফারে';

'হরিতালীচন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বালখণ্ড) পদে আছে,—'আছুক লাভ মোর মূলত আফার';

বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয় প্রথম 'আফারে'র অর্থ 'অপার' এবং দ্বিতীয় 'আফারে'র অর্থ 'ফাঁক' অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, 'আফার' মানে 'হাপর'; বীরভূম-অঞ্চলে ইহার উচ্চারণ 'আফর'; এখানে 'আফর' অর্থ অসঙ্গত নয়। প্রথম পদাংশের অর্থ,—'রাধা, তুমি পালিয়ে দান এড়াতে পারবে না, একেবারে মূল 'আফরে' এসে পড়েছ'; 'আফরে পড়লে সব ঠিক হঞেঁ যাবে' বীরভূমের সুপ্রচলিত বাগ্বিধি। দ্বিতীয় পদাংশের অর্থ দাঁড়ায়,—'আমার লাভের অঙ্কে নবডঙ্কা, মূলেই 'আফর' জ্বলল', অর্থাৎ সব পুড়ে ছারখার হ'ল।

সাসু নিষধিল মোরে বুলীল' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, দানখণ্ড) পদের 'ও' স্থানে 'উ' উচ্চারণ বীরভূমের, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষার আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখানো হইয়াছে। বড়ু প্রায় সর্ব্বত্রই 'ও' স্থানে 'উ', 'এ' স্থানে 'ই' এবং 'সে' স্থানে 'সি' উচ্চারণ ব্যবহার করিয়াছেন। এগুলি বীরভূম-অঞ্চলের বিশিষ্ট উচ্চারণভঙ্গি; 'যে' স্থানেও এখানকার লোক 'যি' উচ্চারণ করে; বলে, 'সি যি বদমাস হৈচে!'

'আইস গোআলিনী বইস কদমের তলে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, দানখণ্ড) পদের 'ঢেণ্টন' 'ঢনঢনে' উচ্চারণে বীরভূমের সর্ব্বত্র প্রচলিত।

'বসি থাকে কদমের তলে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, দানখণ্ড) পদে আছে,—'রাধা পড়িলী কাহ্নের বেঢ়ে'; 'বেঢ়' মানে 'আবেষ্টন'; কিন্তু 'বেঢ়' বা 'বেড়' বীরভূমে একটি বিশিষ্ট স্থানের সংজ্ঞা; নদীর জলভাগের উপরে যে নিম্নভূমি, যেখানে ফসল তরি-তরকারি জন্মায়, সেখানটাকে বীরভূম অঞ্চলে বলে 'ওলা'; আর তাহার উপরে যে ডাঙা, যেখানে গাছপালা জন্মায়, সেইখানটাকে 'বেড়' বলে। কাহ্নের অধিকৃত 'বেড়ে'-ই কদমগাছটি ছিল।

'না জাইব আল রাধা মথুরা নগর' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, দানখণ্ড) পদে

আছে,—'মাগু কিসে মারোঁ আজি যদি করে বল'; 'মাগু' ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে 'যোনি' অর্থে বীরভূম অঞ্চলের সর্ব্বত্র প্রচলিত।

'তোহ্মো যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন সতন্তরে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, দানখণ্ড) পদে আছে,—'যবেঁ কাঢ়ায়িলি বাট দুসহ আরণে'; 'কাঢ়ায়িলি' পদটি ঠিক এই অর্থে বীরভূমে চলিতেছে, বলে, 'উ পথে পা কাঢ়িয়েঁছিস কি মরিছিস।'

'দাতা বলি ছলিআঁ মো নিলোঁ পাতালে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, দানখণ্ড) পদের 'অলঞ্জাল' শব্দটির অর্থ 'উৎপাত'; কোন ছেলে দিনের বেলাটা উপদ্রব ও দৌরাত্ম্যে বৃথা নষ্ট করিয়া রাত্রে পড়াশুনা করিতে বসিলে বীরভূম-অঞ্চলের অভিভাবকস্থানীয়েরা ঠাট্টা করিয়া বলে, 'দিন গেল 'আলে-জলে', রেতের — বাতি জ্বলে!' বীরভূমের 'আল মাটি চাল' করাও উৎপাত অর্থে ব্যবহৃত; জিনিসপত্র 'উল-ঢুল' করিয়া দেওয়াকেও 'আলচাল' করিয়া দেওয়া বলে।

'ছায়েঁখারে জাউ মুগধী বড়ায়ি' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, দানখণ্ড) পদের 'খেড়' বীরভূমের উচ্চারণ; এখানকার লোক 'খড়'কে 'খেড়' বলে।

'কি মোর ঝগড় পাত যমুনার ঘাটে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, নৌকাখণ্ড) পদের 'ঝগড় পাত' বীরভূমের বাগ্বিধি; এরা বলে, 'তোরা দুজনায় আবার ঝগড়া পাতালি কেনে?' 'তারা ঝগড়া পাতিয়েঁচে, দেখ গা' ইত্যাদি; প্রাচীনদের মুখে 'ঝগড়' শুনিয়াছি, কিন্তু আধুনিকেরা 'ঝগড়া' পদই ব্যবহার করে।

'মনত হরিষ কর ঈষত হাসিআঁ' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, নৌকাখণ্ড) পদের 'না বাসসি লাজ' বীরভূমের বাগ্বিধি; 'ভয় বাসি', 'দুখ বাসি', 'লাজ বাস না', 'মন্দ বাসে না' ইত্যাদি এ অঞ্চলের আটপৌরে ব্যবহারের ভাষা। বড়ু একাধিক পদে এই বাগ্বিধি ব্যবহার করিয়াছেন—

'এসব করমে কেহে ভয় না বাসসী' ('উত্তম গোআল কুলে আহ্মার জরম' পদ, বংশীখণ্ড)'
'লাজ না বাস বুলিতে হেন বচনে ('আজি ভাল না শুনো মো তোহ্মার বচন' পদ, ঐ)।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও 'ধিক ধিক বঁধু লাজ নাহি বাস' ইত্যাদি পদাংশে এই বাগ্বিধি ব্যবহৃত হইয়াছে।

'বচনেক বোলোঁ শুন চন্দ্রাবলী রাণী' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, নৌকাখণ্ড) পদে আছে, 'হাট উখুড়িবে' প্রচুর বৈল বেলা, 'উখুড়িবে' বীরভূম-অঞ্চলে হামেশা ব্যবহৃত হয়; এখানকার লোকে বলে, 'ডাওর উথুড়ুক, নইলে কোন কাজই পাওয়া যাবে না'; 'ডাওর উখুড়ুক' মানে 'বাদল শেষ হোক'; জালার গুড়ের সমস্ত মাত নিঃশেষ হওয়ার পর তলের দিকে যে শুকনা অ-রস গুড় জমে, তাহাকে বলে 'উখড়' গুড়।

'যবে রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ
হেহে লহে।
তবেঁ হিল্প হিল্প বুলী কাহ্ন বাহে নাএ
হেহে লহে লহে॥' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, নৌকাখণ্ড)

পদের 'হে হে লহে লহে' মানে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আস্তে-আস্তে!' বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয়ের টীকাতে ইহার অর্থ 'উৎসাহসূচক ধ্বনি' এইটুকু মাত্র দেওয়া আছে; কিন্তু বীরভূম-অঞ্চলে 'ধীরে ধীরে' অর্থে 'লএ-লএ' সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়; বলে, 'অত তাড়াতাড়ি কেনে, লএ-লএ চল।'

'মাঝ বৃন্দাবনে গিআ কাহ্নায়ি গোআল' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ভারখণ্ড) পদে আছে,—'ভার সজ করিবারে'; বীরভূম-অঞ্চলে এই 'সজ' শব্দটি অবিকল প্রচলিত;—এখানকার লোকে আমের সময় জামাই-বাড়ি 'আম-সজ' পাঠায়; পূজার তত্ত্ব পাঠাইবার সময় বলে, 'কাপড়-সজ পাঠাতে হবে।' পূজার সময় ইহারা চাঁছিয়া-ছুলিয়া উঠান ও নাছ 'সজ' করে, ধান উঠিবার আগে খামার 'সজ' করে। ভারখণ্ডের 'বচনেক বোলোঁ সুণ' পদের 'সজী' শব্দটিও বীরভূমে নিত্য ব্যবহৃত হয়; এরা ভাত 'সজী' করে, পান 'সজী' করে দেয়।

'প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ভারখণ্ড) পদের 'সমার' ('সবার' স্থলে) উচ্চারণ বীরভূম আজও অবিকল রাখিয়াছে ; এখানকার লোকে বলে, 'সামার-ই তো ঘরে মাগছেলে আছে ভাই !" এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, বড়ুর 'সহ্মাই' পদ 'সমাই' উচ্চারণে বীরভূমে চলিতেছে ; এরা বলে, 'সমাই মেলে দুখের ভাত সুখ ক'রে খাবে তা না হঞে কথায় কথায় ঝগড়া পাতিঞেঁ-ই আছে !'

'প্রভাত সময় ভৈল সব সখী জনে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বৃন্দাবনখণ্ড) পদে আছে,—'নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে' ; 'ফুটিলছে' মানে 'ফুটিয়াছে' ; বীরভূম-অঞ্চলে 'হয়েছে', 'গিয়েছে' প্রভৃতি স্থানে 'হ'লছে', 'গেলছে' প্রভৃতি বলে। রাধাবিরহখণ্ডের 'আজি স্বপন বড়ায়ি দেখিল এ আল আলিছিল নান্দের নন্দন' পদের 'আলিছিল' বীরভূমে 'আলছিল' উচ্চারণে প্রচলিত ; এখানকার অ-ধোপদোরস্ত চাষা-ভূষারা এখনও 'আসিয়াছিল' স্থানে 'আলছিল', 'মরিয়াছিল' স্থলে 'মলছিল' প্রভৃতি বলিয়া থাকে ; তাহাদের মুখে একটি ছড়া প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, 'ভাগ্যে বুড়ো মলছিল, সেঁই খই-লাড়ুটো হলছিল।'

'সকল গোআলকুল লঞা ততিখনে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কালিয়দমন-খণ্ড) পদের 'জুড়িল কান্দন' বীরভূম-অঞ্চলের বাখিধি ; লোকে বলে, 'লাও, উ আবার কাঁদন জুড়ে দিলে !'

'কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, যমুনাখণ্ড) পদের 'তোর বাঁশী মোএ 'ঘসি না ঘাঁটো'। তাক হাথে করী 'দুধ না আউটোঁ।' ॥' পড়িতে পড়িতে মনে হয়, একেবারে বীরভূম-অঞ্চলের হেঁসেল-ঘরে আসিয়া পড়িয়াছি।

ঐ পদেই আছে,—'মুকুট ধুয়িয়াঁ আছুকিতে ভাল' ; 'আছুকিতে' মানে অভ্যুক্ষণ করিতে, জল ছিটাইতে ; বীরভূম-অঞ্চলে 'আঁউকানি'

শব্দটার খুব প্রচলন আছে; বৃষ্টির সময় জোর হাওয়ায় ঝাপটা আসিতে থাকিলে লোকে বলে, 'দেব্‌তা ঘি আঁউকানি করছে!' আবার, ইহার সঙ্গে 'বাঁউকানি' শব্দও যোগ করিয়া দিয়া বলে, 'ঘি আঁউকানি বাঁউকানি করছে!' আর এক অর্থে 'আঁউকানি' শব্দের প্রচলন দেখিতে পাই; অ-জ্বলন্ত আগুনকে হাওয়া দিয়া জ্বালাইয়া অর্থেও 'আঁউকিঞেঁ দেওয়া' ব্যবহৃত হয়। অবশ্য 'অভ্যুক্ষণ' হইতে কেমন করিয়া এ অর্থ আসিল বলা শক্ত; তবে প্রচলন তো সব সময় ভাষার নিয়মকানুন মানিয়া চলে না! যাহা হউক, ঐ অর্থ ধরিলেও আলোচ্য পদাংশের সঙ্গত অর্থ হইতে পারে; সংস্কৃত 'ধ্মা' ধাতু হইতে 'ধুমিয়াঁ' পদ উৎপন্ন হইতে পারে; (ধ্মা>ধমিয়া>ধোমিয়া>ধুমিয়া>ধুমিঁয়া বা ধুমিয়াঁ) 'ধ্মা' ধাতুর এক অর্থ 'অগ্নি-সংযোগ করা';—'ধ্মা শব্দাগ্নিসংযোগয়োঃ'; সুতরাং 'ধুমিয়াঁ'র অর্থ দাঁড়াইল—অগ্নিসংযোগ করিয়া; 'ধুমিয়াঁ আহুকিতেঁ' মানে কোন কিছুতে 'অগ্নিসংযোগ করিয়া হাওয়া দিয়া জ্বালাইতে'; তাহা হইলে আলোচ্য পদাংশের অর্থ দাঁড়ায়,—'তুমি আমাকে মুকুট লইয়া তোমার সম্মান রাখিতে বলিতেছ! কিন্তু তোমার ও ছার মুকুটের আবার মূল্য কি? উহা দিয়া হাওয়া করিয়া আগুন জ্বালাইতেই ভাল।' চূড়া দিয়া বেশ হাওয়াও করা যাইতে পারে।

'মো যবেঁ জানিবোঁ রাধা তেজিব পরাণে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বালখণ্ড) পদের 'গেলা কতী' বীরভূমের রামপুরহাট অঞ্চলের ভাষা; পাঠ্যজীবনে বিনা অনুমতিতে বহির্গমনের পর ক্লাসে আসিয়া রামপুরহাট-অঞ্চলবাসী আমাদের এক শিক্ষক মহাশয়ের কাছে একাধিকবার ধমক খাইয়াছি; তিনি প্রথমেই আরম্ভ করিতেন, 'কতি গেলছিলা?'

'কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বালখণ্ড) পদে আছে,—'তালের বিনিঞেঁ রাধাক বিচি কাহ্ন'; 'বিনিঞেঁ' মানে

'বেনায়' অর্থাৎ 'বেনা' দিয়া; বীরভূম-অঞ্চলে তালপাতার পাখাকে সবাই বলে 'বেনা',—'পাখা' কেহ বলে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

'কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বংশীখণ্ড) পদের 'নাদেঁ' (না দেয়) বীরভূমে প্রচলিত আছে; এখানকার একটি সর্ব্বজনপরিচিত ঘুম-পাড়ানো ছড়া,—

'ক্ষিদে লেগেছে নাদেঁ,
সেঁই তো গোপাল কাঁদে।'

'প্রথম পহরে গোআল গেল নিন্দে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বংশীখণ্ড) পদের 'নাছে' (বহির্দ্বারে) শব্দটি বীরভূম-অঞ্চলের ইতরভদ্রনির্ব্বিশেষে সকলে ব্যবহার করে।

'ষোল শত রাধার সঙ্গিনী। আল' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বংশীখণ্ড) পদে আছে,—'তণ্ডী কয়িলেঁ না পাইবে বাঁশী'; 'তণ্ডী' মানে 'বিতণ্ডা'; শব্দটি বীরভূমে 'তণ্ডী' ও 'টণ্ডী' উভয় আকারেই প্রচলিত আছে; কেহ কোন জিনিস পাইবার জন্য নাছোড়বান্দা হইয়া জেদ ও কথা-কাটাকাটি করিতে থাকিলে লোকে বলে, 'উ টণ্ডী লাগিয়েঁচে, না নিয়ে ছাড়বে না।'

'আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, রাধাবিরহখণ্ড) পদে আছে,—'আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী'; 'নিবড়ে' মানে 'শেষ হয়'; মনে হয়, সংস্কৃত 'নির্ঘূঢ়' (সমাপ্ত) শব্দ হইতে উৎপন্ন। শব্দটি বীরভূম-অঞ্চলে 'নেবট' বা 'নেপট' আকারে প্রচলিত আছে; এরা ভয় দেখায়, 'তোকে নেপট ক'রে মেরে ফেলব', অর্থাৎ নিঃশেষ ক'রে মারব, ভোজ-কাজের বাড়িতে গৃহকর্ত্তাকে কেহ যদি কিছু খাইতে অনুরোধ করে, গৃহকর্ত্তা বলে, 'সমার-ই খ-দ নিপুটে যাক এগিঞেঁ, তা পরে যা হয় করব।'

'আইস ল বড়ায়ি হের' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, রাধাবিরহখণ্ড) পদের 'ঠাঁঠী' বীরভূমে প্রচলিত রহিয়াছে; কোন নবীনার কথাবার্ত্তা, চালচলন,

বেশভূষা বা ঢং অনভিমত ও বিরক্তিকর হইলে প্রবীণা বলে, 'ঠাঠী, ঠাঠ করছে দেখ।'

তাহা ছাড়া, বড়ুর 'হিঁছোল' (হেঁজোল, হেঁজাল বা হেঁচাল উচ্চারণে), খঙ্গ (খোঁ বা খোঁঙর উচ্চারণে—'ভারী খোঁ বা খোঙর-ওয়ালা ছেলে'), ঢুঁসাঞে (ঢুঁসাঞেঁ বা ঢুঁসিঞেঁ উচ্চারণে), লোহ (লো, নো বা নোড় উচ্চারণে—'চোখের নো — পুঁছতে পুঁছতে বাড়ি গেল'), খাঁখার (ক্যাঙকার উচ্চারণে—'ওদের বউ দুটো দিনরাত ক্যাঙকার করছে), খাট (খেঁটে উচ্চারণে—'বামুনের ঘরের খেঁটে কোথাকার'), পাখুড়ি (পাঁকুড়ি বা পেঁকুড়ি উচ্চারণে—'গাছটোয় পেঁকুড়ি মেলেছে'), উয়ে (অঁইঞেঁ উচ্চারণে—'রোদে বেগুনের পোঅগুলো অঁইঞেঁ গেইচে', 'জোনারীটো আগুনে অঁইঞেঁ নে'), নিহুড়িয়া (লেউড়িঞেঁ উচ্চারণে —'মাটিটো লেউড়িঞেঁ আন'), টালিঞা, ইঞ্চলা (ইঁচলে বা ইলচে উচ্চারণে), আথান্তর, নিমাথী, বিন্ধ্, নারে (পারে না), শাল (শাষ,—লাঙলের শাল') ইত্যাদি বহু পদ ব্যাপকভাবে বীরভূমে নিত্যপ্রচলিত।

আর, বড়ুর হঅাঁ, লঅাঁ প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলির অনুনাসিক উচ্চারণ, এবং শব্দের মাথায় যেখানে-সেখানে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ বীরভূমের ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বীরভূমে 'পোস্ত'কে বলে 'পোঁস্ত', 'সেই'কে বলে 'সেঁই'; এমন বহু শব্দ অযথা অনুনাসিক উচ্চারণে ব্যবহৃত।

বড়ুর 'কবল' বীরভূমে 'কঅল' বা 'ক-ল' আকারে প্রচলিত, অন্যত্র 'খাবল'; 'খাবল' বীরভূমেও প্রচলিত আছে।

ইহার পরও কি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না,—বড়ু বীরভূমের ভাষাতেই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন?

এখন, বড়ুর ভাষা বীরভূমের, পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভাষা বীরভূমের, নান্নুর বীরভূমের, নান্নুরে বাশুলী আছেন, চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় প্রবাদগুলির প্রমাণ বীরভূমেই মিলিয়াছে; সুতরাং এখন নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করিব,—বাশুলীর কৃপাপাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রণেতা এবং পদাবলীর রচয়িতা উভয় চণ্ডীদাসই বীরভূম নান্নুরের 'বাসলীগণে'র কবি।

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ

সংস্কৃত-সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ আজন্ম রূপকার। তাঁর রূপ-সৃজনী প্রতিভা প্রথম থেকেই সৌন্দর্য্যের ধ্বনি-রূপকে আশ্রয় ক'রে নিজের বিকাশসাধন করেছে। ছন্দ ও সঙ্গীত—ধ্বনির এই দুইটি অভিব্যক্তিকে বহু বিচিত্র রূপে প্রয়োগ ক'রে তিনি যে ভাবের মূর্ত্তি গ'ড়ে তুলেছেন, সে সৃষ্টির হয়তো তুলনা নেই। এই দিক দিয়ে তাঁর প্রতিভা সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনি-সামঞ্জস্য ও ছন্দের মধ্যে নিজের একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করেছে। শৈশবে যখন সংস্কৃত কাব্যের অর্থ বুঝে তার রসোপভোগের সময় হয় নি, তখনও যে সংস্কৃত ছন্দের বিচিত্র ঝঙ্কার রবীন্দ্রনাথের কবি-মনকে দোলা দিয়েছে, সে কথা 'জীবনস্মৃতিতে' পাওয়া যায়—

আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারে বাগানে মেঘোদয়ে বড়োদাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায় ছিল না, তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দউচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।···একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গার বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতিপুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম।···আমি তখন সংস্কৃত জানিতাম না··· সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছু বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে "নিভৃতনিকুঞ্জগৃহংগতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং" এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্য্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝংকারের মুখে "নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং" এই একটি মাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। যেদিন আমি—অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং—এই পদটি ঠিকমতো যতি রাখিয়া

পড়িতে পারিলাম সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝি নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্য্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম। আরও একটু বড়ো বয়সে—

মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃকম্পিতদেবদারুঃ
যদ্‌বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ।—

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছু বুঝি নাই—কেবল "মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর" এবং "কম্পিতদেবদারু" এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল।

কিন্তু সংস্কৃতকাব্যের ছন্দের তান-লয় কবি-মনকে মাতিয়ে তুললেও, এ সাহিত্যের সঙ্গে, বিশেষত,কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে, রবীন্দ্র-প্রতিভার যোগ অতি নিবিড়। ছন্দের গুঞ্জরণ ও শব্দচয়নের নিপুণ প্রয়োগে রসপরিবেশের যে শক্তি, তার চরম বিকাশ দেখা যায় কালিদাসের কাব্যে। কালিদাসের ভাষা একাধারে ছবি ও গান; ধ্বনি, রেখা ও রঙের অপরূপ রূপায়ন। এইখানে উজ্জয়িনীর মহাকবির সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার ঐক্য সহজেই চোখে পড়ে। বাংলা ভাষার জীর্ণ বাক্যে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ নব সুর দিয়ে "অর্থের বন্ধন হতে" তাকে "ভাবের স্বাধীন লোকে" নিয়ে গেছে। তাঁর "খেয়ালের ভাষা"—

"আলোকে ছায়ার
রঙে রসে"—

যে ভাবের মূর্ত্তি গড়েছে তা মহাকবি কালিদাসের মত অতীতকে বর্ত্তমানে, বর্ত্তমানকে অতীতে আর অতীত-বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতে নিয়ে তাদের সকলকেই এক আনন্দের ঐক্যের মধ্যে রেখে দিয়েছে। এই

দিক দিয়ে যেন বহু শতাব্দীর যবনিকা ভেদ ক'রে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের আত্মীয়রূপে দেখা দিয়েছেন।

কালিদাস প্রকৃতিকে মানুষ থেকে পৃথক ক'রে দেখেন নি; কালিদাসের চোখে প্রকৃতি জড় নয়, সে মানুষের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তার সঙ্গে মানুষের সৌহার্দ্দ্য হয়, হৃদয়ের আদান-প্রদান চলতে পারে। এইখানে কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকটতম আত্মীয়তা। প্রকৃতির সহিত, নিখিল বিশ্বের সহিত আত্মীয়তাবোধ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ও কাব্যের সাধনা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা যায়, একই নটরাজ মানুষের চিত্তের ভাবপ্রবাহিনীর অপরূপ চলচ্ছন্দে ও প্রকৃতির ঋতুরঙ্গের সৌন্দর্য্যলীলার ভিতরে চঞ্চল চরণে নৃত্য করছেন। কবি লিখেছেন—

প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করে। এই তৃণগুল্মলতা, জলধারা, বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্ত্তন, জ্যোতিষ্কদলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্য্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীচলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো, তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়ছে সেখানে ঝঙ্কার উঠছে সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে। জগতের সমস্ত অণুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হ'ত যদি প্রাণে ও আনন্দে অনন্ত দেশকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত তা হ'লে কখনই এই বাহ্যজগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হ'ত না। যাকে আমরা জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিভেদ নেই ব'লেই আমরা উভয়ে এক জগতে স্থান পেয়েছি, নইলে আপনিই দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী হয়ে উঠত।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় যোগের যে রস-মূর্ত্তি রবীন্দ্র-সাহিত্যে ফুটে উঠেছে বিশ্ব-সাহিত্যে তার তুলনা নেই। এ সম্পর্কে ইয়োরোপীয় কবিদের নাম কাব্য-রসিকদের মনে জাগতে পারে। কিন্তু তাঁরা

প্রকৃতিকে দেখেছেন মানুষ থেকে পৃথক ক'রে। কোন কবি (যেমন ওআর্ডসোআর্থ) মানুষকে জগতের অন্তর্গত হিসেবে দেখেছিলেন; তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে যোগ দেখা যায়, তাকে রসের য়োগ বলা যায় না, সেটা প্রধানত তত্ত্বের যোগ। কোন কবির কাছে প্রকৃতি যেন পঞ্চভূতের আদিম ভূতনৃত্য—সেই নৃত্যের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের অসহায়তা ও অকিঞ্চিৎকরতাই ফুটে ওঠে। কেউ বা প্রকৃতির পটভূমিকায় যে বহিঃসত্তা অনুভব করেছেন, নারীর প্রেমের ভিতর দিয়ে সেই সত্তার ব্যাপক রূপ উপলব্ধি করবার চেষ্টায় হতাশ হয়ে তাঁর মুখে কাতরোক্তি ফুটেছে—I pant, I sink, I tremble, I expire! কিন্তু প্রকৃতির প্রতি অতি-নিবিড় প্রেম, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভাবৈকরসত্ব, যাকে রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে বিশ্ববোধ বা সর্ব্বানুভূতি বলেছেন, তার সন্ধান রবীন্দ্র-কাব্যের বাইরে কালিদাসের কাব্যেই পাওয়া যায়। তাই মনে হয়, যেন কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের সগোত্র।

কিন্তু সংস্কৃত কাব্যের সুর, ধ্বনি ও রং রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাওয়া গেলেও, রবীন্দ্র-কাব্যের আস্বাদ সংস্কৃত কাব্যের আস্বাদ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সংস্কৃত কাব্যের প্রভাবকে নিজের কল্পনায় গলিয়ে তা থেকে নব নব রসের সৃষ্টি করেছে। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণ থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কাব্যের উপাদান আহরণ করেছেন; কিন্তু তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা যা সৃষ্টি করেছে, তাকে ঠিক পৌরাণিক বলা যায় না। তিনি ঐ সব পুরাতন চরিত্রের উপর কল্পনার নূতন আলোকপাত ক'রে যেন পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে "চিত্রাঙ্গদা", "বিদায়-অভিশাপ", "গান্ধারীর আবেদন", "কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ" পড়লে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বকীয়ত্ব সহজেই

বোঝা যায়। কবি এইসব চরিত্রকে নূতন ক'রে অনুভব করেছেন, আর পাঠককে নিয়ে গেছেন তাদের অন্তস্তলে। মহাভারতের চরিত্রগুলি নির্লিপ্ত, সুখ-দুঃখ—সকল কর্ম্মের প্রতি তাদের অনাসক্তি। এই অনাসক্তি, এই আত্ম-সম্পূর্ণতা আধুনিক মন কল্পনা করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের হাতে এইসব চরিত্রের আত্ম-সম্পূর্ণতা দূর হয়েছে, তিনি তাদের ওপর মানব-মনের নানা বিচিত্র অনুভূতি আরোপ ক'রে তাদের সুন্দরতর ক'রে তুলেছেন। মহাভারতের কচ নৃত্যগীতে দেবযানীর চিত্ততোষণ করেছিল কেবল নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য; গুরুকন্যা হিসেবে দেবযানী তার পূজনীয়া ব'লেই, সে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ প্রত্যাখ্যান তার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে নি। রবীন্দ্রনাথের কচ দেবযানীকে ভালবাসে; কিন্তু সে কর্ত্তব্যপালনের কাছে নিজের সুখ-দুঃখ বিসর্জ্জন দেয়, শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে সে প্রেয়কেই বরণ ক'রে নেয়।

স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে যদি
ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্ব্বকার্য্য মাঝে—তবু চ'লে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব সবে
এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে; তার পূর্ব্বে নাহি মানি
আপনার সুখ।

মহাভারতের কচ দেবযানীর অভিশাপের উত্তরে প্রতিশাপ দিতে দ্বিধা করে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কচ দেবযানীর কোন অমঙ্গল-কামনা মনেও স্থান দেয় না—

আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে
ভুলে যাবে সর্ব্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা-উপাখ্যান তৃতীয় পাণ্ডবের বহু প্রণয়-কাহিনীর একটি মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেই আখ্যানের সূত্রটুকু ধ'রে কি অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টি করেছে! সে কাব্যে মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার নামটুকুই পাওয়া যায়, তার সুর সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মূল সুর রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি—

সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের মন ভুলিয়েছে তা হ'লে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতীন ব'লে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্রশক্তি থাকে, তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই, এই চরিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুবসম্বল, নির্ম্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের মুখে রবীন্দ্রনাথ যেসব কথা দিয়েছেন, সেসব কথা মহাভারতে নেই; কিন্তু সেগুলি যে মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর মুখের কথা হতে পারে তাতেও সন্দেহ নেই। কর্ণ ও কুন্তীর কথোপ-কথনের যে আভাস মহাভারতকার দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ তার সঙ্গে মিলতে না পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কর্ণ ও কুন্তীকে দিয়ে যে কথা বলিয়েছেন, সেগুলিকেও মহাভারতের কর্ণ-কুন্তীর কথা ব'লে মনে করতে বাধে না। মহাভারতে "চিত্রাঙ্গদা" বা "বিদায়-অভিশাপের" কাহিনীর কাঠামো পাওয়া যায়, কিন্তু রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানটুকুর

সূত্র ধ'রে রবীন্দ্রনাথ যে "পতিতা"র কল্পনা করেছেন, তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব।

আমি শুধু নহি সেবার রমণী
মিটাতে তোমার লালসাক্ষুধা
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা।
দেবতারে মোর কেহ ত চাহে নি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।

এ কল্পনা রামায়ণ-কারের স্বপ্নাতীত।

পুরাণে মহেশ্বরের যে মহীয়সী কল্পনা আছে, তাকে রবীন্দ্রনাথ "মরণ" "পাগল" প্রভৃতি কবিতায় ও গদ্যরচনায় যে ভাবে প্রকাশ করেছেন, তারও তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধৃত ক'রেই আমার কথা প্রমাণ করব—

যবে বিবাহে চলিল বিলোচন
ওগো মরণ হে মোর মরণ
তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন
ছিল কতশত উপকরণ
তাঁর লটপট করে বাঘছাল
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে
তাঁর ববম্ ববম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

এবং—

হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্তআকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণাবেগে আকাশের লক্ষকোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

'ভাষা ও ছন্দ', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব গান', 'কালিদাসের প্রতি' 'সেকাল', 'স্বপ্ন' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতার উপাদান —রামায়ণকার বা কালিদাস, কিন্তু এগুলি তাঁদের কাব্যের প্রতিচ্ছবি নয় বা তাঁদের প্রতি নিছক শ্রদ্ধার অঞ্জলি নয়, এরা কবিচিত্তের মধুময় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের মন ও দৃষ্টি এইসব কবির মন ও দৃষ্টির সীমারেখাকে ছাড়িয়ে তাঁদের কাব্যের পথেই এমন ভাব-লোকে পৌঁছেছে, যেখানে ব'সে তিনি অবলীলাক্রমে মূল উপাদানগুলিকে আপন প্রতিভায় গলিয়ে সম্পূর্ণ নূতন ও অনুপম রসসৃষ্টি করেছেন। যখন পড়ি—

> কহ মোরে বীর্য্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম
> কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম
> ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
> মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,

সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক
কে লয়েছে নিজশিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,
কহ মোরে সর্ব্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।

তখন তাকে রামায়ণের রামচরিত্র ব'লে চিনতে দেরি হয় না, কিন্তু ঠিক আদিকাণ্ডের বাল্মীকি-নারদ-প্রশ্নোত্তর ব'লেও মনে হয় না। আবার যখন পাই—

কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি; বেত্রবতীকূলে
পরিণত-ফল-শ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা;
পথতরুশাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে
বনস্পতি; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি হতেছে বিকল।

তখন তাকে সহজেই 'মেঘদূত' ব'লে মনে করতে পারি; কিন্তু তবু এর স্বাদ আর কালিদাসের মেঘদূতের আস্বাদ এক নয়। অলকাপুরীর পথ বর্ণনা করতে গিয়ে কালিদাস যে দিকটির নির্দ্দেশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেদিকেই গেছে বটে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির পিছনে রয়েছে তাঁর মনের অনুভূতি।

এক সময়ে বাঙালী সংস্কৃত-সাহিত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ কালিদাস-বাণভট্টের কাব্য-সাহিত্যের রস-বিশ্লেষণ ক'রে শিক্ষিত বাঙালীকে আবার তার প্রাচীন উত্তরাধিকারে ফিরিয়ে

আনলেন। যে সময়ে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র লোকে একপ্রকার ভুলেই ছিল, আবার ইয়োরোপীয় সমালোচনা-রীতিও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তখন আধুনিক দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতের কবিদের কাব্য-সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি আমাদের উৎসাহ ফিরিয়ে আনলেন তাই নয়, তিনি সাহিত্য-সমালোচনার নূতন একটা আদর্শও স্থাপন করলেন। শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কাদম্বরীর ওপরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিগন্ত-উদ্ভাসী কল্পনার আলোকপাত ক'রে তাদের নূতন সৌন্দর্য্যের বিকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে না দিলে, আমরা হয়তো জানতামই না যে, দুর্ব্বাসার অভিশাপ কবির রূপক মাত্র—"বন্ধনহীন গোপন মিলন চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত। উন্মত্ততার উজ্জ্বল উন্মেষ ক্ষণকালের জন্যই হয়—তাহার পর অবসাদের, অপমানের বিস্মৃতির অন্ধকার আসিয়া আক্রমণ করে। ইহাই চির-কালের বিধান।" রূপজ মোহে ও দৈহিক লালসার আরম্ভে প্রেমের যে কামমূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা দুর্ব্বার ও নিরঙ্কুশ ব'লেই দুর্ব্বাসার শাপে অথবা হরের কোপানলে ভস্মীভূত হয়; কিন্তু তপস্যার আগুনে কিংবা বিরহের তাপে বিশুদ্ধ হয়ে প্রেমের যে মূর্ত্তি প্রকাশ পায়, তার সৌম্য সুন্দর শান্ত জ্যোতিতে সংসার মধুময় কল্যাণময় হয়ে ওঠে। এক স্বল্পপরিসর সমালোচনার মধ্যে পুরাতন কাহিনীতে এমন নূতন ব্যঞ্জনা সংযোগ করা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। কালিদাস হয়তো দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন-সাধনের জন্য অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে সৃষ্টি করে-ছিলেন, তাই শকুন্তলাকে স্বামী-গৃহে বিদায় দেবার পর এই দুটি সখীকে তিনি নাটকের নেপথ্যেই নিয়ে গেছেন। কিন্তু কালিদাসের চোখে যারা অনাবশ্যক, রবীন্দ্রনাথ তাদের তেমনই ক'রে উপেক্ষা করতে পারেন না। তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি দেখলেন, "তাহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল

খাইয়াছে, যাহা জানিত না, তাহা জানিয়াছে। কাব্যের কাল্পনিক নায়িকার বিবরণ পড়িয়া নহে, তাহাদের প্রিয়তমা সখীর বিদীর্ণ হৃদয়ের মধ্যে অবতরণ করিয়া।" আমাদেরও মনে প্রশ্ন উঠল—

এখন হইতে অপরাহ্ণে আলবালে জলসেচন করিতে কি তাহারা মাঝে মাঝে বিস্মৃত হইবে না? এখন কি তাহারা মাঝে মাঝে পত্রমর্মরে সচকিত হইয়া অশোকতরুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কোনো আগন্তুকের আশঙ্কা করিবে না? মৃগশিশু আর কি তাহাদের পরিপূর্ণ আদর পাইবে?

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখিয়ে দিলেন—

শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এক দিগন্ত হইতে অন্য দিগন্তে অস্ত যায় নাই তো। তাহারা জীবন্ত, মূর্ত্তিমতী। রচিত কাব্যের বহির্দেশে, অনভিনীত নাট্যের নেপথ্যে এখন তাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে—অতিপিনদ্ধ বল্কলে এখন তাহাদের যৌবনকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না—এখন তাহাদের কলহাস্যের উপর অন্তর্ঘন ভাবের আবেগ নববর্ষার প্রথম মেঘমালার মতো অশ্রুগম্ভীর ছায়া ফেলিয়াছে। এখন এক একদিন সেই অন্যমনস্কাদের উটজপ্রাঙ্গণ হইতে অতিথি আসিয়া ফিরিয়া যায়।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে তপোবনও যে একটি নাটকীয় ব্যক্তি—এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের আগে বোধ হয় কেউই উপলব্ধি করেন নি। কালিদাসের নাটকে—"অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবন-প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র"…"প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা এত কার্য্য সাধন করাইয়া লওয়া—এ তো অন্যত্র দেখি নাই"—এই গভীর সত্য দরদী কবির রসে অপূর্ব্ব-মধুর হয়ে ফুটে উঠেছে।

'কুমারসম্ভবে'র আলোচনাতেও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, "ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।" উদ্ভিন্ন-যৌবনা পার্ব্বতী যখন নিজের বিশ্ববিজয়ী রূপ নিয়ে মহাদেবের যোগাশ্রমে বিচরণ করতেন, তখন বিশ্ব-প্রকৃতিও অকাল-বসন্তের বোধন

ক'রে পার্ব্বতীর রূপ-সাধনায় সাহায্য করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। "কিন্তু অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে অকস্মাৎ উদ্‌ভাসমান এই যে হর্ষ, দেবতা ইহাকে বিশ্বাস করিলেন না,—সরোষে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। নিজের ললিত যৌবনের সৌন্দর্য্য অপমানিত হইল জানিয়া লজ্জাকুণ্ঠিতা রমণী কোনোমতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।" তারপর "ধর্ম্ম যখন তাপস-তপস্বিনীর মিলন সাধন করিল, তখন স্বর্গমর্ত্ত্য এই প্রেমের সাক্ষী ও সহায়রূপে অবতীর্ণ হইল; এই প্রেমের আহ্বান সপ্তর্ষিবৃন্দকে স্পর্শ করিল; এই প্রেমের উৎসব লোকলোকান্তরে ব্যাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে কোনো গূঢ় চক্রান্ত, অকালে বসন্তের আবির্ভাব ও গোপনে মদনের শরপাতন রহিল না।"

'মেঘদূতে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক গভীর বিরহের আর্ত্তি দেখেছেন; যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার বিরহকে তিনি সর্ব্বমানবের অন্তরের বিরহরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। "কেবল অতীত বর্ত্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে! অনন্তের কেন্দ্রবর্ত্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে! আজ কেবল ভাষায় ভাবে আভাসে ইঙ্গিতে ভুল ভ্রান্তিতে আলো-আঁধারে দেহে মনে জন্ম মৃত্যুর দ্রুততর স্রোতোবেগের মধ্যে তাহার একটুখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র। যদি তোমার কাছ হইতে একটা দক্ষিণের হাওয়া আমার কাছে আসিয়া পৌঁছে, তবে সেই আমার বহু ভাগ্য, তাহার অধিক এই বিরহলোকে কেহই আশা করিতে পারে না।

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্ব্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।"

পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথেরই আর একটি কবিতা মনে পড়ে—

ওই দেহপানে চেয়ে, পড়ে মোর মনে
যেন কতশত পূর্ব্বজনমের স্মৃতি!
সহস্র হারানো' সুখ আছে ও নয়নে
জন্ম-জন্মান্তরে যেন বসন্তের গীতি।

এমনই ক'রে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের রসধারার দিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃত সমালোচনা শ্রদ্ধা ও আনন্দের উৎস-পথেই উৎসারিত হয়; আর দেখিয়েছেন, কবির প্রতি ভালবাসা অন্যের মনে সঞ্চারিত করাই সমালোচনার সার্থকতা। সারা জীবন তিনি অফুরন্ত রূপ-সৃজন করেছেন। সে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য উপভোগ করার জন্য কবির ভাষাতেই সকলকে আহ্বান করি—

উদয়-রবি যে রাঙা রঙ রাঙায়ে
পূর্ব্বাচলে দিয়েছে ঘুম ভাঙায়ে—
অস্তরবি সে রাঙা রসে রসিল
চির-প্রাণের বিজয়-বাণী ঘোষিল,
অরুণ-বীণা যে সুর দিল রণিয়া
সন্ধ্যাকালে সে সুর উঠে ঘনিয়া,
নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া।
আয় রে তোরা আয় রে তোরা আয় রে
বাঁধন-হারা রঙের ধারা ঐ-যে ব'হে যায় রে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সোম

পাথরের বাসন

এদিকে হাতে তৈরি এবড়ো-খেবড়ো মেটে পাথরের বাসন যথেষ্ট। দেশীয় লোকেরা অজস্র তৈরি ক'রে ক'রে বিদেশী যারা এসেছে, তাদের বাসা-বাড়িতে ফেরি করে, এদেশের দু-আনার বস্তুটা আট আনায় বিক্রি করে। উভয় পক্ষ ভাবে, বেশ জিতলাম।

কাকীমার বাসনের বাতিক। ঘাটশিলা ছাড়বার দিনও এগিয়ে এল। প্রায়ই দেখি, দরজার সামনে ঝাঁকাতে কালো পাথরের থালা-বাটি নিয়ে পসারীর মেলা, দরদস্তুর চলছে উচ্চকণ্ঠে। তার পরেই বিজয়গর্ব্বে হাসতে হাসতে কাকীমা আসতেন আমার ঘরে। সেখানে ছোট ছোট ছাপার অক্ষরের ওপর ঝুঁকে আমি ল্যাটিন সাহিত্যের রসাস্বাদ করি। অঞ্চলতলে পাথর মুছে কাকীমা সোল্লাসে বলতেন, দেখ খোকা, এক জোড়া কিনলাম—মাত্র দেড় টাকায়। কালীঘাটে এর দাম কত জানিস? তিন টাকার এক পয়সা কম নয়।

কাকা বিরক্ত হতেন; বলতেন, দুদিন ধ'রে ক্রমাগত বিশ্রী বাসনগুলো কিনে যাচ্ছ; একখানা মালগাড়ি ভাড়া নিয়ে কুলোতে পারলে হয়।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরেছি সুবর্ণরেখার তীরে বেড়িয়ে। পেট্রোম্যাক্স বাতিটা আনবার জন্যে কাকার শোবার ঘরে ঢুকতে হ'ল। চৌকিতে পাতা বিছানার ওপরে কাকীমা একা ব'সে ছিলেন, সামনে তাঁর এতদিনের ক্রীত সমস্ত পাথরের বাসন। উন্মনাভাবে বাইরের দেবদারু-গাছটার দিকে চেয়ে আছেন, চোখের নীচে জলের ধারা।

কাকীমার অনর্গল হাসি ও স্ফূর্ত্তির মধ্যেও অশ্রু-নির্ঝর আছে? ডাকলাম, কাকীমা!

চোখ সজোরে মার্জ্জনা ক'রে কাকীমা আমার দিকে তাকালেন, বললেন, ভাবছি, এত বাসন কিনলাম—সব নিজের জন্যে! দেবার লোক আমার নেই আর। মা বিধবা হবার পর পাথর ছাড়া অন্য কিছু ছুঁতেন না। তাঁকে দিলে কত কাজে লাগত। বড়দি বড় বাসনপত্র ভালবাসত, তাকে হাতে ক'রে দুখানা দিলে সে কত খুশী হ'ত। ননদটা পুজো-আচ্চা ব'লে পাগল হ'ত, সেও আর নেই। আমার দেওয়ার সুখ গেছে। তাই ভাবছি, এত বাসন নিয়ে কি করব?

* * *

পেট্রোম্যাক্সে পাম্প করতে করতে আমিও ভাবছিলাম। সহসা লঘু পদে ঘরে ঢুকলেন কাকীমা, চোখে মুখে তাঁর উৎসাহ-চাঞ্চল্য। বললেন, খোকা, কাল হাটে একবার আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। পাশের বাড়ির চাকর আমাদের বঙ্কু চাকরটার কাছে বলছিল, হাটে নাকি আরও ভাল ভাল সব বাসন আসে, আরও সস্তায়। একটা কালো পাথরের ঘটি আমার চাই। কাল দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে উঠেই তুই আর আমি রওনা হয়ে যাব, কেমন? তোর কাকার কানে তুলে কাজ নেই, সব-কিছুতেই ওঁর টিকটিক।

শুনেছিলাম, পাথরেই শুধু দাগ পড়ে না।

শ্রীবাণী রায়

কালীপূজা

ওদের উপরে পড়েছে এবার
বারুদ-বাজি ও বাতির ভার,
মোদের এখানে হবে পাঁঠাবলি,
সার্থক পূজা হইবে মা'র।

রবীন্দ্র-আরতি

লহ অর্ঘ্য গুরুদেব

আজ থেমে গেছে গান, পূর্ব্বাচলে মৌন দিগন্তর ;
কাঁদে পৃথ্বী মৃত্যুক্লিন্না, অশ্রুসিক্ত হিমাদ্রি মর্ম্মর।
ভারতের তপোবনে গুমরিছে অশান্ত ক্রন্দন,
কাঁদিতেছে ভারতীর ছিন্ন বীণা ; নিথর স্পন্দন।
ভাষার অতীত তীরে লুকায়েছে মানবের কবি,
অন্তরের ভাষা তাই মূক আজি ; অস্তমিত রবি
সীমাহীন আঁধারের প্রেক্ষাহীন কোন মর্ম্মতলে !
নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে শুধু চেয়ে আছি সিক্ত অশ্রুজলে।

তুমি এসেছিলে কবি, লোকাতীত কোন্ লোক হ'তে,
বিশ্বের মানসলোকে প্রতিভার দীপ্ত স্বর্ণরথে—
আলোর ইশারা বহি অবলুপ্ত চেতনার দ্বারে,
জাগায়ে উদাত্ত গানে ম্রিয়মাণ নিঃস্ব দেবতারে।
সাথে ক'রে এনেছিলে অমৃতের উৎস নির্ঝরিণী,
মরণের বক্ষে তাই, হে অমর, বাজালে কিঙ্কিণী :
মৃত্যুহীন শাশ্বতের সামমন্ত্রে তুলিয়া ঝঙ্কার !
লহ অর্ঘ্য গুরুদেব ! হে আদিত্য, লহ নমস্কার।

মুক্তির বারতা ল'য়ে এসেছিলে লাঞ্ছিতের মাঝে,
তব মন্ত্র আজি তাই শঙ্কাহীন লক্ষ কণ্ঠে বাজে।
মুষ্টিভিক্ষা সম তুমি ফিরায়েছ রাজার সম্মান,
মানুষের দেবতারে প্রাণধর্ম্মে করিয়া মহান্
দিকে দিকে শুনায়েছ ঋত্বিকের মহামুক্তি-বাণী,
মানস-কুসুমগুচ্ছে মুছায়েছ রিক্ততার গ্লানি—
পরাধীন ভারতের অন্তহীন তপ্ত অশ্রুজল।
'কালের কপোলতলে' তাই তুমি 'শুভ্র সমুজ্জ্বল' !

মরিতে চাহ নি কবি, অনুপম সুন্দর ভুবনে,
তাই আপনার হাতে রচিয়াছ সবাকার মনে
অপরূপ স্মৃতিসৌধ স্বপ্নময় এ তাজমহল !
অন্তর-সৌরভে পূর্ণ কল্পান্তের স্নিগ্ধ হোমানল
জ্বালায়েছ পুণ্যতীর্থ ভারতের প্রাণবেদীমূলে ;
আরতির ঘৃতদীপ অনির্ব্বাণ জ্ঞানের দেউলে।
নয়ন সম্মুখ হ'তে চ'লে গেছ আজ বহু দূরে,
তবু তুমি চিরন্তন নয়নের চির-অন্তঃপুরে।

অন্নক্লিষ্ট শুষ্ক মুখে তুমি কবি, দিয়েছিলে ভাষা,
আনন্দ-উজ্জ্বল আয়ু, বহ্নিদীপ্ত নব নব আশা।
ভাঙিয়া স্বপন-কারা নির্ঝরের চঞ্চল উচ্ছ্বাসে,
জীবনের জয়গান গেয়েছিলে বিপুল উল্লাসে ;
সবার অন্তরে তাই অন্তরঙ্গ তুমি মহাকবি !
মরণের বক্ষপটে এঁকে গেলে জ্যোতিষ্মান ছবি—
স্পর্শে তারি ম্লান হ'ল মৃত্যুর অসহ অহঙ্কার।
লহ অর্ঘ্য গুরুদেব ! হে আদিত্য, লহ নমস্কার।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু

পৃথিবীর দুই সীমা উত্তর দক্ষিণ—
উত্তরে প্রশান্ত-নীল মানস-সাগর,
দক্ষিণে ধূসর-স্রোতা বহে স্রোতস্বতী।
যোগ নাই কিছু।
উত্তরে উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গে চূড়ায় চূড়ায়
বরফের শ্বেতদীপ্তি ঝলকায় রৌদ্র-আভা লেগে ;
তপ্ত রৌদ্ররেণু সেও হিম হয়ে আসে
তুহিনের হিমেল পরশে।

কূলে কূলে প্রসারিত নিস্তরঙ্গ জলে
আকাশের শ্বাস যেন ধুঁকিছে ধোঁয়ায়—
জরাহীন মৃত্যুহীন স্পন্দহীন জীবন সেথায়—
জীবন তবু সে নহে জীবনের মত—
বেগহীন নিঃসাড় শীতল।
সৃষ্টি সুপ্তিলীন।

দক্ষিণের স্রোতস্বিনী তরঙ্গ-চঞ্চল—
একূল ওকূল ভাঙি করে টলমল,
চূর্ণ হয়ে ফেনারাশি আকাশে ছড়ায়
ঘূর্ণির দুরন্ত বেগে।
উৎপাটিত তরুমূল গৃহশিশু পোষ্য খাদ্যভার
ভেসে যায় বন্যার প্রবাহে।
তরঙ্গে জড়ায় এসে দূষিত জঞ্জাল,
মন্দীভূত স্রোতোজলে দুর্ব্বার আবেগ
ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে আসে দিনে দিনে,
বহে স্রোত মৃতপ্রাণ।
সেথায় চাঞ্চল্য আছে ক্ষীণ জীবনের—
জীবন তবু সে নহে জীবনের মত—
হৃতবেগ বিষাক্ত প্রবাহ।
সৃষ্টি ছিন্ন-মূল।

মানস-সাগর—
কূলে কূলে প্রসারিত স্থির স্বচ্ছ জল,
চঞ্চলতা জাগে কি সেথায়?
পবনে তরঙ্গ জাগে অতিসূক্ষ্ম সুরের আঘাতে,
আকাশে ধ্বনিত হয় সুর-শিহরণ—
হিম-পাণ্ডু সূর্য্যালোক চমকিয়া ওঠে,
স্পর্শ পায় নব-জীবনের।
জমাট বরফ-রাশি গুঁড়া গুঁড়া হয়ে
গ'লে যায় সুরের পরশে।

মানস-বিহারী হংস—
প্রসারিত হেমবর্ণ পক্ষ দুটি তার,
নীল জলে সলীল-বিহার,
স্ফুটচঞ্চুপুটে জাগে অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা
অপরূপ সঙ্গীতের।
সুরে সুরে ফুটে ওঠে সোনার কমল
মানসের নীল বুকে।
কোথা হতে আসে ভৃঙ্গদল—
শুরু হয় মধু-লোভে ঘন-গুঞ্জরণ।
সে সুরের শিহরণ
পৌঁছায় আকাশে যেন তারায় তারায়,
হিম-গলা উৎস-জলে জাগে জীবনের
নবতর চঞ্চল স্পন্দন।
মূর্ত্ত হয় অমূর্ত্ত বিলাস।
নেমে আসে স্রোতোধারা পৃথিবীর উষর প্রান্তরে—
রুদ্ধ-উৎস-মূল মুক্ত হয়।

নেমে আসে রাজহংস মানস-বিলাসী—
ধূসর জলের স্রোত মৃতের মতন
যেখানে পড়িয়া আছে।
সুরে সুরে জাগে উন্মাদনা,
আলোক খসিয়া পড়ে তরঙ্গ-চূড়ায়
অপূর্ব্ব-হিল্লোল-ভরে।
যাহা কিছু হীন জড় জীবন-বিহীন
অগ্নির স্পর্শনে যেন হয় ভস্মশেষ—
সে অগ্নি সুরের জানি।
গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুল জাগে দুই তীরে—
পৃথিবীর পরিতুষ্ট প্রসন্নতা যেন।
প্রান্তরে সোনার বর্ণ ধানের সম্ভার
ধরণীর সাফল্য-সম্পদ।

—যোগ হয় উত্তর দক্ষিণে।
উন্মুক্ত উৎসের মুল—বহে স্রোতোধারা।

তারপরে একদিন—
বৃষ্টিশেষে নীলাকাশ রৌদ্র-ঝলমল,
সদ্যঃস্নাত খণ্ডমেঘ ভেসে ভেসে যায়
নিকট দক্ষিণ হতে সুদূর উত্তরে—
হংস-মন বিবাগী চঞ্চল।
দক্ষিণের মধুময় প্রণয়-বন্ধন
মর্ম্মস্থলে জাগায় বেদনা,
তবু উত্তরের প্রীতি করে উচাটন—
উত্তরের অপূর্ব্ব চেতনা।
প্রসারিত-হেমপক্ষ নীলকান্তি আকাশের বুকে
রাজহংস দিল পাড়ি।
সুরের মৃণালখণ্ড ভেঙে ভেঙে পড়ে,
চরাচর মৌন ম্লান আনন্দে বিরহে।
অবসন্ন দিগন্তের পাণ্ডুর আলোয়
কোথা হতে নামে ছায়া—
আকাশের মর্ম্মস্থল করে নিপীড়ন,
রক্তবর্ণ সূর্য্য ভয়ে কালো হয়ে আসে,
বাতাসের উন্মত্ত নর্ত্তন।—
চোখে মুখে লাগে ঝড়।
পাখার পালক—
ছিঁড়ে খ'সে ভেসে যায় বায়ুর প্রবাহে,
হেমবর্ণ পক্ষপ্রভা অন্ধ অন্ধকারে
গহন মরণ লভে।
স্ফুটচঞ্চুপুটে তবু সুর-মূর্চ্ছনায়
ম্রিয়মাণ আলোকের জাগে সম্ভাবনা—
সুর যায় সুদূর উত্তরে,
দেহস্পর্শ পায় শুধু দরদী দক্ষিণ।

দক্ষিণ উত্তর—
পৃথিবীর দুই সীমা দূর বহুদূর,
বহুদূর তবু জানি নাই বিচ্ছিন্নতা—
স্রষ্টা ও সৃজন একাকার।

শ্রীউমা দেবী

মৃত্যুপথিক রবীন্দ্রনাথের শ্রীচরণে

হ'ল মরণের তপ সমাপন !
মর- ধরণীর আঁখি বরষায় ;
চল জীবনের খেলা সারা কোন্
চির- প্রণয়ীর প্রেম-ভরসায় !
ওগো জীবন-গোকুলে কুলবাধা ছিল হ'ত না তো ভাল পরিচয়,
বুঝি তাই তব হ'ল মরণের কালো যমুনার কূলে পরিণয় !
শ্যাম তমালের ডালে বাঁধি ডোর
ছিল ঝুলনের আশে মনচোর,
তব অভিসার চির-আশা তার আজি মিটাবার ত্বরা নাহি সয়।

রাঙা জীবনের রঙমশালের
আলো ঘিরেছিল লাখো শিখাতে,
তাই পার নাই সেই বিশালের
কালো মরমের প্রেমে বিকাতে ?
তুমি চুপি চুপি কত মরণের সাথে কহিয়াছ কথা চিরকাল,
শ্যাম বঁধুয়ার দূতে বাঁধিয়া রাখিতে পেতেছিলে পথে প্রেমজাল ;
সারা হ'ল জীবনের গৃহকাজ ?
পেলে তুমি তো তোমার বঁধু আজ,—
হেথা হতাশার শুধু ব্যাথা সার ! ছুটে হাহাকার, করি আঁখি লাল।

সারা ধরণীর আঁখি ঝরণের
ধারে যাত্রার করি শুচিস্নান,
কর তুমি তো সে কালোবরণের
দেশে মরণের রথে অভিযান
হেথা পারে নি করিতে ভিড় ঠেলে যারা সাক্ষাৎ নতি নিবেদন
ওগো পরপার হতে বিদেহ দরদী, বুঝিবে তাদের কি বেদন!
আর মরণের পারে বাধা নাই,
পদে নির্ব্বাধে নতি করি তাই!
শত বেদনায় ঢাকে চেতনায়, শুধু, 'সে তো নাই' রবে কাঁদে মন।

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ

প্রতিভার যুগ-সূর্য্য অস্ত গেল

প্রতিভার যুগ-সূর্য্য অস্ত গেল প্রোজ্জ্বল ছটায়
দিনান্তের দীপ্ত রাগ 'পরে ধীরে টানি দিয়া হায়
যুগান্তের শেষ যবনিকা; বিশ্ব-ঘেরা এই শ্মশানের
স্তিমিত-নয়ন স্তব্ধ ঘন অন্ধকারে ও-পারের
প্রলম্বিত ছায়া আসি পড়ে; তারি অন্তরালে বসি
বিগত-প্রথম-শোক ভাবি দূর অন্তরেতে পশি
তোমার অনন্ত রূপ, কত দিকে দিকে গেলে ছুঁয়ে
চিত্তে মানবের, এই অবনীর গ্লানি গেলে ধুয়ে
হিয়ার লাবণী দিয়া, ধন্য ওহে করিলে ধূলিরে;
তোমার নয়ন-আলো দিলে ঝলসিত নদীনীরে,
নূপুর-নিক্কণা যত ঝরনার ঝলকে ঝলকে,
সুচিক্কণ তৃণে তৃণে পল্লবের পলকে পলকে
শ্যামল হিল্লোল-গলা, বিথারিলে মনের হরষ
তরঙ্গিত ধান্যশীর্ষে, রেখে গেলে হিয়ার পরশ
হাওয়া-উতরোল তালবনে, মালতীর মর্ম্মমূলে,
আম্রমঞ্জরীর যত গুঞ্জিত বাসরে; আজ তুলে

মৃত্যুহীন আনন্দ তোমার ধরণীর কোণে কোণে,
ধূলি-কণিকায় খোলা সুন্দরের নন্দনে নন্দনে
তীর্থে তীর্থে বন্দন-মুখর ; হে সাধক সুন্দরের,
ধরণীর সীমায় সীমায় এঁকে গেলে সুদূরের
সুষমা-সিঁদুর, লোকে লোকে এ কি রূপ অলকার !
নরনারী মর্ম্মে মর্ম্মে আপন মনের মমতার
অপরূপ মাধুরী মাখালে, মুখে তার দিলে ভাষা
বহুবর্ণ ভঙ্গিতে রুচির, মানবের মূক আশা
বহুছন্দ-লীলায়িত পেল আনন্দ-মুখর বাণী
তোমা হতে, বহু-ব্যবহারে জীর্ণ শব্দে দিলে আনি
নব নব অর্থের ইঙ্গিত অঙ্গুলি-পরশে তব,
জাগাইলে মৃত শব্দে নৃত্যের হিল্লোলে নব নব,
ভাষা ও ছন্দের হে ঐন্দ্রজালিক ; সৌন্দর্য্যের কোন
গুপ্ত উৎসে আকণ্ঠ পুরিলে তব দেহ প্রাণ মন,
অকুণ্ঠ ঐশ্বর্য্যে তারে উৎসারিলে কথায় সঙ্গীতে
নৃত্যে অভিনয়ে চিত্রে নিত্য নব ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে,
অপরূপ শিল্পলীলা দেখাইলে জীবনে তোমার ;
সেই কল্প শেষ আজি, শিল্পীগুরু ! অতীত চিন্তার
সব ধারা তোমাতে হইল যুক্ত একি অভিনব
মনন-রীতিতে, হে মহামনীষী ; পশ্চিম পূরব
নব গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে মিলি ভারত-অঙ্গনে
প্রতিভার প্রয়াস রচিল, মানবে মানবে মনে মনে
প্রাচীর উড়ায়ে দিলে, লোকে লোকে দেয়াল ভেদের ;
বীভৎস কুৎসিত কালো পঙ্কলীলা কূপমণ্ডুকের
ছদ্মবেশী বর্ব্বরের বিবরে বিবরে উঠে কাঁপি
বজ্রকণ্ঠ বাণীতে তোমার, ওহে বজ্রপাণি ; ব্যাপি
ভূমণ্ডল তোমার অমোঘ দণ্ড উদ্যত রাখিলে,
হে পিনাকী, অন্যায়ের 'পরে ; তীক্ষ্ণ বহ্নিরে হানিলে
হীনতার মর্ম্মে মর্ম্মে নিষ্পলক তৃতীয় নেত্রের ।
সংহারি সংহার-রূপ আজন্ম যোদ্ধার, মিলনের
আহ্বান শুনালে এই নব-বৃন্দাবনে সুরে সুরে

মুরলীর, অপরূপ রাসানন্দে দূর পুরে পুরে
নরনারী-গোপীহিয়া উঠিল রসিয়া চুপি চুপি ;
নব বিশ্বরূপ জীবনে দেখালে, ওহে বহুরূপী,
হে প্রেমিক, ওহে কবি, মহাকর্ম্মী, মন্ত্রদষ্টা ঋষি
যুগলীলা অবসান আজি। যুগ-ধারা সব মিশি
গড়েছিল যার জীবনের যুক্তধারা, অতীতের
তিল তিল মিলি মিলি তিলোত্তমা যাহার চিত্তের,
আকর্ষিল যারে বিশ্ব-আকাঙ্ক্ষার মূক আরাধনা,
ধরিল আরাধ্য মূর্ত্তি যাতে বিশ্ব-মর্ম্মের কামনা,
যুগ-যুগ-সঞ্চিত শস্যের ঘনায়িত শেষ ছটা—
ঘনফল সেই—সংহরিল তার লীলায়িত ঘটা ;
সর্ব্ব-বিশ্ব-সারস্বত সূচনার সমাপ্তি সুন্দর—
প্রতিষ্ঠা শাশ্বতী—আজি শেষ তার যা ছিল নশ্বর।
প্রতিভার যুগ-সূর্য্য অস্ত গেল প্রদীপ্ত ছটায়
স্থলে জলে যুগান্তের যবনিকা টানি দিয়া হায় !

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

ডুবিল অরুণ রবি

কালসমুদ্র-তরঙ্গের মাঝে ডুবিল অরুণ রবি,
বিদায়ের শেষ আভায় আকাশ রক্তের মত রাঙা,
কঠোর কর্ম্ম সমাপন করি ডুবিল শ্রান্ত রবি ;
আকাশ পৃথিবী ঘিরিয়া ঘিরিয়া নামিল অন্ধকার।

যাত্রী আমরা, আমাদের পথে নামিল অন্ধকার,
সহসা মোদের ভাগ্য বিমুখ ধুধু প্রান্তর মাঝে ;
দাঁড়ায়ে আমরা বিমূঢ় চিত্তে স্তম্ভিত নির্ব্বাক,
শতেক যোজন ধরিয়া চক্ষে পড়ে না আলোর রেখা।

আমরা যাত্রী ; চলেছি আবার গভীর অন্ধকারে ;
দিশাহারা হয়ে পথে ও বিপথে অন্ধের মত চলি,
আমাদের মনে নামিছে গভীর শ্রান্তি ও অবসাদ,
তন্দ্রালু চোখে অরুণ রবির সোনালী স্বপন দেখি।

শ্রীপুষ্পরঞ্জন মজুমদার

শিলাইদহের রবীন্দ্রনাথ

শিলেদা'র নীচে পদ্মার চরে হাজার বছর ধরি
চখা নিশিদিন হয়রান হ'ল ডেকে ডেকে সহচরী।
তুমি কবি, সেই বিরহবার্ত্তা জানালে জগৎজনে
চির অম্লান পদ্মার ছবি আঁকিলে মোদের মনে।
গোরাই নদীর ক্ষুরধার স্রোতে ভাসিয়ে পান্‌সিখানি
দু পারের পাকা আউশের ক্ষেত লয়েছ পরানে টানি।
সারি সারি লোকে আটি আটি ধান ল'য়ে চলে গ্রামপথে
গন্ধে মাতানো ধানকাটা ক্ষেতে গরু চরে শতে শতে।
হৃদয়ের রঙে রাঙাইলে তুমি মাঠের সোনালী ধানে
ভাষার সোনার তরী ভরি দিলে শাশ্বত তব দানে।
পদ্মার চরে বনঝাউতলে কাছিমের ডিমগুলি—
তাদেরও গাত্রে বুলালে হর্ষে তোমার প্রেমের তুলি।
শিলাইদহের রথের মেলায় তালের পাতার বাঁশি
তুমি যে দেখেছ কেমনে ফুটায় গরিব ছেলের হাসি।
রাখাল ছেলেরা গোচারণে যেত চরে দূর কাশবনে,
মেঘঘন সাঁঝে তাদের ভাবনা জাগিত তোমার মনে।
কালোয়ার মাঠে ইক্ষুক্ষেত্রে চৈত্র-বৃষ্টি-দিনে
নব-অঙ্কুর-শোভা হেরিবারে যেতে আলপথ চিনে।
কুঠিবাড়ি-পাশে বিস্তৃত মাঠে সবুজ ধান্যচারা
নবীন আষাঢ়ে বাদলের দিনে দুলে দুলে হ'ত সারা।
তুমি লভিয়াছ সিক্ত মাঠের আনমনা-করা ঘ্রাণ
বাদলের সাথে ভাবের বন্যা ভরেছে তোমার প্রাণ।

ফাল্গুন মাসে জোছনা-নিশীথে বসি কুঠিবাড়ি-ছাদে
মধুর কণ্ঠে যত গান তুমি গেয়েছ মনের সাধে ;
তোমার সে গান হারায় নি কিছু—প্রতি কথা প্রতি সুর
জলকল্লোলে বনমর্ম্মরে বাজে চির-সুমধুর।
প্রেমিকপ্রবর, তোমারে পদ্মা সঁপেছিল তার হিয়া
গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে সে তুষিত নিতি নবরূপ নিয়া—
তোমার বিয়োগে পাগলিনী আজ কূলে মাথা লুটে মরে,
কাঁদে দিবারাতি কভু বা গুমরি কখনো উচ্চস্বরে।

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

মৃত্যুহীন রবীন্দ্রনাথ

হে বিশ্ব-বিমোহী কবি, ভারতের গৌরব-ভাস্কর !
কে বলে মরেছ তুমি ? মৃত্যুহীন প্রাণ যে তোমার ;—
কালের বিজয়-ভেরী স্তব্ধ করি হে চির-ভাস্বর,
বীণার ঝঙ্কার তব যুগে যুগে নন্দিবে সংসার !

শাশ্বতী বাণীর রূপে মূর্ত্ত তুমি স্বদেশে-বিদেশে ;
বিশ্ব-ভারতীর কণ্ঠে সমুজ্জ্বল তুমি রত্নহার,
উদিয়া প্রাচ্যের ভালে ঘোর অমা-রজনীর শেষে—
হে রবি, রবির সম ছড়াইলে কিরণ-সম্ভার !

সুদূর পশ্চিমে করি সুরঞ্জিত প্রতিভা-আলোকে
বঙ্গ-ভাষা-জননীরে বসাইলে জগৎ-সভায় ;—
দ্যুলোকের বাণী আনি সঞ্জীবিত করিলে ভূলোকে :
হে নবজীবনদাতা, লুটে মৃত্যু তোমারি যে পায় !

যে অনন্ত অমরত্ব লভিয়াছ সাধনার বলে,—
মৃত্যুও তাহার স্পর্শে মৃত্যুহীন হয়েছে ভূতলে।

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

বিয়োগ-ব্যথা

আপনারে বারে বারে শুধু
বিশ্ব সাথে যে দেছে মিলায়ে,
শাশ্বত জীবন-বার্ত্তা বহি
মুক্ত কণ্ঠে যে গেছে বিলায়ে ;
সুখে দুঃখে, মিলনে বিচ্ছেদে,
ধরণীর সহস্র বন্ধনে,
আলো-ছায়ে, দিন-রাত্রি-পথে,
ষড়ঋতু-নিত্য-আবর্ত্তনে,
তটিনীর চল-নৃত্য-বেগে,
বিহঙ্গের পক্ষধ্বনি মাঝে,
গৃহ, পথ, বন, তৃণ, বীজে,
মেঘ-নীলে, বর্ষাঘন সাঁঝে
লীলায়িত ছন্দরেখা টানি
আনিল যে অমৃতের বাণী—
মৃত্যু তার নাহি কভু নাহি,
বিশ্বকবি, জানি তাহা জানি।
তবু সে আশ্বাস-মন্ত্রে আজি
অন্ধ মন কিছুতে না বাঁধে,
হারানোর ব্যর্থ অভিমানে
মূক ব্যথা ডুকরিয়া কাঁদে।
অনন্ত কালের পথ বাহি
হে বাউল! তুমি চলেছিলে,
ভারতের শ্যাম তরুচ্ছায়ে
ক্ষণিক বিশ্রাম লভি নিলে।
মরমের একতন্ত্রী হতে
রাখি গেলে যে সুর-কণিকা,
ভাগ্যহত জাতির ললাটে
পরাল সে দীপ্ত জয়টীকা।

নবজন্মে মুক্তিলাভ করি
মাতৃভাষা, সাহিত্য, সমাজ
নির্য্যাতিত জীবনের মাঝে
আপনারে চিনিয়াছে আজ।

প্রকাশিতে সে দান তোমার
ভাষা কোথা? কোথা ভাবধারা?
নিখিলের চিত্ত লুঠি নিয়া
তুমি যে করেছ সর্ব্বহারা।
এই চির-রিক্ততার সাথে
যুগে যুগে রহি স্মরণীয়
হে রবীন্দ্র! প্রেমিক! সাধক!
আমার ব্যথার পূজা নিও।

শ্রীপ্রীতিময়ী কর

প্রশ্ন

হে চিরপথিক, অবশেষে তব হ'ল কি পথের শেষ,
সোনার তরীটি ভিড়েছে কি কোনো পারে?
ধরণীর রূপপিপাসু নয়ন হয়েছে কি অনিমেষ,
জীবন-দেবতা ধরা দিল আপনারে?

হে জ্ঞানী, তোমার সব সংশয় মিটেছে কি এতদিনে,
ফেলেছ ছিঁড়িয়া মর্ত্ত্যের মোহজাল?
হে কবি, তোমার প্রেম কি আজিও শিহরে মাটির তৃণে,
অথবা ধরার সবই মানো জঞ্জাল?

তোমার কাব্যে জীবনের বহু প্রশ্নের সমাধান
মিলিয়াছে, আজো মিলিতেছে মহাকবি,
তুমি গেলে চ'লে, কোথা গেছ আজ কে দিবে সে সন্ধান,
কোন্ মহাকাশে উদিল মর্ত্ত্য-রবি

শ্রীশান্তি পাল

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ কবি। বাল্যে তাঁহার কবিত্বের উৎস প্রথম আপন পথের সন্ধান পায়, এবং বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সেই কবিত্বের ধারা বিরাট হইতে বিরাটতর রূপ ধারণ করিয়া বিশ্বমানবের তৃপ্তিবিধান করিয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী কবিতা-রচনার পিছনে যে একটা কর্ম্মের ধারা গুপ্তভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছিল, সে কথা অনেকেরই অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথকে জীবনে শুধু কবিকল্পনা ছাড়াও জমিদারি-পরিদর্শন প্রভৃতি নানারূপ কাজে যোগদান করিতে হইয়াছে। তাঁহার জীবন-বীণা নানা ছন্দে ঝঙ্কৃত—নানা প্রকার কর্ম্মের আবর্ত্তের মধ্য দিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের বিকাশ।

শিলাইদহ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চ্চার অনেক উপাদান যোগাইয়াছে এবং এই জমিদারি-পরিদর্শনকালে নানাপ্রকার বিচিত্র অনুভূতি তাঁহার সাহিত্যকে একটা বিশেষ রূপ দান করিয়াছে। শিলাইদহে ছিল তাঁহার বড় কাছারি, তাই কার্য্যবশত এখানেই তাঁহার বেশি যাতায়াত ছিল; তাহা ছাড়া শিলাইদহের নৈসর্গিক দৃশ্য তাঁহার মনকে বেশি করিয়া আকর্ষণ করিত। শিলাইদহ বাস তাঁহার কাব্যজীবনের এক প্রধান অধ্যায়।

শিলাইদহ গ্রামটি নদীয়া জেলায় অবস্থিত। এই গ্রামের অনতিদূরে পদ্মার সহিত গোরাই নদীর সঙ্গম ঘটিয়াছে। শিলাইদহ গ্রাম পদ্মার তীরেই অবস্থিত, অপর পারে পাবনা শহর, গ্রামের এক পার্শ্বে কুমার-খালি, অন্য পার্শ্বে কুষ্টিয়া। তিন দিকে তিনটি শহর থাকাতে এই গ্রামটি এককালে খুব সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে বহু ঘর ব্রাহ্মণের

বাস ছিল, তাহা ছাড়া ধোপা, নাপিত, কামার, কুম্ভকার, কবিরাজ, মোদক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক ছিল। গ্রামের অধিকারী-পরিবার খুব সম্পত্তিপন্ন ছিল, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ লাগিয়াই থাকিত। গ্রামের কোটিপতি ব্যবসায়ী যুগল সাহার স্মৃতি এখনও পঙ্কময় বিশাল পুকুরটির বুকে জাগিয়া আছে। আজকাল গ্রামের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিতেছে।

গ্রামটির অবস্থান খুব মনোরম পরিবেশের মধ্যে। এই গ্রামের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের এক পত্রে। অল্প কথায় গ্রামটির একটি সুন্দর চিত্র কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

দিগন্তের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বালির চর ধূ ধূ করছে—তাতে না আছে ঘাস, না আছে বাড়ীঘর, না আছে কিছু।...ঠিক পাশ দিয়ে পদ্মা চলে যাচ্ছে, ওপারে ঘাট, বাঁধা নৌকা, স্নানরত লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান, অপরাহ্নে নদীর হাটের কলধ্বনি—দূরে পাবনার পারে তরু শ্রেণীর ঘননীল রেখা—কোথাও গাঢ়নীল, কোথাও পাণ্ডুনীল, কোথাও সবুজ, কোথাও মাটির ধূসরতা—আর তারই মাঝখানে এই রক্তশূন্য মৃত্যুর মত ফ্যাকাসে সাদা।—'ছিন্নপত্র', ২৮ নবেম্বর, ১৮৯৪, পৃ. ৩১২।

রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে যাইতেন, পদ্মার চরে বোট নঙ্গর করিয়া একাদিক্রমে বহুদিন কাটাইয়া আসিতেন। একখানি বড় সুদৃশ্য বোটে কবি থাকিতেন, সঙ্গের ছোট ছোট খান দুই বোটে ভৃত্যবর্গ, জিনিসপত্র ইত্যাদি থাকিত। তিনি যখনই গ্রামে আসিতেন, সমস্ত গ্রামখানায় একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। গোয়ালারা ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহাদের প্রস্তুত দধি ছানা প্রভৃতি যদি মনিবের কাজে লাগে, তবেই তাহাদের প্রাণের অনাবিল আনন্দ, তবেই তাহাদের কর্ম্মদক্ষতা সার্থক। জেলেরাও নিজের কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। শিলাইদহ গ্রামেরই জনৈক ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের রান্না করিত। তিনি যখনই আসিতেন, তখনই সেই পাচকের ডাক পড়িত; তাহার রান্না কবির খুব পছন্দ হইয়াছিল।

কবি দিনের পর দিন সেই নির্জ্জন, নিস্তব্ধ চরে বোট লাগাইয়া কিছুকালের জন্য স্বাধীন আবাস রচনা করিয়া থাকিতেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা চলিত। এখানে বাধা দিবার কেহ ছিল না। কবি এক পত্রে লিখিতেছেন—

এই যেন আমার নিজের বাড়ী। এখানে আমার সময়ের উপরে আর কারো কোনো অধিকার নেই।...যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুসী পড়ি, যত খুসী লিখি এবং যত খুসী নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ, আলোকপূর্ণ, আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।—'ছিন্নপত্র', মে ১৮৯৩, পৃ. ১৯৫।

এই পদ্মার চরে সকালবেলায় জলের কলধ্বনিতে তাঁহার ঘুম ভাঙিত এবং এখানেই রাত্রিবেলা জলের কলধ্বনি শুনিতে শুনিতে তিনি নিদ্রার কোলে নিজেকে বিছাইয়া দিতেন। প্রথম যৌবনে সমস্তই চোখে সুন্দর লাগিত। সামান্য তৃণ, তুচ্ছ একটি গাছ, অতি-তুচ্ছ এক খণ্ড নুড়ি, সমস্তই কবিমনের উপর পুলকের একটা স্নিগ্ধ আবেশ অঙ্কিত করিয়া দিত। আনন্দের টানে কবি প্রায়ই বোটে করিয়া মাসের পর মাস জলে জলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—শিলাইদহ হইতে কালিগ্রাম, কালিগ্রাম হইতে পতিসর, পতিসর হইতে সাহাজাদপুর। পল্লীজীবনের সহিত তাঁহার এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁহার সাহিত্য-জীবনের গতিপথে একটা নূতন বাঁকের সৃষ্টি করিল।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে পদ্মার তীর জনশূন্য হইয়া যাইত। সকলে স্নান সমাপন করিয়া কখন গৃহে চলিয়া গিয়াছে। দুপুরের নিবিড় নিস্তব্ধতা শুধু মাঝে মাঝে দুই-একটা নাম-না-জানা পাখির ডাকে ভঙ্গ হইত। কবি কোন কালেই দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত নন, তিনি নিবিষ্ট মনে দুপুরের শান্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেন। তাঁহার একখানি পত্রে দুপুরের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়—

বালির চর ধূ ধূ করচে, তার উপরে ছোট ছোট বনঝাউ উঠেচে। জলের শব্দ, দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ ঝাঁ, এবং ঝাউ ঝোপ থেকে দুটো একটা পাখীর চিকচিক শব্দ, সবশুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব।—'ছিন্নপত্র', ফেব্রুয়ারি ১৮৯১, পৃ. ৬৫।

বৈকালবেলা কবি মাঠে বেড়াইতে বাহির হইতেন।

এই বোটেই আমলাবর্গ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত। জমিদারির কাজকর্ম্ম, বিলিব্যবস্থা, ছোটখাটো অভাব-অভিযোগ সমস্ত এখানেই নিষ্পত্তি হইত। শিলাইদহ-বাসের বেশির ভাগ সময়ই তাঁহাকে বোটে কাটাইতে হইয়াছে; উত্তরকালে 'কুঠিবাড়ি' নির্ম্মিত হওয়ার পরে কবি কিছুদিন এই বাড়িতে থাকিতেন; তখন তাঁহার আগমন ক্রমশই বিরল হইয়া আসিতেছিল।

জমিদারি পরিদর্শন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার জীবন অন্যভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি তখন কল্পনালোকে থাকিতেন, জটিল মানব-চরিত্র জানিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই; রূঢ় বাস্তব লইয়া তিনি কোন দিন ভাবেন নাই। শিলাইদহে যখন তিনি প্রথম আসিলেন, তখন তাঁহার বয়স তিরিশ বৎসর, সেটা ১২৯৮ সাল। সেই বৎসর শীতকালে তিনি জীবনে প্রথম গ্রাম-ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং সুখ-দুঃখময় গ্রামগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হইলেন, অধিবাসীদের সুখদুঃখের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগের সুযোগ উপস্থিত হইল। কাব্যলোক হইতে তিনি একেবারে বাস্তবলোকে মানুষের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। এখন হইতে জমিদারির হিসাব-নিকাশ, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি তাঁহার গতিপথে জমিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি সেগুলি সুনিপুণভাবে দেখিতে লাগিলেন এবং মানবের বিচিত্র চিত্তবৃত্তির সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন।

এই যে বিশ্ব—এই বিপুল সৃষ্টি, ইহা সম্পূর্ণ করিতে শুধু পুরুষ কিংবা

শুধু প্রকৃতিতে পারে না; পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন ভিন্ন সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাথ এতদিন শুধু প্রকৃতির মধ্যেই ডুবিয়া ছিলেন। মানুষকে জানিবার সুযোগ হয় নাই। এতদিন পরে তিনি মানুষকে যথার্থভাবে চিনিলেন। ফলে তাঁহার সাহিত্য-জীবনে নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। প্রথম শিলাইদহ-ভ্রমণের পরে ফাল্গুন মাসে তিনি কলিকাতা ফিরিয়া যান এবং নবপ্রতিষ্ঠিত 'হিতবাদী' পত্রিকায় "দেনা-পাওনা", "গিন্নী", "পোষ্ট-মাষ্টার" প্রভৃতি ছয়টি গল্প লেখেন। এই গল্পগুলি তাঁহার গ্রাম-ভ্রমণের বিচিত্র অনুভূতি দ্বারা গঠিত; এই গল্পগুলির মধ্যে তাঁহার মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। পল্লীর মানুষের নিজস্ব সুখদুঃখ সহানুভূতির রঙে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব কিরণে দীপ্তি পাইতেছে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের একটা আদর্শ খাড়া করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে এরূপ আদর্শ ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে একটিও ছিল না বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে সত্যই গর্ব্ব করিবার জিনিস। এই গল্পলেখা সম্বন্ধে শিলাইদহের এক পত্রে কবি লিখিতেছেন,—

আজকাল মনে হচ্ছে যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখতে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য্য হতে পারলে হয় তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর ভ'রে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে…।—'ছিন্নপত্র', ২৭ জুন ১৮৯৪, পৃ. ২৬২।

শিলাইদহে তিনি কতকগুলি গল্প লেখেন। ১৮৯১ সালের অগ্রহায়ণের 'সাধনা' পত্রিকায় "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন" নামে যে গল্প প্রকাশিত হয়, তাহাতে এই শিলাইদহের পদ্মার রাক্ষুসে মূর্ত্তির সুস্পষ্ট চিত্র

দেখিতে পাই। ১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি শিলাইদহে "সম্পত্তি-সমর্পণ" গল্পটি রচনা করেন, "কঙ্কাল" গল্পটিও এই সময় শিলাইদহ-বাস-কালে রচিত। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প "ক্ষুধিত পাষাণ"ও তাঁহার গ্রাম-ভ্রমণকালে লিখিত—সাহাজাদপুরে বোটে বসিয়া এই গল্পটি তিনি লেখেন। "বোষ্টমী" গল্পটির ঘটনাস্থল এই শিলাইদহ। এখানকারই একটি সত্য ঘটনা লইয়া এই গল্পটি রচিত। পল্লীজীবনের নিবিড় সংস্পর্শে না আসিলে আমরা হয়তো এই গল্পের মণিকক্ষের সন্ধান কোন দিন পাইতাম না।

প্রথম জীবনে কবির কাব্যে যে আবেগ, যে কল্পনা উদ্দাম হইয়া তরতরবেগে দুই কূল প্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছিল, যে 'নির্ঝর' চক্ষু উন্মীলন করিয়া তপনের কিরণস্পর্শে স্বপ্নভঙ্গের পর উত্তালবেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল, তাহা এখন অনেকটা শান্ত, অনেকটা সংযত হইয়া আসিয়াছে। এই সময় শুধু হৃদয়াবেগ নহে, বুদ্ধি ও জ্ঞানে তাঁহার কল্পনা সুন্দর এবং সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চিরজীবনের সখী পদ্মা তাঁহার কাব্যে নূতন শক্তি, নূতন সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিল।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের জমিদার। জমিদার হিসাবে তাঁহাকে কত প্রজার দুঃখের কাহিনী শুনিতে হইত, কত অভাব-অভিযোগের মীমাংসা করিতে হইত। কল্পনাপ্রবণ কবি যে কিরূপ দক্ষতার সহিত জমিদারি চালাইয়াছিলেন, তাহা ও-অঞ্চলের লোকেদের মুখে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি শুধু নায়েব-গোমস্তার উপর ভার দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া কাব্যবিলাস করিতেন না, তিনি স্বচক্ষে সমস্ত দেখিতেন, সমস্ত মীমাংসা-ভার নিজ হাতে লইতেন। তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা করিত, তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না। প্রজাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে সম্মান করিত। এই সেদিনও

তিনি যখন পতিসরে যান, তখন এই ভাষাহীন, মূক প্রজাদের সরল হৃদয়ের যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাইয়াছিলেন, তাহা সকলের সুবিদিত।

শিলাইদহ-বাসকালে তিনি কত দুঃস্থ প্রজার খাজনা মাফ করিয়াছেন, কত দরিদ্রকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি একজন ব্রাহ্মণের বিধবার কথা জানি, তিনি পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্রের হাত ধরিয়া কাছারিতে গিয়া উঠিলেন; কর্ম্মচারীগণ তাঁহার সম্বন্ধে দুই-একটি কথা কবিকে বলিতেই কবি তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় সত্তর টাকা খাজনা মাফ করিয়া দিলেন। তবে, রবীন্দ্রনাথের এই প্রকার দানের কথা যে তত প্রসিদ্ধ নয়, তাহার কারণ আছে। কবির সুদৃঢ় মতবাদ ছিল যে, খাজনা-ব্যাপারে ধনীদের প্রতি কোনরূপ বিবেচনা করিবেন না। দরিদ্রদিগকে প্রায়ই তিনি অর্থ-ব্যাপারে সাহায্য করিতেন। দরিদ্রদের কণ্ঠধ্বনি আর কতদূরই বা পৌছায়! তাই রবীন্দ্রনাথের নীরব দান শান্ত পল্লীগ্রামের মধ্যেই নীরবে সমাধিলাভ করিয়াছে, পল্লীর আবেষ্টনী ছাড়িয়া তাহা জনকোলাহলময় বহির্জগতে আসিয়া পৌছায় নাই; কেবল সেই জমিদারিতে যদি যাওয়া যায়, তবে প্রজাদের মুখে এই নীরব দানের কাহিনী আজিও শুনিতে পাওয়া যায়। কবি মানুষ চিনিতেন, লোকচরিত্র সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন, এই শিলাই-দহের কাছারি হইতেই তিনি জগদানন্দ রায় মহাশয়কে শান্তিনিকেতনে আনিয়া অনুকূল পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরচনার সুযোগ দান করেন।

প্রজাদের সুখদুঃখ কবির প্রাণকে বিশেষভাবে বিচলিত করিয়া তুলিত। এই নিরন্ন প্রজাদের চাপা কান্না তাঁহার নিকট গুপ্ত থাকিত না। শিলাইদহের এক পত্রে দেখিতে পাই কৃষকদের দুর্দ্দশা—

এবার এত জলও আকাশে ছিল! আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করছে।

চাষারা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে—আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি—যখন আর ক'দিন থাকলে পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারা যায়। যদি ঐ শীষের মধ্যে দুটো চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা।—'ছিন্নপত্র', ৪ জুলাই ১৮৯৩, পৃ. ২১৪।

বাংলা সাহিত্যে কবির একেবারে নিজস্ব দানের মধ্যে পত্র-সাহিত্য একটি প্রধান জিনিস। ইহার পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় পত্র-সাহিত্যের অস্তিত্বই ছিল না। রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম দেখাইলেন যে, নিছক পত্রও কি রকম উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে। এই পত্রগুলি রচনার সূচনা এই শিলাইদহে প্রথম হয়। কবির বহু পত্র এখানে লেখা। 'ছিন্নপত্রে'র ছোট ছোট পত্রের মধ্যে কি পরিমাণ সাহিত্যরস পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহা পাঠকমাত্রেরই অগোচর থাকিবে না। এই পত্রাবলী বাংলা-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

শিলাইদহ-বাসকালে ছোটগল্প, পত্র ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক কিছু রচনা করেন। তাঁহার আর একটি নিজস্ব দান নাট্যকাব্য। তাঁহার প্রথম নাট্যকাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' শিলাইদহে লেখা। তখন গ্রীষ্মকাল, ১২৯৯ সাল। 'চিত্রাঙ্গদা' কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এইরূপ অপর নাট্যকাব্য "বিদায়-অভিশাপ" তিনি কালিগ্রাম-পরিদর্শনকালে রচনা করেন। শিলাইদহে কবি বহু কবিতা লেখেন। ১২৯৮ সালে ফাল্গুন মাসে এখানে "সোনার তরী" কবিতাটি লেখেন। এই কবিতাটি লইয়া বাংলা সাহিত্যের আকাশে যে তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। "সোনার তরী"তে বর্ণিত বর্ষার চিত্র—"পরপারে তরুছায়া মসীমাখা মেঘে ঢাকা গ্রাম" "ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা" ইত্যাদি পদ্মাতীরের সম্পূর্ণ নিজস্ব চিত্র। এখানে তিনি "বিম্ববতী" "নিদ্রিতা" "রাজার ছেলে

ও রাজার মেয়ে" এই তিনটি রূপকথা ধরনের কবিতা লেখেন। "হৃদয়-যমুনা" ও ব্যর্থ যৌবন" কবিতা দুইটিও এখানে লেখা। রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কবিতা "ব্রাহ্মণ" ও "পুরাতন ভৃত্য" ১৩০১ সালের ফাল্গুন মাসে শিলাইদহ-বাসকালে লেখা। ইহার আড়াই মাস পরে যে "দুই বিঘা জমি" কবিতাটি লেখেন, তাহাতেও শিলাইদহ গ্রামের সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ বর্ণনা—"জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়াবার ধুম" "পল্লবঘন আম্রকানন" এবং "রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা মন্দির করি পাছে" প্রভৃতি শিলাইদহেরই প্রাচীন চিত্র। এখানে নন্দীর গোলা, হাটখোলা ছিল—বর্ত্তমানে শুধু স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে। কেবল গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দির এবং গোপীনাথজী রহিয়াছেন। "ক্ষণিকা"ও ১৩১৪ সালে শিলাইদহে বসিয়াই লেখা।

ইহার পরে ১৩০৯ সালে কবি শিলাইদহে আসিয়া কুঠিবাড়িতে অবস্থান করেন। রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি শিলাইদহ গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত; ইহা পদ্মা হইতে কিছু দূরে। সামনে দিয়া বড় রাস্তা একেবারে গোরাই নদীর তীর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কুষ্টিয়া স্টেশনে নামিয়া গোরাই নদী খেয়া-নৌকায় পার হইলেই এই রাস্তা দিয়া সোজা শিলাইদহে উপস্থিত হওয়া যায়। কুঠিবাড়ির বর্ণনা উত্তরকালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এক পত্রে পাওয়া যায়—

বোলপুরের সঙ্গে এখানকার চেহারার কিছুমাত্র মিল নেই। সেখানকার রৌদ্র বিরহীর মতো, মাঠের মধ্যে একা ব'সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলচে, সেই তপ্ত নিশ্বাসে সেখানকার ঘাসগুলো শুকিয়ে হলদে হয়ে উঠেচে। এখানে সেই রৌদ্র তার সহচরী ছায়ার সঙ্গে মিশেচে; তাই চারিদিকে এত সরসতা। আমার বাড়ীর সামনে সিসু-বীথিকায় তাই দিনরাত মর্ম্মরধ্বনি শুনচি, আর কনক-চাঁপার গন্ধে বাতাস বিহ্বল, করেৎ বেলের শাখায় প্রশাখায় নতুন চিকন পাতাগুলি ঝিলমিল করচে আর ঐ বেণুবনের মধ্যে চঞ্চলতার

বিরাম নেই।…এখন চৈত্র মাসের ফসল সমস্ত উঠে গিয়েচে, ছাদের থেকে দেখতে পাচ্চি, চষা মাঠ দিকপ্রান্ত ছড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু বৃষ্টির জন্যে। মাঠের যে অংশ বাবলা বনের নীচে চাষ পড়ে নি সেখানে ঘাসে ঘাসে একটু স্নিগ্ধ প্রলেপ, আর সেইখানে গ্রামের গোরুগুলো চরচে।…আগে পদ্মা কাছে ছিল—এখন নদী বহুদূরে স'রে গেচে…একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখন আসতুম তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গেই আমার আলাপ চলত।…ছাদের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সব শেষে উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো ঐ যে একটি ঝাপসা বাষ্পরেখাটির মত দেখতে পাচ্চি জানি ঐ আমার সেই পদ্মা।—('ভানুসিংহের পত্রাবলী,' ২২ চৈত্র ১৩২৮, পৃ. ১২০)

এই কুঠিবাড়িতে তাঁহার 'চৈতালি'র কবিতা লেখা শুরু হয়। তখন চৈত্র মাস—মাঠ হইতে সব শস্য উঠিয়া গিয়াছে; তাই কবি চৈত্রে রচিত কবিতার বইয়ের নাম 'চৈতালি' রাখিলেন। 'চৈতালি'র প্রথম কবিতাগুলি শিলাইদহে, মাঝেরগুলি পতিসরে, এবং শেষেরগুলি সাহাজাদপুরে লিখিত হয়। ১৩১১ সালে মাঘ মাস হইতে গ্রীষ্মাবকাশ পর্য্যন্ত কবি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় সাময়িকভাবে এখানে স্থানান্তরিত করেন। কবি পরিণত বয়সে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে যে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন, একদিন শিলাইদহে তাহা প্রতিষ্ঠা হইবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। এমন কি কবি একবার পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লইয়া এখানে বেড়াইতে আসেন।

শিলাইদহের যে ভবনে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন থাকিতেন ও যেখানে ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' জন্মগ্রহণ করে, সেই রবীন্দ্রভবন দর্শন করিতে অনেকে আসেন। কিন্তু কবিতীর্থ ঐ মন্দিরটির অবস্থা এতই শোচনীয় যে, বহুদূর হইতে আগত দর্শকগণ উহা দেখিয়া বেদনা বোধ করেন। ঐ পবিত্র মন্দিরটি জাতীয় সম্পত্তিরূপে সুরক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন কবির বয়স ৪৯ বৎসর, তখন শিলাইদহে 'রাজা' নাটক লিখিত হয়; পৌষ মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩১৮ সালে জন্মোৎসবের পরে কবি পুনরায় এখানে আসেন এবং 'অচলায়তন' রচনা করেন। এই দুইখানি নাটক রচনা করিবার পর কবিকে পুনরায় দেখি ১৩১৯ সালে, এখানে কুঠিবাড়িতে বসিয়া তিনি সতরোটি গান রচনা করেন, সেগুলি গীতিমাল্যের অন্তর্ভুক্ত। পরে তিনি এখানে 'গীতাঞ্জলী'র কয়েকটি গানের ইংরেজী অনুবাদও করিয়াছিলেন। শিলাইদহ গ্রাম এবং ইহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা কবির মনে যে অনুভূতির উদ্রেক করিয়া তাঁহাকে নবসাহিত্য-রচনায় প্রণোদিত করে, সেজন্য বাংলা সাহিত্য শিলাইদহের নিকট ঋণী।

রবীন্দ্রনাথের রচিত সঙ্গীতে যে বাউল গানের প্রভাব খুব সুস্পষ্ট, তাহার সূচনা হয় এইখানে। কবি এখানে আসিয়া অনেক বাউলের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং তাহাদের অনেক গান সংগ্রহ করেন। এখানকার বিখ্যাত লালন ফকিরের গান কবিকে খুবই আনন্দ দিত। শিলাইদহের ডাকহরকরা গগনও একজন খুব ভাল পদ-রচয়িতা ছিলেন; তাঁহার অনেক গান কবি সংগ্রহ করেন।

পরে জমিদারি ভাগ হইয়া গেলে রবীন্দ্রনাথ এখানে আসা প্রায় বন্ধ করিলেন। শিলাইদহ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি হইল এবং ক্রমে ক্রমে এই প্রিয় গ্রামের সঙ্গে কবির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি শিলাইদহের প্রতি কবির আন্তরিক প্রীতি এক কণাও ম্লান হয় নাই। এই সেদিন শিলাইদহের পল্লীকবি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে শিলাইদহের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ কবিতা উপহার পাঠাইলে কবি স্বহস্তলিখিত পত্রে প্রত্যুত্তর দেন—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শিলাইদহে দীর্ঘকাল তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তাসূত্রে যুক্ত ছিলাম আজো তোমাদের মন থেকে তা ছিন্ন হয়ে যায় নি তারই প্রমাণ পাওয়া গেল তোমার সুন্দর চিঠিখানিতে। শ্রদ্ধার দান নানাস্থান থেকেই পেয়েছি ; তোমাদের অর্ঘ্য সকলের চেয়ে মনকে স্পর্শ করেছে। অনেকবার শিলাইদহ-দর্শন করে' আসবার ইচ্ছা করেছি, কিন্তু সেই আমার চিরপরিচিত শিলাইদহ এখন আর সেদিনকার সেই আনন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত নেই নিশ্চয় জেনে নিরস্ত হয়েছি।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর একবার পল্লী-সাহিত্য-সম্মেলনে যোগদানের জন্য শিলাইদহ হইতে আহ্বান আসে। সে আহ্বানের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

ওঁ

আমার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরস সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে। সেখানে আমার যাত্রাপথ আজ সহজগম্য নয়, কিন্তু সেই পল্লীর স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ সরস হ'য়ে আছে আজও আমার নিভৃত স্মৃতিলোকে, সেই আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর অশ্রুতিগম্য করুণ-ধ্বনিতে আজও আমার মনে গুঞ্জরিত হ'য়ে উঠ্‌ছে সেই কথা এই উপলক্ষ্যে পল্লীবাসীদের আজ জানিয়ে রাখ্‌লুম। ইতি ১ চৈত্র ১৩৪৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইহাতে সত্যই বুঝা যায় যে, তাঁহার প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিত এই গ্রামের অঙ্কে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার জন্য, এই গ্রামের স্নেহচ্ছায়ালাভের জন্য, এই প্রাণপ্রিয়া পদ্মার সঙ্গে নীরব আলাপন করিবার জন্য। শিলাইদহ তাই সাহিত্যসেবীদের তীর্থবিশেষ।

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার

প্রসঙ্গ কথা

সেই আদিম জন্তুটা

সে যেন আদিম্‌কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু; তা'র চোখ নাই, কান নাই কেবল তা'র মস্ত একটা ক্ষুধা আছে ;—...

মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তা'র লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।

...তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিঃশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা!

...আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মত জন্তু, তাহাকে চিনি না। তা'র কি রকম মুণ্ড, কি রকম গা, কি রকম ল্যাজ কিছুই জানা নাই—তা'র গ্রাস করিবার প্রণালীটা কি ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ!

ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—সে যে কি রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।

—রবীন্দ্রনাথ

*　　*　　*

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দেশ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি; দাড়ি ও "বিবিধ প্রসঙ্গে"র জন্য তিনি দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। দাড়ি বলিলাম এইজন্য যে, তিনি স্বয়ং ইউরোপ ভ্রমণ-কালে দাড়ি লইয়া কি ভাবে বিব্রত হইয়াছিলেন, সে কাহিনী পূর্ব্বে এবং সদ্য সদ্য বারংবার বিবৃত করিয়াছেন; শুধু দাড়ির জন্যই তাহারা ঐ বেঁটেখাটো মানুষটিকে তালপ্রাংশু রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়া কিরূপ খাতির করিয়াছিল, সে গল্প আপনারা 'প্রবাসী'তে বার দুই তিন, 'মডার্ন রিভিউ'য়ে বার কয়েক, 'কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যাল গেজেট' এবং 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'তে একাধিকবার নিশ্চয় পড়িয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

পরিচয় শুধু দাড়ি ও "বিবিধ প্রসঙ্গে"ই নহে; কাঁচা এবং অর্দ্ধসিদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে ইনিই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল পাব্লিসিটির ভাবনা দিয়া পাকা ও পূর্ণসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া প্রায়শই মনে মনে গর্ব্বানুভব করিয়া থাকেন, ইঁহারই তাগিদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী লেখা আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া নোবেল পুরস্কার তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল। ইনিই একদিন 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" এবং 'মডার্ন রিভিউ'র Notes-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সার্ আশুতোষের গাত্রে অপর্য্যাপ্ত বিষাক্ত নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিয়া পরে কন্যাদের পরীক্ষা-ভাতার ও জামাতার মাসিক ভাতার প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম বশত সেই বিষ স্বয়ং চাটিয়া পান করিয়াছিলেন; সুতরাং ইঁহাকে মডার্ন নীলকণ্ঠও বলা চলে; কিন্তু ইঁহার সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্ববেশ পরিচয় ইঁহার পুত্রকন্যাদের কৃতিত্বে—শ্রীমতী সীতাশান্তা এবং শ্রীমান অশোককেদারের নানা গুণবত্তার কথা আপনারা 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ'য়ের পৃষ্ঠায় নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন; অক্সফোর্ডের বাংলা অধ্যাপক অ্যাণ্ডার্‌সনের প্রশংসাপত্র, "বিবিধ প্রসঙ্গে"র মধ্যে "পুস্তক পরিচয়" ইত্যাদির কথা অবশ্যই আপনাদের স্মরণ আছে।

* * *

অচল টাকা ভাঙাইবার কৌশল দুই এক জনের এমনই আয়ত্ত যে, অনেক সময় দেখিয়া আমাদের তাক লাগিয়া যায়। কিন্তু মৃত মানুষ ভাঙাইয়া যাঁহারা আখেরের কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারেন, তাঁহারা সত্যই মহানুভব ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে যিনি তাঁহাকে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' গহ্বরে পুরিয়া অল্প অল্প করিয়া লেহন ও ক্ষয় করিয়া আসিতেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও যে তাঁহার লালাসিক্ত জারকরস তাঁহার শবদেহকেও নিঃশব্দে জীর্ণ করিবে, এ কথা কি কোনও সাধারণ ব্যক্তি কল্পনা করিতে পারে?

* * *

এ জারকরস অহমিকায় ক্লেদাক্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবশত প্রত্যেক সাময়িক-পত্রই তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁহার মৃত্যুর পর স্ব স্ব পৃষ্ঠায় তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি হ্যান করিলাম, আমি ত্যান করিলাম, আমি যেমনটি করিয়াছি তেমনটি আর কেহ পারে নাই, অন্তত এ বিষয়ে সে দম্ভপ্রকাশ কোনও ক্রমেই শোভন নয়; সত্য হইলেও নয়। কিন্তু যাহা সত্য নয়, যাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, তাহাই বড় গলা করিয়া এই ব্যপদেশে প্রচার করার দুঃসাহস যিনি প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি আর যাহাই হউন, সাধারণ মানুষ নহেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অক্টোবর মাসের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় Notes বিভাগে এই দুঃসাহসিকতা দেখাইয়া আপন অসাধারণত্ব প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

Perhaps there is no special Tagore number or Poojah number of any Bengali newspaper or periodical this year which does not contain some letter or letters of Rabindranath Tagore. Some of them may or may not be important if only their matter or subject is considered, but always their style, their literary excellence, betrays their authorship. The Tagore letters which have been appearing in *Prabasi*...are remarkable not only for their style and literary merits, but also because they contain information relating to his life and opinions and glimpses of his personality which no hitherto published prose writings or poems of his contain. P. 380.

অর্থাৎ 'প্রবাসী'তে যে পত্রগুলি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা বিষয়-গৌরবে এবং স্টাইলগুণে 'জীবন-স্মৃতি', 'ছিন্নপত্র' 'ছেলেবেলা' প্রভৃতি হইতেও মূল্যবান। বিজ্ঞাপনে এমন ভাষা 'বসুমতী'ও কখনও ব্যবহার করে নাই। এমন অবাধ মিথ্যাভাষণ মহৎ না হইলে করা যায় না!

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত এরূপ দুই একটি মহৎ পত্র নিয়ে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি—

১। (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত) ভাদ্র, ১৩৪৮, পৃ. ৫৩২

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সুরেন অল্প একটু অবকাশ সম্প্রতি পেয়েছে। তাকে মডার্‌ন্‌ রিভিয়ুর জন্যে অনুরোধ করলে শিক্ষা বা অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করতে দ্বিধা করবে না। কর্ম্ম এখন আমার পক্ষে বোঝা অথচ তাকে কাঁধের থেকে নামানো অসম্ভব হয়েছে—এদিকে শরীর অপটু, মনও বাহিরের দিকে নেই। ইতি ২২ জানুয়ারি ১৯৩৬

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। (ঐ) আশ্বিন, ১৩৪৮, পৃ. ৬৫৯

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

চিঠিখানি পেয়ে আরাম পেলুম।

"বৈকালী" লোকহস্তে পাঠাচ্ছি। কালিদাসের চিঠিতে এর বিবরণ পাবেন। যেমন ইচ্ছা ছাপাবেন। পরে এগুলি বই আকারে বের করব।

অত্যন্ত শ্রান্ত আছি। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩৩৩

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। (ঐ) আশ্বিন, ১৩৪৮, পৃ. ৬৬০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সম্ভবত আগামী কাল বৃহস্পতিবারে মধ্যাহ্নের গাড়িতে কলকাতায় যাত্রা করব—দুই তিন দিনের জন্যে সেখানে থাকবার কথা। ইতিমধ্যে আপনি যদি আশ্রমের অভিমুখে না আসেন তাহলে সেখানেই দেখা হবে। ইতি বুধবার [১৯২৭ সালের ৫ই জানুয়ারি। (?)]

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপরে উদ্ধৃত চিঠিগুলি স্টাইল, লিটারারি মেরিট এবং বিষয়বস্তুর দিক দিয়া অসাধারণ সন্দেহ নাই, কারণ সেগুলি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত

হইয়াছে! এইগুলি অপেক্ষা তুচ্ছতর পত্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তো আমরা জানি না। রবীন্দ্রনাথের লেখা হিসাবে কোনও চিঠিই অ-মূল্যবান, এ কথা আমরা মনে করি না; কিন্তু যদি তুলনাই করিতে হয় তাহা হইলে বলিব, 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয় আত্মপ্রচারের জন্য তাঁহার নিকট লিখিত অতিতুচ্ছ প্রূফ দেখা সম্পর্কিত চিঠিও পত্রস্থ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের ছেলেমেয়ে-জামাইদের নামের টীকা ও তাৎপর্য্য যে ভাবে পত্রশেষে দেওয়া হইয়াছে, তাহাও ভদ্রতাবিরুদ্ধ এবং কদর্য্য।

* * *

কিন্তু এখনও রামানন্দী মিথ্যার চরমে আসি নাই; সে চরম যে কি ভয়াবহ চরম, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন—

It may be mentioned incidentally that *Prabasi* has been publishing photographs of Rabindranath Tagore—either of himself alone or of himself in the midst of others—and those near and dear to him, some of which had never yet been published and a few of which relating to his childhood of which even the existence and whereabouts were hitherto unknown.—*Modern Review*, Oct. 1941, p. 330.

লজ্জার মাথা কি পরিমাণ খাইতে পারিলে এরূপ মিথ্যা, প্রবীণ ধার্ম্মিক ব্যক্তির কলমে আসিতে পারে, তাহা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে এবং অবস্থায় নানা বৈষয়িক অথবা অন্যান্য সম্পর্কে এত বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের পাল্লায় পড়িয়া ছবি তুলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, যে কোনও পত্রিকা ইচ্ছা করিলেই তাঁহার বহু অপ্রকাশিত ফটোগ্রাফ এখনও দশ বৎসর প্রকাশ করিতে পারে। বস্তুত প্রায় সকল সাময়িক-পত্রেই তাঁহার কোনও না কোনও নূতন ছবি বাহির হইয়াছে। ইহা গণ্য করিয়া জাহির করার মত ব্যাপারই নহে।

এ বিষয়ে যদি কেহ গৌরব করিতে পারেন তো তিনি একমাত্র 'কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যাল গেজেটে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল হোম। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার পত্রিকার যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সত্যই রবীন্দ্রনাথের এবং বাংলা দেশের মর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষা করিয়াছে। এত নূতন এবং পুরাতন প্রয়োজনীয় চিত্র আর কেহ একত্র প্রকাশ করিতে পারেন নাই; রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এত খবরও আর কেহ দিতে পারেন নাই। 'প্রবাসী'তে এমন কোনও প্রয়োজনীয় চিত্র দেখিলাম না, যাহা পূর্ব্বে অন্যত্র প্রকাশিত হয় নাই। অবশ্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূর সহিত চীনযাত্রার পূর্ব্বে জাহাজঘাটায় রবীন্দ্রনাথ যে ছবি তুলিয়াছিলেন, তাহা অন্যত্র প্রকাশিত হয় নাই। বহু মুখোপাধ্যায়, দত্ত, বসু, দাস মহাশয়েরাও ইচ্ছা করিলে স্ব স্ব আত্মীয়-আত্মীয়া সম্পর্কে এরূপ নূতন চিত্র এখনও প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শৈশবের যে চিত্রটির (কার্ত্তিকের 'প্রবাসী'র ৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে) কথা রামানন্দবাবু উল্লেখ করিয়াছেন ("of which even the existence and whereabouts were hitherto unknown"), সেই চিত্রটিই যে ইতিপূর্ব্বে অন্তত দশবার দশ জায়গায় বাহির হইয়াছে, এ কথা তো তাঁহার অজ্ঞাত নাই! তথাপি এত বড় মিথ্যাটা তিনি লিখিলেন!

"অজ্ঞাত নাই" লিখিলাম এইজন্য যে, স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত *Golden Book of Tagore*-এ পুরা দশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ চিত্রের রবীন্দ্রনাথ-অংশটুকু ছাপা হইয়াছিল। সম্পূর্ণ চিত্রটি রবীন্দ্র-জয়ন্তী কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রচারিত (রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে, ১৯৩১) নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মুদ্রিত একটি অ্যাল্‌বামে ('Tagore Septuagenary Souvenir Album') প্রকাশিত ও

বাজারে বিক্রয় হইয়াছিল। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ১ম খণ্ডের প্রথম চিত্রও এই hitherto unknown ছবি। পরে উহা আরও অন্যত্র বাহির হইয়াছে, এমন কি গত শ্রাবণ সংখ্যা 'বসুমতী'ও (পৃ. ৪১৬) উহা প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ চিত্রকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব এবং অভূতপূর্ব্ব বলার বাহাদুরী আছে বইকি!

* * *

আমরাও ব্যবসা করিয়া থাকি এবং ব্যবসায়ের জন্য একটু আধটু অনৃতভাষণ সমর্থন না করিলে আমাদের চলে না। রবীন্দ্রবিয়োগবিধুর কার্ত্তিকের 'প্রবাসী'তে এই কারণে সম্পূর্ণ চারিপৃষ্ঠাব্যাপী একটি বিজ্ঞাপনকে প্রবন্ধ হিসাবে চালানো ("ব্যবসায়ে বাঙালী", পৃ. ১২৪-৭, সূচীও দ্রষ্টব্য) আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলাম ; ঐ সংখ্যাতেই (২৭ পৃষ্ঠায়) সুইং-ডোরের আড়ালে স্ত্রী-পুরুষের জাপটা-জাপটি ছবিটিকেও ব্যবসায়ের অঙ্গ হিসাবে ক্ষমা করিতাম ; এবং রবীন্দ্রনাথের ছবির নীচের নামে ১১ বৎসরকে ৯ বৎসর, ১২ বৎসরকে ১৪ বৎসর এবং ৩৬ বৎসরকে ৩০ বৎসর করাতে আপত্তি প্রকাশ করিতাম না। এমন কি, অক্টোবরের 'মডার্ন রিভিউ'য়ে ৩৫২ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ রবীন্দ্রনাথের দণ্ডায়মান ছবিটির নীচে

"This is probably the last standing pose, given by the poet in March 1941"

লেখাটাও হজম করিতে পারিতাম। যদিও কবির উক্ত ফোটোটি যে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে তোলা নয়, এ কথা যে কোনও কম-প্রসিদ্ধ সম্পাদক ধরিতে পারিতেন! চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের সহিত কম ঘনিষ্ঠ যে কোনও ব্যক্তি জানেন যে, ১৯৪১ সালে কবি খাড়া দণ্ডায়মান হইবার মতন অবস্থায় ছিলেন না। ইহাও সহিতে প্রস্তুত ছিলাম ; তবে একেবারে পুকুর-চুরির সমর্থন আমরা কি করিয়া করিব!

কিন্তু আদিম জন্তুটার নাক নাই, কান নাই, শুধু লালাসিক্ত ক্ষুধা আছে। সেই ক্ষুধারই জয় হউক!

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী

সংযোজন ও সংশোধন

রবীন্দ্র-সংখ্যায় যে 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংকলনকর্ত্তাগণ ক্রমশ প্রস্তুত করিতেছিলেন. সংকলন পূর্ণাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই তাহা সেই সংখ্যায় প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। এইজন্য ইহাতে কিছু ভ্রম-ত্রুটি থাকিতে পারে। পাঠকগণের সহায়তায় ক্রমশ তাহা সংশোধন হইতে পারিবে। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুসারে এই গ্রন্থতালিকা সাজানো হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি গত কয়েক বৎসরে প্রকাশিত কতকগুলি পুস্তক সম্বন্ধে আমরা অবগত আছি যে, বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় সেগুলি যথাসময়ে ও যথাক্রমে সন্নিবেশিত হয় নাই। এইরূপ কয়েকটি সংশোধনও দেওয়া হইল।

ইংরেজী গ্রন্থের তালিকায় অনেক অসম্পূর্ণতা আছে। তৎসত্ত্বেও এই তালিকা প্রকাশের কারণ ইহাতে অনেকগুলি পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান আছে, যেগুলির কথা আমরা পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না এবং ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জীগুলিতে সেগুলির কোন উল্লেখ নাই।

পৃ. ৮৬৯। গল্প। ইহা এই পৃষ্ঠায় উল্লিখিত গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ডেরই দ্বিতীয় খণ্ড। পত্রাঙ্ক দেখিয়াও তাহা বুঝিতে পারা যায়। আখ্যাপত্রে ও পুস্তক মধ্যে ইহার নাম 'গল্প' মুদ্রিত আছে বলিয়া তালিকায়ও সেইরূপ আছে। মূল বাঁধাইতে 'গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ড' ছাপা আছে।

পৃ. ৮৬৯। কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থে মোহিতচন্দ্র সেন কবিতাগুলিকে ভাবানুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে সাজাইয়াছিলেন। কয়েকটি পুরাতন কবিতাপুস্তকের নামও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন যেমন 'সোনার তরী'; যদিও তাহার কবিতা-সংকলন ঐ সকল পুস্তকের কবিতা হইতে স্বতন্ত্র। এই সংস্করণ কাব্যগ্রন্থের প্রচলন বন্ধ হইবার পরও, উহার কয়েকটি বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে—যেমন 'কাহিনী' ও 'কথা' বিভাগ লইয়া 'কথা ও কাহিনী', 'সংকল্প' ও 'স্বদেশ' বিভাগ লইয়া 'সংকল্প ও স্বদেশ'। এই 'সংকল্প ও স্বদেশ' ও ৮৭০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 'স্বদেশ' গ্রন্থের অনেকাংশে অনুরূপতা আছে; প্রধান ভেদ এই যে, 'স্বদেশ' গ্রন্থে 'শিবাজী উৎসব' ও অনেক স্বদেশী গান আছে যাহা কাব্যগ্রন্থের 'সংকল্প' 'স্বদেশ' বিভাগে ছিল না, 'সংকল্প ও স্বদেশের' পুনর্মুদ্রণেও নাই।

পৃ. ৮৭১-৭২। ১৩০৭-০৮ সনে প্রথমে মজুমদার লাইব্রেরি পরে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলী বিভিন্ন খণ্ডে ক্রমান্বয়ে ক্রমিক সংখ্যাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হয়—'বিচিত্র প্রবন্ধ' ইহার প্রথম খণ্ড ও 'ধর্ম্ম' ষোড়শ খণ্ড। 'চারিত্রপূজা' ইহার

অন্তর্গত নহে। এই পঞ্জী বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুসারে সাজানো হইয়াছে। তবে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বিভিন্ন খণ্ড যথাক্রমেই প্রকাশিত হইয়াছিল, পরবর্তী খণ্ড প্রথমে প্রকাশিত হয় নাই।

পৃ. ৮৭৮। ঋতুরঙ্গ। এই গীতিনাট্যের অভিনয় ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন চলিয়াছিল, এবং বিভিন্ন দিনের অভিনয়ের গান কবিতা ইত্যাদিতে পার্থক্য ছিল, দুইরূপ পুস্তিকায় তাহাই সূচিত হইয়াছে। এই দুই আকারের পুস্তিকা একই তারিখ দেওয়া থাকিলেও ইহা একই তারিখে প্রকাশিত হয় নাই, বিভিন্ন দিনের অভিনয়ে বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল।

পৃ. ৮৭৯। 'শেষের কবিতা' ও 'তপতী' বেঙ্গল লাইব্রেরির ১৯৩০-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইলেও সেগুলি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং 'শেষের কবিতা' 'তপতী'র পূর্ব্বে বসিবে।

পৃ. ৮৮০। 'সঞ্চয়িতা' 'শাপমোচনে'র পরে বসিবে।

পৃ. ৮৮১। 'ভারতপথিক রামমোহন' নামে যে পুস্তিকা রামমোহন শতবার্ষিকীর অভিভাষণরূপে বিতরিত হইয়াছিল, ঐ তালিকায় তাহাই উল্লিখিত হইয়াছিল। ঐ শতবার্ষিকীর দিন 'ভারতপথিক রামমোহন' নামে একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক খণ্ড বিক্রীত হইবার পর তাহার প্রচলন বন্ধ থাকে।

পৃ. ৮৮২। 'পত্রধারা' 'সেঁজুতি'র পরে বসিবে।

'আকাশপ্রদীপ' পুস্তকের আখ্যাপত্রের পিছনে যে 'বৈশাখ ১৩৪৫' মুদ্রিত আছে, তাহা মুদ্রণপ্রমাদ—উহা 'বৈশাখ ১৩৪৬' হইবে।

পৃ. ৮৮৩। 'পথের সঞ্চয়' হইতে 'প্রসাদ' পর্য্যন্ত গ্রন্থগুলির নাম এই পর্য্যায়ে বসিবে—
'শ্যামা', 'পথের সঞ্চয়', 'মহাজাতি সদন', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ১ম খণ্ড, 'বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দির প্রবেশ-উৎসব', 'প্রসাদ', 'অন্তর্দেবতা'।

পৃ. ৮৮৪। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭ম খণ্ডের পূর্ব্বে মুদ্রিত হইলেও উহা রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশিত হইবার পর সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থপঞ্জী মুদ্রিত হইবার পর ১৫ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ও 'ছড়া' ও 'শেষ লেখা' বই দুইখানিও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

পৃ. ৮৭৮। 'লেখন' মুদ্রিত হইবার সময় 'বৈকালী' নামে একটি গান ও কবিতার সংকলন কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়, কিন্তু তাহা এখনও সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই।

পৃ. ৮৮৪-৯০। ইংরেজী পুস্তক-তালিকায় অনেকগুলি পুস্তিকা যথাস্থানে ও কতকগুলি একেবারেই উল্লিখিত হয় নাই, আগামী বারে সেগুলির উল্লেখ করিব।

পৃ. ৮৮৭। পংক্তি ৪, *The Fugitive* পুস্তকের "Political musings..." স্থলে "Poetical musings..." হইবে।

অশৌচান্তে নিয়মভঙ্গ একটু ঘটা করিয়াই করিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাগজ যেখানে আসিয়া ঠেকিল, তাহাতে দেখিতেছি, এক পদ দুই পদের বেশি পরিবেশনের আর জায়গা নাই। ফর্ম্মা-সংখ্যা বাড়াইলে অবশ্য চলিত, কিন্তু সাদা কাগজ যেরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তাহাতে বাধ্য হইয়াই একসঙ্গে অনেকখানি মজার লোভ সম্বরণ করিতে হইল। আমরা যেভাবে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহাতে আমাদের পাঠকবর্গকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, আগামী সংখ্যাতেই নিয়মভঙ্গটা ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইবে, এবারে 'নমুনা মাত্র চাখিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আর একটি কথা অবশ্য-স্মরণীয় যে, অধিকাংশ পত্রিকারই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সংখ্যা বাহির হইয়া গিয়াছে, ১লা অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে নূতন কিছু মশলা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। সুতরাং পুরাতন মালে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত চালাইলে দোষ হইবে না।

—

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সম্বন্ধে যে এত নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারিব, তাহা আমরা কখনই কল্পনা করিতে পারি নাই। এত লোকের সঙ্গে তাঁহার এত মাখামাখি রকম পরিচয় ছিল, তাহা কে জানিত! কত লোককে কত রকমে বুকে জড়াইয়া তিনি কতবার নিঃশব্দে এবং সশব্দে কাঁদিয়াছেন, ছাপার অক্ষরে না

দেখিলে সেসব কথা তো বিশ্বাসই করিতে পারিতাম না! একটা মানুষ, এতজনকে এত গূঢ় গোপন কথা বলিয়া যাইতে পারিবেন, তাহাই বা কে ভাবিতে পারিয়াছিল! সেসব কথা এখন শুনিয়া আমাদের তাক লাগিয়া যাইতেছে! তাঁহার জীবনের নানা কাজে তিনি এত লোকের কাছে সাহায্য ও পরামর্শ পাইয়াছিলেন, এত লোকের কাছে অর্থ-সাহায্য পাইয়াছিলেন, এসব কথা যতই প্রকাশ হইতেছে, ততই তাঁহার বিচিত্র লীলাময় মূর্তি দেখিয়া আমরা তাজ্জব বনিতেছি! কাবুলিওয়ালারা সম্ভবত বাংলা লিখিতে জানে না, জানিলে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই শুনিতে পাইতাম, তিনি কোনও সময়ে টিপসহি করিয়া তাহাদিগকেও ফাঁসাইয়া গিয়াছেন, সন্ধান করিলে হয়তো সেসব দুরূহ স্থানে তাঁহার টিপসহিও মিলিতে পারে!

* * *

যেমন, মৃত্যুর পরে তাঁহার বহুমূল্য ঘড়িটির সন্ধান পাওয়া গেল। সন্ধান দিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি যে একজন উদার মহানুভব ব্যক্তি সেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাটাই সুকৌশলে গোপন করিয়া ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার বিনয়ের প্রশংসা করি। ঘটনাটি রায় বাহাদুরের ভাষাতেই শুনুন—

একদিন প্রাতে যোড়াসাঁকোর কবির ভবনে গিয়াছি, তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'ওহে তোমার ঘড়ির দরকার আছে? যদি থাকে ত এই ঘড়িটা নিতে পার।' আমি ঘড়িটি দেখিলাম, হ্যামিণ্টনের প্রকাণ্ড সোনার Chronometer ঘড়ি—উপরে R. T. মনোগ্রাম। দাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ৩৫০ টাকা; আমি চমকিয়া উঠিলাম দেখিয়া কবি বলিলেন, 'দেখ, এক জন ১৫০ টাকায় ঘড়িটি নিতে চেয়েছে, কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা নয়, তাকে দিতে। তুমি যদি নেও ১২৫ টাকায় পেতে পার।' আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম।—'মাসিক বসুমতী', শ্রাবণ, ১৩৪৮, পৃ. ৫১৫

এই অতি গুহ্য transaction-এর কথা প্রকাশ না করিলে আমরা রবীন্দ্র-চরিত্রের আর এক দিক জানিতেই পারিতাম না। তাঁহারও যে টাকার অভাব হইত এবং তিনিও যে সাধারণ দোকানদারসুলভ বাক্‌ভঙ্গিতে পটু ছিলেন (যেমন, সাক্ষাৎ খরিদ্দারকে খুশি করিবার জন্য কল্পিত পূর্ব্বক্রেতা অপেক্ষা তাঁহাকে ২৫ টাকা কমে ঘড়িটি "অফার" করা ইত্যাদি) রবীন্দ্রনাথের এই নূতন পরিচয় রায় বাহাদুর রবীন্দ্র-বিয়োগে অতিরিক্ত শোকাবেগবশতই গোপন করিতে পারেন নাই। বুঝিতেছি, বার্দ্ধক্যহেতু তাঁহার চরিত্রের কলপ-কালোপ্রস্তরকঠিন দৃঢ়তা কিছু নরম হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তো তাঁহাকে এরূপ বেসামাল হইতে দেখা যায় নাই! ব্যক্তিগত গোপন কথাগুলি তিনি গোপনই রাখিতে পারিয়াছিলেন! বার্দ্ধক্য এবং বন্ধু-বিয়োগ উভয়ই মিলিয়া এতদিনে যে সৌম্যসংযত রায় বাহাদুরের মানুষ-মূর্ত্তি আমাদের নিকট প্রকট করিল, ইহাতে আমরা খুশিই হইয়াছি।

মানুষের দুঃখ যখন সর্ব্বাধিক প্রবল হয়, তখন হয় সে পাষাণবৎ নির্ব্বাক হইয়া যায়, অথবা অস্ফুট দুর্ব্বোধ্য ভাষায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। যে মাতা সন্তানের অথবা যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর ইনাইয়া বিনাইয়া সাতকাহন করিয়া বেশ মিহি মিঠা নাকি সুরে কাঁদিতে থাকে, কথার পর কথা সুর করিয়া আওড়াইয়া যায়, সে মাতা বা পত্নীর বিয়োগদুঃখও আমাদের উপহাসের বিষয় হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আমরা এই দুই জাতীয় শোকই দেখিয়াছি। একেবারে নির্ব্বাক শোক দেখা সম্ভব নয়, কারণ তাহা কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না, কিন্তু শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শোকের মধ্যে আমরা নির্ব্বাকের কাছাকাছি

কিছু পাইয়াছি; দুর্বোধ্য ভাষাও তাহাকে বলিতে পারি, অস্ফুট আর্ত্তনাদও বলা চলে। তাঁহার শোক genuine, মোটেই লোক-দেখানো নয়। কারণ লোক-দেখানো হইলে লোকে তাঁহার বক্তব্য বুঝিতে পারিত। গত ভাদ্রের 'পরিচয়ে'র শেষ কয়েক পৃষ্ঠার (পৃ. ১৮০-১৮৬) এই হৃদয়মন্থন-করা অথচ প্রায়মূক শোকের নিদর্শন আছে। যথা—

বুদ্ধির সিদ্ধান্তে বিশ্বাসের সমর্থন যেমন সাধারণত দুষ্প্রাপ্য, তেমনই ওই স্বতোবিরোধী বৃত্তিদ্বয়ের সহযোগী নির্দ্দেশ ব্যতীত জ্ঞানমার্গের মতো কর্ম্মকাণ্ডও অলাতচক্রের প্রকারভেদ; এবং সেইজন্যে যদিচ আবাল্য বুঝে আসছি যে অতিমানুষ রবীন্দ্রনাথ সুদ্ধ চিরায়ু নন, তবু একাশী বৎসরে তাঁর আমন্থর ভবলীলাসংবরণ অন্তত আমার কাছে যে-পরিমাণ আকস্মিক লেগেছে, সে-রকম অভিভাব আপাতত আধিদৈবিক সর্ব্বনাশেরই অনুবর্ত্তী।

* * *

অন্যপক্ষে চটুল বাক্যমুখর লোক-দেখানো শোকও দেখুন আশ্বিনের 'কবিতা'য় বুদ্ধদেব বসুর লেখায়।—

সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড়ো প্রতিভাই বা পৃথিবীতে কবে আর দেখা গিয়েছে। তাঁর কথা উঠলেই দান্তে শেক্সপিয়র গ্যোয়টে টলষ্টয়ের নাম আমাদের মুখে আসে; কিন্তু সত্যি বলতে তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর আর-কোনো লেখকেরই তুলনা হয় না। ...রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বতোমুখী প্রতিভা ইতিহাসে কখনো হয়নি এ-কথা আমরা প্রায়ই বলি, কিন্তু আসলে তাঁর প্রতিভা বুদ্ধের কি যীশুর অনুরূপ; যে-উদ্দাম প্রাণস্রোত মরলোকে নবজীবন ব'য়ে আনে সেই প্রাণ তাঁর।...

...আজকের দিনে স্বতন্ত্রভাবে তাঁকে স্মরণ করাও আমাদের পক্ষে অনর্থক, এমনকি হাস্যকর, কারণ আমাদের সমস্ত জীবনই তো তাঁর, তিনি না-থাকলে আমাদের অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত লোপ পায়, তাই তাঁকে হারিয়ে আজ যতই না শোকাকুল হই এ-কথা কিছুতেই মুখে আনতে পারবো না যে তিনি নেই। আমাদের প্রাণে যেখানে তিনি জ্বলছেন, সেখানে তিনি স্মৃতি নন, ইতিহাস নন, সেখানে তিনি জীবন্ত, তিনি মনোগোচর, এমনকি

ইন্দ্রিয়গম্য। তা যদি না হবে তাহ'লে আমরা বেঁচে থেকে সকল কাজকম ক'রে যাচ্ছি কেমন ক'রে?

* * *

এই ন্যাকামিই চরমে উঠিয়াছে শেষোক্ত লেখকের 'সব পেয়েছির দেশে' নামক সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই পুস্তকে ভদ্রলোক তাঁহার পরিবার শ্রীমতী মক্ষিরাণী(!)কে লইয়া যে পরিমাণ লেপ্‌টালেপ্‌টি কাণ্ড করিয়াছেন, তাঁহার বয়স জানা না থাকিলে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারিতাম, উক্ত মক্ষিরাণী ভদ্রলোকের চতুর্থ পক্ষ অথবা আরও বড়-কিছু। রবীন্দ্রনাথের কপাল ভাল, এই বিচিত্র বৌদ্ধ শ্রাদ্ধ তাঁহাকে দেখিয়া যাইতে হয় নাই।

—

বুদ্ধদেববাবু তাঁহার 'সব পেয়েছির দেশে' রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়া এমন কথা বলাইয়া লইয়াছেন, রায় বাহাদুরের ঘড়ির ইতিহাসের মত যাহা গোপন থাকিলে রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ প্রকাশ পাইতে এদেশে বিলম্ব হইত। রবীন্দ্রনাথের মহাভাগ্য যে, শেষজীবনে মক্ষিরাণীদের সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। তাঁহার কৈশোর ও যৌবনের ক্ষোভ বার্দ্ধক্যে মিটিয়াছিল বলিয়াই বসু মহাশয় লিখিতে পারিয়াছেন—

আমাদের বলছিলেন—'তোমরা জানো না—আমরা জন্ম নিয়েছিলুম স্ত্রীলোকহীন জগতে। বাংলার বিধাতাপুরুষ তখনো স্ত্রীলোক গড়েননি। সতীধর্মের কী দুর্দান্ত তেজ আমরা দেখেছি—কাছে যেতে সাহস হ'তো না। তখন কি ছাই জানতুম যে সে-ও মনে মনে আমাকেই চাইছে, ভাবছে লোকটা কাছে আসে না কেন, এলেই তো ভালো হয়।'

বুদ্ধদেববাবু আর একটু কল্পনাপ্রবণ এবং পুরাণজ্ঞ হইলে রবীন্দ্র-নাথের মুখ দিয়া স্ত্রীলোকহীন বাংলা দেশের ছদ্মবেশী পুরুষদের গর্ভে মুষল প্রসব ও ফলে বাঙালী বংশ ধ্বংসের গল্পও বলাইয়া লইতে পারিতেন। গল্পটা সত্য হইলেও যেন ভাল হইত।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন যে ভদ্রলোক, কার্ত্তিকের 'ভারতবর্ষে' "আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকণ্ঠ অথবা তাঁহার নিজের লম্বকর্ণ বিষয়ক কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। মেকুরকে যখন বিড়াল বলানো যাইবে না, তখন আমরা সে চেষ্টা করিব না। আমাদের বক্তব্য অন্য বিষয় লইয়া। তিনি লিখিয়াছেন—

কবির খাদ্য দেখিলাম, খুব সাদাসিধা, নিরামিষ। তাতে ঝাল বা মশলা নাই। তবে ফল ও মিষ্ট তাঁহার প্রিয় ছিল। আমাকেই তিনি ফলের রাজা বলিতেন।—পৃ. ৬১১

রবীন্দ্রনাথ যে কতবড় সংযমী পুরুষ ছিলেন, ইহা হইতেই উপলব্ধি হইবে। সেন মহাশয়কে 'ফলের রাজা' জানিয়াও তিনি কখনও খাইবার চেষ্টা করেন নাই। অবশ্য আমরা গুরুপরম্পরায় জানি ও ফল না খাইতে চেষ্টা করাই তাঁহার পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছে।

—

এবারে বন্দে আলী মিয়াকে দিয়াই শেষ করিব। রবীন্দ্র-সংখ্যা (ভাদ্র, ১৩৪৮) 'মাসিক মোহাম্মদী'তে তিনি "রবীন্দ্র সান্নিধ্যে" যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহা সত্যই মর্ম্মস্পর্শী। তিনি যে দরদী কবি, লেখাটির ছত্রে ছত্রে তাহার প্রমাণ পাইলাম। স্মরণ রাখিতে হইবে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্মরণ করিয়াই প্রবন্ধটি লিখিত

হইয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে গিয়াছিলেন শান্তিনিকেতনে, সেখানে কি দেখিলেন ?

দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে কোথাও তালগাছ—কোথাও বা খেজুরগাছ। এমনি একটা খেজুর বনের আড়ালে তালগাছের ছায়ায় একজন সাঁওতাল তরুণ একটী তরুণীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে হয়তো প্রেমালাপই করছে। আমাদের আগমনে তাদের নিভৃত কূজন গুঞ্জনে ব্যাঘাত হলো তা তাদের মুখ চোখ দেখে বোঝা গেল।—পৃ. ৭৮২

যে যেরূপটি চায়, সে সেরূপটি পায় বলিয়াই তো শান্তিনিকেতন। ভাগ্যবান বন্দে আলী। শান্তিনিকেতনে শুধু তালগাছ খেজুরগাছই আছে, বেতগাছ নাই !

—

স্থানাভাবে 'পুস্তক-পরিচয়'ও দেওয়া সম্ভব হইল না। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সেগুলি বাহির হইবে। আগামী সংখ্যা হইতে শ্রীমতী অমলা দেবীর সুবৃহৎ' উপন্যাস 'সরোজিনী' ধারাবাহিকভাবে বাহির হইবে। আগামী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী-লিখিত বীরবলের আত্মকথা এবং রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসরের জয়ন্তী-উৎসবে (২৫এ বৈশাখ, ১৩৩৮) প্রসিদ্ধ চৈনিক কবি ইউনের কাব্য-শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হইবে।

—

আমাদের নববর্ষে আমাদের গ্রাহক ও পাঠকবর্গকে নমস্কার নিবেদন করিতেছি।

আশা করি, তাঁহারা ভি. পি. ফেরত দিয়া আমাদের শ্রদ্ধাকে বিচলিত করিবেন না।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস। সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্য দাশগুপ্ত
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
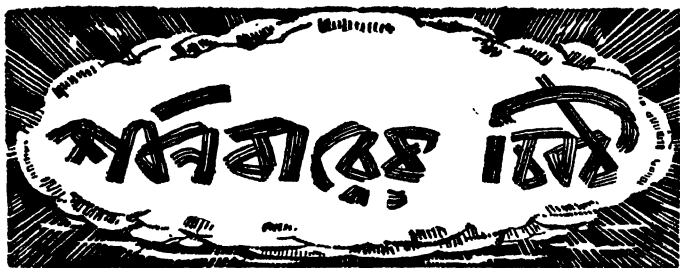
১৪শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ [২য় সংখ্যা

November, 1941.

মানস-সরোবর

সব ভুল, সব ভুল, যাহা কিছু জানিয়াছিলাম ;
সকল দিনের শেষে নাহি নামে রাত্রির আঁধার,
সকল রাত্রির শেষে জাগে না প্রভাত।
দিবসের উদয়াস্ত মানুষের মনের আকাশে,
কালের প্রবাহ চলে ধমনীর শোণিত-প্রবাহে।
লোল চর্ম্ম পক্ক কেশ—এই মহাকালের স্বরূপ—
স্তব্ধ জড় অন্ধকার, হিমে-জমা তমসার স্রোত
গতিহীন, তাই শব্দহীন।
নিশ্চল তুষার-স্তূপে বিন্দু বিন্দু বুদ্বুদের মত
লক্ষ লক্ষ যুগান্তের কোটি কোটি মানুষের প্রাণ
চিরদিন আছে বন্দী হয়ে।
রৌদ্রকরস্পর্শে কভু গলিবে না সে হিম-তুষার,
বন্দী প্রাণ মুক্ত নাহি হবে ;
অনন্ত তিমির-গর্ভে মানুষের অনন্ত বিশ্রাম।

এই মৃত্যু, এই পরিণাম।
সব ভুল, সব ভুল, যাহা কিছু জানিয়াছিলাম।

ক্লান্ত পক্ষ বিস্তারিয়া, রাজহংস পঁহুছিল শেষে
হিমাচল-পাদমূলে গাঢ়নীল মানসের তীরে।
হিমাচল—ধরণীর চিরন্তন অন্ধ সংস্কার,
যুগান্তের জড়ত্ব বিপুল।
তারই মাঝখানে রচা মানুষের কল্পনার চরম আশ্রয়
সুখস্বর্গ মানস-সাগর;
মনের অপূর্ব্ব সৃষ্টি তাই তো মানস-সরোবর।
ভগ্নপক্ষ রাজহংস পঁহুছিল মানসের তীরে।

মানস-সাগর—
সেখানে নীলের মাঝে জীবনের পরম ইঙ্গিত।
অসংখ্য উপলখণ্ড তীরে তীরে যায় গড়াগড়ি,
পায়ে পায়ে মৃতকল্প জীবনের উঠিছে ঝঙ্কার।
ধরণীর রাজহংস নভচারী হংস-বলাকায়
আসিছে মানস-তীর্থে অবিশ্রাম ডানা ঝাপটিয়া,
দীর্ঘ পথ পার হয়ে হেথা তার সুদীর্ঘ বিশ্রাম।

আমারো বিশ্রাম জানি এই নীল মানসের তীরে,
যে মানস আমারই মানসে;
মোর হিমাচল-মূলে স্তব্ধ শান্ত নীলাম্বু-সায়র—
আমি রচিয়াছি সেথা ক্লান্তপক্ষ বিহঙ্গের অন্তিম বিশ্রাম,
আপনি করেছি সৃষ্টি টলমল নীল নীর স্বচ্ছ সুশীতল,
অগাধ অতল জল, মোর তপ্ত জীবনের জ্বালা-অবসান।

পাখী এল কুলায়ে আপন,
নামিছে অনন্ত রাত্রি আলো-ঝলা ছাইয়া আকাশ,
নামিছে অনন্ত অন্ধকার।
দেখিতে পাই না চোখে ভগ্ন জীর্ণ আপনার পাখা,
শুনিতে না পাই কানে দিবারৌদ্র-ক্ষুধাতুর শাবকের
ব্যাকুল কাকলী।
বহু দূর নদীতীরে সায়াহ্নের শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে
বিদীর্ণ মন্দিরে,
দেবতার শেষ-পূজা হ'ল সমাপন—
বাতাসে তরল হয়ে তারই রেশ পশিতেছে কানে।
প্রান্তরে প্রাঙ্গণে হোথা তুলসীর বেদীমূলে সন্ধ্যাদীপ
হইয়াছে জ্বালা,
মানসের অন্ধকারে তারই দীপ্তি সারি সারি
জ্বলিতেছে খদ্যোত-শোভায়।

রাজহংস, করিও না ভয়।
অদূরে কৈলাস-চূড়ে পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদ হানিতেছে
ব্যথিত চুম্বন।
তোমার সকল আশা, যুগান্ত কামনা তব
শোভিতেছে বিশীর্ণ সুন্দর,
তুষার-স্ফটিক-দীপ্তি হাসিতেছে অন্ধকারে
মৃত্যু-ম্লান হাসি।
রাজহংস, করিও না ভয়—
দীর্ঘ পথ হ'ল শেষ, হের কাঁপিতেছে ওই—
কাঁপিতেছে মনোহর নীল-অম্বু মানস-সাগর।

বাংলা বুলি

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার তাঁহার 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' পুস্তকের শেষ প্রবন্ধ "আধুনিক সাহিত্যের ভাষা"য় লিখিয়াছেন—

বাংলা গদ্য-সরস্বতীর এক চরণ প্রাকৃত-বাংলার কলধ্বনিমুখর রাজহংসীর উপর, এবং অপর চরণ সাধুভাষার সুসংস্কৃত, গাঢ়বন্ধ, শুচি-শ্রী ও সৌরভময় সহস্রদল পদ্মের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। যেদিন হইতে ভাষার এই দুই বিপরীত স্বভাবের সমন্বয় ঘটিয়াছে সেইদিন হইতেই বাংলা গদ্য আপন প্রাণধর্ম্মে সঞ্জীবিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ও শক্তি লাভ করিয়াছে; তাহার সংস্কৃত জাতি ও প্রাকৃত গোত্র, দুইয়ের ধর্ম্মই বজায় রাখিয়া একাধারে সংযম ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত পদপদ্ধতির কাঠামোখানাই তাহার জাতি-কুল রক্ষা করিয়াছে; পণ্ডিতের ঘরে ভূমিষ্ঠ না হইলে তাহার যে কি দশা হইত, তাহা আজিকার স্বেচ্ছাচারদৃষ্টে অনুমান করা দুরূহ নয়। সেই বাগ্‌-বৈভব ও বাক্‌-পদ্ধতির আশ্রয় পাইয়াই প্রাকৃত বাংলার শ্রীহীন অথচ জীবন্ত বচনরাশি ভাব-অর্থ ও রসের আধার হইয়া উঠিল। বাংলা গদ্যের সেই সাধুরীতিই উত্তরোত্তর কথ্য-বাংলার বচনরাশিকে আত্মসাৎ করিয়া রবীন্দ্রনাথের যুগে এমন সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম হইয়া উঠিয়াছে।

"প্রাকৃত বাংলার শ্রীহীন অথচ জীবন্ত বচনরাশি"—এই বাক্যাংশের দ্বারা মজুমদার মহাশয় ইংরেজী 'ইডিয়ম' কথাটি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। বাংলা ভাষায় ইহার সমার্থবাচক কোনও একটি শব্দ চলিত নাই। মোহিতলালই উক্ত প্রবন্ধে "খাঁটি বাংলা বুলি" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় ইডিয়ম লইয়া এখন পর্য্যন্ত বিশেষ আলোচনা হয় নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয়, ভাষা এবং শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা এখনও সজাগ নহি। ইডিয়ম বা বুলি ভাষার আসল প্রাণশক্তি—ভাষার অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। ভোকেবুলরি বা শব্দকোষ যেমন ভাষার সম্পদ, ইডিয়ম বা বুলি তেমনই এই শব্দ-সম্পদকে ধারণ করিয়া থাকে। শব্দকোষ প্রায় সমস্ত সুধীস্বীকৃত ভাষায় সমান; সমার্থক বা ভিন্নার্থক শব্দ পরিভাষার সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া লওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ইডিয়ম বা বুলি কেহ তৈয়ারি করিতে পারে না; ভাষার জীবনধারা হইতে, বহু যুগের সংস্কার বা প্রয়োগ হইতে অর্থাৎ ভাষার নিজস্ব বনিয়াদ হইতেই ইহা আপনি

গড়িয়া উঠে। প্রত্যেক ইডিয়ম বা বুলির পিছনে বড় বা ছোট এক একটি ইতিহাস গোপন থাকে। ইহার উদ্ভব আকস্মিক নয় এবং অভিধানের আশ্রয়ে মুখ গুঁজিয়া থাকিয়া কোনও বুলি ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করে না। বুলির প্রচার মুখে মুখে; ইহার ঐশ্বর্য্য ও শক্তি প্রয়োগের মধ্যে। বুলির প্রয়োগ হইতেই এক ভাষা হইতে অন্য ভাষার মূল পার্থক্য ধরা যায়। ইংরেজীতে খাঁটি ইডিয়মের এবং ইডিয়মের সুষ্ঠু প্রয়োগের অসংখ্য বই আছে; বড় বড় অভিধানও আছে। কোনও লেখকের ইডিয়ম ভুল হইলেই ছাপার অক্ষরে প্রয়োগের নজির দেখাইয়া তাহার ভুল সংশোধন করা হয়। রবার্ট ব্রিজেস প্রমুখ ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান কবি-সাহিত্যিকেরাও এই শব্দ ও ইডিয়ম ভুলের বিরুদ্ধে রীতিমত অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমরা এখনও এ বিষয়ে নিরঙ্কুশ। বাংলা ভাষায় যতদিন পর্য্যন্ত যাবতীয় ইডিয়ম বা বুলি কোনও প্রামাণিক অভিধানে সঙ্কলিত না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত বিফল ও ভুল ইডিয়ম প্রয়োগের দুঃখ আমাদের সহিতে হইবে।

বাংলা সাহিত্যে লিখিত ভাষার দুই রূপ। অনেক কাল হইতেই এই দ্বৈতবাদ আমাদের ভাষায় চলিয়া আসিতেছে; 'সবুজ পত্রে'র যুগেই "চল্‌তি ভাষা"র জন্ম নয়। বঙ্কিমের আমলের 'বঙ্গদর্শনে'ও এই দুই রীতির দ্বন্দ্ব দেখিয়াছি। তিনি স্বয়ং ১২৮৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' এই দ্বন্দ্বের নিরসন-চেষ্টা করিয়া শেষে বলিয়াছেন—

> বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা।... প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়।...যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে।...বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য, ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।

ভাষার প্রয়োগ বিষয়ে ইহা একেবারে আধুনিকতম মত। যাঁহাদের বিশ্বাস 'সবুজ পত্র' হইতেই বাংলা ভাষা একটা মোড় ফিরিয়াছে, তাঁহারা জানেন না বঙ্কিমচন্দ্র সেই কালেই বলিয়াছিলেন—

…রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী।

যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র "হুতোমি" বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারই ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন সিংহ সেকালের বাংলা ভাষার অনাচার সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন—

আজকাল বাঙ্গালি ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েচে। বেওয়ারিস লুচির ময়দা বা তৈরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্ম্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তৈরি করে খেলা করে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙ্গালি ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন…

অর্থাৎ 'সবুজ পত্রে'র আবির্ভাবের পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে ভাষা লইয়া "যা মনে যায় করা"র বিরুদ্ধে হুতোম নালিশ জানাইয়াছিলেন; বাংলা সাহিত্যে নূতন ঢঙ মোটেই আকস্মিক ও অভাবনীয় নয়। এমন কি, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের একটি পত্রেও আমরা দেখিতে পাই—

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্ত রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁরা "লোকহিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর?—'ভাব্‌বার কথা'

আমরা দেখিতে পাইতেছি, বাংলা সাহিত্যে এই চলিত ভাষার প্রয়োগ আদিকাল হইতেই আছে। বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা নয়; এই ভাষা প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা।

বাংলা ভাষায় শত-করা পঁচাশিটি শব্দই সংস্কৃত ভাষার তৎসম বা তৎভব শব্দ হইলেও * দুই ভাষার প্রাণধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাংলা ভাষা যখন সবে গড়িয়া উঠিতেছে, তখন হইতেই অর্থাৎ বৌদ্ধগান ও দোহা এবং ডাক ও খনার বচন হইতেই বাংলা পদ্যে এই সংস্কৃতেতর প্রাকৃত প্রাণধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে; সংস্কৃতের চাপে বাংলা বুলি ব্যাহত হয় নাই। বাংলা ভাষার এই নিজস্ব প্রাণশক্তির প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই চণ্ডীদাসের পদাবলীতে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে, কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে এবং চরমতম বিকাশ দেখি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরে, হরু ঠাকুর, রাম বসু, গোঁজলা গুঁই, শ্রীধর কথক প্রভৃতি কবির কবিগানে, দাশুরায়ের পাঁচালি এবং ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীতে। রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা'য় এবং পরবর্ত্তী অনেক কাব্যে খাঁটি বাংলা বুলিকে আশ্রয় করিয়াই অনন্যসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যই ছিল এই বাংলা বুলি। আদর্শ নিখুঁত এবং অটুট থাকাতে বাংলা কাব্যে ভাষার দ্বৈতবাদ মোটেই ক্ষতির কারণ হইতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও 'বঙ্গদর্শনে' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫) লিখিয়াছিলেন—

আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইত এখনও হইতেছে। বোধ হয়, আজিকালি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পদ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে…

কিন্তু বাংলা গদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। ইহা অর্ব্বাচীন, মাত্র সেদিন ইহার জাতসংস্কার হইয়াছে এবং সূত্রপাত হইতেই সংস্কৃত ও প্রাকৃতের দ্বন্দ্ব বাংলা গদ্যে দেখা যাইতেছে। ভাষা-বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে,

যাঁহারা সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পদ্যাপেক্ষা গদ্য শ্রেষ্ঠ, এবং সভ্যতার উন্নতিপক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কার্য্যকরী।

সুতরাং গদ্যের সমস্যাই ভাষার আসল সমস্যা। পদ্যে কোনও বিরোধ নাই—এই যুক্তিতে এই সমস্যাকে এড়াইয়া যাওয়া চলিবে না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে আমরা বাংলা গদ্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী বলিয়া জানি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় অগাধ পণ্ডিত হইয়াও নিজের রচনায় প্রাকৃত রীতিকে বর্জ্জন তো করেনই নাই, বরঞ্চ তাঁহার 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় এই

* উইলিয়ম কেরী, অভিধানের ভূমিকা।

রীতিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। বাংলা বুলির প্রয়োগ তখন হইতেই সমানে চলিতেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের পর গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এক দিকে যেমন বাংলা বুলির সহায়তায় সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংস্কৃত রীতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এই দ্বন্দ্ব চরমে উঠে উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে, এবং রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র 'মাসিক পত্রিকা'য় বিদ্যাসাগরী রীতির বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্বতন্ত্র দল গঠন করিতে বাধ্য হন। কালীপ্রসন্ন সিংহ এক দিকে মহাভারতে এবং অন্য দিকে তাঁহার হুতোমী নকৃশায়—দুই দলেই সমান দক্ষতার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই দুই দলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে একটা নিজস্ব দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত-হিমালয় হইতে তিনিই ভগীরথের মত আধুনিক ভাষা-গঙ্গার পথ কাটিয়া তাহাকে সাগর-সঙ্গমে আনিয়াছেন।

আধুনিক বাংলা ভাষায় ইডিয়ম বা বুলির মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসাধারণ কীর্ত্তির কথা ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগী কয়েকজন পণ্ডিতের বামহস্তের লিপিকৌশলে বাংলা গদ্যের জন্ম; সংস্কৃত রীতিই প্রথম হইতে বাংলা ভাষাকেও বন্ধন করিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির অবকাশ এই পণ্ডিতেরাই রাখিয়াছিলেন। নিতান্ত দয়া করিয়া সুবিশাল সংস্কৃত-সৌধের খিড়কি-দ্বারে প্রাকৃত বাংলার খ'ড়ো কুটীরখানিও ইঁহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সংসারযাত্রায় এই কুড়েঘরখানির একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিলেন। তিনি দেখাইলেন, মূল সংস্কৃতের কাঠামোটি বাহিরে বজায় রাখিয়া খাঁটি বাংলা বুলির সাহায্যে "কোকিলকলালাপ বাচাল"তাকেও 'কপালকুণ্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'দেবী চৌধুরাণী'র বাহন করা চলিতে পারে; তিনি দেখাইলেন, সত্যকার সাহিত্যিক ভাষা গঠনে খাঁটি বাংলা বুলির ব্যবহার অপরিহার্য্য, এমন কি, প্রাকৃতের দিকেই তাঁহার প্রবণতার পরিচয়ও পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর,

শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রেরই পরবর্ত্তী সাধক। এই রীতির অনুসরণে পূর্ব্বে শ্রীহট্ট, দক্ষিণে চট্টগ্রাম, উত্তরে জলপাইগুড়ি ও পশ্চিমে বীরভূম—কোনও অঞ্চলের লেখককেই বেগ পাইতে হয় নাই। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সকলেই সমান দক্ষতার সহিত এই রীতি অনুসরণে সক্ষম হইলেন। খাঁটি বাংলা বুলি-জ্ঞানের অভাবও এই রীতিতে ঢাকিয়া লওয়া চলিল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তথাকথিত চলিত ভাষা বা প্রাদেশিক ভাষা প্রয়োগের আন্দোলনে প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হইল। তখন হইতেই বুলি-বিভ্রাট দেখা দিল। যাঁহারা খাঁটি বুলির এবং চলতি ভাষার প্রবর্ত্তক বা সমর্থক ছিলেন, তাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে এই ভাষার আদর্শ—কলিকাতার ভাষার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পাছে গোলযোগ বাধে, এই কারণে স্বামী বিবেকানন্দ বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই লিখিয়াছিলেন—

যদি বল ওকথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ ক'রবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে প'ড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ এক কল্‌কেতার ভাষা। পূর্ব্বপশ্চিম, যেদিক্ হ'তেই আসুক না, একবার কল্‌কেতার হাওয়া খেলেই দেখ্‌ছি, সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখ্‌তে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব্বপশ্চিমি ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হ'তে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ কল্‌কেতার ভাষাই চ'লবে। —'ভাববার কথা'

ইহা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কথা; ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেও রবীন্দ্রনাথ গোলযোগের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন, তাই 'সবুজ পত্রে' (১৩২৩ সাল) বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—

যাঁরা প্রতিবাদী তাঁরা এই বলিয়া তর্ক করেন যে, বাংলায় চলিত ভাষা নানা জিলায় নানা ছাঁচের, তবে কি বিদ্রোহীর দল একটা অরাজকতা ঘটাইবার চেষ্টায় আছে! ইহার উত্তর এই যে, যে-যেমন খুসি আপন প্রাদেশিক ভাষায় পুঁথি লিখিবে, চলিত ভাষায় লিখিবার এমন অর্থ নয়। প্রথমত খুসিরও একটা কারণ থাকা চাই। কলিকাতার উপর রাগ করিয়া বীরভূমের লোক বীরভূমের প্রাদেশিক ভাষায় আপন বই লিখিবে এমন খুসিটাই তার স্বভাবত

হইবে না। কোনো একজন পাগলের তা হইতেও পারে কিন্তু পনেরো আনার তা হইবে না। দিকে দিকে বৃষ্টির বর্ষণ হয় কিন্তু জমির ঢাল অনুসারে একটা বিশেষ জায়গায় তার জলাশয় তৈয়ি হইয়া উঠে। ভাষারও সেই দশা। স্বাভাবিক কারণেই কলিকাতা অঞ্চলে একটা ভাষা জমিয়া উঠিয়াছে তাহা বাংলার সকল দেশের ভাষা।

একজন সংস্কারক ও একজন কবির মতের মূল্য আছে, কিন্তু ভাষা সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিকের নজিরই সর্ব্বাগ্রে দেয়। পণ্ডিত শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত এ বিষয়ে সুস্পষ্ট। তাঁহার 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে'র ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে, ভাগীরথী নদীর তীরবর্ত্তী স্থানের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা, সমগ্র বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ মৌখিক ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপ নগরী বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্র-স্থান ছিল বলিয়া, এবং কলিকাতা নগরী বঙ্গদেশের (এবং ১৯১২ সালের শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের) রাজধানী থাকায় ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শিক্ষার ও মানসিক উৎকর্ষের কেন্দ্র হওয়ায়, এইরূপ ঘটিয়াছে। এই মৌখিক ভাষাকে বিশেষ-ভাবে চলিত-ভাষা বা চল্‌তি ভাষা বলা হয়; এবং অধুনা সাহিত্যে সাধু-ভাষার পার্শ্বে, এই মৌখিক বা চলিত ভাষার আধারের উপরে স্থাপিত আর একটি সাহিত্যিক ভাষা বিশেষ স্থান পাইয়াছে; সেই নূতন সাহিত্যিক ভাষাকেও চলিত-ভাষা বলা হয়।

আসলে সাহিত্যিক চলিত ভাষা ঠিক রাজধানীর বা কলিকাতার ভাষা নয়—ইহা "দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে, ভাগীরথী নদীর তীরবর্ত্তী স্থানের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত মৌখিক···ভাষার আধারের উপরে স্থাপিত" ভাষা। বাংলা দেশের আধুনিক লেখকেরা যখন চলিত ভাষার এই সংজ্ঞা পাইলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ভাগীরথী নদীর তীরবর্ত্তী স্থানের ভদ্র ও শিক্ষিত বাসিন্দা না হইয়াও যখন কেহ কেহ চলিত ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে বসিলেন, তখন তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য ছিল, এই মৌখিক ভাষাকে আয়ত্ত করা অর্থাৎ ইহার ইডিয়ম বা বুলি আয়ত্ত করা। এই অধিকার অভিধান মুখস্থ করিয়া জন্মায় না, গায়ের জোরেও এই অধিকার মেলে না। এই কাজে সাধনা আবশ্যক। যাহাদের ভিতরে সাহিত্য-সৃষ্টির তাগিদ আছে, অথচ ভাষা বিষয়ে সাধনার জোর নাই, মফস্বল হইতে আগত সেই সকল সাহিত্যিক

পূরা সংস্কৃত রীতির অনুবর্ত্তন করিলে বিপন্ন হইতেন না। কিন্তু আধুনিকতার মোহে যখন তাঁহারা রাজধানীর মৌখিক ভাষাকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া চলতি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে চাহিলেন, তখনই ইডিয়ম বা বুলির অরাজকতা দেখা দিল, এই বুলি-বিভ্রাটের কারণটি স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্যই এই প্রসঙ্গে চলিত ভাষা সম্বন্ধে এতখানি আলোচনা করিতে হইল।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী রীতি পরিত্যাগ করিয়া 'সবুজ পত্রে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবলের আদর্শে বা অনুপ্রেরণায় চলতি ভাষাকে লেখ্য ভাষার একমাত্র অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সংস্কৃতের পাথুরে মাটিতে যে বাংলা ইডিয়মের কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি বা বিকাশের সম্ভাবনা ছিল না, চলতি বাংলার সহজ এবং দেশজ উর্ব্বরতায় তাহাই ফলে ফুলে বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিল। অর্থাৎ বাংলা ভাষা সংস্কৃতের কঠিন নিগড় হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি চাহিল।

কিন্তু সকল বাঁধভাঙা মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বেনো জলের মত অনাচারের অবাধপ্রবেশও সহ্য করিতে হয়। যেখানে দ্বৈতবাদ ছিল, সেখানে বহুবাদ দেখা দিল। অজ্ঞতা এবং অক্ষমতাকেই অনেকে অতি-আধুনিকত্ব বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। বাহবা দিবার লোকেরও অভাব হইল না। কারণ, একটি নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের মৌখিক ভাষাকে একমাত্র আদর্শ বলিয়া খাড়া করিলে প্রাদেশিক দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য। বাংলা দেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে এমন অনেক লেখক আবির্ভূত হইলেন, যাঁহারা দম্ভবশতই বুলির অজ্ঞতাকে মূলধন করিয়া বিচিত্র ভাষায় গল্প-উপন্যাস-কবিতা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন; খাওন, যাওন প্রভৃতি gerund-এর প্রয়োগে কি মারাত্মক কাণ্ড ঘটিয়াছিল, কাহারও কাহারও তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। ভাষার রাজ্যে সেইদিনকার ভয়াবহ অরাজকতা আজ স্মরণীয়। নিজের নিত্য এবং সহজ ব্যবহারের বস্তু লইয়া সৃষ্টির খেলা চলে, কিন্তু যাহা পরিশ্রম করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে না আসিলে তাহা দিয়া অনাসৃষ্টি ঘটানো যায়, কিছু সৃষ্টি করা চলে না। বস্তুত, সেই গোলযোগের মধ্যে, বিপাকের বিভীষিকায় এই জাতীয় লেখকেরা কিছু

সৃষ্টি করিতে পারেনও নাই। মসী ও লেখনীর অতখানি বিপুল উদ্যম সম্পূর্ণ বিফলে গিয়াছে।

এই বুলি-বিভ্রাট-রূপ অনাচারের বিরুদ্ধাচরণ কেহ কেহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন কৌশলে তাঁহাদিগকে "মৃত" "বস্তাপচা" সংস্কৃত রীতির সমর্থক—সুতরাং গোঁড়া বলিয়া উপেক্ষা করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত বাংলার পক্ষে যুক্তি দিয়াছিলেন—

বাংলাকে সংস্কৃতের সন্তান বলিয়াই যদি মানিতে হয় তবে সেই সঙ্গে একথাও মানা চাই যে তার ষোলো বছর পার হইয়াছে, এখন আর শাসন চলিবে না, এখন মিত্রতার দিন। কিন্তু যতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্যসীমানা পাকা হইতে পারিবে না। ততদিন সংস্কৃত বৈয়াকরণের বর্গির দল আমাদের লেখকদের ত্রস্ত করিয়া রাখিবেন।

এই সকল লেখক রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তিই সেদিন, যাঁহারা ভাষা ও ইডিয়মের বিশুদ্ধি রক্ষায় যত্নবান ছিলেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আসলে এই লড়ালড়ির মধ্যে প্রাদেশিক মনোবৃত্তিই প্রকট হইয়াছিল এবং মফস্বলের একদল লেখক রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্য্যন্ত লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—

স্বভাবতই এই ভাষার ভূমিকা দক্ষিণ বাংলার ভাষায়। এইটুকু নম্রভাবে স্বীকার করিয়া না লওয়া সদ্বিবেচনার কাজ নহে। ঢাকাতেই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চয়ই ঢাকার লোক-ভাষার উপর আমাদের সাধারণ ভাষার পত্তন হইত এবং তা লইয়া দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা যদি মুখ বাঁকা করিত তবে সে বক্রতা আপনিই সিধা হইয়া যাইত, মানভঞ্জনের জন্ম অধিক সাধাসাধি করিতে হইত না।

অন্য পক্ষকেও রবীন্দ্রনাথ সেদিন আশ্বাস দিয়াছিলেন—

হিন্দুস্থানীতে একটা কথা আছে "পয়লা সামাল্ না মুস্কিল হুয়।" স্বয়ং বিধাতাও মানুষ গড়িবার গোড়ায় বানর গড়িয়াছেন, এখনও তাঁর সেই আদিম সৃষ্টির অভ্যাস লোকালয়ে সদাসর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরাও সাহিত্যে সেই আদিম সৃষ্টির অভ্যাস দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলাম। দূর হইতে রাজধানীতে আগত লেখকেরা অশিক্ষা এবং অর্দ্ধশিক্ষার দরুন খাঁটি বাংলার ইডিয়ম বা বুলি লইয়া নিদারুণ লণ্ডভণ্ড শুরু করিয়া দিলেন। দুঃখের বিষয়, সেই আদিম অভ্যাসের

ছোঁয়াচ লাগিতে লাগিল খাঁটি রাজধানী-অঞ্চলের লেখকদেরও কলমে। ফলে ভুল এবং বিফল ইডিয়মে আধুনিক বাংলা ভাষা কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ইহার সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যে কোনও দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে এরূপ ভুল বুলি-প্রয়োগের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই। গদ্যে "সঙ্গে" বা "সহিতে"র স্থলে "সাথে", "প্রাণপণ চেষ্টা"র স্থলে "আপ্রাণ চেষ্টা", "চুল উস্কখুস্ক" স্থলে "চুল হেস্তনেস্ত", "ঝাড়পোঁছ" স্থলে "ঝাড়ফুঁক", "দোকান করা" স্থলে "দোকান দেওয়া"—এসব তো আমরা হামেশাই দেখিতে পাইতেছি। এগুলি যে সত্যই অপপ্রয়োগ, বহুলপ্রচারের ফলে সেই কথাই আজকাল অনেকের মনে হয় না। অনেকে তর্ক করিতে বসেন। ব্যাকরণের যুক্তি দিয়া ইডিয়ম বুঝানো যায় না, ইহাই অসুবিধা। দোকান, খাবার, জুতা, ঔষধ ইত্যাদির নামকরণেও ইডিয়ম-জ্ঞানের অভাবে নানা কৌতুককর বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। কলিকাতা-অঞ্চলে এক জাতীয় মিষ্টান্নের নাম দেওয়া হইয়াছে "মনোহরা"; জনাইয়ের "মনোহরা" বিখ্যাত। ঢাকা অঞ্চলে সুতরাং এক জাতীয় সন্দেশের নাম দেওয়া হইয়াছে "প্রাণহরা"। এই "প্রাণহরা" যাঁহারা হজম করেন, তাঁহাদের বীরত্বের তারিফ করিতেই হয়।

ইডিয়ম বস্তুটি ঠিক কি, তাহা বুঝাইতে অধ্যাপক সুনীতিকুমারের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

> চলিত ভাষা কিন্তু ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী স্থান সমূহের মৌখিক ভাষার রূপান্তর বলিয়া ইহার সহিত ঐ অঞ্চলের একটি বিশেষ যোগ আছে—সে-রূপ যোগ অন্য অঞ্চলের মৌখিক ভাষার সহিত ততটা নাই। ইহাতে ব্যবহৃত প্রাদেশিক শব্দাবলী, ইহার চটুলগতি, ইহার বিশিষ্ট বাক্য-ভঙ্গী—সমস্তই জীবন্ত; সুতরাং লেখায় ও কথোপকথনে ভালরূপে এই ভাষার প্রয়োগ করা, বাঙ্গালা দেশের অন্য অঞ্চলের লোকের পক্ষে অনেক সময়ে শিক্ষা-সাপেক্ষ হইয়া থাকে।…ভাগীরথী তীরের মৌখিক ভাষার ব্যাকরণসম্মত ও বাক্য-ভঙ্গীর অনুমোদিত চলিত-ভাষা প্রয়োগ করা উচিত।

সুনীতিবাবু "বিশিষ্ট বাক্য-ভঙ্গী" এবং "বাক্য-ভঙ্গীর অনুমোদিত

চলিত-ভাষা" বলিতে ইডিয়মকেই বুঝাইয়াছেন। ডক্টর মহম্মদ শহী-দুল্লাহ সাহেবের মতে ইডিয়ম অর্থে "শব্দ এবং বাক্যাংশের বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ।" দৃষ্টান্ত দিতেছি। "মুখ" শব্দটির অভিধান-সম্মত অর্থ আমরা জানি। কিন্তু বুলি-সম্মত প্রয়োগে এই "মুখে"রই অর্থ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার মত। যথা, (১) লোকটা ভারী মুখফোড় (২) আমি বড় মুখ ক'রে চেয়েছিলাম (৩) ভগবান কবে মুখ তুলে চাইবেন (৪) এখানে মুখ খারাপ ক'র না (৫) লোকের কাছে আমার মুখ রইল না (৬) বউটা শাশুড়ীকে মুখ করে (৭) তোমার মুখনাড়া স'য়ে এ বাড়িতে থাকব না (৮) মুখখিস্তি করা (৯) লোকটা মুখ ছুটিয়েছে হে (১০) তোমার মুখ-ঝামটা আর সহিতে পারি না (১১) খাওয়ার পর একটু মুখশুদ্ধি চাই (১২) ছেলেটা মুখ-সর্ব্বস্ব (১৩) ছেলেটা মুখচোরা (১৪) কারও মুখ চেয়ে ব'সে থেকো না (১৫) বড্ড দেরি হচ্ছে, মুখ চালাও হে (১৬) মেয়ের মুখে খই ফুটছে (১৭) এর পর তুই মুখ দেখাবি কি ক'রে (১৮) মুখ লাগা ওল।

এ ছাড়া, মুখ-উজ্জ্বল, মুখ-চুন, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, মুখ বুজে সহ্য করা, মুখ পোড়া, মুখে আগুন, মুখ-মিষ্টি, মিষ্টি-মুখ, মুখ-রক্ষা, মুখপাত, মুখপত্র, মুখ টিপে হাসা, মুখ ফেরানো, থোঁতা মুখ ভোঁতা, মুখে মুখে জবাব, মুখের ওপর কথা, তোমার বড় মুখ, ফোড়ার মুখ আনা, মুখ আলগা, ঘাটার মুখ এসেছে, মুখ খাওয়া, মুখ খিঁচনো, মুখ গোঁজ করা, মুখ চুলকানি, মুখছোপ, মুখ তাকানো, মুখ তাড়া, মুখদেখানি (দর্শনী), মুখপাত্র, মুখ ফসকানো, এই যে মুখ ফুটেছে, মুখভঙ্গি, মুখ ভেঙানো, মুখ মেরে দেওয়া, মুখ-সাপট, মুখ সেলাই, ফোড়ার মুখ হওয়া, মুখে জল আসা, মুখে জল দেওয়া, একটু কিছু মুখে দাও, মুখে ফুলচন্দন পড়া, মুখে চোপা করা, মুখের কথা, মুখের মত—প্রভৃতি এক 'মুখে'র প্রয়োগের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এই প্রয়োগগুলি একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, বাংলা ভাষার প্রাণশক্তি কোথায়। অভিধানগত অর্থে শব্দের প্রয়োগ আমরা অল্পই করিয়া থাকি। ইডিয়ম বা বুলির দিকেই আমাদের ঝোঁক বেশি। 'মুখে'র মত হাত, মাথা, পাকা, তোলা, ধরা, লাগা প্রভৃতি

বহু বিশেষ্য ও ক্রিয়া পদের বিচিত্র প্রয়োগ দেখাইয়া আমাদের কথা প্রমাণ করা যায়।

জোড়া শব্দ বাংলা বুলির বিশেষত্ব। এ শব্দগুলিও অভিধান বহির্ভূত, কিন্তু প্রয়োগের জোরে এগুলির প্রকাশক্ষমতা অসাধারণ। কালামুখী, পাটাবুকী, ছারকপালী, থ্যাবড়ানাকী, বাপসোহাগী, গতর-খাকী, ছিঁচকাঁদুনী, কোলপোঁছা, নেই-আঁকুড়ে, থলে-ঝাড়া, ঘুমকাতুরে, উড়নচণ্ডী, বউ-কাঁটকী, দেখনহাসি, বুক-জুড়ানো, হাড়-জ্বালানো প্রভৃতিতেও বাংলা বুলির বিশেষত্ব ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শব্দতত্ত্বে'র "ভাষার ইঙ্গিত" প্রবন্ধে উস্‌খুস্‌, উস্কোখুস্কো, নজ্‌গজ্‌, নিশ্‌পিশ, আইঢাই, কাঁচুমাচু প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

এই কথাগুলির অধিকাংশই আগাগোড়া অনির্দ্দিষ্টভাব প্রকাশ করে। হাত পা চোখ মুখ কাপড়চোপড় লইয়া ছোটখাটো কত কী করাকে যে উস্‌খুস্‌ করা বলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে হতাশ হইতে হয়। কী কী বিশেষ কার্য্য করাকে যে আইঢাই করা বলে তাহা আমাদের মধ্যে কে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারেন? কাঁচুমাচু করা কাহাকে বলে তাহা আমরা বেশ জানি, কিন্তু কাঁচুমাচু করার প্রক্রিয়াটি যে কী তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিবার ভার লইতে পারি না।

কিন্তু এই ভার লইবার সময় আসিয়াছে। স্থানান্তরের লোককে বুলির যথাযথ প্রয়োগ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না করিলে আমাদিগকে পুনরায় সাধুভাষায় ফিরিয়া যাইবার আন্দোলন চালাইতে হইবে। যাহা স্বভাবধর্ম্মে আসিয়াছে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কিছু পরিশ্রম করিতেই হয়। বুলির অভিধান প্রকাশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কাজ। তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি।

আর একটি কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। অনেকে প্রবাদকে বুলি বলিয়া ভুল করেন। শব্দ যেমন বুলি নয়, প্রবাদও তেমনই বুলি নয়, স্বতন্ত্র পদার্থ। বাংলা প্রবাদের একটি অভিধান অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। নানা প্রবাদের মধ্যে বহু বুলি আত্মগোপন করিয়া আছে, এগুলিকেও খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক। সাহিত্যিক ভাষা প্রয়োগ

করিতে হইলে বুলি ও প্রবাদের শিষ্ট ব্যবহার জানা একান্ত আবশ্যক। দাকুমড়া সম্বন্ধ, সোনার চাঁদ, মাথা খাওয়া, গোল্লায় যাওয়া, চোখের মাথা খাওয়া, খইয়ে বন্ধন, ঘোড়ার ডিম, মাণিকজোড়, অরণ্যে রোদন, কলুর বলদ, চিনির বলদ, বকধার্ম্মিক, গোঁয়ারগোবিন্দ, এলাহি কাণ্ড, নরকগুলজার, ধনুকভাঙা পণ, পোওয়া-বারো, অন্ধের নড়ি প্রভৃতি বলিতে আমরা কি বুঝি এবং কেন বুঝি, তাহা ছাপার অক্ষরে কোথাও লিপিবদ্ধ না থাকিলে শিক্ষার্থীদের ভুল হইবেই, এবং যতকাল একটা পাকা ব্যবস্থা না হইবে, ততদিন সাথে, টইটম্বুর, ফিন্‌কি, ফিনিক, মাথাবকা প্রভৃতি বহু শব্দ ও বুলির ভুল ব্যবহারে আমরা পীড়িত হইতে থাকিব। এক ভাঁড় দুধে এক ফোঁটা গোমূত্রের মত এক একটি ভুল বুলির প্রয়োগে যে সমুদয় রচনা নষ্ট হইয়া যায়, বাংলা দেশের লেখকদের সর্ব্বাগ্রে সেই জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। ইডিয়ম বা বুলির চর্চ্চা বিজ্ঞান-সম্মতভাবে হইবার সময় আসিয়াছে।

পরিশেষে, রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি সকলকে স্মরণ রাখিতে বলি—

প্রতিদিনের যে-ভাষার খাদে আমাদের জীবন-স্রোত বহিতে থাকে, সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে যত দূরে পড়ে ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে। চির-প্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইলে তাহাকে একদিকে সাধারণ, আর একদিকে বিশিষ্ট হইতে হইবে। সাহিত্যের বিশিষ্টতা তার সাধারণতাকে যখন ছাড়িয়া চলে তখন তার বিলাসিতা তার শক্তি ক্ষয় করে। সকল দেশের সাহিত্যেরই সেই বিপদ। সকল দেশেই বিশিষ্টতার বিলাসে ক্ষণে ক্ষণে সাহিত্য কৃত্রিমতার বন্ধ্যদশায় গিয়া উত্তীর্ণ হয়। তখন তাহাকে আবার কুল রক্ষার লোভ ছাড়িয়া প্রাণরক্ষার দিকে ঝোঁক দিতে হয়। সেই প্রাণের খোরাক কোথায়? সাধারণের ভাষার মধ্যে, যেখানে বিশ্বের প্রাণ আপনাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকাশ করিতেছে।

এই কৃত্রিমতা আমাদের ভাষাতেও দেখা দিয়াছে, সুতরাং সাধারণের ভাষার মধ্য হইতে, প্রচলিত বুলি হইতে আবার নূতন করিয়া শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে।

রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ

গত আশ্বিনের 'শনিবারের চিঠি'তে কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের যে সম্পূর্ণ নূতন পরিচয় শ্রীযুক্ত অতুল সেনের নিকট লিখিত চিঠিগুলির সাহায্যে প্রদত্ত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া সে বিষয়ে আরও কিছু নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি পত্র তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনখানি পত্রে তাঁহার কালিগ্রাম পতিসর অঞ্চলে পল্লীসংস্কার কার্য্যের উল্লেখ আছে। অতুলবাবুর নিকট লিখিত পত্রগুলির পরিপূরক হিসাবে এই তিনখানি পত্র রবীন্দ্র-জীবনীতে স্থান পাইবার যোগ্য।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার কথা; মনোরঞ্জনবাবু তখন বাঁকুড়া কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন এবং তিনি বাঁকুড়া কলেজ হস্টেলেই অবস্থান করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুইখানি ইংরেজী পুস্তকের লেখক পাদরি এড্‌ওয়ার্ড টমসন (অধুনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক) তখন বাঁকুড়া কলেজের অধ্যাপক। যাঁহারা টমসনকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য, সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে উৎসাহিত করিয়াছিলেন মনোরঞ্জনবাবু তাঁহাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতা পড়িতে পড়িতে টমসন সাহেবের ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে একবার বাঁকুড়ায় লইয়া আসিবেন। সুতার অভাব হয় নাই; রবীন্দ্রনাথও রাজি হইয়াছিলেন।

প্রভাতবাবু তাঁহার 'রবীন্দ্র-জীবনী'র দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৮৪) লিখিয়াছেন—

ইতিমধ্যে কলিকাতায় 'ফাল্গুনী' নাটক অভিনয় করিবার আয়োজন হইল। এই সময়ে বাঁকুড়া জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল; রবীন্দ্রনাথ ঠিক করিলেন যে শান্তি-নিকেতনের ছাত্র ও অধ্যাপক লইয়া অভিনয় করিয়া যে টাকা উঠিবে তাহা বাঁকুড়া

দুর্ভিক্ষ তহবিলে দান করিবেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর গান গাহিবার জন্য ছাত্ররা কলিকাতায় যায়, ঠিক হইল উৎসবের পরেই অভিনয় হইবে।

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জনবাবুকে এই পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন। বলা প্রয়োজন, টমসন সাহেব বাঁকুড়া হইতেই 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের টিকিট সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন—পত্রে সে বিষয়েরও উল্লেখ আছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠিখানি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি তারিখে লিখিত। গত আশ্বিনে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অতুল সেনকে লিখিত ৪ নং চিঠিটি দ্রষ্টব্য। উহা পরদিন অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি তারিখে লেখা।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু [কলিকাতা]

অভিনয় ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি—মুহূর্ত্ত মাত্র সময় নাই। ইহার উপরে মাঘোৎসবের কাজ আছে।

বাঁকুড়ায় যাইব স্থির ছিল কিন্তু পতিসরে আমি যে পল্লীর কাজ ফাঁদিয়াছি সেখানে কাজের গোলমাল বাধিয়াছে। শীঘ্র না গেলে মুস্কিলে পড়িতে হইবে। অতএব অভিনয়ের পরেই সেখানে ছুটিতে হইবে। দেরি যথেষ্ট হইয়াছে, আর করা চলিবে না। এই জন্যই বেনারস বাঁকুড়া দুই জায়গারই আহ্বান ফিরাইতে হইল।

টমসন সাহেব যদি টেলিগ্রাফ যোগে টিকিট না কেনেন তবে অভিনয় দেখিতে পাইবেন না—কেন না টিকিট প্রায় ফুরাইয়া আসিল। ইতি ১০ই মাঘ ১৩২২

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরের চিঠিখানি ইহার তিন দিন পরেই কলিকাতা হইতে লিখিত—

ওঁ

[কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু

টমসন সাহেব বিরক্ত হইতে পারেন, সেজন্য আমি দুঃখিত আছি। কিন্তু তোমরা ত আমাকে জান, তোমরা কি জন্য আমাকে অনাবশ্যক

টানাটানি করিবার ইচ্ছা করিতেছ? আমার যে বয়স ও যে অবস্থা, এখন আমার শক্তি সাবধানে ব্যয় করা দরকার। হাতে যে কাজ পড়িয়াছে তার অতিরিক্ত কিছু করিতে গেলে সেই কাজের ক্ষতি হয়; কেন না আমার শরীরের সামর্থ্য এখন পরিমিত। পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লিসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে, নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করে এই আমার অভিপ্রায়। প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি—আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায় তাহাতে বৎসরে ১১০০০ টাকার আয় দাঁড়াইয়াছে। এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যয় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে। কিন্তু অপব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খলতা যথেষ্ট আছে। এইজন্য কিছুদিন হইল আমি নিজে গিয়া সকলকে ডাকিয়া নূতন নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছি। এখন যিনি অধ্যক্ষ তাঁহার সঙ্গে কর্ম্মচারীদের খিটিমিটি হওয়াতে কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে, এসময়ে আমি যদি অতি শীঘ্র না যাই তবে অনুতাপ করিতে হইবে। ইহার উপরে গ্রামে ওলাউঠা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে—আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে তাহার ভালরূপ প্রতিকার হইতে পারিবে। এমন অবস্থায় আমি কাহারো খাতিরে একদিনও যদি বিলম্ব করি তবে অপরাধ হইবে। এ কথা মনে রাখিয়ো আমি বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচিতাম—যে কাজের মধ্যে যাইতেছি তাহা আরামের নহে কিন্তু তাহা অত্যাবশ্যক—বাঁকুড়ায় যাওয়ার আবশ্যকতা সে জাতীয় নহে। অতএব আমার প্রতি অসন্তোষ ও বিরক্তিকে আমি শিরোধার্য্য করিয়াই মঙ্গলবার দিনে পতিসরে চলিয়া যাইব। সে জায়গা মনোরম নয়, স্বাস্থ্যকর নয়, নির্জ্জন নয়, সেইজন্যই মন সহজেই সেখানে না যাইবার ছুতা খোঁজে—ইহার উপরেও তোমরা যদি সামান্য কারণে উপদ্রব করিতে চাও তবে তাহাতে আমার বোঝা বাড়াইয়া আমাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিবে। তোমরা আমাকে চেন, অতএব আমার উপরে এই বিশ্বাস স্থির রাখিয়ো যে, আমি দেহমনকে সামাজিক দায়িত্ব হইতে যেটুকু বাঁচাইয়া চলি

তার কারণ আলস্য নয়, তার কারণ, আমার উপর কাজের ভার আছে সে কাজ আমাকে নির্ব্বাহ করিতেই হইবে। ইতি ১৩ মাঘ ১৩২২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয় চিঠিখানি ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শিলাইদা হইতে লিখিত। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গের চিঠি, তবে তন্মধ্যে এই সম্পর্কে এইটুকু মাত্র খবর আছে—

"শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হল বলে ডাক্তারের তাড়নায় শিলাইদহে এসেচি। শীঘ্রই পতিসরে কাজে যাব।"

* * *

মনোরঞ্জনবাবুর নিকট লিখিত অন্যান্য চিঠিগুলি হইতে মানুষ ও কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের অন্য বহুবিধ নূতন পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক পুরাতন পরিচয়ও এগুলি দ্বারা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। আমরা এই সংখ্যায় শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথের পরিচয়-সূচক পত্রগুলি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। অন্যান্য পত্র বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ কবিসুলভ ভাবাবেগে আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই কবিসুলভ চপলতায় প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করেন নাই। একদিন যাহা করিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহাই সুষ্ঠুভাবে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এখানে তিনি কবি নন, কর্ম্মী। ইহার জন্য তিনি জীবনের বহু বিলাস এবং সুখ বর্জ্জন করিয়াছেন, অপরিমিত ত্যাগ করিয়াছেন, অমানুষিক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন এবং অসহ্য মানসিক দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। চঞ্চলমতিত্বের যে অপবাদ কবিরা গর্ব্বের সঙ্গেই মাথা পাতিয়া লন, রবীন্দ্রনাথ অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে সে অপবাদ স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার পরবর্ত্তী সমগ্র জীবন ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। যে আদর্শ বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য তিনি নিজে কি পরিমাণ কায়িক শ্রম ও মানসিক চিন্তা করিতেন, তাঁহার জীবনীকারেরা তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়

দিতে বাধ্য। কবির জীবনের অপেক্ষা কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের জীবন কম রোমাঞ্চকর নয়। প্রভাতবাবুর জীবনীতে কিছু পরিচয় আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় নাই। মনোরঞ্জনবাবুকে লিখিত গোড়ার পত্রগুলিতে এই রবীন্দ্রনাথের একটি ধারাবাহিক পরিচয় লুকাইয়া আছে। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে) রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন চিঠি লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন মনোরঞ্জনবাবু বালক মাত্র, তিনি তখন ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রসঙ্গত ইহা বলাও আবশ্যক যে, সরোজ মনোরঞ্জনবাবুর ছোট ভাই, তিনিও শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রদের প্রত্যেকের ভালমন্দের জন্য, প্রত্যেকের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্ধারণের জন্য তিনি কি পরিমাণ চিন্তা করিতেন, এই পত্রগুলিতে তাহারও পরিচয় মিলিবে। নানা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গই এই পত্রগুলির বিশেষত্ব। এগুলির মধ্যে দুই একটি পত্র অনেক দিন পূর্ব্বে মনোরঞ্জনবাবু-সম্পাদিত ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'দীপিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। দুটি একটি পত্র শ্রীযুক্তা ইন্দুলেখা দেবীর নিকট লিখিত, ইনি শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের প্রথম পাঁচজন ছাত্রীর অন্যতম এবং পরবর্ত্তী কালে মনোরঞ্জনবাবুর সহধর্ম্মিণী হন।

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

সরোজের জ্বরের সংবাদে আমাদের উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। বহু চেষ্টায় তাহার শরীর সুস্থ হইয়াছিল। তাহার কুশল সংবাদ পাইবার জন্য উৎকন্ঠিত রহিলাম।

কিছুদিনের জন্য বোলপুর আশ্রমে আসিয়াছিলাম আজ আবার কলিকাতায় যাইতেছি। রথীও এখন কলিকাতায় আছে।

ছুটির পরে তোমাদের সহিত দেখা হইবে। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি ১৯ কার্ত্তিক ১৩১৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মাঝে আমার শরীর ভাল ছিল না—এখন সুস্থ আছি। বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়াছে—পাঁচ সাত জন ছাত্র এখনও আছে—তাহারা ছুটির সময় এখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিবে।

তোমার ম্যালেরিয়া জ্বর এখনো ছাড়ে নাই শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। আমার বিশ্বাস, কিছুদিনের জন্য সমুদ্রের বাতাস যদি সেবন করিতে পার তবে রোগ হইতে মুক্তি পাইবে। সরোজের পীড়া ত পুরীতে গিয়া আরাম হইয়াছিল।

পিসিমার শরীর ভাল নাই।

সন্তোষ আশ্রমেই আছে—সম্ভবত এইখানেই সে কাজ করিবে।

রথী এখন কলিকাতায় আছে।

ক্ষিতিমোহনবাবু অসুস্থ শরীর লইয়া সম্প্রতি কটকে গিয়াছেন—সেখানে কতকটা ভাল আছেন।

ঈশ্বরের কৃপায় তুমি স্বাস্থ্য ও বল লাভ কর এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২০শে বৈশাখ ১৩১৭

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[বোলপুর]

কল্যাণীয়েষু

রথীর শরীর অসুস্থ, এইজন্য কবে পর্ব্বতে যাওয়া হইবে নিশ্চয় বলিতে পারি না।

ছুটির পরে বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া সম্বন্ধে যে নূতন নিয়ম হইয়াছে তাহা তোমার পক্ষে খাটিবে না—কারণ তোমার শরীর অসুস্থ। অতএব

তুমি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াই আশ্রমে আসিবে সেজন্য তোমাকে কোনো দণ্ড স্বীকার করিতে হইবে না। ইতি ৩০শে বৈশাখ ১৩১৭

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু

তোমার পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

কলেজ স্থাপনার প্রস্তাব লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। আশু-বাবুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিলাম বাড়িঘর তৈরি করিতে যে টাকার প্রয়োজন সে আমাদের সাধ্যাতীত—অতএব এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

ময়মনসিংহে সাহিত্য সম্মিলনে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে কোনো মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না—কারণ সেই সময়ে আশ্রমে নববর্ষের উৎসব।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তোমার পক্ষে এখন কিছুকাল কলেজে পড়াই কর্ত্তব্য হইবে। তাহার পর, অন্তত I. A. পরীক্ষার পর, তুমি কোন্ পথে প্রবৃত্ত হইবে তাহা স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইবে। তোমরা কলিকাতায় যাহাতে সকলে একত্রে mess করিয়া থাকিতে পার তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য হইবে।

আমি আগামী মঙ্গলবারে আশ্রমে ফিরিয়া যাইব। আশ্রমের সমস্ত সংবাদ ভাল।

ঈশ্বর তোমার মনকে সরল, নির্ম্মল, মঙ্গলনিষ্ঠ ও ভক্তিপরায়ণ করিয়া তোমার জীবনকে সার্থক করিয়া তুলুন, এই আমি আশীর্ব্বাদ করি। ইতি রবিবার [২৬ মে ১৯১১]

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

মাতঃ ইন্দু, তোমাদের জন্যে আমার মন ব্যথিত আছে সে তোমরা জান, যদি পেরে উঠি তবে আবার তোমাদের কাছে আনবার ব্যবস্থা করব। ঈশ্বর সকল ঘটনা ও সকল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তোমাদের চিত্তকে বড় করে রাখুন, তাঁর মঙ্গল বিধানের কাছে নম্রভাবে স্থির করে রাখুন।

শিলাইদহে এসে ভাল বোধ হচ্চে। বাড়ির ছাতের উপর একটি ছোট ঘর আছে সেইখানে আমি থাকি। চারিদিকের দরজা খুলে দিলে সম্মুখে পদ্মা নদী—ও অন্যদিকে মাঠ দেখতে পাওয়া যায়—শস্তে ভরা ক্ষেতগুলির সবুজে দুই চোখ নিমগ্ন হয়ে যায়। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকেরা আমাকে একটা নূতন নাটক লেখবার জন্যে ধরেছেন—তাই একটু একটু করে লিখি—লিখ্‌তে ইচ্ছা করে না—অধিকাংশ সময় চুপ করে বসেই কাটে।*

বৌমা মীরা এখানেই আছে—তারা শাকসবজির বাগান করতে লেগে গেছে। বেশ মনের আনন্দেই আছে।

আমি ছুটির শেষ পর্য্যন্তই এখানে থাকব মনে করে আছি। ইতি

১২ই কার্ত্তিক, ১৩১৭

চিরশুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

আমাদের উৎসবে তুমি যোগ দিতে পার নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের এখানকার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে তাহা

---

* 'রাজা' নাটক, কার্ত্তিকেই রচনা শেষ হয়। পৌষ মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

শ্রীমান সরোজের নিকট সমস্ত শুনিতে পাইবে। অত্যন্ত শ্রান্ত আছি। অদ্যই রাত্রে শিলাইদহে যাইব—সেখানে দেড়মাস থাকিয়া এখানে ফিরিব। আশা করি তোমার শরীর সুস্থ আছে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ২৭শে বৈশাখ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়েষু

এখন শিলাইদহে আছি এখানে ভালই আছি। আসিবার সময় নেপালবাবু বলিয়াছিলেন ছুটির সময় বোলপুরে উপস্থিত থাকিয়া সরোজের প্রস্তুত হওয়া নিতান্তই দরকার—নতুবা আগামী পরীক্ষায় সে কোনোমতেই সুবিধা করিতে পারিবে না, অতএব তুমি তাহাকে অবিলম্বে বোলপুর যাইতে বলিবে। সেখানে অজিত, চুনি ও জগদানন্দ আছেন, সরোজের ইংরেজি নিতান্তই কাঁচা অতএব তাহার সময় নষ্ট করা উচিত হইবে না।

তোমার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনো খবর না পাইয়া আশঙ্কা হইতেছে হয়ত এবারকার পরীক্ষায় তুমি কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। যদি এই আশঙ্কাই সত্য হয় তবে আশা করি ধৈর্য্যের সহিত এই অপ্রিয় সংবাদ বহন করিবে।

আমাদের ছাত্রেরা কলিকাতায় কোথায় থাকিবে এখনো তাহা স্থির হয় নাই। যাহারা Science Course না লইবে তাহারা সম্ভবত Scottish Churchএ যাইবে ও সেখানকার hostelএ গোরাদের সঙ্গে থাকিবে, দেবলও সম্ভবত সেই কলেজেই যাইবে, বীরেন ও বিশু বোধ হয় বাঁকিপুরে ভর্ত্তি হইবে। সোমেন্দ্র পাস করিয়াছে তাহার ইচ্ছা প্রেসিডেন্সিতে পড়ে কিন্তু সে যখন Science লইবে না তখন

প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি হইবার চেষ্টা করা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক ; তাহার পিতাকেও সেইরূপ লিখিয়া দিয়াছি। ইতি ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[শিলাইদা]

কল্যাণীয়েষু

তুমি নিশ্চয় জানিবে আশ্রমে আসিয়া অধ্যয়নে যোগ দিলে আমি আনন্দিত হইব। ইহাতে তোমার কোনো সঙ্কোচের কারণ নাই। তোমার শিক্ষার কিরূপ বিশেষ ব্যবস্থা সম্ভব তাহা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ না করিয়া এখনি বলিতে পারি না। যাহা হউক তুমি বিলম্ব না করিয়া আশ্রমে গিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের একত্রে মিলিবার একটা ঘর হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে ইহা অনেকদিন হইতে অনুভব করিতেছি। অর্থাভাবে কিছুই করা যাইতেছে না। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের ঋণ হইয়াছে এবং প্রতি মাসেই ৩।৪ শত টাকার অভাব ঘটিতেছে। অতএব বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে যেখানে যতটুকু স্থান আছে নূতন ছাত্রদের জন্য রাখিতে হইবে—নহিলে এত অধিক অসচ্ছলতা পূরণ করা অসম্ভব হইবে। বিদ্যালয়ের আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য না হইলে ইহাকে স্থায়ী করা সম্ভবপর হইবে না। এখন সেই দিকেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিতে হইবে। মনে করা যাইতেছে দুই শত ছাত্র হইলেই বিদ্যালয়ের ব্যয়

সঙ্কুলান হইতে পারিবে। দুই শত ছাত্রকে স্থান দিতে হইলে বর্ত্তমানে যত ঘর আছে সমস্তই পরিপূর্ণ না করিলে চলিবে না। এই সকল নানা কারণে অন্য কোনো কাজে ঘর দিতে বা নূতন ঘরের জন্য ব্যয় করিতে সাহস হইতেছে না। এমন কি তোমাদের আপিস ঘরও সম্ভবত শান্তিনিকেতনের আপিস ঘরে স্থানান্তরিত করিয়া ওখানে ছাত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তথাপি মনে এ আশা নিশ্চয় রাখিয়ো ক্রমে ক্রমে আমাদের যাহা অভাব সমস্তই পূরণ করিতে পারিব। একদিন বিদ্যালয়ের অতিথি-শালা, মিলনশালা ও গ্রন্থাগার প্রস্তুত হইয়া উঠিবে।

তোমরা সকলে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি
৮ই কার্ত্তিক ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

কল্যাণীয়েষু

বিদ্যালয় সম্বন্ধে মনে কোনো আশঙ্কা রাখিও না। আমি বিদ্যালয়কে তাহার বাহিরের আকৃতির দিক হইতে বিচার করি না—সে সম্বন্ধে সন্তোষকে কাল আমার বক্তব্য লিখিয়াছি। কয়েকজন ছাত্র কমিয়া যাওয়া বা বাড়িয়া উঠার উপর এই বিদ্যালয়ের জীবন মৃত্যু নির্ভর করে না। আমাদের সত্য-সাধনাই ইহার প্রাণ। ইহার মধ্যে যতক্ষণ কোনো সত্য কোনো মঙ্গল থাকিবে ততক্ষণ ইহা বাঁচিয়া আছে জানিবে—আর হাজার ছাত্র লইয়াও যদি এ বিদ্যালয় তাহার তপস্যা হারায় তবে ইহার মৃত্যু হইল জানিবে। বাহিরের আঘাতে কোনো ক্ষতি করিবে না—বরঞ্চ যদি আমাদের মধ্যে কোনো সত্য থাকে তবে তাহাকে জাগ্রত করিয়াই তুলিবে—আমাদের নিজেদের মধ্যে যেটুকু দুর্ব্বলতা যেটুকু ফাঁকি আছে তাহাই বিদ্যালয়ের পক্ষে সাংঘাতিক। তোমরা বড় হও,

তোমরা ভাল হও তাহা হইলে তোমাদের মধ্যেই বিদ্যালয় স্থায়ী হইয়া থাকিবে। যদি মনে কর তোমাদের বিদ্যালয়ের তরী তুফানে পড়িয়াছে তবে তোমাদেরই সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াও। আর কিছু করিতে হইবে না—যাহাতে তোমাদের বিদ্যালয়ের আদর্শ আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে—এখানে যে কয়জন অবশিষ্ট থাকে তাহারা সকলেই যাহাতে নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে—তোমাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ যাহাতে পবিত্রতর কল্যাণতর হইয়া উঠে সেজন্য প্রাণপণ করিয়া নিযুক্ত হও। ভিতরকার সমস্ত দুর্ব্বলতা অন্ধকার কাটাইয়া ফেল তাহা হইলেই আর কিছুতেই কোন ভয় নাই—তাহা হইলেই একজনই আমাদের একসহস্র। মাথা গণনা করিয়া বা ওজনে মাপিয়া স্থূলভাবে সত্যের পরিমাণ হয় না। সত্যের কণাটুকুও প্রচুর। তোমরা নিতান্ত বিশ্বাসহীনের মত অল্প আঘাতেই দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া ভীরুতা প্রকাশ করিয়ো না। যিনি কল্যাণরথের সারথি তিনি জগতের সকল রাজার চেয়ে বড়—রাজবিধি তাঁহাকে বাধা দেয় না, তিনি কেবল আমাদের অন্তরের মধ্যে সত্য দেখিতে চান—তিনি কদাচ মিথ্যাকে জয়যুক্ত করিবেন না। তোমরা সেই সত্যের বলে অজেয় হইয়া উঠ—সত্যকে জীবনের আশ্রয় কর এবং কোনো বাহিরের সঙ্কটকেই ভয় করিয়ো না। ইতি ২৪শে কার্ত্তিক ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়েষু—

তোমাদের পরীক্ষার সময়ে তোমরা জোড়াসাঁকোয় থাকিয়া যাহাতে পরীক্ষা দিতে যাইতে পার আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। তোমাদের বিছানা সঙ্গে আনিয়ো। সংবর্দ্ধনার* দিন পিছাইয়া গিয়াছে—

* পঞ্চাশৎ বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধনা। এই অনুষ্ঠান মাঘ মাসে হয়। পরবর্ত্তী পত্রে এই ব্যাপারেরই উল্লেখ আছে।

অতএব আমি আর অধিক দিন এখানে থাকিব না। সম্প্রতি অত্যন্ত বাদলা করিয়াছে এই বাদলাটা কাটিয়া গেলেই হয় পুরীতে নয় পদ্মায় পালাইব। তোমাদের ওখানে অত্যন্ত জ্বরের প্রভাব হইয়াছে শুনিয়া উদ্বিগ্ন রহিলাম। এই সময়েই ডাক্তারের অভাব ঘটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তোমরা পরীক্ষার্থীরা প্রত্যহ অল্প করিয়া কুইনীন খাইয়ো— ইতিমধ্যে জ্বরে পড়িলে তোমাদের পক্ষে দুর্গতির কারণ হইবে। ইতি
১১ই অগ্রহায়ণ ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পতিসর
আত্রাই

কল্যাণীয়েষু

পরীক্ষায় তোমরা এখনকার মত কোনোপ্রকারে উদ্ধার পাইয়াছ শুনিয়া খুসি হইলাম—এখন শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইব। ইতিমধ্যে বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রস্তুত হইয়ো—কেন না যেটা করিতেই হইবে সেটা ঢিলাঢালা রকমে করিতে বসা নিতান্তই কাপুরুষতা।

ঠিক জানি না কিন্তু শুনিতেছি আগামী ১৬ই মাঘেই আমার অভ্যর্থনার দিন স্থির হইয়াছে। সেই উৎপাতটা চুকিয়া গেলেই একবার তোমাদের ওখানে গিয়া বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে তোমাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিব এইরূপ আমার ইচ্ছা।

তোমাদের আশ্রম সম্মিলনীর ভিতর দিয়া আমাদের আশ্রমের চিত্ত এক আদর্শের মধ্যে নিবিড়ভাবে সম্মিলিত হইতে থাকে এই আমার একান্ত ইচ্ছা। অধ্যাপক এবং ছাত্র এবং সমস্ত আশ্রমবাসীকে সত্য-ভাবে গভীরভাবে একটি বড় সাধনার মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিতে হইবে, নতুবা সেখানে আমাদের প্রতিদিনের ব্যর্থ জীবন কেবলি অপরাধরূপে সঞ্চিত হইয়া উঠিবে। আমি তোমাদের সকলকে তেমন করিয়া জাগাইয়া তুলিতে পারি নাই—আমার নিজের মধ্যে সেই শক্তি নাই।

তোমাদের সকলের সম্মিলিত শক্তির দ্বারাই আমাদের আশ্রমজীবনের উদ্বোধন ঘটিবে এই আমি একান্ত মনে আশা করি। ইতি ২রা মাঘ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঔঁ

[Felton Hall, U. S. A.
15. 2. 1913]

শ্রীমান মনোরঞ্জন চৌধুরী
কল্যাণীয়েষু

তোমরা দুই ভাই তোমাদের মাকে হারাইয়াছ। কিন্তু মাকে হারাইয়াও হারানো যায় না সে কথা তোমরা জান। নিজের জীবনের মধ্যে যাঁহাকে পাইয়াছ তিনি তোমাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। এই কথা মনে রাখিয়ো জননী এখন সম্পূর্ণ তোমাদের অন্তরের সামগ্রী হইয়াছেন—এখন হইতে অন্তঃকরণকে একান্ত যত্নে পবিত্র করিতে পারিলে তাঁহার প্রতিদিনের সেবা সম্পূর্ণ হইবে। শোকে তোমাদিগকে যেন শুচি করিয়া দেয় এই আশীর্ব্বাদ করি।

আমার সমস্ত সংবাদই তোমরা পাইতেছ নূতন করিয়া কিছু লিখিবার নাই। এখন এখানে পথে পথে ঘুরিতেছি পত্র লিখিবার সময়ও নিতান্ত অল্প।

জিজ্ঞাসা করিয়াছ এখানে ইংলণ্ডের মত আমার রচনা সমাদর লাভ করিতেছে কি না? এই সমাদরের নেশা তোমাদের পাইয়া বসিয়াছে—তোমরা এই উত্তেজনাকে থামিতে দিতে চাও না। দরকার কি সমাদরের? মনে কর না অপমান ঘটিতেছে। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সম্মানে অপমানে ত সত্যের ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না। মানবের ইতিহাসে কি তাহার সহস্র প্রমাণ পাও নাই? সত্যকে লোকের সমাদরের ভিতর দিয়া যাচাই করিতে গিয়া আমরা তাহাকে নিজের শক্তিতে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিবার বল হারাইয়া ফেলি। আমার জীবনে যদি কোনো সাধনা সত্য হইয়া থাকে তবে জীবন পূর্ণ বীজের

মত গোপন মাটির ভিতর হইতেই তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে—লোকের স্তুতির মধ্যে তাহার বিকাশ নয়। এ কথা মনে করিয়ো না লোকে আমার কাজকে আদর করিতেছে ইহাতে আমি কোনো আনন্দ পাই না। কিন্তু এক জায়গায় ইহার সীমা আছে। এই বাহিরের লোকের প্রশংসাকে অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিতে নাই—রাস্তার ধারের বাহির দরজাটার কাছ পর্য্যন্তই তাহার গতিবিধি ভাল—জীবনে তাহাকে অধিক জায়গা জুড়িতে দেওয়া কোনোমতেই স্বাস্থ্যকর নহে।

তোমাদের আশ্রমিক সমিতির কাজ এখনো চলিতেছে শুনিয়া খুসি হইলাম। আমাদের বিদ্যালয় ত অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত নহে—ইহার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ কেবল কিছুদিনের প্রয়োজনের সম্বন্ধ বলিয়া আমি মনে করি না। বস্তুত এ বিদ্যালয় কেবলমাত্র বোলপুরের মাঠের মধ্যে নহে তোমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে ইহার প্রতিষ্ঠা, তোমাদের চিন্তার সঙ্গে তোমাদের শক্তির সঙ্গে তাহা মিশিয়া আছে, তোমাদের সংসারের মাঝখানেও সে আপনার স্থান লাভ করিবে। তোমাদের আশ্রমিক সমিতি এই সত্যেরই একটি বাহ্য নিদর্শন মাত্র। আশ্রমের বাহিরে দাঁড়াইয়াও আশ্রমের সেবা করিবার এই একটি ক্ষেত্র তোমরা রচনা করিয়াছ, এখন ইহাকে ছোট দেখাইতেছে কিন্তু তোমাদের জীবনের মধ্যে ইহার জীবন আছে—কখন একদিন দেখিবে ইহা বড় হইয়া উঠিয়াছে। এখন তোমরা ভাবিতেছ ইহাকে কি কাজে লাগাইবে কেমন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে কিন্তু একদিন এই সমিতিই তোমাদিগকে কাজে লাগাইবে এবং তোমাদিগকে গড়িয়া তুলিবে। এখন শিশু অবস্থায় ইহার দায় তোমাদের উপরে কিন্তু এ যখন বাড়িয়া উঠিবে তখন এই ত তোমাদের দায় গ্রহণ করিবে—একদা সেইদিন আসিবে একথা মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়ো এবং কোনো অবস্থাতেই হাল ছাড়িয়া দিয়ো না। স্রোত যখন ক্ষীণ হইয়া আসিবে তখনো জানিয়ো সম্মুখে বর্ষা ঋতু আছে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

C/o Messrs Thomas Cook & Son
Ludgate Circus, London
২০ বৈশাখ ১৩২০

কল্যাণীয়েষু

তোমরা আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

শিকাগো সহরে Mrs Moody একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। তিনি আমেরিকার বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি উইলিয়ম মুডির বিধবা স্ত্রী—তিনি নিজে বিদুষী এবং প্রতিষ্ঠাশালিনী। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার একান্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে বলিয়াই তিনি আমাদের কোনো একটি ছাত্রকে তাঁহার ব্যবসায়ে মানুষ করিয়া দিবার ভার লইয়াছেন। শিকাগোতে মিষ্টান্ন ও রুটি বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুতের একটি বড় কারখানা তাঁহার আছে। ইহাকে মুদির কারবার বলিয়া মনে করিয়ো না। ইহা প্রচুর লাভের ব্যবসায় এবং এ সকল ব্যবসায়ে প্রবেশ লাভ সহজ নহে। লণ্ডনেও তাঁহার দোকান আছে কিন্তু সরোজ যদি আসে তবে তাহাকে তিনি শিকাগোতে নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে ডিগ্রি লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সব কাজ শিক্ষা চলে না। বরঞ্চ শিকাগোতে থাকিয়া আর কোনো Technical বিষয় শিক্ষা করিবার সুযোগ সে পাইতে পারে। Mrs Moodyর স্নেহ ও সাহচর্য্য লাভকে আমি একটি পরম সুযোগ বলিয়া মনে করি। সেখানকার বাসা ভাড়া ও অন্যান্য খরচ সরোজের কিছুই লাগিবে না এবং পরম যত্নে থাকিতে পারিবে। ইহাতে যদি তোমাদের অভিভাবকদের সম্মতি থাকে তবে অবিলম্বে প্রস্তুত হইয়া জুন মাসেই তাহাকে এখানে আসিতে হইবে। কারণ, জুনে Mrs Moody এখানে আসিবেন—এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে সরোজের পরিচয় করাইয়া দিতে পারিব। যদি সরোজের আসা সম্ভবপর না হয় তবে তৎক্ষণাৎ সে সংবাদ আশ্রমে নেপাল

(শেষ অংশ ২৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বীরবলের আত্ম-পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের বীরবলের জন্ম হয় তিয়াত্তর বৎসর পূর্ব্বে। নিজের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—

> আমাদের বাড়ি পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে।
>
> আমাদের উপাধি হচ্ছে মৈত্র, আর খেতাব চৌধুরী। আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত। আমার জন্ম হয় যশোর সহরে। সেখানে আমার পিতা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

অতি শৈশবে তিনি পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসেন। তাঁহার মতে এই কারণে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের উভয় প্রান্তের দোষ-গুণের প্রভাব তাঁহার উপরে পড়িয়াছে।

> পাঁচ বৎসর বয়সে আমি প্রতাপাদিত্যের রাজধানী থেকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে আসি, আট বৎসর বাস করি। আর এখানেই বাঙলা ও ইংরেজী লেখাপড়া শিখি। আমি প্রথমে একটি ছাত্রবৃত্তিস্কুলে পড়ি আর সেখানেই আমার বিদ্যার ভিত গাঁথা হয়। পরে কৃষ্ণনগর Collegiate Schoolএ ভর্ত্তি হই, আর তেরো বৎসর বয়সে Entrance কেলাসে উঠি। এই ক্লাসে মাস ছয়েক পড়ি। পরে malariaর দৌরাত্ম্যে কৃষ্ণনগর ত্যাগ করে বেহারে আরায় যাই। শৈশবে যখন কৃষ্ণনগরে আসি তখন আমি ছিলুম আধ আধ ভাষী বাঙাল, আর যখন সে নগর ত্যাগ করি তখন আমার মুখের ভাষা হয়ে উঠেছিল নদে শান্তিপুরের ভাষাই; আর সেই সময়েই হয়ে উঠি পুরো কৃষ্ণনাগরিক। সেই সঙ্গে কৃষ্ণনগরের আদি বাসিন্দা বারেন্দ্রদের দোষ গুণও আমার শরীরে এসে বর্ত্তায়; অর্থাৎ তাদের বাক্‌চাতুরী ও কর্ম্মবিমুখতা।

যশোহর হইতে কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর হইতে আরা, এবং আরা হইতে কলিকাতা।

> আরা থেকে ফিরে কলকাতায় আসি ও প্রায় তিন বৎসর এই সহরেই বাস করি। হেয়ার স্কুল থেকে Entrance পাস করি, তারপর

> প্রায় দুই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি। কিন্তু তাই বলে আমি কলকাতাই হয়ে উঠিনি। সে কালে এ সহরের বিকৃত ভাষায় আমার মুখের ভাষার বদল হয়নি। আর এখানকার স্কুলের ছেলেরা বাক্‌চাতুরীতে বঞ্চিত ছিল। তাদের কথোপকথন ছিল রসিকতাছুট; দুটি চারটি তুচ্ছ মুখস্থ বুলি ছাড়া। সকলেই সেই সব মুখস্থ বুলি বলত, আর তা শুনে অন্তরা হেসে কুটিকুটি হত। তার পরে আবার বছর দেড়েকের জন্ত কৃষ্ণনগর ফিরে যাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের দর্শন লাভ করি আর তাঁর কথা শুনি। এর ফলে সাবালক হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনের মোড় ফিরে যায়। এ সব কথা পূর্ব্বে বলেছি, সুতরাং তার আর পুনরুক্তি করব না। আমি যে আজ বাঙলা লেখক হয়েছি, সে তাঁর মনের আবহাওয়ায় বাস করে।

ইহার পরেই তিনি কলিকাতায় আসেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ ৺লালচাঁদ বড়ালের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। শিশুকাল হইতেই বীরবল সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং সঙ্গীত-কুশলী দলের সহিত মেলামেশা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি নিজেও সুকণ্ঠ ছিলেন এবং ভাল গান করিতে পারিতেন। তিনি হিন্দুস্থানী গানের ভক্ত, এবং আধুনিক কালের বাংলা গানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব আছে। এই সময়েই শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ শীল এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়।

কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি অ্যাটর্নির অফিসে আর্টিক্‌ল্‌ড-ক্লার্ক হিসাবে ছিলেন, কিন্তু এদিকটা তাঁহার কোন দিনই পছন্দ হয় নাই।

> ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আবার কলকাতায় আসি, আর সেই অবধি এইখানেই রয়ে গিয়েছি; আর এখানেই **First Arts, B. A., M. A.** পাস করিছি। তার পরে বছর দুয়েক অ্যাটর্নির আপিসে **articled clerk** ছিলুম। কিন্তু উকিলের আপিসের হাওয়া আমার বরদাস্ত হল না। ফলে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমি বিলেত যাই। বছর খানেক **Oxford**এ

বীরবল

শিল্পী শ্রীঅমূল্যকুমার সেনগুপ্তের সৌজন্যে
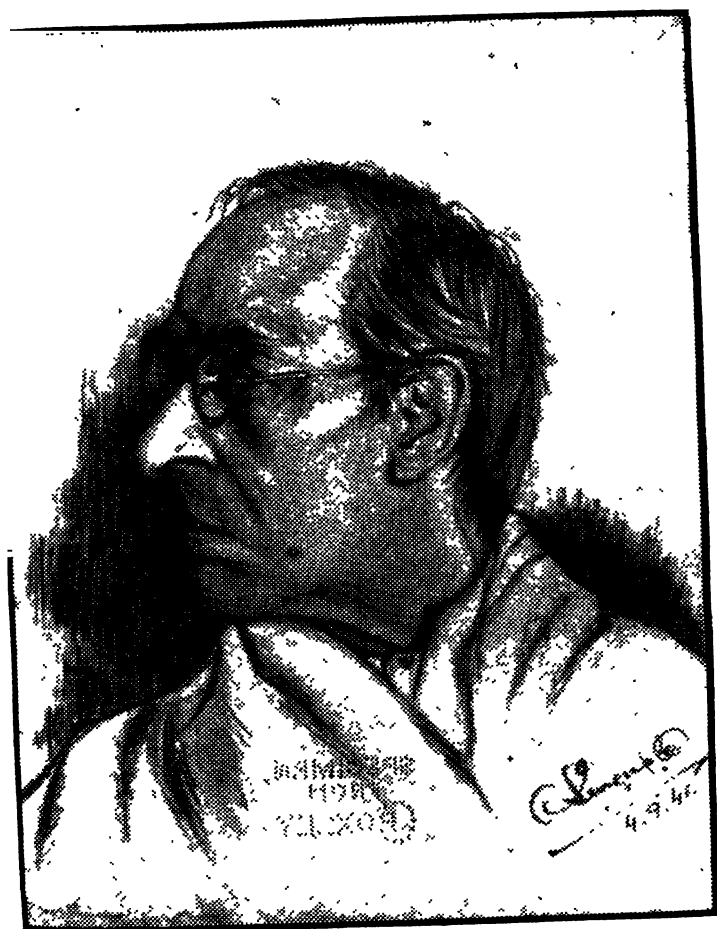
থাকি, তার পর লণ্ডনে। শেষটায় ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরি। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করি।

বীরবল Oxford-এ থাকিলেও সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে ছিলেন না। বিলাত-প্রবাসকালে প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ৺জে. এন. রায় ও ৺রমেশ সেনের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ঘটে। আর একজন বন্ধু ছিলেন শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু। প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা স্বর্গীয় দীপনারায়ণ সিংহ ও নবাব নিয়াজুদ্দিন খাঁ তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। অক্সফোর্ড-প্রবাসকালে ও বিলাতের অন্যান্য স্থানেও শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত একই বাসায় থাকিতেন।

কলেজ-জীবনেই তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন, এবং এই ভাষার উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। গী দ্য মোপাসাঁ ও পিয়ের লোতির ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার প্রিয়। তাঁহার মতে মোপাসাঁ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখক।

যৌবনে শেক্স্পীয়র ব্যতীত স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে ও বুলওয়ার লিটন ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁহার প্রিয় ছিলেন। এই পরিণত বয়সেও তিনি শেক্স্পীয়র পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করেন।

যৌবনেই তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবা আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম গল্প "প্রবাসস্মৃতি", তাহার পরে "চার ইয়ারী কথা"। তাহার পরে আসে 'সবুজ পত্রে'র যুগ।

রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে শিলাইদহে পদ্মার বোটে। সঙ্গী ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং বীরবল। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কিছু পরের কথা।

রবীন্দ্রনাথের সেই সময় খেয়াল হয়, তিনি আর কিছু লিখিবেন না। কারণ ভবিষ্যতে নূতন কিছু লিখিবার চেষ্টা করিলেই তাহা হইবে

বিগত যুগের রচনার পুনরাবৃত্তি। বলা বাহুল্য, বীরবল এবং মণিলাল ইহাতে তীব্র আপত্তি জানাইয়াছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বীরবলকে বলেন, আচ্ছা, তুমি যদি কোন কাগজ বার কর, তাতে আমি লিখতে রাজি আছি। তবে তার বাইরে আর কোথাও লিখব না।

ফলে 'সবুজ পত্রে'র জন্ম। নামটি বীরবলের নিজেরই দেওয়া। দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া এই কাগজখানি বাংলা সাহিত্যে যে আভিজাত্য-পূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা নূতন করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দুই তিন বৎসর এই কাগজের বাহিরে আর কোথাও লিখিতেন না, পরে অবশ্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছিলেন।

ব্যবসার দিক দিয়া 'সবুজ পত্র' সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। পারা অবশ্য ইহার উদ্দেশ্যও ছিল না। বীরবল এই সম্পর্কে হাসিয়া বলেন, লাভ তো হয়ই নি, উপরন্তু পকেট থেকে বছর বছর মোটা টাকা বেরিয়ে গেছে।

> পরে সবুজ পত্র প্রকাশ করি এবং বাঙলা লেখা আমার নেশা হয়ে ওঠে। আজও তার জের টানছি; যদিচ এখন লেখাটা আমার পক্ষে সহজ নয়। আমার লেখার ভিতর যদি একরোখামী থাকে তো তার কারণ আমি বাঙ্গাল; যদি বাক্‌চাতুরী থাকে তো তার কারণ আমি কৃষ্ণনাগরিক; আর যদি প্রাণ থাকে তো তার কারণ আমি আকৈশোর রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রাণের স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়েছি।

পরিশেষে তাঁহাকে দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল। এক—তাঁহার গল্পের নীললোহিতের মধ্যে খানিকটা সত্য আছে কি না, অথবা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। নীললোহিতকে তিনি সম্পূর্ণ কল্পনা বলিয়া স্বীকার করেন না। হাসিয়া বলেন, কেন এ রকম লোক দেখ নি? বলিতে হয়, অল্পস্বল্প দেখিয়াছি, কিন্তু এতটা উচ্চস্তরের চালিয়াৎ নজরে পড়ে নাই। প্রকৃতপক্ষে নীললোহিতের কঙ্কাল সত্য, তাহার উপর লেখকের কল্পনার মৃত্তিকা ও রঙের তুলির টান পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি, যাহাকে ইংরেজীতে বলে 'ইম্পার্টিনেণ্ট কোয়েশ্চন', বীরবলকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি ভূত দেখেছেন? আশা ছিল, হয় তিনি নিজেই দেখিয়াছেন, অথবা তাঁহার পরিচিত বন্ধুবান্ধব কেহ দেখিয়াছেন, এবং অন্তত একটি 'অথেণ্টিক' ভূতের গল্প শোনা যাইবে। কিন্তু তিনি নিরাশ করিলেন। বলিলেন, না।

প্রশ্ন করা হইল, ভূত মানেন? এ প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ ভূত তিনি নিশ্চয় মানেন। কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তাকে নিরাশ ও বিস্মিত করিয়া জবাব আসিল, মোটেই না।

তবে আপনি অত ভূতের গল্প কি ক'রে লিখলেন? যেমন 'চার ইয়ারী কথা'র টেলিফোন-ভূত।

তিনি সহাস্যে বলিলেন, লিখলেই যে বিশ্বেস করতে হবে, তার কি মানে আছে?

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

[আর্য্যকুমার সেন কর্ত্তৃক লিখিত]

দর্শন

খোদার উপরে খোদকারি করি যারা হয়েছিল অহঙ্কারী,
পাথরে ধাতুতে নাম তাহাদের খোদাই হয়েও বারুদে উড়ে;
ভাঙিয়া ভূতলে পড়িছে বিমান; মেঘ চিরদিন আকাশচারী—
মাটির প্রেমেতে নামে যে মাটিতে, ফলিছে ফসল দুনিয়া জুড়ে।
খোদার উপরে খোদকারি করা মানুষ শেষে সে ফসল খোঁজে,
ধাতু-পাথরের থাকে না চিহ্ন, মানুষের প্রাণ মাটি ও জলে;
লেনিন ষ্ট্যালিন হিট্‌লার সবে মাটির তলায় নয়ন বোজে,
মাটি উবে হয় আকাশের মেঘ, মেঘের জলেতে ফসল ফলে।

পুরোহিত

সেই দেবতার জান কেহ পরিচয়,
আমি যার পুরোহিত ?
যুগযুগান্ত দুর্গম পথে চলেছে তীর্থলোভী
সুদূর তীর্থে পুণ্যলোভীর দল—
দুঃসহ শীতে দারুণ গ্রীষ্মে অসহ্য ক্লেশ মানি
ভূমি-উদ্ঘাত-কণ্টকক্ষত-জীর্ণ চরণতল
লবন-শোষণে শীর্ণ ওষ্ঠপুট
জটিল রুক্ষ বিবর্ণ কেশে জমেছে ধুলার কণা,
কঠোর পরিশ্রমের কশায় উৎসাহ নিবে আসে,
চক্ষু-তারকা অস্থি-কোটরগত,
ছিন্ন মলিন পথচারীদের শুষ্ক-চর্ম্মদলে
বাঁধিছে আগার চর্ম্ম-বিলাসী কীট,
স্বল্প পাথেয় অল্প আহার শয্যা বসন কিছু,
দীর্ঘ পন্থা অসহন-শ্রম গ্লানি ও ক্লেদের ভরে
ঋজু পৃষ্ঠের রেখা ক্রমে যেন ন্যুব্জ হইয়া আসে,
দিবস রাত্রি তবু পায়ে হেঁটে চলেছে তীর্থলোভী—
সুদূর তীর্থে পুণ্যলোভীর দল।

কোথা বদরিকা হিম হিমালয়-চূড়ে
আড়ষ্ট বায়ু শীতল-তুষার-স্পর্শে জমিয়া গেছে,
সবুজের কোথা চিহ্নমাত্র নাই,

শাখা-পাতা-ফুল-ফল-বীজ-হীন ধুধু করে দিক-সীমা,
দিগন্তরেখাপ্রসারী যেন সে বরফের মরুভূমি,
হিম আঁধি ঝড়ে বরফ ভাঙিয়া পড়ে
গুঁড়া হয়ে ওড়ে রৌদ্রতপ্ত বালুর কণিকা সম,
শুধু দুটি রঙ নীল-সাদা, সাদা-নীল
অসীম শূন্যে নীড় রচিয়াছে নীল রঙ আকাশের
নিম্নে গড়িছে ভাঙিছে উড়িছে বরফের সাদা রেণু
অযুত-বর্ণছায়া-সমাবেশ-চিত্রিতা ধরণীর
স্নেহ-সুলালিত মানবচক্ষু বর্ণিমা-লোভাতুর
দেখিছে সেথায় পলক ফেলিতে সপ্তবর্ণছটা
কঠিন তুষারখণ্ডের পরে যেথা
রৌদ্রের রেখা ঝলিয়া ঈষৎ বেঁকে
বর্ণ-বিহীন বরফ-মরুতে রচিছে অলীক বর্ণের মরীচিকা,
হায় কোথা দূর—দূর বদরিকা হিম হিমালয়-চূড়ে—
হায় যাত্রীর দল !

কোথা ইপ্সিত গঙ্গাসাগর সাগরের সঙ্গমে
কলকলরোলা জাহ্নবী-ধারা পড়িছে যেথায় এসে
স্ফীত-উচ্ছল-জলদল-চঞ্চল
গৌরীনেত্রে ভ্রূকুটি-ভঙ্গি উপহাস-জর্জ্জর
প্রমথেশ হেরে স্মিত কৌতুকভরে
তরঙ্গ ভাঙে উন্মাদনায় যৌবন রঙ্গের
নদী-ধূসরতা ম্লান হয়ে আসে সাগরের নীল জলে
নীল জল হয় নীলতর রেখা দিকসীমা-প্রাঙ্গণে—

সাগরে গঙ্গা মেশে।
ঢেউয়ের চূড়ায় ফেনাচূর্ণের মুক্তা-কান্তি-ছটা
আকাশ কীর্ণ করে উদ্দাম বেগে
অতি পিচ্ছিল সিক্ত-সিকতা ওষধি গুল্মজালে
ক্রমশ বিরল সমুদ্র তীরে তীরে
সাদায় সোনায় নীলে ও সবুজে আলোয় অন্ধকারে
পুষ্ট প্রাণের আবেগ-বিচঞ্চল
অসীম-শূন্য রৌদ্র-ছায়ায় দিগন্তে পড়ে গলে
হায় কোথা দূর দূর গঙ্গা ও সমুদ্র-সঙ্গম—
হায় যাত্রীর দল!

কোথা মরুভূমে মরুতীর্থের মরুযাত্রীর সাথী
রৌদ্র-পুষ্ট তৃণ-দল নাই শ্যাম-খর্জ্জুর-ছায়
কঠিন-কোমল মৃত্তিকা-ভূমি লাগি
ব্রণকণ্টক-যাতনা-বিদ্ধ কাঁদিছে চরণতল
ধুধু করে বালুরাশি
রৌদ্র-দগ্ধ পীত-পাণ্ডুর মৃত মরুকঙ্কাল
মৃগ-তৃষ্ণার বিহার শ্মশান-ভূমি
ভয়াবহ পঙ্কিল
খর রবিতাপে ধুঁকিছে বাতাস মহাস্থবিরের প্রায়
রৌদ্র-বাষ্পে বিধুনন জাগে অসীম শূন্যতলে
গুপ্ত মরণ ছলনা করিয়া মেলিছে মিথ্যা ছবি
জাগিছে নিমেষে সৌধ-প্রাসাদ-ছায়াঘেরা-জলাশয়
কাকচক্ষুর মতন স্বচ্ছ সুশীতল জল কূলে কূলে টলমল

কণ্ঠতালুর শুষ্কতা বাড়ে চক্ষে বাড়িছে জ্বালা
তপ্ত-বালুকাব্রণ-কণ্টক-বিদ্ধ-চরণতল
দুরাশা-দগ্ধ ছবি
হায় কোথা দূর দূর মরুভূমে দেবতার মন্দির—
হায় যাত্রীর দল !

সহসা মিলায় তুষারশীর্ষ শীতল শৈলরাজি
অসীম আকাশে রোরুদ্যমান থামে জলকল্লোল
মরু-মরীচিকা-শিখা নিবে যায় নিমেষে অকস্মাৎ,
আমার দেবতা জাগে
মহীয়ান দেব অসংখ্য-শতজন্মের মহিমায়
শত-অবতার পরশে যাহার ধন্য হয়েছে জানি
ধন্য মেনেছে স্বয়ং স্বয়ম্ভুব
নিস্পৃহ-দেব-চিত্তে জেগেছে বাসনা স্বর্ণময়
নীল-কান্তিক বক্ষে দুলেছে কৌস্তভ-মণি-ছায়া
ময়ূরপুচ্ছ-কোমল কৃষ্ণকেশে
দিগম্বরের কটিদেশ ঘিরে চিত্রবাঘাম্বর
একদা যে দেব মদনভস্ম করেছে শৈলচূড়ে
ললাট-নেত্রে বহ্নির ছায়া ধকধক জ্বলিয়াছে
সেই গড়ে পুনঃ স্বর্ণসীতার মূর্ত্তি অযোধ্যায়
নবমেঘোদয়ে করুণ-নেত্র-ছায়া জল-ছলছল
ঘন ছায়াখানি সজল চক্ষে ঘনতর হয়ে নামে।
হায় রে দেবতা ! কোথায় দেবতা—কোথা যাত্রীর দল !

কালো পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে সর্পিল তার গতি
ভয়ভীত তবু শঙ্কিল ক্রূর অতি
ভূমি-গর্ভের অন্ধ-অতল-তলে
প্রকট অন্ধকার
আলোকস্পর্শবিহীন বাতাসে জমিছে বাষ্পবিষ,
জমিছে গলিছে বাতাসবাষ্প মৃত্তিকা ক্লেদ যেন
জমিছে যেথায় সেথায় দিবস রাত্রি কিছুই নাই।
পত্র-পুষ্প-অর্ঘ্য-মাল্য-তণ্ডুল-ফল-মূল
স্তূপাকার হয়ে পচে আর গ'লে যায়।
সিঁদুর-লিপ্ত পাষাণ-দেবতামূর্ত্তি বসিয়া আছে
ঘৃতদীপ জ্বলে পাদপীঠমূলে তার
—তবু সে দেবতা নহে,
অন্ধ-পাষাণ-মূর্ত্তি ত্যজিয়া দেবতা চলিয়া গেছে
ঘৃতদীপখানি টলমল করে জমাট অশ্রুজলে—
বিদায়কালের করুণ অশ্রুজল।
কোথায় দেবতা! প'ড়ে আছে জানি দেবতার কঙ্কাল,
হায় যাত্রীর দল!

আমার দেবতা মাটির প্রতিমা নহে,
কালো পাথরের ক্ষোদিত মূর্ত্তি নহে,
সাদা পাথরের ক্ষোদিত মূর্ত্তি নহে,
সোনা দিয়ে আর রূপা দিয়ে তার নির্ম্মাণ হয় নি কো,
ইন্দ্রিয়াতীত নহে যে দেবতা—সে দেবতা চেনো কেহ,
আমি তার পুরোহিত।

এই পৃথিবীতে যুগযুগ ধরি জন্ম নিয়েছে যারা,
বিধাতা-দত্ত-কীর্ত্তিকলাপ স্বাক্ষরলিপি নিয়ে
প্রোথিত করেছে জয়স্তম্ভ বিজিত ভূমির 'পরে—
কঠিন দম্ভ-ভরে,
শিলা-ফলকের স্পষ্টলেখায় জ্ঞাপন করেছে আপনার সম্মান—
অপরে অসম্মানের পঙ্কে করিয়া নিমজ্জন,
তাহাদের কীর্ত্তির
পঙ্ক-তিলক এঁকেছে যাহারা আপন ললাট 'পরে
স্বাধীন-মুক্ত কণ্ঠস্বরের এনেছে পঙ্কিলতা,
গেয়েছে তাদের মন তুষিবার বন্দীস্তুতি-গান,
গ্লানি তার তবু রয়েছে তাদের স্বপ্নের অগোচর,
অসম-সাহস শক্তির পরিচয়ে—
যাদের বীর্য্যস্রোতে
তৃণখণ্ডের মত ভেসে গেছে যাহাদের সম্বল
তাহাদের স্বরে মিলায়ে কণ্ঠস্বর
গাহিব না আমি ক্লেদাক্ত স্তুতিগান
তাদের দেবতা জানি, জানি আমি, আমার দেবতা নহে ৷৷

সৈন্যবাহিনী পার হয়ে চলে আল্‌প্‌স্‌পর্বতমালা
বীরপদভর-পরশ-অধীর হয়ে—
ধরার শৈল-নীবিবন্ধন মুহূর্ত্তে খ'সে যেন
জোসেফাইনের স্বপন ।ঙিয়া যায়
মানুষ সহসা দেবতা হয়েছে ফরাসী-সিংহাসনে
প্রাণদান নহে—প্রাণহননের অসীম শক্তি নিয়ে,

দেবতা নেপোলিয়ান।
অশ্বখুরের উর্দ্ধ-বিহারী ধূলায় সন্ধ্যা নামে
অকালসন্ধ্যা-আঁধার ঘনায় পরিত্যক্ত দিকে দিকে পশ্চাতে
মেসোপোটেমিয়া ব্যাবিলোনিয়ার প্রান্তরে প্রান্তরে।
প্রখর দিবস তবু—
ঘোর হয়ে ঘন ছায়া নেমে আসে ক্রন্দনে চীৎকারে,
ডেরিয়াস দেখে দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক-বিভীষিকা
ভারতবর্ষ গিরিবর্ত্মের পন্থা উদ্ঘাতিনী,
বীর-জন-পদ-যুগ-তলে যেন মসৃণ হয়ে লোটে
ম্যাসিডোনিয়ার আলেক্জাণ্ডারের
মিলায় সে ছবি, পরিখা-প্রাকার পার হয়ে আসে উদ্ধত গৌরবে
বিজয়মাল্য-পতাকা-শোভন বৈজয়ন্তী রথ—
সম্মুখে চলে অতি বিচিত্র বাদ্যের সম্ভার,
বিচিত্র বেশভূষা,
পশ্চাতে চলে শৃঙ্খল-বাঁধা বিজিত বন্দীদল,
রথ-পশ্চাৎ-চক্র-লগ্ন-লৌহ-শৃঙ্খলের
বাঁধনে বদ্ধ শ্রেষ্ঠ পুরুষ-নারী,
সদ্যবিজিত হতভাগ্ রাজ্যের,
বিজয়ী অট্টহাস্যে মিশিছে বিজিতের ক্রন্দন,
উদ্ধত-বেগ-ধাবন-দুষ্ট রথচক্রের তলে
পেষিত-পিষ্ট হতেছে কয়েকজন,
ভ্রূক্ষেপ নাই রথারূঢ় দেবতার
জুলিয়াস সিজারের,
রক্তবর্ণ-রবিমণ্ডল ডোবে পশ্চিম নভে

অযুত-লক্ষ বন্দীর রাঙা রক্তে রাঙিয়া যেন— ।
সহসা অকস্মাৎ
পরিবর্ত্তিত পটভূমিকায় হেরি যে সূর্য্যোদয়—
সিজারের রাঙা রক্তে রাঙিয়া দেবতা পঙ্কলীন,
রথারূঢ় দেব রথচক্রের তলে !
ঝড় নেমে আসে, ঝড়ের দোলায় দোলে চিঙ্গিসখান
কৃষ্ণবর্ণ তুরঙ্গমের ঘন কালো মেঘ দোলে,
দোলে আর ছোটে বন্যামুক্ত গিরিতটিনীর মত,
শত সহস্র অসির ফলকে চমকায় বিদ্যুৎ,
তুরগের খুরধ্বনিতে মিশায় চঞ্চল হ্রেষারব
চর্ম্মে বর্ম্মে ভয়াবহ ঘর্ষণ,
স্বেদস্রোতাবেগ সৃজিছে পঙ্ক পথের ধূলির পরে
ঘননিশ্বাসে আকাশের বুকে কুজ্ঝটি ছায়া দোলে—
দোলে আর ছোটে কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব চিঙ্গিসের,
ভয়াবহ ঝড় নামে পৃথিবীর বুকে—
ঝড় কালবৈশাখী ।

অনেক এসেছে, অনেক গিয়েছে কালবৈশাখী ঝড়
বর্ত্তমানে ও অতীতে ভবিষ্যতে
শাখা-পাতা-ফুল-ফল-হীন কাঁদে নির্ব্বোধ বনভূমি
শাখা-পাতা-ফুল-ফলবিহারিন কাঁদিছে প্রাণীর দল
ভয়-ভীত হয়ে প্রাণের আশঙ্কায়,
তবু তাহাদের বন্দনা করে যারা বন্দীর দল
ধূলি-আবিষ্ট অন্ধ-নয়ন ল'য়ে,

তাহাদের স্বরে মিলায়ে কণ্ঠস্বর,
গাহিতে পারি না ক্লেদাক্ত স্তুতিগান।
—তাদের দেবতা জানি, জানি আমি, আমার দেবতা নহে
উদ্ধত রথারূঢ় যে দেবতা, সে মোর দেবতা নহে,
আমার দেবতা অত্যাচারের ফাঁদে
দুর্ব্বল ভীরু জনে না কখনও বাঁধে,
গলিত অশ্রু-ছোঁয়ায় হৃদয়ে আগুন নিবিয়া যায়,
সোনার শস্য সোনা-হাসি হাসে জীবনের প্রান্তরে
স্পর্শ লভিয়া যার,
অতি-সকরুণ-মুগ্ধ-মানস সে দেবতা চেন কেহ?
আমি তার পুরোহিত।
কোটি অর্ব্বুদ বুদ্বুদ ফেনা জাগে নির্ঝর-জলে,
প্রতি বুদ্বুদে জাগে নির্ঝর-প্রাণ
এক আলো-শিখা জ্বলিছে গগনে ভূতলে ও অর্ণবে
রৌদ্র-জ্যোৎস্না-বিজলী-বাড়বা-আলেয়া-অগ্নি-রূপে,
এক চেতনার ক্রমশ বিকাশ-রেখা,
মূরতি লভিছে অচেতন হতে চেতনের কায়া মাঝে—
সেই চেতনের পরম শ্রেষ্ঠ রূপ,
যাহার মাঝারে আপন সত্তা পেয়েছে নির্ব্বিশেষ,
তারে কি চিনেছ কেহ,
দেহাতীত নহে—দেহরূপ সেই দেব?
আমি তার পুরোহিত।

এই পৃথিবীর ভূধর-মেখলা বারে বারে টুটিয়াছে

কঠিন হস্তে তার,
সাগরের জল ছলছল চঞ্চল
বহি ল'য়ে তার তরীসম্ভার ধন্য মেনেছে নিজে,
ঘন-অরণ্য-বিটপী-বিথার আপনারে সঁপিয়াছে,
নদী হতে জল, বন হতে ফল, লতা হতে ফুল পাতা
কীটের রেশম পশুর পশম ভার
অসংখ্য স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ-রূপ-রেখা-সম্পদ
দিবস রাত্রি আরতি করিছে তারে,
মুগ্ধ মৃত্যু বারে বারে এসে ভবন রচিয়া গেছে,
মহীয়ান দেব শতজন্মের গৌরব মহিমায়
আরও মহত্তর।
মৃত এ ভুবন পরশে যাহার জীবন লভিছে যেন,
ভাবময় যাহা রূপ লভিতেছে যার অন্তরে এসে,
আমি তার পুরোহিত।

আমার দেবতা মাটির প্রতিমা নহে,
কালো পাথরের ক্ষোদিত মূর্ত্তি নহে,
সাদা পাথরের ক্ষোদিত মূর্ত্তি নহে,
সোনা দিয়ে আর রূপা দিয়ে তার নির্ম্মাণ হয় নি কো,
অশ্রু-গলানো পরশে হৃদয়ে আগুন নিবিয়া যায়,
সোনার শস্য সোনা-হাসি হাসে জীবনের প্রান্তরে।
অতি সকরুণ-মুগ্ধ-মানস সে দেবতা চেন কেহ ?
আমি তার পুরোহিত।

শ্রীউমা দেবী

সরোজিনী

১

বিকালে বেড়াইতে বাহির হইতেছিলাম। পত্নী আসিয়া কহিলেন, রাত ক'র না, সন্ধ্যে হবার আগেই ফিরবে। কহিলাম, কেন? পত্নী হাসিবার উপক্রম করিয়াই গম্ভীর হইয়া কহিলেন, জান না নাকি? পাড়ায় যে একটা পেত্নীর ভর হয়েছে। সভয়ে কহিলাম, তাই নাকি? কোথায়? পত্নী ফিক করিয়া হাসিয়া কহিলেন, গাঙুলীদের প'ড়ো বাড়িতে। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সন্ধ্যা হইতে বেশি দেরি নাই, অথচ ঐ পেত্নী-আশ্রিত বাড়িটার পাশ দিয়াই যাইতে হইবে এবং ফিরিতেও হইবে, অতএব কাজ নাই বেড়াইতে গিয়া। ফিরিবার উপক্রম করিতেই পত্নী কহিলেন, যাবে না? মাথা চুলকাইয়া কহিলাম, থাকগে, আজ বেশি বেলা নেই, তা ছাড়া গাঙুলী মশায় সকাল সকাল ছাড়তে চান না, রাত্রে একটু কাজও আছে আমার।

পত্নী সাহস দিয়া কহিলেন, না, যাও, একটু ঘুরেই এসগে, গাঙুলী বুড়োর কাছে নাই বা গেলে। মুচকি হাসিয়া কহিলেন, দিনের আলোতে তো পেত্নী কিছু করে না, অন্ধকারেই ভয়।

গাঙুলী মশায়ের বাড়ির দিকেই চলিলাম। ইহা ছাড়া আর যাইবার জায়গাই বা কোথায়? ডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানাটি তো আমাদের বিপক্ষ দলের আড্ডা। পা দিলেই টীকা-টিপ্পনীর চোটে অস্থির করিয়া দিবে। থানায় দারোগাবাবুর কাছে যাওয়া চলে, কিন্তু রাস্তা অনেকখানি। তা ছাড়া হাকিমদের দরবারে হাজিরা দিয়াই উঠিয়া আসা চলে না। বিশেষ করিয়া এই দারোগাবাবুটি এত সাংঘাতিক রকমের ভাল লোক যে, আমাদের মত লোকদেরও পাইলে ছাড়িতে চাহে না, চেয়ারে বসাইয়া, চা, এমন কি, সিগারেট পর্য্যন্ত খাওয়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেন। কিন্তু আমাদের পাড়ায় পেত্নীর অধিষ্ঠান হইবার তো কোন কথা ছিল না! ও পাড়ায় অবশ্য দিন কয়েক হইল একটি

অল্পবয়সী বউ সন্তান প্রসব করিতে না পারিয়া শনিবারের ভরা সন্ধ্যায় চার পোয়া দোষ মাথায় লইয়া মারা গিয়াছে। পয়সার অভাবে প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্র, বিশেষ করিয়া, পঞ্জিকা যদি মিথ্যা না হয়, তাহা হইলে মেয়েটির প্রেত-যোনিপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। কিন্তু ও পাড়ার পেত্নী এ পাড়ায় কেন? পেত্নী হইলেও বেআইনী কাজ করা উচিত নয়।

গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দেখিলাম, আমাদের হারাণ আসিতেছে। হারাণ কালো, মোটা, মাথার ঠিক মাঝখানটিতে একটি ডবল পয়সার মত গোল টাক, মাকুন্দে মুখ, গায়ে গেঞ্জি, কাপড় ফেরতা দিয়া পরা, পা খালি। হারাণ চক্রবর্ত্তীর বাবা তেজারতি করিয়া অনেক বিষয়-আশয় কিনিয়া রাখিয়া মারা গিয়াছে। কাজেই হারাণকে কোন কাজ-কর্ম্ম করিতে হয় না, কেবল খাইতে, ঘুমাইতে, আড্ডা মারিতে, পরচর্চ্চা ও পরছিদ্রান্বেষণ করিতে হয়। আমাকে দেখিয়া হারাণ একগাল হাসিয়া কহিল, কি ভায়া, কখন ফিরলে? জজিয়তি হয়ে গেল?

বলিয়া রাখি, দিন কয়েকের জন্য জেলায় সেসন্স-কোর্টে একটা খুনের মকদ্দমায় জুরি হইয়া গিয়াছিলাম, কহিলাম, আজ সকালে।

ঝুলিয়ে এলে নাকি?

না, খালাস। কথাটি উল্টাইয়া দিয়া কহিলাম, গাঙ্গুলী মশায়ের খবর কি? বাড়িতে রয়েছেন তো? হারাণ এক মুহূর্ত্তে মুখের ভাব বদলাইয়া চিন্তাকুল হইয়া উঠিল এবং টাকের মাঝখানটিতে ডান হাতের তর্জ্জনী দিয়া খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, তাই তো ভায়া, বড় শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ! গাঙ্গুলী মশায়ের কোন বিপদ-আপদ হইয়াছে নাকি? উৎকণ্ঠিতভাবে কহিলাম, কি ব্যাপার, কোন অসুখ নাকি? হাতটি মাথা হইতে নামাইয়া গাল চুলকাইতে চুলকাইতে হারাণ কহিল, অসুখ, না সুখ, জানব কি ক'রে! দুদিন ধ'রে গাঙ্গুলী বুড়োর টিকি পর্য্যন্ত দেখা যায় নি। গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করলেই ফ্যাসফ্যাস ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, পাড়ার লোকে বলছে, বুড়োকে পেত্নীতে পেয়েছে।

বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, তার মানে? পুরাপুরি হাসিয়া হারাণ কহিল, মানে অনেক কিছু, যাও না গিন্নীর কাছে, তোমাকে হয়তো সব কথা খুলে বলবে। হারাণকে ধরিয়া রাখিবার জন্ত কহিলাম, তুমিও চল না, একসঙ্গে বাড়ি ফিরব এখন। হারাণ কহিল, না ভাই, আমি আর যাব না, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কনেবউ সন্ধ্যের পরে বাইরে থাকতে মানা করছে।—বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

হায় হায়! পেত্নীটা শেষে বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মশায়ের স্কন্ধে ভর করিল! গ্রামে কি আর শক্ত-সমর্থ স্কন্ধ খুঁজিয়া পাইল না! কিন্তু যে স্কন্ধে গাঙ্গুলী-গিন্নীর মত স্ত্রীলোক আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া কায়েমী হইয়া বিরাজ করিতেছে, সেখানে ভাগ বসাইতে যাইয়া এই নবীনা পেত্নীটি কি ভাল কাজ করিয়াছে?

গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়িতে আসিয়া বার দুই হাঁকাহাঁকি করিয়া ও বার কয়েক গলা-খাঁকারি দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, উঠানে আসন পাতিয়া দুই পা মেলিয়া বসিয়া, গাঙ্গুলী-গিন্নী সলিতা পাকাইতেছেন। মাথার ও গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিয়াছেন এবং বাম পায়ের হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত কাপড় সরাইয়া দিয়া, বাম হাত দিয়া পুরাতন বস্ত্র-খণ্ডটি অনাবৃত উরুদেশের উপর ধরিয়া ডান হাতের চাপ দিয়া দিয়া সেটিকে পাকাইয়া সলিতায় রূপান্তরিত করিতেছেন। আমাকে একবার কটাক্ষে দেখিয়া লইয়া আবার গম্ভীর বদনে নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। অঙ্গের আবৃত ও অনাবৃত অংশের অনুপাত অপরিবর্ত্তিত রহিল। মনটা ছোট হইয়া গেল। কথা না বলুন, কিন্তু আমার মত একজন পুরাদস্তুর পুরুষমানুষকে দেখিয়াও বেপরোয়া বসিয়া রহিলেন! বিন্দুমাত্র লজ্জা করিলেন না! আমাকে কি এখনও ছেলেমানুষ মনে করেন, না আজকাল চোখে কম দেখিতেছেন! যাহাই করুন, তাঁহাকে লজ্জিতা হইয়া উঠিবার সুযোগ দিবার জন্ত আর একবার গলা-খাঁকারি দিলাম। ফলে লজ্জার না হোক, বাকশক্তির আবির্ভাব ঘটিল, গলা ঝাড়তে হবে না, দেখতে পেয়েছি। কহিলাম, পেয়েছেন তো একটু সামলে বসুন, একেবারে জখম হয়ে গেলাম যে। দিদিমা গায়ে কাপড় তুলিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, জখম করবার যদি

ক্ষমতা থাকত তো অমনই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতে? এতক্ষণ পায়ের তলায় লুটোপুটি খেতে।

তাই তো ইচ্ছে করছে দিদিমা। নেহাত খালি উঠানটা ব'লে পেরে উঠছি না, একটা মাদুর-টাদুর—

থাক, আর লুটোপুটি খেয়ে কাজ নেই, ইচ্ছে হয় তো ঐ মোড়াটা নিয়ে ব'স। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, আজ না হয় বুড়ী হয়েছি, কিন্তু এমন দিন ছিল, একবার চোখে দেখবার জন্যে তোমার মত অনেক মিন্সে রাস্তার ধারে ঘুরঘুর করত; তাও তোমাদের বউদের মত মুখ খুলে মেমসাহেবদের মত বেড়িয়ে বেড়াবার রেওয়াজ ছিল না তখন, ঘরে বাইরে চব্বিশ ঘণ্টা এক হাত ঘোমটা দিতে হ'ত।

মোড়াটা টানিয়া লইয়া দিদিমার সামনে বসিয়া কহিলাম, সত্যি দিদিমা, এখনই দেখে আমার বুকের ভেতরটা কি রকম ক'রে উঠছে, চল্লিশ বছর আগে আপনাকে এমনই ক'রে দেখলে কি যে ক'রে বসতাম বলা যায় না, হয়তো—

দিদিমা হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, নিয়ে সটকাতে, এই তো? কিন্তু তোমার দাদামশায়ের লাঠি ছিল না? মাথা একেবারে ভেঙে দিত। আজকালই এমনই অগ্রাহ্যি, আগে একদণ্ড কাছ-ছাড়া হ'ত নাকি! সব সময়ে চোখে চোখে রাখত, আর কি সন্দেহ! দেওরদের সঙ্গে পর্য্যন্ত হেসে কথা কইবার জো ছিল না, ভিখিরীদের ভিক্ষে দিতে গেলে রেগে আগুন হয়ে যেত। প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, এখন বলে কিনা, বুড়ী মাগীর মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না।

উৎসুক কণ্ঠে কহিলাম, কি ব্যাপার দিদিমা? দাদামশায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন বুঝি?

দিদিমা খ্যাঁক করিয়া উঠিলেন, ঐ তোমার একচোখোমি। আমিই কেবল ঝগড়া করি! তোমার দাদামশায়টি একেবারে পরমহংসদেব! আমি যে কত সহ্যি করি, কি ক'রে জানবে? কথায় কথায় বুড়ী, চিপসী, তুবড়ী সহ্যি হয়? আর বয়েস কি আমার একলার হয়েছে, ওর হয় নি? আমারই দাঁত পড়েছে, ওর পড়ে নি? আমি যদি উল্টে বলি, বুড়ো, টিপসে, তোবড়া, তবে?

ব্যাপারটা পরিষ্কার করিবার জন্য কহিলাম, আমাকে সব খুলে বলুন দেখি, আমি মিটমাট ক'রে দিচ্ছি।

দিদিমা কহিলেন, ঝগড়া-টগড়া কিছু নয় যে, মিটমাট করতে হবে। ভাল কথা বলতে গেলাম, তো রেগে টং হয়ে সকালে বেরিয়ে গেল, এখনও ঘর ঢুকল না।

প্রশ্ন করিলাম, কি ভাল কথা বলেছেন?

দিদিমা জবাব না দিয়া ডান হাত দিয়া বাম হাতের শাঁখাটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, আচ্ছা ভাই, ওর বয়েস হয় নি? আমার চেয়ে দশ বছরের বড়, আমারই পঞ্চাশ পার হতে গেল—। কহিলাম, নিশ্চয়ই। কিন্তু দিদিমা, আপনাকে দেখলে কিন্তু এত বয়স ব'লে মনে হয় না। মনে হয় খুব জোর ত্রিশ, কি—

দিদিমা ধমক দিয়া কহিলেন, থাক, আর তোষামোদি করতে হবে না। যা বলছি শোন, বয়েস ওর হয়েছে, আমিই খাইয়ে-দাইয়ে তরিবৎ ক'রে অমনিটি রেখেছি তাই, নইলে ষাট বছরের বুড়ো, তা যতই দাঁত বাঁধিয়ে, মেরজাই গায়ে দিয়ে ছোকরা সেজে ঘুরে বেড়াক।

চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তা এখন পুজো-আর্চ্চা ক'রে পরলোকের কাজ গোছানো উচিত, না একটা ছুঁড়ী বিধবার পেছনে ছুটোছুটি করা উচিত? বনজঙ্গল নয়, সমাজ জায়গা—লোকে কি বলছে বল দেখি!

ব্যাপার খুব ঘোরালো বলিয়া মনে হইতেছে, কহিলাম, কিছুই তো বুঝতে পারছি না, সব কথা খুলে বলুন।

দিদিমা আবার ধমক দিলেন, ন্যাকামি দেখলে গা জ্বালা করে! সব কাজের সাগরেদ তুমি, তুমি কিছু জান না?

সত্যি বলছি দিদিমা, আমি তো ছিলাম না দিন কয়েক।

দিদিমা দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, তুমি আবার কোথায় গিছলে? নাত-বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বাড়ি পালানো শুরু করেছ বুঝি?

হাসিয়া কহিলাম, না না, জেলায় গিয়েছিলাম, একটু কাজ ছিল।

দিদিমা দুই ভ্রূ তুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, ওঃ, তাই ! আমি বলি—। তা যাক, শোন তবে, প্রবোধ ঠাকুরপোর বিধবা বউটা ফিরে এসেছে, শুনেছ তো ?

সবিস্ময়ে কহিলাম, না, কখন এসেছে ?

পরশু। এক বছর স্বামী মরেছে, এতদিন পরে স্বামীর ভিটের কথা মনে পড়ল। বুড়ো শাশুড়ীকে নিয়ে নাকি এতদিন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।—বলিয়া যুগপৎ ভ্রূ ও অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, নেহাত কচি বয়েস, ছেলেপিলে একটাও হয় নি। পশ্চিমে ছিল, যেমন শরীর হয়েছে, তেমনই গায়ের রং, রূপ যেন ফেটে পড়ছে। প্রবোধ ঠাকুরপোকে তখন বারবার মানা করেছিলাম বিয়ে করতে, তোমার দাদামশায়ের পরামর্শেই এ কাজ করলে কিনা! মিছিমিছি মেয়েটার সারা জীবনটা মাটি ক'রে দিয়ে গেল। টাকা-কড়ি ধন-দৌলত যাই থাক, তাতে কি মেয়েমানুষের মন মানে ? একটা ছেলে, নেহাত একটা মেয়ে থাকলেও হ'ত।—বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

* * *

প্রবোধ গাঙুলী পশ্চিমে রেলের কণ্ট্রাক্টারি করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিত। দেশে পৈতৃক জমিদারি অনেক বাড়াইয়াছিল এবং কর্ম্মস্থানেও নাকি বিস্তর সম্পত্তি করিয়াছিল। বৎসর ছয় পূর্ব্বে বিপত্নীক হইয়া দেশে ফিরিয়া প্রচার করিল, এ সংসারে আর থাকিবে না, সন্ন্যাস লইবে ; গুরু ও গেরুয়া দুইই সংগৃহীত হইয়াছে ; শুধু গুরুদেবের আদেশে পৈতৃক ভিটা জন্মের মত একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য দেশে আসিয়াছে। প্রবোধের গুরুজন স্থানীয় ও স্থানীয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা 'হায়-হায়' করিয়া উঠিল, প্রবোধের মত ছেলে সংসারে থাকিবে না তো কাহাদের জন্য সংসার ? এতবড় জমিদারি, এত টাকা, এত সুখ, এত স্ফূর্ত্তি ছাড়িয়া প্রবোধের কি সন্ন্যাসী হওয়া চলে ? প্রবোধ পরম বৈরাগ্যের সহিত কহিল, চলে, বুদ্ধদেব রাজার ছেলে ছিলেন। প্রবোধ এণ্ট্রান্স ক্লাসে ইতিহাস পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার

শ্রোতাদের সে সৌভাগ্য হয় নাই। তাহারা বলিয়া উঠিল, ওসব বৃদ্ধ-টুদ্ধুর কথা থাক। প্রবোধের সন্ন্যাসী হওয়া চলিবে না।

প্রবোধ কহিল, কি হবে সংসারে থেকে? ছেলেপিলে নেই—

বলিতে না বলিতে দুই হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়সের এক ডজন ছেলে প্রবোধের সামনে আনীত হইল। প্রবোধ যাহাকে ইচ্ছা এখনই পোষ্যপুত্র লউক। প্রবোধ ঘাড় ও হাত নাড়িয়া কহিল, এখন না, পরে ভেবে স্থির করব।

গাঙুলী মশায় গোপনে প্রবোধকে কহিলেন, পোষ্যপুত্র নিয়ে কি হবে? পরের ছেলে কখনও আপনার হয় না, একটা পুরোপুরি স্বকীয় ছেলের ব্যবস্থা কর।

প্রবোধ আন্দাজে গাঙুলী মশায়ের বক্তব্য বুঝিয়া মৃদুহাস্য সহকারে কহিল, কি করতে বলছেন? বিয়ে? এই পঞ্চাশ বছর বয়সী বুড়োকে কে মেয়ে দেবে?

গাঙুলী মশায় কহিলেন, কুলীন বামুনের বয়েস! খাবি খেতে খেতে বিয়ে করতে চাইলেও আমাদের কনের অভাব হয় না।

পরদিন প্রচার হইয়া গেল, প্রবোধ গাঙুলী বিবাহ করিবে। গ্রামের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাদের মহলে হিড়িক পড়িয়া গেল; তাহারা নিজ নিজ বিবাহযোগ্যা মেয়েগুলিকে প্রবোধের সামনে হাজির করিয়া রূপ ও গুণের পরীক্ষা দেওয়াইল, এবং শেষে মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পিতৃহীনা মামাতো বোন সপ্তদশী সরোজিনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া প্রবোধের পত্নীত্বপদ লাভ করিল।

সরোজিনীর কথা মনে পড়িল,—শান্তশিষ্ট লাজুক মেয়েটি, ছিপছিপে গঠন, দুধে-আলতা-গোলা গায়ের রং। প্রবোধের সামনে যখন চুলের মাপ দিতেছিল, কাছে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছিলাম, ঘনকৃষ্ণ চুলের রাশি পিঠ ছাপাইয়া হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। লম্বা ধরনের মুখ, টানা-টানা না হউক, সুন্দর ডাগর চোখ, সুগঠিত চিবুকপ্রান্তে একটি অকৃত্রিম তিল। মনু চক্রবর্ত্তীর যে এমন সুন্দরী বোন ছিল, তাহা কে জানিত! এ যেন ভিক্ষার ঝুলি হইতে লাখ টাকার হীরা বাহির করিয়া মনু গ্রামের ছোকরাদের তাক লাগাইয়া দিল।

আমরা সকলেই এমন চমৎকার মেয়েটিকে নিশ্চিত অকাল-বৈধব্যের কবলে সঁপিয়া দেওয়ার জন্য মন্নুকে গঞ্জনা দিতে লাগিলাম। কিন্তু গ্রামের প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারা তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মন্নু বেশ কাজ করিয়াছে, অদৃষ্টে থাকিলে ঐ স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া, সিঁথিতে সিন্দূর লইয়া সরোজিনী মরিবে; তা ছাড়া এত টাকা, এত সুখ, এত সম্পত্তি!

* * *

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, বুড়ী শাশুড়ী চোখে দেখতে পায় না, কে যে ঐ মেয়েকে সামলাবে!

বলিলাম, কেন? সরোজিনী তো খুব শান্তশিষ্ট মেয়ে।

দিদিমা ঠোঁট উল্টাইয়া কহিলেন, শান্তশিষ্ট মেয়ে! দেখে এসগে একবার, মেয়ে যেন উড়ছে! বিধবা হয়েছিস, থান-কাপড় পরবি, শুধু-হাত করবি, স্বামীর জন্যে দিনরাত কাঁদবি-কাটবি, তা নয় পরনে ধোপদস্ত কালাপেড়ে শাড়ি, গায়ে এক গা গয়না, চুলের তেমনই বাহার।

আপনি কি দেখতে গিয়েছিলেন নাকি?

দুই হাতের প্রসারিত বৃদ্ধাঙ্গুলি সামনের দিকে উঁচাইয়া দিদিমা কহিলেন, আমার দায় পড়েছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তোমার দাদামশায়টি যত নষ্টের গুরু কিনা! বউটা ওর ভাইয়ের ওখানে উঠতে যাচ্ছিল, তা মিন্সের মাথা টনটন ক'রে উঠল, গাঙুলী-বাড়ির বউ হয়ে চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে উঠবে! তা হ'লে ছিষ্টি রসাতলে যাবে যে! ব'লে শাশুড়ী বউকে টেনে এনে বাড়িতে ঢোকাল। হঠাৎ নাকী সুর ধরিয়া কহিলেন, এ কদিন আমার যে কি ক'রে কেটেছে ভাই, আমিই জানি, চোখ মেলে তাকাই নি, কানে শুনি নি।

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

দিদিমা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, কেন? দেখা যায়? শোনা যায়? বাপের বয়েসী বড়ঠাকুর, তার সামনে মাথার কাপড় খুলে ফরফর ক'রে ঘুরে বেড়ানো, রাতদিন আড়ালে-আবডালে গনগন ফসফস! কি করি, নতুন লোক, তা ছাড়া লোকের কথার ভয়, নইলে মনে হচ্ছিল ঝেঁটিয়ে বার ক'রে দিই। সহসা কণ্ঠস্বর করুণ পর্দ্দায় নামাইয়া কহিলেন, আহা!

শুড়ী মাগীটা বড় ভাল। ছেলের জন্তে দিনরাত ভূধারা বইছে। চোখে দেখতে পায় না, বউয়ের ভয়ে সন্ত্রস্ত। ঐ বউয়ের হাতে অনেক দুর্দশা হবে মাগীর, আমি ব'লে দিলাম তোমাকে। কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ উঁচু পর্দায় চড়াইয়া কহিলেন, কিন্তু ঐ ছুঁড়ীর? একটুও কষ্ট হয় নি। দিনরাত কেবল টাকা, টাকা আর টাকা। কোথায় কোন খাতকের দলিল তামাদি হচ্ছে, কোন প্রজা খাজনা ফাঁকি দিয়ে জমি খাচ্ছে, কে কোথায় ওর জায়গা মেরে নেবার চেষ্টা করছে, ছুঁড়ী সব খবর রাখে। প্রবোধ ঠাকুরপোকে বোধ করি মরবার সময়ে ইষ্টনাম পর্য্যন্ত করতে দেয় নি। আর কত চালাক! দলিলের হাতবাক্সটি কিছুতে হাতছাড়া করছে না। তোমার দাদামশায় কত বললে, একবার দাও দলিলগুলো, দেখি, না হ'লে বুঝব কি ক'রে, ব্যবস্থাই বা করব কি ক'রে, তো ছুঁড়ী কেবল মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

আর দাদামশায় কি করলেন?

রোষ-কষায়িত লোচনে দিদিমা কহিলেন, ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকতে লাগলেন। যেন কেউ কখনও অমন ক'রে হাসে নি। দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিলেন, ও হাসি ছুঁড়ীর থাকবে না তুমি দেখো, মুখ ওর পুড়বে। গাঙ্গুলী-বাড়ির মাথা নীচু হবে ব'লে তোমার দাদামশায় মাথা ঘামিয়ে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু ঐ মেয়েই গাঙ্গুলী-বাড়ির মাথা মাটিতে লুটিয়ে দেবে, আমি ব'লে দিচ্ছি।

কহিলাম, কখন গেছে ওরা এ বাড়ি থেকে?

দিদিমা কহিলেন, ছাড়তে কি চায় তোমার দাদামশায়! বলে, ঘরের বউ, শোকটা একটু সামলাক, তারপর যাবে। শোকে তো একেবারে উল্টে যাচ্ছে মেয়ে! আমি বললাম, ঘরদোর ওদের পরিষ্কার হয়েছে, সেইখানেই গিয়া শোক সামলাক ওরা। আমার সংসারে আর আমি রাখতে পারব না, তো কি রাগ মিন্সের! কাল বিকেলে নিয়ে গেল সব ওখানে। আবার, ছুঁড়ীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলা হ'ল, ঐ কিপটে মাগীর সহ্য হচ্ছে না তোমাদের এখানে থাকা, মাগী ধান-চাল টাকা-কড়ি মরবার সময় গাঁটরি বেঁধে নিয়ে যাবে। তা শুনে ছুঁড়ীর কি ফিকফিক হাসি! যাবার সময় একটা পেনাম পর্য্যন্ত ক'রে গেল না!

দাদামশায় কাল ফিরলেন কখন ?

ঐ নিয়েই তো ঝগড়া সকালে। কাল সন্ধ্যে থেকে হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে রইলাম, এই আসে, এই আসে! এল কিনা দুপুর রাত্রি পার ক'রে একেবারে খেয়ে-দেয়ে! পাড়ার লোক বলছে, ওখানেই নাকি ভাসুর-ভাদ্রবউ মিলে রান্না করেছে,—কত হাসি! কত মস্করা! পাড়ায় ঢি-ঢি প'ড়ে গেছে। হঠাৎ কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ করিয়া কহিলেন, বাঁচতে ইচ্ছে হয় না ভাই। মনে হচ্ছে, বিষ খেয়ে কিংবা গলায় দড়ি দিয়ে মরি। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বাষ্প-লেশ-শূন্য কণ্ঠে কহিলেন, তাই বললাম সকালে, গাঁসুদ্ধ ছেলে বুড়ো বউ ঝি তোমাকে গাঁয়ের মাথা ব'লে মানে, বুড়ো বয়েসে কেলেঙ্কারি ক'রে সেই মাথা হেট ক'র না, তো কি রাগ! বলে, নিজের দাঁত পড়েছে, চুল পেকেছে ব'লে বিশ্বসুদ্ধ সবাইকে বুড়োই দেখছে, মাগীকে দেখলে গা ঘিনঘিন করে। আবার নাকী সুরে কহিলেন, এই কথা আমাকে বলা! এই সহ্য করব আমি! ভারী রাগ হ'ল; ঝাঁটা হাতে ক'রে বললাম, যাও দেখি কোথা যাবে! এক পা বাড়ালে ঝ্যাঁটা মেরে বিষ ঝেড়ে দোব, তো মিন্সে কথা শুনলে না, আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া কহিলেন, চল্লিশের পর মেয়েমানুষের বেঁচে থাকা ভাল নয়।

কহিলাম, দুঃখ করবেন না, দাদামশায়ের রাগ তো! এতক্ষণ জল হয়ে গেছে, ফিরে এসে আবার আদর করবেন এখন।

দিদিমা কহিলেন, সারাদিন ফেরে নি। ঐখানেই নেয়েছে, খেয়েছে। যা ইচ্ছে করুক। কিন্তু পাড়ার লোক কি বলছে বল দেখি! সব সহ্যি করতে পারি, কিন্তু ঐ যে পাড়ার মেয়েরা দেখলেই 'আহা, উহু' করবে, আর পেছন ফিরলেই মুখ টিপে হাসবে, ও কখনও সহ্যি করতে পারি না, এতদিন সহ্যি করতে হয় নিও।

ব্যাপারটা বুঝিলাম। গাঙ্গুলী মশায়কে এতদিন ধরিয়া দেখিয়া বুঝিয়াছি, মেয়েদের সম্পর্কে কোনরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্যের বালাই তাঁহার নাই। যাহার জন্য তিনি মেয়েটির পাছু লইয়াছেন, তাহা মেয়েটির রূপ-যৌবন নহে, স্বামীপরিত্যক্ত অর্থ ও ভূ-সম্পত্তি। পাছে অন্য কেহ

মেয়েটির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাতে ভাগ বসায়, এই ভয়ে তিনি মেয়েটির কাছ-ছাড়া হইতে পারিতেছেন না।

কহিলাম, আপনি কিছু ভাববেন না। আপনি যা ভয় করছেন, তা নয়। মেয়েটির সত্যিই আপনার ব'লে আপনারা ছাড়া কেউ নেই।

দিদিমা ফোঁস করিয়া উঠিয়া কহিলেন, আমরা কিসের আপনার! আমাদের সঙ্গে সাত পুরুষ হয়ে গেছে। ওর বেশি আপনার বরং রাধানাথ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, কই, রাধানাথ তো নেচে বেড়াচ্ছে না! একবার খবর পর্য্যন্ত নেয় নি।

মনে মনে কহিলাম, নিয়েছে, তবে বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি বোধ হয়।

উঠিবার উপক্রম করিতেই দিদিমা কহিলেন, ভাই, ভুলিয়ে-ভালিয়ে এনে দাও, তারপর ব্যবস্থা করব আমি।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। শুক্ল পক্ষের রাত্রি। কিন্তু পশ্চিম আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় চতুর্থীর চাঁদের ক্ষীণ আলোটুকু আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। কয়েক দিন আগে সপ্তাহ খানেক ধরিয়া বাদল গিয়াছে; ফলে, রাস্তার ধারের ঘাসগুলা গজাইয়া উঠিয়াছে, ঝোপ-ঝাপগুলা ঘন হইয়া উঠিয়াছে এবং খানা-ডোবাগুলিতে জল জমিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বের আঁস্তাকুড়গুলাতে পচিয়া-উঠা আবর্জ্জনার গন্ধ নাকে আসিতেছে, এবং ডোবার ধার হইতে ভেকের সবিরাম গর্জ্জন ও ঝোপগুলার মধ্য হইতে মশকের অবিরাম গুঞ্জন শোনা যাইতেছে।

গাঙুলী মশায়ের মতলব কি? সরোজিনীর জমি-জায়গা টাকা-কড়ি গয়না-গাঁটি সব ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া বেচারাকে পথে বসাইতে চান নাকি? কিন্তু রাধানাথ চুপ করিয়া আছে কেন? সেই তো শুনিলাম, গাঙুলী মশায়ের চেয়ে সরোজিনীর বেশি আপনার, সে কি বসিয়া বসিয়া গাঙুলী মশায়কে নির্ব্বিবাদে সরোজিনীর সম্পত্তি হজম করিতে দিবে? রাধানাথকে যতদূর জানি, তাহাতে ইহা সম্ভব বলিয়া

মনে হয় না। তবে দিদিমা বলিয়াছেন, সরোজিনী অনেক চালাক হইয়াছে, মুখে চোখে নাকি খই ফুটিতেছে! পশ্চিমের জল-হাওয়ার গুণে নেহাত হাবা-গোবা লোকও চালাক-চতুর হইয়া উঠে। তবুও, রাধানাথ ও গাঙ্গুলী মশায়ের টানাটানি সামলাইয়া সরোজিনী তাহার সারা জীবনের সম্বলটুকু বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না।

প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ির সামনে হাজির হইলাম। রাস্তার ধারেই দোতলা পাকা বাড়ি; বাড়ির ডান পাশে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পড়িয়া আছে, পিছনে কিছুদূরে বাউরী ও মুচী পাড়া। রাস্তার উপরেই ফটক, আগে কাঠের দরজা ছিল, এখন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ফটক পার হইলেই ডান দিকে বৈঠকখানা এবং কয়েক পা আগাইলেই সামনে সদর-দরজা। দেখিলাম, বৈঠকখানা অন্ধকার, বাড়ির ভিতরে আলো জ্বলিতেছে।

গাঙ্গুলী মশায় কি আজও এখানে নৈশ-ভোজন সারিয়া বাড়ি ফিরিবেন নাকি? ওদিকে তো দিদিমা বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু গাঙ্গুলী মশায়কে বাহির করিয়া আনিব কিরূপে? হাঁকাহাকি করিলে কি ভাল দেখাইবে? আমি আসিয়াছি জানিতে পারিলে দাদামশায় নিশ্চয়ই বাহির হইয়া আসিবেন। কিন্তু ইহা জানাইবার তুইটি মাত্র উপায় আছে; প্রথম, গলা-খাঁকারি দেওয়া; দ্বিতীয়, গান গাওয়া। প্রথমটির সম্বন্ধে আপত্তি এই, আমার গলা-খাঁকারির যে বিশেষ ধরনটি আমার ব্যক্তিত্বের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাহা পৃথিবীর একটি মাত্র লোকের কাছেই বিশেষ পরিচিত। কাজেই, গাঙ্গুলী মশায় আমার গলা-খাঁকারি বিপক্ষদলীয় কাহারও—বিশেষ করিয়া রাধানাথের মনে করিয়া, হয়তো আরও চাপিয়া বসিবেন। দ্বিতীয় উপায়টি তো আমার পক্ষে একেবারে অচল। কারণ, গান গাহিতে জানি না, এবং জানিলেও একজন স্কুল-শিক্ষকের এমন সময়ে একজন ভদ্রমহিলার (বিশেষ করিয়া সুন্দরী বিধবার) বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া সঙ্গীত-চর্চ্চা করা উচিতও নয়। অতএব?

এমনই ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নানাপ্রকার সম্ভব অসম্ভব উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে কে হাঁক দিল, কে, কে হে তুমি?

চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম, অদূরে লণ্ঠন হাতে রাধানাথ দাঁড়াইয়া আছে। রাধানাথের গতিবিধিও তাহা হইলে আরম্ভ হইয়াছে। কহিলাম, আমি। রাধানাথ ধমকাইয়া কহিল, তুমি কে? ভদ্রলোকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করা হচ্ছে শুনি? রাধানাথ বোধ হয় চিনিতে পারে নাই। লণ্ঠনের আলোকে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য পা বাড়াইতেই রাধানাথ হাঁকিল, খবরদার! আগাবে না, এক পা আগালেই লোক ডাকব।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, আমি, রাধুদা। রাধানাথ পা দুই আগাইয়া আসিয়া লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, অ্যাঁ! তুমি! তোমার এই কাজ—বাড়িতে অমন বউ থাকতে! ছিঃ ছিঃ, রাধানাথ বলে কি! প্রতিবাদ করিলাম, কি যা তা বলছ? আমি গাঙ্গুলী মশায়ের খোঁজে এসেছি।

রাধানাথ লণ্ঠনটা নামাইয়া ড্যাবডেবে চোখ দুইটা আরও বড় করিয়া কহিল, বুড়ো কি এখনও রয়েছে নাকি? ওঃ, ছিনে জোঁককেও হার মানিয়েছে দেখছি! আচ্ছা, দাঁড়াও তুমি, আমি এখনই তাড়াচ্ছি বুড়োকে। আমার নিজের বউঠান, আর কোথাকার কে সাউকিরি ফলাতে এসেছে!—বলিয়া রাধানাথ বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই বাড়ির ভিতর হইতে রাধানাথের হাঁক শোনা গেল, বুড়ো নাই হে, স'রে পড়। কোমল নারীকণ্ঠের প্রশ্ন শ্রুত হইল, কে ঠাকুরপো? রাধানাথ তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, ঐ আমাদের মাস্টার, গাঙ্গুলী বুড়োর খোঁজ করছিল। বুড়ো এখানে এসেছিল বুঝি?

উত্তর হইল, এসেছিলেন আবার কি! সকাল থেকেই তো ছিলেন। গিন্নীর সঙ্গে বুঝি ঝগড়া হয়েছে। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই একটু আগে বিদেয় করেছি। রাধানাথ বিস্ময়ের সুরে কহিল, তাই নাকি? ওঃ! খোঁজ-টোজ বাজে কথা তা হ'লে, বুড়োর হয়ে পাহারা দিচ্ছিল মাস্টার। হাঁক দিয়া কহিল, কি হে, গেলে, না আড়ি পাতছ দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

নারীকণ্ঠ হাস্য-তরল স্বরে কহিল, ও বিদ্যেও আছে নাকি?

রাধানাথ উচ্চকণ্ঠে বোধ করি আমাকে শুনাইবার জন্যই কহিল, খুব। দিন কয়েক থাক না, হরেক রকমের বিদ্যে দেখতে পাবে।

অগত্যা চলিয়া আসিলাম। কিন্তু রাধানাথের কাণ্ড দেখুন দেখি! একজন নিরপরাধ লোকের নামে এমনই করিয়া দুর্নাম প্রচার করা! তাহা আবার একজন মহিলার সামনে! সরোজিনী আমাকে কি মনে করিল কে জানে!

মনটা বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি একজন স্কুলের শিক্ষক; ছাত্রদের লেখাপড়া ও স্কুল সম্বন্ধীয় কাজকর্ম্ম লইয়াই আমার থাকা উচিত। গ্রাম্য দলাদলির মধ্যে মাথা গলাইবার আমার প্রয়োজন কি? কিন্তু উপায় নাই। প্রত্যেক গ্রামেই কি হিন্দু, কি মুসলমান, দুই জাতির মধ্যেই দুই বা ততোধিক দল আছে; গ্রামে বাস করিতে হইলে কোন একটা দলে যোগদান না করিয়া উপায় নাই। কারণ নিরপেক্ষ ব্যক্তি বিপদে-আপদে কোনও দলের কাছ হইতেই সাহায্য পাইবে না। অবশ্য গ্রাম্য দলাদলি যে আজকালই দেখা দিয়াছে তাহা নহে, আগেও ছিল। তবে আগে ইহার প্রকৃতি ছিল সামাজিক, আজকাল হইয়াছে রাজনৈতিক, অর্থাৎ সদাশয় সরকার বাহাদুর স্বায়ত্ত-শাসন দান করিয়া আমাদিগকে সামাজিক জীব-পর্য্যায় হইতে রাজনৈতিক জীব-পর্য্যায়ে প্রমোশন দিয়াছেন। ইউনিয়ন-বোর্ডের ইলেক্‌শনের সময়ে কেহ দয়া করিয়া কোন পল্লীগ্রামে আসিলেই, আমাদের রাজনৈতিক চেতনা যে কিরূপ চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, বুঝিতে পারিবেন। বুঝিতে পারিবেন, দল বাঁধাবাঁধিতে, বিপক্ষ দলের মিথ্যা কুৎসা প্রচারে, কূট-বুদ্ধি ও কলা-কৌশলে, যেন তেন প্রকারেণ ভোট সংগ্রহে, এবং ভোটার লইয়া হাতাহাতি ও টানাটানিতে, কলিকাতা কর্পোরেশন, জেলা-বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির ধুরন্ধরদের চেয়ে আমরা তিলমাত্র কম নহি। পাড়াগাঁয়ের প্রত্যেকটি স্কুল এই রাজনৈতিক সংগ্রামের দুর্গ-স্বরূপ। যে পক্ষ এই দুর্গ অধিকার করিতে পারে, তাহার জয় অনিবার্য্য। কারণ, বিনা খরচে এতগুলি নিষ্কাম ও নিরতিশয় বিশ্বস্ত প্রচারক ও ভোট-সংগ্রাহক অপর পক্ষ পয়সা দিয়াও জুটাইতে পারে না।

দেখিলাম, গাঙ্গুলী মশায় হনহন করিয়া আসিতেছেন। আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ, অ্যাঁ?

কহিলাম, আপনার ওখানে।

গাঙ্গুলী মশায় ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, গিন্নী কিছু বলছিল নাকি?

কহিলাম, হ্যাঁ, আপনি নাকি রাগ ক'রে সারাদিন বাড়িতে পা দেন নি?

গাঙ্গুলী মশায় সক্ষোভে কহিলেন, হ্যাঁ, তাই তো। ঘরে আর ফিরব না, থাকুক মাগী একলা। আমি কোথায় একটা অনাথা বিধবা যাতে দু মুঠো খেতে পরতে পায়, তার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছি, আর তাতে ও মাগী টিকটিক করছে! এই বয়সে ওসব ভাল লাগে? তুমিই বল দেখি ভায়া?

অজ্ঞতার ভান করিয়া কহিলাম, অনাথা বিধবা আবার কোথায় পেলেন?

কেন? আমাদের প্রবোধের স্ত্রী এসে পড়েছে যে! আমার ওখানেই উঠল এসে। ভারী আনন্দ হ'ল। গ্রামে প্রবোধের সত্যিকার আপনার বলতে তো আমিই, রাধানাথ আত্মীয় হ'লেও চিরদিন শত্রুতা ক'রেই এসেছে। তা, তোমার দিদিমা এ সম্বন্ধে কিছু বলে নি?

কহিলাম, বলেছেন। কিন্তু, তিনি তো বলছিলেন, রাধানাথই মেয়েটির নিকট-আত্মীয়।

দুই চোখ ডাগর করিয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, তাই নাকি? বুড়ী বলছিল ঐ কথা? ঘাড়টি নাড়িয়া কহিলেন, ও তাই বলবে, ভীমরতি ধরেছে কিনা! সক্রোধে কহিলেন, হুঁ, আত্মীয়! আত্মীয় নয় হে, জ্ঞাতি। মহাভারত তো পড়েছ, জ্ঞাতি শত্রুর চেয়ে শত্রু আছে নাকি জগতে?—বলিয়া মাথাটা উঁচাইয়া চোখ দুইটা আমার দিকে স্থির করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই মাথাটা সোজা করিয়া, ঝাঁকানি দিয়া কহিলেন, শত্রু ছাড়া ও কিছু নয়, পরম শত্রু, প্রবোধের বিয়ের সময় কেমন বাগড়া দিয়েছিল মনে নেই? আমি দাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়েছিলাম তাই।

তবে যে রাধানাথকে দেখলাম প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ি ঢুকতে?

দুই চোখ কপালে তুলিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, সত্যি নাকি? কখন?

এইমাত্র, আপনাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম আমি।

শুষ্ককণ্ঠে গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, তারপর?

তারপর আর কি? রাধানাথ ঢুকল, সাদরে অভ্যর্থনাও হ'ল, মেয়ে-গলার হাসিও শুনলাম যেন একবার, তারপর এতক্ষণ বউঠান-ঠাকুরপোতে রসালাপ চলছে বোধ হয়।

গাঙ্গুলী মশায়ের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। আর্ত্তকণ্ঠে কহিলেন, সত্যি! হায় হায়! বিধবাটাকে আর বাঁচাতে পারলাম না, রাঘব-বোয়ালের পেটেই গেল শেষে।—বলিয়া রাস্তার উপরেই বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, ও কি করছেন? গাঙ্গুলী মশায় ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, দাঁড়াও, একটু বসি; আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে।—বলিয়া উবু হইয়া বসিয়া দুই হাঁটুর উপর খাড়া ভাবে স্থাপিত বাহুদ্বয়ের প্রসারিত করতলে মুখটি রাখিয়া মূর্ত্তিমান শোকের মত বসিয়া রহিলেন।

গাঙ্গুলী মশায় কি বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও হার মানাইবার মতলব করিয়াছেন নাকি? না হইলে, অনাথা বিধবার জন্য এই বয়সে এতখানি দরদ বাংলা দেশে সচরাচর দেখা যায় না।

কহিলাম, বাড়ি চলুন; এখানে ব'সে থেকে কি হবে?

গাঙ্গুলী মশায় আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, এখনও গল্প করছে বোধ হয়; আড়ি পেতে শুনলে হয় না?

কহিলাম, পাগল হয়েছেন নাকি? লোকে দেখলে বলবে কি?

তা বটে। কিন্তু কি করা যায় বল দেখি?

কহিলাম, বেশ তো। রাধানাথই সব ব্যবস্থা করুক। যে কেউ হোক করলেই হ'ল; মোটের ওপর, বিধবাটির কোন কষ্ট না হয়, এইটি সকলকেই দেখতে হবে।

গাঙ্গুলী মশায় তাতিয়া উঠিয়া কহিলেন, পাগল নাকি! আমি বেঁচে

থাকতে রাধানাথ মুরুব্বিয়ানা করবে? কিছুতেই না।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজই একটা হেস্তনেস্ত করব আমি, এখনই যাব ছুঁড়ীর কাছে। চোখে আঙুল দিয়ে ব'লে আসব, মরণ-দশা ধরেছে তোর। মাথা ধরেছে, গা ম্যাজম্যাজ করছে ব'লে আমাকে বিদেয় ক'রে দিয়ে, রাধানাথকে বসিয়ে গল্প করার ফল ভাল হবে না। ইহকাল পরকাল দুইই হারিয়ে পথে বসতে হবে, এস দেখি আমার সঙ্গে তুমিও, কাছে দাঁড়িয়ে থেকে শুনে আসবে।—বলিয়া হাত ধরিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। বাধা দিতে দিতে কহিলাম, দাঁড়ান, দাঁড়ান, ওতে ভাল হবে না। হঠাৎ রাগের মাথায় কোন কাজ না ক'রে ভেবে চিন্তে করা উচিত। আজ বাড়ি চলুন, কাল ভেবে চিন্তে কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে।

গাঙুলী মশায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কি হবে?

কহিলাম, রাধানাথের অসাধ্য কিছু নেই, এখনই হয়তো এমন ফ্যাসাদে ফেলে দেবে যে, কাল গাঁয়ে মুখ দেখানো যাবে না।

মন্ত্রাভিভূত সর্পের মত এক মুহূর্ত্তে শান্ত হইয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন; তা বটে। কিন্তু বাড়ি তো যেতে পারব না। মাগীকে বড় গলা ক'রে ব'লে এসেছি, আর বাড়ি ফিরব না। চল, তোমার ওখানেই আজ যাওয়া যাক। রাত্রিটা তোমার বৈঠকখানায় প'ড়ে কাটিয়ে দোব। মাগীর তেজটা একটু কমুক।

কহিলাম, তা কি হয়?

গাঙুলী মশায় ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, বুড়ো বামুনকে এক রাত্রি দুমুঠো খেতে দিতে পারবে না হে?

ছি ছি, কি বলছেন!—বলিয়া পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিলাম, আমাদের বাড়িতে পায়ের ধূলো দেবেন, সে তো আমার ভাগ্যের কথা, কিন্তু দিদিমা ভারী দুঃখ করবেন। তা ছাড়া মনের যা অবস্থা দেখে এসেছি!

গাঙুলী মশায় কিঞ্চিৎ উদ্বেগের সহিত প্রশ্ন করিলেন, কি?

জবাব দিলাম, মনের অবস্থা খুবই খারাপ। অন্য বিষয় নিয়ে

ঝগড়া হ'লেও বা, মানে, এর মধ্যে ঐ সুন্দরী বালবিধবাটি রয়েছে কিনা, মানে, ওঁর মনে একটু সন্দেহ হয়েছে, আপনি হয়তো—

বাধা দিয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন, পাগল নাকি! মেয়ের বয়সী।

যাই হোক, এ অবস্থায় আপনি যদি বাড়ি না ফেরেন তো মনের দুঃখে একটা কিছু ক'রে বসতেও পারেন।

গাঙুলী মশায় এবার সত্যই উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, সত্যি। যা ওর মেজাজ, কিছু অসাধ্য নেই ওর। একবার রেগে কুয়োতে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল। ফেরাই যাক, কিন্তু তুমিও সঙ্গে চল ভায়া।

সাহস দিয়া কহিলাম, কিছু চিন্তা নেই আপনার; আমি বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি, কিছু বলবেন না আপনাকে।

গাঙুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, বেশ বোঝবার লোকটি! পিঠে হাত দিয়া কহিলেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিটমাট ক'রে দিয়ে আসবে চল, না হ'লে সারারাত ঝগড়া করবে এখন।

অগত্যা যাইতেই হইল। বাড়ি পৌঁছিয়া দাদামশায়কে বৈঠকখানায় বসাইয়া, ভিতরে গিয়া দেখিলাম, দিদিমা উঠানে গালে হাত দিয়া বিরহ-ব্যাকুলা কণ্বতনয়া শকুন্তলার পোজে বসিয়া আছেন। খুব যে চিন্তা-মগ্না, দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। আমার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলেন না বোধ হয়। কাছে গিয়া ডাক দিলাম, দিদিমা! চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, কে? আমার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, ওঃ, তুমি? উনি এসেছেন? মৃদুকণ্ঠে কহিলাম, এসেছেন, অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে এনেছি। আজ আর ঝগড়া করবেন না। দিদিমা অভিমানাহত কণ্ঠে কহিলেন, না, ঝগড়া কেন করব? ঝগড়া আমি নিজে হতে করি? উনি করেন ব'লেই করি।—বলিয়া আবার হাতে গাল রাখিয়া অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, এও কপালে ছিল! কবে যে মরণ হবে জানি না। মৃদুতর কণ্ঠে আশ্বাস দিয়া কহিলাম, ভয় নেই আপনার। রাধানাথ জুটে গেছে।

দিদিমা এক মুহূর্ত্তে চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া কহিলেন, তাই নাকি? হঠাৎ দুই হাত যুক্ত করিয়া কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, মা চণ্ডী!

তুমি আছ, তোমাকে ষোল আনার পূজো দোব আমি, আমাকে কহিলেন, ওকে পাঠিয়ে দাওগে।

কহিলাম, তা কি হয়! আপনি নিজে গিয়ে নিয়ে আসুন।

দিদিমা ফোঁস করিয়া উঠিয়া কহিলেন, কি, ও নিজে করবে দোষ, আর আমাকে তোষামোদ ক'রে বাড়ি আনতে হবে? কি মনে করেছ বল দেখি তোমরা? বিষ নেই? ঐ করবীগাছের শেকড় বেটে খেয়ে মরতে পারি না আমি?—বলিয়া উঠানের এক কোণে একটা করবীগাছের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন।

সত্যই তো! গাঙুলী মশায়ের বেশ কাণ্ড! হাতের কাছে বিষ আগাইয়া দিয়া বাহিরে এই কীর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেছেন! ত্রস্তকণ্ঠে কহিলাম, আবার পাগলামি শুরু করলেন! বলছি যে, আর কিছু ভয় নেই। আমি বাড়িতে ছিলাম না তাই এতটা করেছেন, থাকলে করতে দিতাম না। ফিসফিস করিয়া কহিলাম, প্রবোধ গাঙুলীর স্ত্রী ওঁকে বিদায় ক'রে দিয়ে রাধানাথের সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করছে, নিজের চোখে দেখে এসেছি।

দিদিমা, সজল চক্ষে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, বেশ, তুমি যাও, আমি ডেকে নিয়ে আসছি এখনই। বাহিরে আসিতেই দাদামশায় কহিলেন, কি হ'ল? কহিলাম, আসছেন এখনই।

আসছেন তো কখন! মশার কামড়ে যে অস্থির ক'রে দিলে!—বলিয়া চটাস করিয়া একটি মশকের প্রাণ-সংহার করিলেন।

হাসিয়া কহিলাম, অত অস্থির হ'লে চলবে কেন? পাপ করেছেন, প্রায়শ্চিত্ত একটু হোক।

গৃহে ফিরিতেই পত্নী কহিলেন, এত রাত পর্য্যন্ত বাইরে কোথায় ছিলে? মানা করলাম না তখন!

গম্ভীর মুখে কহিলাম, পেত্নী ছাড়াচ্ছিলাম।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া পত্নী কহিলেন, গাঙুলী বুড়োর বুঝি?

হুঁ, ছাড়িয়ে, তাঁকে গিন্নীর হেপাজতে রেখে এলাম।

পেত্নী গেলেন কোথায়?

রাধানাথের ঘাড়ে।

তার মানে?

ব্যাপার সব খুলিয়া বলিলাম। পত্নী সব শুনিয়া কহিলেন, এ গাঁয়ের সবই উল্টো। গাঁয়ে এমন একটা সুন্দরী ছুঁড়ী এসেছে, কোথায় গাঁয়ের ছোকরা-মহলে হৈ-হৈ প'ড়ে যাবে, কিন্তু তার কিছু নেই। ওদিকে বুড়োদের মধ্যে মাতামাতি শুরু হয়ে গেছে। গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিলেন, কিন্তু তুমি এই রোজাগিরি ছাড় দেখি, পেত্নী যদি ঘাড়ে চেপে বসে তো মুশকিল হবে। রোজাকে পেলে নাকি পেত্নীরা সহজে ছাড়তে চায় না।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

নরায়ণ

তাই হোক, তাই হোক—
মাটির বক্ষে মাটির মানুষ পুন হোক বীতশোক।
খেয়ালী শিবের লীলা অদ্ভুত, মানুষে করেন মৃত্যুর দূত,
আত্মঘাতের এ মহাযজ্ঞে পূত হয় নর-লোক।
কবি বাল্মীকি মুদিত নয়ন এখনো লেখে নি নব নরায়ণ,
ভবিষ্যতের মানুষের তরে রচিত হয় নি শ্লোক।
পৃথিবী জুড়িয়া চলে আয়োজন মানুষ-মিথুনে হানে ব্যাধজন,
তমসার তীর মন্থন করি ফুটিছে অরুণালোক।
তাই হোক, তাই হোক—
মৃত্যুর মাঝে মর্ত্ত্য মানুষ পুন হোক বীতশোক।

বিদ্যাসাগর

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার বাসা। ডাক্তার দুর্গাচরণ ও বিপিন নামক একটি লোক কথাবার্তা কহিতেছেন। ডাক্তার দুর্গাচরণের একটু বয়স বাড়িয়াছে তাহা বোঝা যাইতেছে

দুর্গাচরণ। আপনি বিধবা-বিবাহ করতে রাজি আছেন ?

বিপিন। আছি, কিন্তু ওই যে বললাম, আমার টাকা চাই।

দুর্গাচরণ। ঈশ্বরকে বলেছেন সে কথা ?

বিপিন। বলেছি।

দুর্গাচরণ। কি বললে সে ?

বিপিন। বললেন, বণ্ডে সই করতে হবে।

দুর্গাচরণ। তাতেও রাজি আছেন ?

বিপিন। আছি।

বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও বয়স বাড়িয়াছে দেখা যাইতেছে। তাঁহার হাতে একখানি কাগজ

বিদ্যাসাগর। এই যে দুর্গাচরণ, এসে গেছ দেখছি।

দুর্গাচরণ। কেন ডেকেছ বল দিকি ?

বিদ্যাসাগর। বলছি। [বিপিনকে] নাও, সই কর।

বিপিন সই করিয়া দিল

দশ তারিখে বিয়ে হবে, সেই সময় টাকাটাও পাবে।

বিপিন। কিছু অগ্রিম পেলে সুবিধে হ'ত আমার।

বিদ্যাসাগর। অগ্রিম পাবে না।

বিপিন। আচ্ছা, তা হ'লে দশ তারিখেই নেব।

প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল

বিদ্যাসাগর। তোকে ডেকেছি টাকার জন্যে, কিছু টাকা দিতে পারিস ?

দুর্গাচরণ। কেন ?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহের খরচ এত বেশি হচ্ছে যে, সামলাতে পারছি না।

দুর্গাচরণ। এ রকম ভাবে কত দিন তুমি বিধবা-বিবাহ চালাবে ?

বিদ্যাসাগর। আমি একা চালাব, এ রকম কথা তো ছিল না। তোমরা সবাই আশ্বাস দিয়েছিলে, টাকার জন্য ভাবনা নেই, এখন কিন্তু তোমাদের কারও টিকিটি দেখা যাচ্ছে না।

দুর্গাচরণ। তবু চালাতে হবে ? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, এরা টাকার লোভেই খালি—

বিদ্যাসাগর। দেখ, ওসব আলোচনা ক'রে কোন লাভ নেই, ওরা টাকার লোভে বিয়ে করছে এই ওজুহাতে কর্ত্তব্য কর্ম্মের দায়িত্ব এড়ানো যায় না। ওসব কথা যাক, তুমি হাজার খানেক টাকা দিতে পারবে কি না বল।

দুর্গাচরণ। ধার দিতে পারি, দান করতে পারব না।

বিদ্যাসাগর। বেশ, ধারই দিও।

দুর্গাচরণ। তোমার ছেলেরও নাকি বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছ ?

বিদ্যাসাগর। সে নিজেই করতে চাইছে, আমি কিছু বলি নি।

একটি ভৃত্য কতকগুলি কাগজপত্র আনিয়া টেবিলে রাখিয়া গেল

দুর্গাচরণ। ওসব আবার কি ?

বিদ্যাসাগর। প্রুফ।

দুর্গাচরণ উঁকি দিয়া দেখিলেন

দুর্গাচরণ। বহুবিবাহ! বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও কিছু করছ নাকি ? ভিমরুলের চাকে একটা ঢিল মেরেই তো নাস্তানাবুদ হবার যোগাড় হয়েছ, আবার কেন ?

বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না। প্রুফগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন

দুর্গাচরণ। টাকাটা তোমার আজই চাই ?

বিদ্যাসাগর। আজ পেলেই ভাল হয়।
দুর্গাচরণ। আচ্ছা, বিকেলে নিয়ে আসব তা হ'লে, এখন যাই।
বিদ্যাসাগর। আচ্ছা।

দুর্গাচরণ চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর প্রুফগুলি সংশোধন করিতে লাগিলেন। একটু পরে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত

বিদ্যাসাগর। এস শ্রীশ, ব'স, তারপর খবর সব ভাল তো?

শ্রীশ কোন উত্তর দিলেন না, একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন

কি, ব্যাপার কি, অমন বিমর্ষ কেন?
শ্রীশ। মনটা ভাল নেই।
বিদ্যাসাগর। কি হ'ল হঠাৎ?

শ্রীশ নীরব রহিলেন

দাঁড়াও, তোমার মন ভাল ক'রে দিচ্ছি। হাজিপুরি ল্যাংড়া আম যোগাড় করেছি কিছু, আনি, থাম। [উঠিতে গেলেন]
শ্রীশ। থাক, আমি এখন খাব না কিছু। আমি দুর্গাচরণের খোঁজে বেরিয়েছি।
বিদ্যাসাগর। সে তো এই যাচ্ছে। অসুখ নাকি কারও?

শ্রীশ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন

শ্রীশ। আমি আর বাঁচব না ভাই।
বিদ্যাসাগর। কেন?
শ্রীশ। কাল রাত্রে পেটে এমন একটা ফিক-ব্যথা উঠল, মনে হ'ল, গেলাম এবার। সত্যি, আমি বড় ভয়ে ভয়ে বাস করছি ভাই।
বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] কেন, ভয়টা কি?
শ্রীশ। সত্যি বলছি ভাই, বিধবা বিয়ে ক'রে অবধি এতটুকু শান্তি নেই আমার। আত্মীয়স্বজনরা পরিত্যাগ করেছে, পাড়াপড়শীরাও ভাল ক'রে কথা কয় না, মনে হয়, এ কোথায় বাস করছি আমি, প্রাণটা সর্ব্বদা হুহু করে, তা ছাড়া—[থামিয়া গেলেন]
বিদ্যাসাগর। [মৃদু হাসিয়া] তা ছাড়া আবার কি?
শ্রীশ। তা ছাড়া, আমার মাঝে মাঝে কেমন সন্দেহ হয়, কালীমতি তার

আগের স্বামীর কথা চিন্তা করে লুকিয়ে। একদিন দেখলাম, কাঁদছে।

বিদ্যাসাগর হাসিয়া ফেলিলেন

বিদ্যাসাগর। তুমি একটি নির্ব্বোধ।

শ্রীশ। হয়তো। তবু আমার কথাটা শোন।

বিদ্যাসাগর। কিছু শুনতে চাই না, তুমি আগে খোঁজ ক'রে দেখ, যারা বিধবা-বিবাহ করে নি, তাদের ও রকম হয় কি না।

শ্রীশ। কি রকম?

বিদ্যাসাগর। তোমার যা যা হয়েছে, অর্থাৎ তাদেরও কারও কারও আত্মীয়স্বজন তাদের পরিত্যাগ করেছে কি না, তাদেরও কারও কারও পেটে ফিক-ব্যথা ধরে কি না, তাদেরও স্ত্রী লুকিয়ে কাঁদে কি না।

শ্রীশ। কিন্তু—

বিদ্যাসাগর। কিন্তুটা তোমার মনে, বাইরে কোথাও নেই। বেশি দূর যাবার দরকার কি, আমাকেই দেখ না, আমি তো বিধবা-বিবাহ করি নি, কিন্তু আমারও আত্মীয়স্বজনরা আমার ওপর কেউ বড় সন্তুষ্ট নন, কেবল টাকার দরকার হ'লেই আমাকে মনে পড়ে, এমন কি বাবাও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে থাকেন। আমার পেটের ব্যাপার তো জানই, চিরকাল ভুগছি। আর আমার স্ত্রীর—থাক, স্ত্রীর কথাটা আর নাই বললুম। [হাসিলেন]

শ্রীশ। তোমার কথা আলাদা। তুমি বিনা ক্লোরোফর্মে কার্বাঙ্কল কাটাতে পার, দরকার হ'লে আরসোলা গিলে খেতে পার, আমি পারি না; আমি দুর্ব্বল, আমার কেবল মনে হয়—

থামিয়া গেলেন ও চাহিয়া রহিলেন

বিদ্যাসাগর। কি কাণ্ড!

শ্রীশ। আমি পারছি না ভাই, আমার—

বিদ্যাসাগর। তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক হয়ে যদি এইসব তুচ্ছ কারণে ভেঙে পড়, তা হ'লে সাধারণ লোকে কি করবে বল দেখি?

তোমার আদর্শে কত লোক বিধবা-বিবাহ করছে, তুমি অমন করলে চলে কি?

শ্রীশ। আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।

বিদ্যাসাগর। কালীমতির যে ছেলেবেলায় একবার বিয়ে হয়েছিল, এই কথাটাকেই তুমি এত বড় ক'রে দেখছ কেন?

শ্রীশ। সেই কথাটাকেই যে বড় ক'রে দেখছি তা ঠিক নয়। [সহসা] কাল খবর পেলাম, শালকের যে লোকটি বিধবা-বিবাহ করেছিল, সে হঠাৎ মারা গেছে কলেরায়।

বিদ্যাসাগর। তোমার কি ধারণা, বিধবা-বিবাহ করলেই মানুষ অমরত্ব লাভ করবে?

শ্রীশ। না, তা আমি বলছি না।

বিদ্যাসাগর। এর উল্টোটাও যে হচ্ছে, যোগেনও বিধবা বিয়ে করেছিল, কিন্তু তার বউটাই ম'রে গেল, যোগেন বেঁচে আছে দিব্যি।

শ্রীশ। কিন্তু বিধবা-বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গেই কলেরা হওয়াটা একটু এ নয় কি?

বিদ্যাসাগর। এ বছর কলেরায় যত লোক মরেছে, সকলেই কি বিধবা-বিবাহ ক'রে মরেছে বলতে চাও? [সহসা] মরবে না? যে দেশে বিজ্ঞানের চেয়ে শীতলা আর ওলাবিবি বড়, বিচারের চেয়ে আচার বড়, সে দেশে মানুষ মরবে না তো কোথায় মরবে?

শ্রীশ। আমি তোমার যুক্তি মানি, কিন্তু—

বিদ্যাসাগর। আবার কিন্তু কেন, সত্যিই যদি বুঝতে পেরে থাক যে, রজ্জুটা সর্প নয়, তা হ'লে শুধু শুধু আঁতকে ওঠার মানে কি?

শ্রীশ। সংস্কার।

বিদ্যাসাগর। সংস্কার, সংস্কার, সংস্কার—শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল! এই সংস্কারের পাঁকে সমস্ত দেশটা ডুবে যাচ্ছে, ঝুঁটি ধ'রে টেনে তোল তাকে।

শ্রীশ। আমি ভাই দুর্ব্বল।

বিদ্যাসাগর। কে বললে, তুমি দুর্ব্বল? তোমার মত এত বড় বীরত্ব

বিদ্যাসাগর। গভর্মেণ্টকে চটবার আমি কোন সঙ্গত কারণ দিই নি।

কৃষ্ণমোহন। বিধবা-বিবাহ বিলটা পাস হওয়াতে গভর্মেণ্ট দেশের লোকের কাছে একটু অপ্রিয় হয়েছে। তোমার ওপর চটবার আসল কারণ তাই।

বিদ্যাসাগর। তা আমি জানি।

কৃষ্ণমোহন। তুমি যদি বল, আমি মাঝে প'ড়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে পারি, গর্ডন ইয়ঙের সঙ্গে আলাপ আছে আমার।

বিদ্যাসাগর। থাক, দরকার নেই।

কৃষ্ণমোহন shrug করিলেন। কিছুক্ষণ নীরবতা

কৃষ্ণমোহন। বাই দি বাই, মধু শুনেছি ফ্রান্সে নাকি মহা অর্থকষ্টে প'ড়ে তোমাকে চিঠি লিখেছে—no wonder, he is such a reckless chap.

বিদ্যাসাগর। ওর সমস্ত বিষয়টি গ্রাস ক'রে যাঁরা ব'সে আছেন, তাঁরা একটি পয়সা পাঠান নি। আমি ব'লে ব'লে হার মেনে গেছি।

কৃষ্ণমোহন। I see. শেষ পর্য্যন্ত কি হ'ল ?

বিদ্যাসাগর। কি আর হবে! আমি কয়েকবার ওঁদের কাছে ছুটোছুটি ক'রে যখন বুঝলাম যে, ওঁরা টাকা দেবেন না, তখন নিজেই ধারধোর ক'রে পাঠিয়ে দিলাম কিছু। কি আর করব ?

কৃষ্ণমোহন। That's noble of you.

কিছুক্ষণ নীরবতা

তুমি তা হ'লে কিছুতেই আর চাকরি করবে না ?

বিদ্যাসাগর। না।

কৃষ্ণমোহন। Finally settled ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

কৃষ্ণমোহন। আমি বলি, আর একটু বিবেচনা ক'রে দেখ। There is no harm in reconsidering it once more.

বিদ্যাসাগর। না, আমি আর করব না।

কৃষ্ণমোহন। আচ্ছা, চলি তা হ'লে। আর এক জায়গায় যেতে হবে আমাকে।

চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর উঠিতে যাইবেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র সমভিব্যাহারে দিনময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। এ কি, তোমরা হঠাৎ যে ?

শম্ভুচন্দ্র। বউদিদি আসতে চাইলেন, তাই নিয়ে এলাম।

বিদ্যাসাগর। কারণটা কি ?

শম্ভুচন্দ্র। ওঁর কাছেই শুনুন।

বিদ্যাসাগর। বীরসিংহার খবর সব ভাল তো ?

শম্ভুচন্দ্র। বাবা কাশী চ'লে যেতে চাইছেন।

বিদ্যাসাগর। কেন ?

শম্ভুচন্দ্র। দেশে বিধবা-বিবাহ নিয়ে এমন অশান্তি হয়েছে যে, তাঁর আর ভাল লাগছে না।

বিদ্যাসাগর নীরব হইয়া রহিলেন। শম্ভুচন্দ্র অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন, দিনময়ী দাঁড়াইয়া রহিলেন

দিনময়ী। [শুষ্ককণ্ঠে] নারাণও শুনছি বিধবা বিয়ে করবে ?

বিদ্যাসাগর। [উৎফুল্ল] তুমি শুনেছ ? আমিও শুনেছি, ভারী খুশি হয়েছি শুনে।

দিনময়ী। আমি বাধা দিতে এসেছি। বিধবাকে বিয়ে করা বড় অমঙ্গলের, ও আমি কিছুতে হতে দেব না। তুমি মানা কর ওকে।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন

মানা কর, মানা কর, ও আমাদের একমাত্র ছেলে, তোমার পায়ে ধরছি, মানা কর ওকে।

পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার বাসা। বিদ্যাসাগর মহাশয় অসুস্থ, বিছানায় শুইয়া আছেন। মাথার শিয়রে আলো জ্বলিতেছে, তিনি শুইয়া একটি বই পড়িতেছেন। ঘরে টেবিল চেয়ার প্রভৃতি দুই একটি সাধারণ আসবাব রহিয়াছে। দিনময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দিনময়ী। বার্লি খাবে এখন ?

বিদ্যাসাগর। এখন থাক।

দিনময়ী। সকাল থেকে তো কিছুই খাও নি।

বিদ্যাসাগর। দুর্গা মানা ক'রে গেছে বেশি খেতে।

দিনময়ী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন

দিনময়ী। এখানে যখন শরীরটা ভাল থাকছে না, তখন বীরসিংহায় গিয়ে দিন কতক থাকবে চল।

বিদ্যাসাগর। বীরসিংহায় গিয়ে কোন্ সুখে থাকব ? কর্ম্মাটাঁড়ে যাব ঠিক করেছি।

দিনময়ী। সে সাঁওতালী জায়গায় আমি গিয়ে থাকতে পারব না বাপু।

বিদ্যাসাগর। তোমাদের কাউকে যেতে হবে না, আমি একাই যাব।

দিনময়ীর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তিনি সামলাইয়া লইলেন, একটু হাসিলেনও

দিনময়ী। তুমি একা যেতে চাইলেই তোমাকে যেতে দিচ্ছি কি না!

বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না

দিনময়ী। আমি না হয় না-ই গেলাম, নারাণের বউকে নিয়ে যাও।

বিদ্যাসাগর। [সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে] শুনলাম নারাণের বউকে তোমার নাকি খুব পছন্দ হয়েছে ?

দিনময়ী। [হাসিয়া] সত্যি, খুবই পছন্দ হয়েছে। প্রথমে আমার ভয় হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি—ও কি, তুমি অমন ক'রে চেয়ে আছ যে ?

বিদ্যাসাগর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর উত্তর দিলেন

বিদ্যাসাগর। তুমি যখন নারাণের বিয়েতে বাধা দেবার জন্যে এসেছিলে,

তখন তা আমার সহ্য হয়েছিল, কারণ তার ভেতর আন্তরিকতা ছিল, কিন্তু যখন তুমি বিয়ে আটকাতে না পেরে নারাণের বউকে কোলে নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়লে, তখন আমার তত ভাল লাগে নি।

দিনময়ী। কেন?

বিদ্যাসাগর। তার মধ্যে ভণ্ডামি ছিল, আর সেটা প্রকাশ পাচ্ছিল তোমার হাসিতে কথায় বার্তায় চোখে মুখে।

দিনময়ী। মানুষ কি নিজের ভুল শুধরে নিতে পারে না?

বিদ্যাসাগর। পারে, কিন্তু তোমরা পার নি। বিয়ে আটকাতে না পেরে তোমরা সবাই আমার মন রাখবার জন্যে দেঁতো হাসি হেসেছ। আমি সব বুঝতে পারি।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

দিনময়ী। বার্লি আনব?

বিদ্যাসাগর। বলছি তো, একটু পরে।

দিনময়ী। ঠাকুরপো বীরসিংহা থেকে এসেছে, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়, ভয়ে আসতে পারছে না।

বিদ্যাসাগর। কে, দীনো? আসুক না, আমি আর কি করব তার?

দিনময়ী। বড় মনমরা হয়ে আছে, বেশি বোকো-ঝোকো না।

দিনময়ী চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরে দীনবন্ধু আসিয়া প্রণাম করিলেন

বিদ্যাসাগর। বড় মনমরা হয়ে আছ শুনলাম, মকদ্দমায় তোমার দাবি ডিসমিস হয়ে গেছে, তাই দুঃখ হয়েছে?

দীনবন্ধু। আমার দোষ হয়েছে, ক্ষমা করুন।

বিদ্যাসাগর। থিয়েটারি ভঙ্গিতে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্যেই দেখা করতে এসেছ নাকি? তার দরকার নেই।

দীনবন্ধু চুপ করিয়া রহিলেন

দেখ, প্রেসটা হয়তো তোমাকেই দিতুম, কিন্তু তুমি অন্যায়ভাবে দাবি ক'রে 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে এগিয়ে এসেছিলে ব'লেই মকদ্দমা

করেছি তোমার সঙ্গে। এতে তোমার যদি দুঃখ হয়ে থাকে, আমি নিরুপায়, অন্যায়কে আমি কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারি না।

দীনবন্ধু ইহার কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। পিরানের পকেট হইতে কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া নিকটস্থ তেপায়ার উপর রাখিয়া প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন

দীনবন্ধু। আপনি আসবার সময় আমার স্ত্রীকে গোপনে যে টাকা দিয়ে এসেছিলেন, তা আমি আর নিতে পারব না, মাপ করুন। আপনার টাকা নেবার আমার আর অধিকার নেই।

বিদ্যাসাগর। ভাল। যদি স্বাবলম্বী হতে পেরে থাক, সুখের কথা। [সহসা উচ্চকণ্ঠে] কিন্তু ঝুটো আত্মসম্মানের মুখোশ প'রে বউটাকে দুঃখ দিও না। আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম, সে ছেঁড়া কাপড় প'রে ঘুরছে, তাই টাকা কটা দিয়ে এসেছিলাম, আর তাই লজ্জার মাথা খেয়ে তোমার একটা চাকরির জন্যে লাটসায়েবের দ্বারস্থও হয়েছিলাম। তিনি তোমাকে একটা ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট-গিরি দেবেন বলেছেন, আমার কোন রকম সাহায্য যদি না নিতে চাও, এ চাকরিও পরিত্যাগ করতে পার, করলে সুখীই হব।

দীনবন্ধু এ কথার কোন জবাব দিলেন না। পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বিদ্যাসাগরকে দিলেন

দীনবন্ধু। শম্ভু এই চিঠিখানা আমার হাতে দিয়েছিল আপনাকে দেবার জন্যে।

বিদ্যাসাগর পত্রটি পড়িলেন

বিদ্যাসাগর। নারাণ বিধবা-বিবাহ করেছে ব'লে আমাদের আত্মীয়-কুটুম্বেরা আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করতে চান?

দীনবন্ধু। তাঁরা সকলেই বিরূপ হয়েছেন।

বিদ্যাসাগর। মা কি বলেন?

দীনবন্ধু। মা কিছু গ্রাহ্য করেন না।

বিদ্যাসাগর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন

বিদ্যাসাগর। তুমি বীরসিংহায় কবে ফিরবে?

দীনবন্ধু। আজই, সেখান থেকে জিনিসপত্র গুছিয়ে আমাকে কালই বরিশাল রওনা হতে হবে।

বিদ্যাসাগর। বরিশাল? কেন?

দীনবন্ধু। ওখানকারই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে আমি নিযুক্ত হয়েছি, অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে হবে।

বিদ্যাসাগর। এতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগছে না বুঝি? তোমাদের কি যে আসল রূপ, তা ধরতে পারলাম না এখনও।

দীনবন্ধু চুপ করিয়া রহিলেন

যাবার আগে চিঠির উত্তরটা নিয়ে যেও। আচ্ছা, দাঁড়াও, এখনই লিখে দিই।

উঠিয়া বসিলেন এবং পত্র লিখিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ লিখিবার পর কলমটা রাখিয়া দিলেন

বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে, থাক, পরে লিখে ডাকে পাঠিয়ে দেব।

দীনবন্ধু চলিয়া যাইতেছিলেন

শোন, এক কাজ কর, আমি ব'লে যাই, তুমি লিখে নাও। উত্তরটা তাকে অবিলম্বে জানানোই ভাল।

দীনবন্ধু চেয়ারে বসিলেন। বিদ্যাসাগর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তিনি লিখিতে লাগিলেন

আমি যতটা লিখেছি, তার পর থেকে লেখ। "আমি বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা-বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে

প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি ; সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার বিহার পরিত্যাগ করিবেন এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবা-বিবাহ হইতে বিরত করিতাম তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব ; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে আহার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরূপ বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ ; অস্মদীয় ইচ্ছার অনুবর্ত্তী বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে।”

পত্র লেখা শেষ হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর তাহা পড়িয়া সহি করিয়া দিলেন। দীনবন্ধু চিঠি লইয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তার দুর্গাচরণ প্রবেশ করিলেন

দুর্গাচরণ। কেমন আছ এ বেলা ?

বিদ্যাসাগর। অনেকটা ভাল আছি, এ বেলা চারটি ভাত খাই, কি বল ?

দুর্গাচরণ। আজ নয়, কাল।

বিদ্যাসাগর। বেশ, [ক্ষণকাল পরে] উপবাস করতে আমি খুব পারি, কিন্তু এখন আমার শুয়ে থাকলে চলবে না, অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে।

দুর্গাচরণ। দুদিন বিশ্রাম কর না, বহু-বিবাহ বিল পাস হবার আশা নেই।

বিদ্যাসাগর। তা জানি, ও আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি। এখন আমার সর্ব্বপ্রধান চিন্তা—কলেজটা, ওটাকে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে।

দুর্গাচরণ। বিধবা-বিবাহের ধাক্কাই তো এখনও সামলাতে পার নি, এতে আবার হাত দিচ্ছ কার ভরসায় ?

বিদ্যাসাগর। ভরসা আর কারও ওপরে নেই। ধারের ওপর ধার জমছে।

দুর্গাচরণ। ধারের জ্বালায় আমিও অস্থির হয়ে উঠেছি ভাই, পাওনাদার বাড়িতে ধরনা দিয়ে ব'সে আছে। তোমাকে যে টাকাটা দিয়েছিলাম, সেটা না পেলে আর মান থাকবে না। দিতে পারবে টাকাটা?

বিদ্যাসাগর। আজই চাই?

দুর্গাচরণ। পরশু নিশ্চয়ই চাই।

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ ফাণ্ডে তুমি এককালীন কিছু টাকা এবং নিয়মিত চাঁদা দেবে ব'লে প্রতিশ্রুত ছিলে, তার কি কিছুই দেবে না?

দুর্গাচরণ। ভাই, আমি বড় বিপন্ন।

বিদ্যাসাগর। তুইও শেষে এই কথা বললি দুর্গা!

দুর্গাচরণ। সত্যি, আমি এখন বড় বিপদে পড়েছি, তা না হ'লে—

বিদ্যাসাগর। কবে চাই বললি টাকাটা?

দুর্গাচরণ। পরশু।

বিদ্যাসাগর। আচ্ছা যোগাড় ক'রে রাখব এখন। মধুর কাছে গেছলি? কি বললে সে?

দুর্গাচরণ। যা চিরকাল বলছে, হাতে একটি পয়সা নেই—

বিদ্যাসাগর। আমার দুরবস্থার কথা বলেছিলি বুঝিয়ে?

দুর্গাচরণ। সব বলেছিলাম।

বিদ্যাসাগর। কি বললে?

দুর্গাচরণ। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে কবিত্বপূর্ণ একটি বক্তৃতা দিলে, বললে, তোমার অন্তঃকরণ Bengali mother-এর মত—সে যখন ফ্রান্সে কপর্দ্দকহীন, তখন তোমার টাকা না গেলে অকূল পাথারে পড়ত সে। হাতে টাকা হ'লেই সে তোমার টাকা অবিলম্বে শোধ ক'রে দেবে, কিন্তু এখন হাতে কিছু নেই—এই সব আর কি!

বিদ্যাসাগর। অথচ স্পেন্সস হোটেলে নবাবের মত রয়েছে! [খানিকক্ষণ পরে] কি তোমরা!

দুর্গাচরণ। আমার ভাই, বড় জরুরী দরকার, তা না হ'লে তোমায় বিরক্ত করতাম না এখন।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন

পরশু আসব তা হ'লে ?

বিদ্যাসাগর। এস।

দুর্গাচরণ। এখন তা হ'লে উঠি।

চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর নিস্পন্দভাবে বসিয়াই রহিলেন। দীনময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দীনময়ী। বার্লি আনব ?

বিদ্যাসাগর। আন, আর ছিরুকে একটা গাড়ি ডাকতে বল।

দীনময়ী। অসুখ শরীরে আবার কোথায় বেরুবে ?

বিদ্যাসাগর। টাকার চেষ্টায় বেরুতে হবে, টাকা চাই। অমন ক'রে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না, যা বলছি, তাই কর।

দিনময়ী চলিয়া গেলেন। দীনবন্ধু দ্রুতপদে আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দীনবন্ধু। এই মাত্র শম্ভু খবর পাঠিয়েছে যে, বীরসিংহায় আমাদের ঘর-বাড়ি সব জ্বালিয়ে দিয়েছে !

বিদ্যাসাগর। অ্যাঁ ! ও, হুঁ—

[চুপ করিয়া গেলেন]

ক্রমশ

"বনফুল"

সান্ত্বনা

আমরা প্রাচীন, আমরা বনেদি সুতরাং মোরা সইব—
আহেলি নরার যত অনাচার—আধুনিক দুর্দ্দৈব !
নূতন স্বর্গ করিতে রচনা জানি শেষাশেষি মরবে,
এবং পচবে পুরানো নরকে, বেঁচে আছি সেই গর্ব্বে।

বহ্নিশিখা

(আধুনিকতম স্টাইল)

জগৎসংসারে এমন এক একজন জন্মগ্রহণ করে যারা অন্যের জন্য নয়, এমন কি নিজের জন্যও নয়; যেন একটা দীপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অথচ বিশ্বসংসারের আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, তাদের জন্যেই সকলের ভাবনা।

ঠিক এমনই মেয়েই আমাদের শিখা।

শ্যাম আর কৃষ্ণের মাঝামাঝি ওর রঙ; ভারবাহুল্যহীন স্বচ্ছ দেহ, দ্রুত চলায়, উচ্চকণ্ঠের বচনে, তীক্ষ্ণ তর্কবিতর্কে, বুদ্ধির প্রাচুর্য্যে, খোলা হাসিতে একেবারে ঝলমল। কলেজে, ক্লাবে, সভাগৃহে ওর আসন সবার সম্মুখে।

বন্ধুমহলে ভক্তের দল ওর নব নামকরণ করেছে—বহ্নিশিখা।

মায়ের ভাবনা এই মেয়ে নিয়ে। পুরুষেরও চেয়ে যে মেয়ে হয়ে উঠল দৃঢ়, তার দৃঢ়তাকে কোমল করবে এমন দৃঢ়তর পুরুষ মিলবে কি ক'রে? কত ছেলে কামনা ক'রে ফিরে গেল—ওর হৃদয় ছুঁয়েছে এমন ইঙ্গিত এল না এখনও।

অরণ্যানী বলে, মাসীমা, ভাবছ কেন? ওই তো আমাদের গর্ব্ব। কি কঠিন ওর মন! জান, ছেলেরা কি বলেছে? বলেছে, বহ্নি, তোমার বিমুখ মুখের অগ্নিতে আমরা প্রস্তুত হব।

না, না মা, এ ভাল নয়। ভাল নয় এমন কঠিন হওয়া। আমার ভাবনা হয়, এ মেয়ে যেদিন ভাঙবে, হাতে রাখবে না কিছু। চূর্ণ-বিচূর্ণ হতেও বাজবে না কোথাও।

সেদিন ফাল্গুনের অপরাহ্নে উতলা বাতাসে মিলেছে আমের মুকুলের গন্ধ। অতীন এল, বললে, বহ্নি, বেড়াতে যাবে?

আমার সময় নেই।

এমন কি কাজ আছে?

লিটররি ক্লাবে মীটিং আছে, আমাকে জোর ক'রে বানিয়েছে তার প্রেসিডেন্ট।

অতীন হাসল—বহ্নি, ঠিক হ'ল না তোমার কথা। তোমাকে জোর করবে, এমন ক্ষমতা কার?

দল বেঁধে এল ঘরে, বললে, তোমাকে নইলে চলবে না।

সাড়া দিলে সহজে। বার বার ক'রে এই কথাটা ভুলতে থাকি, তুমি একলা কারুর নও, তুমি সকলের। সেখানে এই হতভাগ্য অতীন আর লিটররি অ্যাসেম্ব্লির কোন ভেদ নেই। আচ্ছা বহ্নি, হৃদয়ের প্রয়োজন কি নেই তোমার?

যথেষ্ট আমার আপনার হৃদয়। অতীন, তুমি কি আজকাল কবিতা লেখ?

এমন কথা বলছ কেন? সে কি দোষের?

না। তবে সত্য ক'রে লেখ। ভাবে গদগদ হয়ে কোন মেয়ের মুখে তাকিয়ে নয়, আর যদি তাই হয়, মনে রেখো, সে মেয়ে আমি নই।

কঠিন তোমার মন, আরও কঠিন তোমার মনে করানো।

শিখা ঘড়ি দেখে বললে, সময় হ'ল। সাতটায় শুরু হবে মীটিং।

সঙ্গী হতে পারি?

পার। তবে দরকার নেই তার।

থাক তবে।

কি কথা ?

একদিন সময় দেবে আমাকে।

ব্যস্ত হয়ে খাতাপত্র ঠিক করতে করতে বললে, দেব।

কবে, কাল ?

হ্যাঁ, কালই।

না, ফাল্গুনী-পূর্ণিমাতে।

শিখা হেসে উঠল—আচ্ছা, কথা দিলেম।

মনে মনে নিশ্চয় জানে, কামনা ক'রে যারা গেছে ফিরে, সেই মুগ্ধদের দল-সংখ্যায় আরও একটি সংখ্যা যোগ দেবার সময় হয়ে এল।

ফাইল আর খাতার তাড়া হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল শিখা, দুয়ার পার হয়ে গেল বেরিয়ে।

এলোমেলো রুক্ষ ওর চুল, ঔদাসীন্যে অযত্নসজ্জিত সাদা খদ্দরের শাড়ির আঁচল কাঁধের একপ্রান্ত থেকে পায়ের কাছাকাছি পড়েছে। বেরুবার পূর্ব্বে প্রয়োজন হয় না শাড়ি বদলাবার, আপন মুখের প্রতি নেই কোন ঔৎসুক্য কিংবা মোহ, তাই হাতের কাছাকাছি কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না আয়না।

অতীন ওর দ্রুত চ'লে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল।

চুপ ক'রে অতীনের পাশে ব'সে হঠাৎ এক সময় ব'লে উঠল বহ্নি, কাজ আছে, এবারে ফেরা যাক অতীন।

বহ্নি, কাজের কথা আজ থাক। আজকের দিনটিকে যদি দিলে, দাক্ষিণ্য দিয়ে দাও, কৃপণ হয়ে দিও না।

তুমি জান, আমি চুপ ক'রে থাকতে পারি নে।

চুপ করবে কেন ?

যা বলব, সে কাজের কথা; তোমার কবিতার সঙ্গে মিল হবে না

নিশ্চয়ই। নীরব থাকার মস্ত সুবিধা এই যে, যারা বানাতে পারে তারা বানাতে থাকে—সে সুযোগ মিলবে না আমার কাছে।

জানি বহ্নি, তোমাকে বানাবার মত মূঢ়তা কখনও যেন না হয়। চুপ ক'রে রইলে কেন? যা বলবার বল, শুধু কাজের তাড়া দিয়ে ফেরার কথা ব'ল না, দোহাই তোমার।

শিখা তবু চুপ ক'রে থাকল। ওর এই নিষ্ক্রিয় নির্ব্বাক হওয়াটা অসম্ভাব্যতার মত অসহ্য।

অতীন বললে, আচ্ছা বহ্নি, শুধু কথা দিয়েছ ব'লেই কি এই দিনটিকে দিলে, তাই আধখানা হয়ে রইল—যেন মন নেই তোমার কোথাও।

শিখা হেসে বললে, ওগো কবি, অত উতলা হ'য়ো না, সে কি এতই সহজ?

সহজ বহ্নি, সহজ। আবেগে অতীনের স্বর কাঁপতে লাগল, অকস্মাৎ দু হাতে শিখার হাত ধরল চেপে, মুখ তুলে ব'লে উঠল, দুর্ব্বহ হয়ে উঠল এই একলা মন বইবার ভার। বহ্নি, কথা শোন, প্রসন্ন মুখে চাও।

শিখা হেসে উঠল—পুরুষের মত আকাশ-কাঁপানো হাসি। হাত ছাড়িয়ে পড়ল দাঁড়িয়ে।

আহত হয়ে বললে অতীন, দয়াও কি নেই তোমার মনে?

চোখ ছলছল ক'রে এল।

অতীন, মনে রেখো, দয়া করবার জন্যে পাগল যে মেয়েরা, আমি তাদের দলে নই।

এমন মেয়েরও জেদ ভাঙল।

* * *

অতীনকে দেখেছিস, যেন চলছিল অগাধ জলে, কোন্ না-জানা চড়ায় ঠেকে গিয়ে ভেঙে পড়েছে, বললে কল্যাণী।

অরণ্যানী বললে, ভুল হ'ল তোমার। না-জানা নয়, জানা চড়ায় ইচ্ছে ক'রে ভাঙানো। কল্যাণী, এমনিই হয়, জানে, ভাঙবে কপাল, তবু থামবে না কল্পনা।

সেদিন গিয়ে দেখি, সমস্ত মুখের ওপর একটা অন্ধকার নেমেছে। বললুম, অতীন, এমন চুপ ক'রে কেন? জবাব দিলে—দেখে এলুম, ঝড়ে শুকনো পাতার দল চলেছে উড়ে—জনতার মত; কোনখানে নেই তার একলা বাঁচার মূল্য। বুঝলুম, ওর একান্ত নিজের কথা।

অরণ্যানীর চোখ ছলছল ক'রে এল, বললে, বহ্নিকে যারা কামনা করেছে, দুর্ভাগ্য তাদের। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কল্যাণী, এমন মেয়েও কি ভাঙল?

সেই কথাই জানতে চাই। ওকে কোন দিনও চুপ ক'রে থাকতে দেখি নি। সেদিন গিয়ে দেখি, ব'সে আছে টেবিলের ধারে। কাজ নেই হাতে; জানতেই পারল না আমি এসেছি। কাঁধে হাত রাখতে একেবারে চমকে উঠল।

বহ্নির মত মেয়ের তো এমনতর উদাস হবার কথা নয়।

শোন তবে, অরণ্যাণী বললে, বলছি।

সেদিন আমাদের ছেলেদের মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে গেল। শচীন বললে, সামনের ঐ ছোট বাড়িটাতে এসেছেন যিনি, ভয়ঙ্কর কাল্‌চার্ড। য়ুনিভার্সিটির দরজাগুলো পার হয়েছেন সবার আগে আগে, দ্বিতীয়কে বহু পিছনে রেখে। সমুদ্রের ওপার থেকে বিদেশী সরস্বতীর আপন হাতের প্রসাদ নিয়ে যখন ফিরলেন; দেশের য়ুনিভার্সিটি-মহলে সাড়া প'ড়ে গেল এমনতর যোগ্যতরকে আপন ঘরে বরণ করবার জন্যে। কিন্তু কি যে ওঁর মন—কাউকে দিলেন না মাল্য! আপনার মনে চলল পড়াশোনা আর অবসর-সময়ে বাগানের পরিচর্য্যা; হৃদয়ের মধ্যে এই দুই রসধারার যোগ ঘটল।

অশোক বললে, ভয় পাইয়ে দিলে যে। এমন লোককে যদি পাই বেড়ে উঠবে আমাদের গৌরব। কিন্তু, দলে টানবে কে?

শচীন বললে, সম্ভব হবে না হয়তো; দলছাড়া ওঁর মন, ভিড়ের মধ্যে দেখলুম না কোন দিনও।

বটবৃক্ষের মত বল। আপনার গুঁড়ির বিস্তৃতি আর ঝুড়ির প্রাচুর্য্যে আপনাতে সম্পূর্ণ, বললে বিনায়ক।

ঠিক বলেছ।

রাখ তোমাদের কথা। পারবে আমাদের বহ্নি। রেগে উঠল দীপঙ্কর।

ছেলেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল, বহ্নিকে গিয়ে ধরল—না ক'র না, এ তোমাকে পারতেই হবে।

ও বললে, আচ্ছা।

আমাকে বললে, চল অরণ্য।

নতুন বাড়িতে নতুন উৎসাহে চলছিল বাগানের কাজ, নমস্কার করে বললেন, চিনতে পারলেম না তো!

বহ্নি দীপ্ত হয়ে উঠল, আমরা এসেছি 'অনাগত-আলোক-সন্ধানী' থেকে। সামনের বাড়িটায় বসে আমাদের সভা, সেইখানেই আমাদের কার্য্যালয়।

দেশকে সুন্দর ক'রে সম্পূর্ণ করবে যাঁরা তারা আগামী কালের—সেই আগামী ভবিষ্যতকে দীপ্ত করবার ভার নিয়েছি আমরা নিজেদের 'পরে।

নতুন এসেছি, খবর জানি নে কিছু।

ছোট দুটো বেতের মোড়া দিলেন এগিয়ে। বহ্নি বললে, কিছু কাজ আছে আপনার সঙ্গে।

কি কাজ ?

আমাদের সমিতির সভ্যতালিকায় নাম লেখাতে হবে।

আমার ভয় হ'ল, আস্তে ক'রে যোগ ক'রে দিলুম, খুশি হব তা হ'লে।

বললেন, সময় হবে না তো।

বহ্নি সজোরে বললে, সময় হবে না, কেন ? এ কাজে কি আপনার মন নেই ? আছে, এমনই খবরই তো পেয়েছিলুম।

হয়তো আছে, কিন্তু সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করবার কাজে উৎসাহ নেই।

মুখ ভ'রে উঠল প্রশান্ত হাসিতে। জ্বলতে লাগল বহ্নির চোখ—ঔৎসুক্যও নেই মনে ? দেখবেন না, কি নির্ভীকভাবে চলছে আমাদের কাজ, কি সত্যের বন্ধনে বাঁধা আমরা ?

দেখব বইকি, সময় হ'লেই দেখব।

তবু নাম দেওয়াতে বাধা আছে আপনার ?

হ্যাঁ, আছে। মাপ করবেন আমাকে।

সমস্ত দেহ কেঁপে উঠল থরথর ক'রে, কঠোর হয়ে এল বহ্নির মুখ, ওর ভিতরকার উদ্যত অপমানবোধ যেন এখনই পড়বে ভেঙে। কাঁপা গলায় শুষ্ক চোখের আগুন মিশিয়ে বললে, চললেম।

তিনি হাতজোড় ক'রে বললেন, আচ্ছা, নমস্কার।

বহ্নির কপাল ভাঙল। এমনতর প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরে নি কখনও। সেই জ্বালা ওকে মারলে। ওর মনের একটা জেদ বাড়ল, হার মানাবে তবে ছাড়বে। কিন্তু কঠিনকে ভাঙা দুঃসাধ্য হ'লেও সাধ্য, এমন কঠোর অথচ শান্তকে ভাঙবে কি দিয়ে ? এ যে প্রশান্ত। তাই হার মানাতে গিয়ে হার মানলে। ভাঙলে যে মেয়েরা পারে না কাঁদতে, ওর হ'ল সেই দশা। দ্বিগুণ তেজে লাগল কাজে। মীটিংএর পর চলল মীটিং। জনগণের দুঃখদুর্দ্দশা নিবারণকল্পে কাজ ছুটল বেগে।

শিখরেশ্বরের চোখের সম্মুখে জ্বলতে লাগল হাজার পাওয়ারের বাতি।

ভাবনা ধরল মনে। এ তো তেজ নয়, এ তো কান্নার রূপান্তর ঘটছে।

শুধু ছেলেরা আরও দীপ্ত হয়ে উঠল, শচীনকে ধমক দিয়ে বললে, রাখ তোমার কাল্‌চার্ড।

তারপর? বললে কল্যাণী।

তারপর একটা ঘটনা ঘটল।

আমাদের সমিতির একটা শাখার কাজ চলছিল বিদ্যাহীনতা নিবারণকল্পে,—স্কুলে, নাইটস্কুলে, লাইব্রেরিতে। একটি অনাথা বিধবার ছেলে ছিল তারই একজন ছাত্র। তীক্ষ্ণ তার বুদ্ধি, আশ্চর্য্য করত আমাদের। হঠাৎ একদিন খবর এল, ছাত্রটি ছুটি নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। ব্যাপার কি, খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ছেলেটি শিখরেশ্বরের বাড়িতে, তাঁর তত্ত্বাবধানে।

ক্ষেপে উঠল ছেলেরা, ব'লে এল বাড়ি চড়াও ক'রে, এ অত্যন্ত অন্যায়।

শিখরেশ্বর বললেন, এর জবাব পরে দেব।

বহ্নি কিছু লিখছিল ব'সে, আমি পাশের ঘরে, এমনই সময় এলেন শিখরেশ্বর। চমকে উঠে বললে বহ্নি, একি, এখানে যে!

কিছু কথা আছে।

আমাদের ছেলেটিকে নিয়ে গেছেন ভাঙিয়ে। আরও কি চাই আপনার? রুক্ষ ওর স্বর।

শিখরেশ্বর দুই চোখ মেলে ধরলেন ওর মুখে, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, তোমার মুখ থেকে শুনব এমন কথা, আশা করি নি।

শান্ত হয়ে গেল বহ্নি, বললে, বলুন আপনার কথা।

তোমাদের সমিতির হাতে ছিল ছেলেটি, জানা ছিল না। বিধবার মৃত্যুকাল যখন উপস্থিত হ'ল, ডাকিয়ে নিয়ে গেল আমাকে। ঠিক জানি নে, হয়তো তোমাদের কাজে কোনখানে তার ভয় ছিল, কেঁদে বললে, আমার ছেলের ভার নিতে হবে। মৃত্যুকালে কথা দিয়েছিলুম, সম্পূর্ণ ভার নেব আমি।

এখন কি করতে হবে?

আমার সত্যকে বাঁচাও।

রক্তিম হয়ে আসা মুখে যেন দুলতে লাগল বহ্নির বুক। এতজন থাকতে শিখরেশ্বর ওরই 'পরে যে নির্ভর করলেন, এমন ক'রে বিশ্বাস করলেন ওকে, এই কথাটা কিছুতে ভুলতে পারলে না।

বহ্নির বুদ্ধিও হার মানল। বুঝল না যে, সমিতির আরও যারা তারা দশমিক, ওই পুরো এক।

ভিতরকার সত্যকে আবিষ্কার করতে গিয়ে কাঁপতে লাগল ওর স্বর, বললে, তাই হবে।

আর, শিখরেশ্বর বললেন, তোমাদের সমিতির সঙ্গে বিরোধ ঘটেছে, এমন কথা যেন মনে না পড়ে, তাই আরও একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।

কি? বললে বহ্নি।

তোমাদের সভ্যতালিকায় যোগ ক'রে দিতে হবে আমার নাম।

বোধ হয় বহ্নির গলা ধ'রে এল, বললে, আচ্ছা।

নমস্কার সারার পর শিখরেশ্বর গেলেন বেরিয়ে, যতদূর দেখা গেল

চেয়ে রইল বহ্নি, তারপরে টেবিলে কাগজপত্রের আড়ালে মুখ রাখল. সমস্ত দেহ নত ক'রে। পাশে এসে দেখি, ওর দেহ উঠছে ফুলে, কেঁপে কেঁপে। কি আশ্চর্য্য! বললুম, বহ্নি! এ কি!

মুখ না তুলেই ধরা গলায় বললে, চুপ চুপ, অরণ্য, চুপ কর।

* * *

এর পরে আর বাঁধ রইল না। মানুষ যখন আপন হাতে আপনাকে রাঙাবার ভার গ্রহণ করে, তখন হিসাব থাকে না কিছু। শিখারও এল সেই হিসাব-হীনতা, আপন মনে আর কিছু ফাঁকা থাকল না।

মাঝে মাঝে যখন সমাগম হয় শিখরেশ্বরের, শিখা সুন্দর হয়ে ওঠে, মুখে ভ'রে ওঠে লাবণ্য, চোখের পাতা যেন জড়িয়ে আসতে চায়, মনে মনে বলতে থাকে, হ'ল আবির্ভাব। পায়ের শব্দে বুক দুলে ওঠে, চ'লে যাওয়ার সময় উদাস হয়ে আসে মন।

এতদিন পরে ঋজু সবুজ বৃন্তটি কুঁড়ির ভারে নত হয়েছে।

এমনই ক'রে মাস কয়েক কাটল। মেয়েরা খবর পেল ইঙ্গিতে। ছেলেদের মধ্যে শুধু জানতে পারল একজন, সে শচীন।

অরণ্যানীকে ডেকে বললে, এ তো ঠিক হ'ল না।

কি করব আমি?

জানিয়ে দাও ওকে, বললে শচীন।

বহ্নি!

এস অরণ্য, এস।

কবি যদি হতুম, পারতুম সৃষ্টি করতে। নিষ্ফল হ'ল এই সন্ধ্যা।

বহ্নি, নতুন স্বর শুনছি তোমার কণ্ঠে।

আমার আকাশলোক নতুন সৃষ্টির কামনায় রাঙিয়ে এল। অরণ্য, আজ অতীনকে মনে পড়ছে।

যদি ডাক দাও, এসে ঠিক পৌঁছবে।

না না, থাক। ডাক দিয়ে দুঃখ দিতে পারি, এমন ক্ষমতা তো আজ নেই। কঠোর দুঃখ দিয়েছি।

মনে রাখবার নতুন শক্তি তৈরি করছ মনে মনে।

শিখা হাসল স্নিগ্ধ, যেন বললে, ঠিক বলেছ।

কিন্তু বহ্নি, একটা কথা মনে করিয়ে দিতে হ'ল। কঠোর যখন ছিলে, কেবলই আঘাত দিয়েছ, আজ কল্পনায় এমন ক'রে সৃষ্টি করছ যে ভয় হয়, বুঝি উল্টো দিক এল এগিয়ে।

অরণ্য, ভয় করছ কেন? এ কি শুধুই কল্পনা? তবু মনে হচ্ছে— কিছু জান তুমি, গোপন ক'র না।

না, গোপন করব না। তবে শোন—

শিখরেশ্বরের যখন অল্প বয়স, তখন সেই প্রথম কালে একটা নাড়া খেয়েছিলেন। হয়তো সেটা এমন কিছু নয়, হয়তো এমন ঘ'টেই থাকে। ওঁর কাছে অন্য ফল হ'ল, বললেন, এই প্রথম, এই শেষ। কত মেয়ের কপাল ভাঙল, কেঁদে গেল ফিরে, টলল না ওঁর মন। তাই বলছি, বহ্নি, ফেরার সময় যদি থাকে এখনও, ফিরে এস; এমন ক'রে নিষ্ঠুর পাথরে ভেঙো না আপনার সর্ব্বস্ব।

বিবর্ণ হয়ে এল শিখার মুখ, যেন পায়ের তলা থেকে মাটি গেল স'রে। শুধু বললে, অরণ্য, আমাকে একলা থাকতে দাও।

মুখ নীচু ক'রে অরণ্যানী এল বেরিয়ে।

বেদনার সঙ্গে যখন স্বীকার করতে হ'ল, মন নেই অন্যপক্ষে—তখন বিশেষ ক'রে আবিষ্কার হ'ল আপন মনের গোপন কথা, একেবারে নিঃশেষ ক'রে মরেছে।

কাজে দিতে পারে না মন, চুপ ক'রে থাকতে পারে না ব'সে। ঘরে

এসে টাইপরাইটারে দেয় হাত, বলে, না, লেখা আছে বাকি, ফুলস্কেপের পাতা শেষ না ক'রেই যায় উঠে।

রাগ ক'রে শচীনকে বললে অরণ্যানী, ওর মত মেয়ে এমন ক'রে ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে ঘুরে, দেখতে পারি নে যে। যেন কোন্ গ্রহ আপন কক্ষ হারিয়েছে।

নির্ব্বোধ, এ কি বুদ্ধি দিলে? যা জানবার আপনা থেকে যখন জানত, সহজ হ'ত সব।

শচীন বললে, কঠিন আঘাত যার হাত দিয়েই আসুক না কেন, কঠিন হয়েই আসে। ভয় ক'র না বহ্নির জন্যে।

ভয় নয়, সহ্য করতে পারি নে।

যখন স্থির থাকতে আর পারল না, তখন শিখা এল শিখরেশ্বরের বাড়ি। আলো জ্বেলে পড়ছেন বই, এসে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বললে, তোমার প্রথম আর শেষ সেই যদি সবচেয়ে সত্য, মধ্যখানের আর সমস্ত যদি মিথ্যে, সেই মিথ্যে দিয়ে কেন আমাকে ভোলালে?

বাজল শিখরেশ্বরকে, ছলোছলো হয়ে এল মন, বললেন ভারী গলায়, শিখা ভুলিয়েছি তোমাকে মনে করতে পারি নে। যদি ভুল ক'রে থাকি কখনও, মাপ ক'র।

—যাক, শেষ হ'ল সব। ভয় পেও না, বেশি কিছু বলব না। এ কথাও বলতেম না। মন আছে, এমন মনে ক'রে যে মনকে গ'ড়ে তুললুম আপন হাতে, সে যখন জানতে পারল নেই মন, স্থির থাকতে পারল না। আমার এমন ক'রে জানা, সে কি একেবারে মিথ্যে?

—বাইরে থেকে জানায় বাড়ল জ্বালা, কিছুতেই শান্তি পেলাম না। তাই তোমার আপন মুখ থেকে শুনতে এলেম।

বেদনায় আহত হয়ে উঠলেন ব'লে, বল আমি কি করব?

এই স্পর্শে শিখার ভিতরকার চিরন্তনী উঠল জ্ব'লে, হাত জোড় ক'রে বললে, ওগো, মাপ কর। মেয়েদের তোমরা অবজ্ঞা কর সে বরং সইবে, দয়া ক'রে ভুল ক'র না, সে সইবে না।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন শূন্যে। চুপ ক'রে থেকে বললেন, এখন তুমি কি করবে?

আমার এই জীবন দু বছর পূর্ব্বে ছিল সম্পূর্ণ অজানা, এ তো আমার আপন হাতেই তৈরি। আজ থেকে যে আর এক জীবনের হ'ল সুরু, সেও বাঁচবে আমার হাতেই। ভাবনা ক'র না।

শিখা, লজ্জা দিলে আমাকে।

না। বিরাট তোমার মন। বেদনায় শীর্ণ হয়ে যে শিখা এল কাছে, তাকে গ্রহণ করতে পার দয়ার দাক্ষিণ্যে—রসের সাগরে যে শিখা উঠেছিল বিকশিত হয়ে, সহজেই মুখ ফিরিয়েছ তাকে; প্রেমের দাক্ষিণ্য তোমার বাঁধা প'ড়ে আছে। যাক, আমি তো তোমাকে চাই নে শুধু দুঃখ-রাতের সঙ্গী ব'লে জানতে।

কি বলব, ভেবে পাই নে।

কিছু ব'ল না। আমার এই আশ্চর্য্য নতুন জীবন ভেবেছিলুম তোমার দান। তাই মনে করেছিলুম, তোমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে শান্ত হব একেবারে। আমার ভাবনা গেল ভেঙে।

চোখ ভ'রে এল, রোধ করতে গিয়ে রুদ্ধ হয়ে এল কণ্ঠ—বললে, তবে চললেম।

বাইরে এসে মনে পড়ল, আরও একদিন এ বাড়ি থেকে গেছে ফিরে। সেদিনের কথা মনে করতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ছেলেরা দল বেঁধে এল বাড়িতে। বললে সমস্বরে, বহ্নি, তুমি গেলে থাকবে কি? এ কি কখনও হতে পারে?

হেসে বললে, যেতেই হবে।

দল বললে, এত সহজে ত্যাগ করলে?

অরণ্যানী আড়ালে কেঁদে উঠল। শিখা বললে, অরণ্য, তুমি তো সবই জান।

শিলং পাহাড়ে মেয়েদের স্কুলে চাকরি নিয়ে গেল চ'লে।

অনাগত আলোক-সন্ধানীর চলন হ'ল ভাঙা ভাঙা। নেহাত আছে আয়ু তাই বাঁচা।

এমনই ক'রে কাটল বছর তিনেক।

ইতিমধ্যে শিলং পাহাড়ে শিখার মায়ের সমস্ত ভাবনার শেষ হ'ল।

কাজের বন্ধন খসবার পর ছিল আর একটি বন্ধন, সেই মায়ের বাঁধন যখন খসল, শিখা বললে, আর নয়।

খবর এল, শিলং পাহাড় থেকে অকস্মাৎ শিখার অন্তর্দ্ধান ঘটেছে। যখন এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত খোঁজ করিয়ে সন্ধান পেল না কিছু, তখন কেঁদে পড়ল অরণ্যানী।

অনাগত আলোক-সন্ধানীর আয়ু একেবারে হ'ল সমাপ্ত।

* * *

দশ বছর পরে উঠল যবনিকা। অতীনের কাছে চিঠি এল, অরণ্যানীর চিঠি।

বহ্নিকে দেখলাম, কাশ্মীরের পথে, তপস্বিনী-বেশে। গৈরিকের অন্তরালে ক্ষীণ ওর দেহ যেন জ্বলছে ওর সৌরজগতের দীপ্ত অগ্নিশিখা। এ আমাদের সে বহ্নি নয়, যাকে দেখেছিলাম ডিবেটে, লিটররি মীটিংএ, অনাগত-আলোক-সন্ধানীতে; শিখরেশ্বরের পায়ের ধ্বনিতে

চমক-খাওয়া নয় এ বহ্নি, প্রাণের আনন্দে বিকশিত আত্মার আনন্দে সম্পূর্ণতর বহ্নি।

একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম, তুমিই বহ্নি!

বললে, না, আমি বহ্নি নই।

কে তুমি?

আমি যা তা তোমরা মানবে কি ক'রে?

হাত চেপে ধরলেম, বললেম, আমাকে ফাঁকি দেবে? বহ্নি, এ তুমিই।

অরণ্য, বহ্নি আজ চলেছে।

বললেম, এমন ক'রে চ'লে এলে কেন, সবার শক্তি হরণ ক'রে?

সকলকে ছিলেম ঢেকে, এ বড় লজ্জা, মুক্তি দিলেম তাদের, আমারও ঘটল আপন মুক্তি।

সত্যি বলছ?

সত্য বলছি।

শিখরেশ্বরকে কি পেরেছ ভুলতে?

মুখ ভ'রে উঠল হাসিতে, বললে, দরকার হ'ল না ভোলার। প্রেম যখন যুক্ত হ'ল চলার পথে, সবার চেয়ে বড় শক্তি দিল এনে।

আমি বললেম, বহ্নি, সেদিন হঠাৎ এলেন শিখরেশ্বর, কি ব্যাকুল, অসহায় ওঁর চিরকালের শান্ত মুখ! বললেন, শিখা তো ভালবাসতেন তোমাকে, তাই তোমাকে বলছি, আজ যে জানতে পারলাম আপনাকে। তাঁকে যে আমার বড় দরকার।

বহ্নি, ফিরে এস।

না না, বাইরে থেকে চাই নে কিছু। তাঁকে যখন পেলেম আমার আপনার মধ্যে, ব'লে উঠল মন, যাঁকে পেলে হয় সকল পাওয়া তাঁকেই

পেলেম। ক্ষোভ রইল না। এ যে আমার পথের পাওয়া, কি আনন্দ! কি মুক্তি!

এত বড় আঘাত দেবে তাঁকে?

ছলছল ক'রে এল চোখ, বললে, বাইরে থেকে যা আঘাত ব'লে মনে হয় সে তো আঘাত নয়, সে আপনাকে জানা। অরণ্য, অতীন কোথায়?

তোমার ঘাট থেকে যাকে দিলে ফিরিয়ে, নিয়ে এলেম তাকে আমার ঘাটে।

খুশি হয়ে উঠল। বললে, ফিরিয়ে যেদিন দিলেম কিছু বুঝি নি, ভাল যেদিন বাসলেম তোমার মনের ইঙ্গিত পেলাম যেন। অরণ্য, তোমার ধন তুমি পেলে, আর কি চাই!

ঠিক হ'ল না বলা।

তোমার ঘাট যদি মিলত, পৌঁছত কি আমার ঘাটে? তাই বড় ভয়, বুঝি বাঁধাই আছে, মন নেই!

না না, আছে বইকি। ব্যথিত হয়ে উঠল ওর স্বর, বললে, ক্ষোভ ক'র না অরণ্য, পুরো মনটাকে কে কবে পেয়েছে?

চুপ ক'রে থাকলেম।

বুঝতে পারলেম, বহ্নিকে আমরা কেন এমনতর সবার বড় ক'রে ভালবেসেছি, হ'ত যদি অন্য মেয়ে ঈর্ষা ক'রে মরতেম। সে কি শুধু ওর বুদ্ধিতে, ওর প্রচণ্ড তেজে?

আসল কথা, ওর মধ্যে বিশেষকে দেখেছিলেম, ঐখানেই মানুষের টান। সেই বিশেষকে দেখলেম ওর কাজে, ওর ভালবাসায়; আজকের তপস্যায় সেই বিশেষ বিকশিত।

যাবার সময় বললে, অতীনকে ব'ল, কবির বিশেষ আনন্দ তার দেবার আনন্দ নয়, সৃজনেরও নয়, আপন অন্তর থেকে আপনার মধ্যে চলার বেগ পাবার আনন্দ, এতদিনে এই খবর আজ পেয়েছি।

বললেম, আবার কবে দেখা হবে, বহ্নি?

হেসে বললে, আর নয়।

শ্রীনমিতা মজুমদার

দুর্ঘটনা

ইনি আর উনি।

বড় রাস্তাটা ক্রস করিতেছিলেন দুইজনেই। ইনি যাইতেছিলেন এদিক হইতে ওদিকে, আর উনি আসিতেছিলেন ওদিক হইতে এদিকে। ইনি অনেকটা আগাইয়া গিয়াছেন, উনি ততক্ষণে ততটা আসিতে পারেন নাই।

উনির দুর্ভাগ্য ক্রস করিতে করিতে হুড়মুড় করিয়া একটা বাস আসিয়া পড়িল। কি ভয়ঙ্কর! ইনির স্নায়ুমণ্ডলীর উপর দিয়া একটা শিহরণ খেলিয়া গেল। অ্যাঁ, লোকটা চাপা পড়িতেছে তবে? উপস্থিত দুর্ঘটনার ভীষণ দৃশ্যে ইনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও স্তব্ধ হইয়া যেখানে ছিলেন সেইখানেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

ভাগ্যক্রমে উনি বাঁচিয়া গেলেন সামান্য এতটুকুর জন্য। কিন্তু ইনি আর বেশিক্ষণ বাঁচিলেন না।

ইনি ছিলেন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া—একেবারে স্থাণুবৎ। ইনির দুর্ভাগ্য। পিছন হইতে কখন গাড়ি আসিয়া ইনিকে চাপা দিয়া গেল। উনি তখন অপর ফুটপাথে পৌঁছিয়াছেন। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যে উনির স্নায়ুমণ্ডলীর উপর দিয়া একটা শিহরণ খেলিয়া গেল। এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা দেখিয়া উনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও স্তব্ধ হইয়া যেখানে ছিলেন সেইখানেই দাঁড়াইয়া গেলেন।

কলিকাতা শহর—অল্পক্ষণেই ভিড়ে ভিড়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষাল

স্ত্রী

সার্ শঙ্কর তরফদারের বাড়ি, লেডি তরফদারের বসিবার ঘর। সময়, রাত্রি নটা বাজে। সার্ শঙ্কর ঢুকলেন

সার্ শঙ্কর। এখনও আসে নি দেখছি। ভাল। কিছু সময় হাতে পাওয়া গেল। জিনিসটাকে বেশ ড্রামাটিক ক'রে তুলতে হবে। (পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে) নটা বাজতে পনরো মিনিট। আমি ভেবেছিলুম, প্রেমিকরা একটু অশান্ত, হয়তো আধঘণ্টাটাক আগেই এসে পড়বে। (ঘড়ি পকেটে রেখে) যাই হোক, এখুনি যে আসবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চিঠিতে তো তাই লিখেছিল দেখেছিলুম। দেবেন! দেবেন!

নেপথ্যে—আজ্ঞে যাই। পরে দেবেন ঢুকল

সার্ শঙ্কর। দেবেন, কেউ আসে নি তো?

দেবেন। আজ্ঞে না।

সার্ শঙ্কর। আচ্ছা। (দেবেন যাচ্ছে এমন সময়) দেবেন, শোন। এই কিছুক্ষণ আগে খবর পেলুম, লেডি তরফদারের এক পুরনো বন্ধু তাঁর সঙ্গে এই নটা নাগাদ দেখা করতে আসবেন। তিনি তো জান পিসীমার বাড়ি গেছেন। আসতে একটু দেরি হতে পারে। তাই আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলুম। যদি সে ভদ্রলোক আসেন আর লেডি তরফদারের খোঁজ করেন তো তাঁকে সোজা এইখানে নিয়ে আসবে। তিনি যে বাড়ি নেই সে কথা জানাবে না। বুঝলে?

দেবেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাবু শঙ্কর। আচ্ছা, এবার যেতে পার।

দেবেনের প্রস্থান

সাবু শঙ্কর। মাধবী এখনও ছেলেমানুষ আছে। যার সঙ্গে প্রেম করা হয়, তার চিঠি কি অমন ভাবে ভুল ক'রে এক দণ্ডের জন্যও টেবিলে ফেলে রাখতে আছে! এই তো আমার চোখে প'ড়ে গেল। বাড়ির ঝি চাকর কারুর চোখে পড়েছে কি না কে বলতে পারে! অনেক ক'রে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পিসীমার বাড়িতে পাঠিয়েছি। টালা, বালিগঞ্জ থেকে মাইল আষ্টেক তো হবেই। পিসীমাকে বলেছি, নটার আগে যেন কোনমতেই তাকে বেরোতে না দেন। নটার সময় আমার গাড়ি গিয়ে নিয়ে আসবে। আধঘণ্টা সময় হাতে থাকবে। (পায়চারি করতে করতে) সে লোকটা পুরনো প্রেমের কথা স্মরণ করতে অনুরোধ করেছে। লিখেছে, তোমার প্রেমপত্রগুলি আমি সযত্নে তুলে রেখেছি। আশা করি, তুমিও আমারগুলি রেখেছ। (একটা চেয়ারে ব'সে) দোষ আমারই। আটত্রিশ বছর বয়সে কুড়ি বছরের বালিকাকে আমার বিয়ে করাই অন্যায় হয়েছে। অধ্যাপকের জীবন, পড়াশোনাই আমাদের একমাত্র নেশা। আমার স্ত্রীর হয়তো সেটা পছন্দ হয় না। বিশেষ ক'রে শেয়ার মার্কেটের দালালের মেয়ে। সে কলকাতার সোসাইটি গার্ল—অনেক লোকের সঙ্গে মেশবার সুযোগ তার ঘটেছে। আমি তাকে সুখী করতে পারি নি। কিন্তু তবুও সে আমার স্ত্রী। তার প্রেম না পেলেও তার মান বাঁচাতে আমাকে হবেই। স্বেচ্ছায় যদি সে বিদায় নিয়ে চ'লে যায়—যাক, কিন্তু তার আগে পর্য্যন্ত—

হঠাৎ থেমে গেলেন

ললিত কারকর্ত্তার প্রবেশ। চেয়ারে উপবিষ্ট ব'লে সার্ শঙ্করকে দেখতে পেলে না। সোজা ঘরের মধ্যে চ'লে এল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে

ললিত। এই ঐশ্বর্য্য কিনেছে সে প্রেমের বিনিময়ে! নারীর কাছে মূল্য কি শুধু টাকা, গয়না, বাড়ি, গাড়ি, আর নামের? ভালবাসাটা কি তাদের চোখে একান্তই তুচ্ছ জিনিস? আমি তাকে এতটা না দিতে পারলেও খুব দৈন্যে রাখতুম না। আমাদের প্রথম যখন পরিচয় হয়, তখন তার বয়স পনরো বছর। চার বছর আমরা বলতে গেলে একসঙ্গে উঠেছি বসেছি। আমি যখন বিলেত যাই, সে বলেছিল আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আর এই এক বছরের মধ্যেই—না না, তাকে বোধ হয় জোর ক'রে তার বাপ বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। তার স্বামী তার মন, তার ভালবাসা নিশ্চয়ই পায় নি। সে আমারই আছে, আমাকে এখনও ভালবাসে। নইলে আমাকে এই সময় দেখা করতে লিখে পাঠাবে কেন? লিখেছে, সার্ শঙ্করের আজ বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের extra-ordinary মীটিং আছে, আসতে দেরি হবে।

সার্ শঙ্কর। নটা বাজতে মাত্র ছ মিনিট বাকি।

ললিত। (চমকে) কে? অঁ্যা—

সার্ শঙ্কর। (চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এসে) কি বলছেন?

ললিত। আমি—আমি জিজ্ঞেস করছিলুম, আপনি কে?

সার্ শঙ্কর। ভারী আশ্চর্য্য তো! আপনি যখন ঘরে ঢোকেন, আমারও ঠিক এই কথাই মনে হয়েছিল।

ললিত। তাই নাকি? কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমার পরিচয়ে আপনার কি প্রয়োজন থাকতে পারে।

সার্ শঙ্কর। প্রয়োজন ঠিক আমার নেই। তবে মানুষের idle curiosity—

ললিত। আশা করি আমি তা নিবৃত্ত না করলে আপনি কিছু মনে করবেন না।

সার্ শঙ্কর। মোটেই না। (ব'লে তিনি চেয়ারে বসলেন)

ললিত। আপনি তো দেখছি এটাকে নিজের বাড়ির মত মনে করছেন।

সার্ শঙ্কর। তা করছি বইকি। কেন করব না বলুন ?

ললিত। করবেন না এইজন্যে যে, এটা সার্ শঙ্কর ও লেডি তরফদারের বাড়ি। আমি জানতে পারি কি, আপনি কি অধিকারে লেডি তরফদারের ঘরে ঢুকেছেন ?

সার্ শঙ্কর। নিশ্চয়ই পারেন। তবে আপনার জানবার অধিকার যতটুকু, আমার উত্তর না দেবার অধিকারও তার চেয়ে কম নয়।

ললিত। এটা কোন উত্তর হ'ল না। আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, আমি এসে আপনাকে লেডি তরফদারের ঘরে ব'সে থাকতে দেখেছি।

সার্ শঙ্কর। তা ঠিক। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম, তারপর ব'সে পড়লুম। আর একটু পরে এলে হয়তো নিদ্রিত অবস্থায় দেখতেন। কিন্তু আপনার কথায় আমার একটা প্রশ্ন মনে হ'ল। আপনি এখানে কোন্ অধিকারে এসেছেন জানতে পারি কি ?

ললিত। আমি ? আমি এসেছি, মানে এই—লেডি তরফদারের সঙ্গে দেখা করতে।

সার্ শঙ্কর। কি আশ্চর্য্য ! আমিও ঠিক সেইজন্যেই এসেছি।

ললিত। আমাকে আপনি এ কথা মনে করিয়ে দিতে বাধ্য করছেন যে, লেডি তরফদার বিবাহিতা এবং তাঁর ঘরে একজন অপরিচিত পুরুষের উপস্থিতি অনেক কথার সৃষ্টি করতে পারে।

সার্ শঙ্কর। ভাগ্যিস বললেন। আমি এভাবে ভেবে দেখি নি।

আপনার চিন্তাশক্তি সত্যিই খুব প্রখর। তা হ'লে আমার এখন কি করা উচিত?

ললিত। ভদ্রলোকের এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র পথ আছে।

সার্ শঙ্কর। ঐ তো মুশকিল করলেন। আমি ভদ্রলোক, এমন কথা কখন বললুম? তা যাই হোক, কিন্তু পথটা কি?

ললিত। এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে চ'লে যাওয়া।

সার্ শঙ্কর। ঠিক বলেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। (যেতে গিয়ে হঠাৎ থেমে) দেখুন, একটা কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি চ'লে গেলে আপনার উপর অবিচার করা হবে না কি?

ললিত। আমার ওপর! কেন?

সার্ শঙ্কর। (এগিয়ে এসে) বুঝছেন না? আপনার কথামত আমি যদি চ'লে যাই আর আপনি একা থেকে যান, তবে ভদ্রলোক হিসেবে আপনারও ঐ একটি পথই থাকবে অর্থাৎ কিনা চ'লে যেতে হবে।

ললিত। আপনি ভুল করছেন, আমাদের দুজনের এক রকম অবস্থা নয়। আমাকে এখানে লেডি তরফদার বিশেষ ক'রে আসতে অনুরোধ করেছেন ব'লেই এসেছি।

সার্ শঙ্কর। যদি সে কথা বলেন, তবে আমারও ঠিক ঐ অবস্থাই।

ললিত। আপনাকেও আসতে বলেছেন! অসম্ভব। আমাকে আর আপনাকে একই সময় তিনি ডেকেছেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

সার্ শঙ্কর। আপনি ঘরে ঢুকছেন দেখে আমারও ঐ রকম একটা ধারণা জন্মেছিল। এখনও ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।

ললিত। একবার ভেবে দেখেছেন, সার্ শঙ্কর যদি জানতে পারেন—

সার্ শঙ্কর। কি যে বলেন! সার্ শঙ্করকে কে কেয়ার করে? একটা স্বামী বইতো নয়। আজকাল কোন্ স্ত্রী বা তার বন্ধু স্বামীর সেন্টিমেণ্টকে গ্রাহ্য করে?

ললিত। তাঁর সেন্টিমেণ্টের কোন দাম নেই বলতে চান?

সার্ শঙ্কর। একেবারেই কোন দাম নেই। মডার্ন মেয়ে স্বামীকে খরচ যোগাবার একজন সরকার ছাড়া আর কিছু মনে করে না। আপনি এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মিছে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?

ললিত। কারণ আমি লেডি তরফদারের অনেকদিনকার পুরনো বন্ধু। তাঁর সুনামের কথা আমায় ভাবতে হবে।

সার্ শঙ্কর। এটা একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন। লেডি তরফদারের সঙ্গে আমার খুব বেশি দিনের আলাপ না হ'লেও সার্ শঙ্করকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি।

ললিত। 'তাঁর বিশেষ বন্ধু হয়েও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতে দেখাশোনা আলাপ করতে আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন না?

সার্ শঙ্কর। না। কারণ আমি ছাড়া আরও অনেকেরই তো এ সৌভাগ্য ঘটে। স্বামীকে লুকিয়ে স্ত্রীরা যা যা করে, তা যদি সব স্বামীরা টের পেত, তা হ'লে প্রত্যেকে এতদিন পাগল হয়ে যেত। এই তো ধরুন, আপনিও এসেছেন—

ললিত। বার বার এক কথা তুলছেন। বলেছি তো, আমি এখানে লেডি তরফদারের বিশেষ অনুরোধে এসেছি। কিন্তু আপনার এখানে আসার কোন ন্যায্য কারণ দেখাতে পারছেন না।

সার্ শঙ্কর। আমি সার্ শঙ্করের বিশেষ অনুরোধে—

ললিত। তাঁর স্ত্রীর ঘরে এসে ব'সে আছেন! চমৎকার যুক্তি!

সার্ শঙ্কর। দেখুন, আমরা যখন মীমাংসা করতে পারছি না, তখন লেডি তরফদারের হাতেই এ ভারটা দিলে কি রকম হয়?

ললিত। ঠাট্টার একটা সময় আছে। তাঁর সঙ্গে আমার পাঁচ বছরের আলাপ। আপনার আলাপের চেয়ে অনেক বেশি।

সার্ শঙ্কর। এটা সত্যি কথা। তবে একজন পনরো বছরের বালিকার আপনার মতন সুদর্শন যুবকের সঙ্গে প্রথম প্রেম ক্ষমা করা চলতে পারে। কিন্তু কুড়ি বছরের যুবতী ঠিক অত সহজে হয়তো তৃপ্ত হবে না। সংসারকে সে একটু বেশি বুঝতে শিখেছে। শুধু সুন্দর চেহারা আর মিষ্টি কথাবার্ত্তায় সে এখন নাও ভুলতে পারে। আর আপনাকে ভালবাসেন কিংবা বাসতেন তার প্রমাণ?

ললিত। কি আবোল-তাবোল বকছেন! (পকেট থেকে একতাড়া চিঠি বের ক'রে) এই সমস্ত চিঠি তাঁরই লেখা। এর চেয়ে বড় প্রমাণ কিছু চাই?

সার্ শঙ্কর। না। তবে (পকেট থেকে একতাড়া চিঠি বের ক'রে) আমাকেও তিনি পত্র লিখেছেন এবং তাতে প্রেমের একটু আমেজও আছে মনে হয়। হতে পারে, তিনি সব মিথ্যে ক'রে লিখেছেন, কিন্তু তবু লিখেছেন তো।

ললিত। আপনাকে তিনি প্রেমপত্র লিখেছেন? মিথ্যে কথা, আমি ওসব বিশ্বাস করি না।

সার্ শঙ্কর। আহা, চটেন কেন? আসুন বাজি ফেলা যাক।

ললিত। কিসের বাজি?

সার্ শঙ্কর। আমাদের এই চিঠির তাড়া। যাকে লেডি তরফদার বেছে নেবেন, সেই জিতবে। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?

ললিত। মোটেই ভয় পাচ্ছি না। কারণ জিতব আমিই।

সার্ শঙ্কর। তবে আর কি, দেখাই যাক না। আপনি আগে চেষ্টা করবেন, তারপর না হয় আমি ভাগ্য পরীক্ষা করব। তবে একটা সর্ত্ত।

ললিত। কি?

সার্ শঙ্কর। আপনি যখন লেডি তরফদারের সঙ্গে কথা কইবেন, আমি পাশের ঘরে আমার চান্সের জন্তে অপেক্ষা করব। আপনি কিন্তু আমার কথা উল্লেখ করতে পাবেন না।

ললিত। রাজি।

সার্ শঙ্কর। বেশ, তা হ'লে আমি পাশের ঘরে চললুম।

প্রস্থান

ললিত। এ লোকটা কে? মাধবীরই বা এর সঙ্গে কি সম্পর্ক? এক বছরের মধ্যে এতখানি সে বদলে গেল কি ক'রে? একটা বুড়ো স্বামী, বিশেষ ক'রে একটা অধ্যাপককে মাধবীর মত রোমান্টিক মেয়ে কখনও ভালবাসতে পারে না—

লেডি তরফদারের প্রবেশ

ললিত। (এগিয়ে কাছে গিয়ে) মাধবী!

লেডি তরফদার। মিষ্টার কারফর্ম্মা! এসেছেন দেখছি।

ললিত। মিষ্টার কারফর্ম্মা! এসেছেন! তুমি কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে যে, এক সময়ে আমি তোমার ললিতদা ছিলুম।

লেডি তরফদার। আপনিও দেখছি ভুলে গেছেন যে, আমি এখন লেডি তরফদার।

ললিত। কিন্তু সেটা মনে করিয়ে দেবার দরকার ছিল কি?

লেডি তরফদার। হয়তো ছিল।

ললিত। হয়তো তোমার কথাই ঠিক।

লেডি তরফদার। ভবিষ্যতে আপনি বললে বাধিত হব।

ললিত। উত্তম। মানুষ যখন অনেক দাম দিয়ে কোন রত্ন কেনে, তখন সে ঠকেছে জানলেও মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে গর্ব্বভরে পাঁচজনকে দেখিয়ে বেড়ায়।

লেডি তরফদার। তার মানে?

ললিত। মানে পরিষ্কার। লেডি তরফদারের মন শুধু বাহ্যিক আড়ম্বরে কেনা যায় না।

লেডি তরফদার। সে কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি। আপনি আমাকে ডেকে পাঠাতে বাধ্য করেছেন কেন?

ললিত। বাধ্য বলবেন না।

লেডি তরফদার। সত্যি কথা বলতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না।

ললিত। বেশ তাই। আমি শুধু এই কথা ভাবছি যে, আমার এখানে আসাতে আপনি যতটা আনন্দিত হয়েছেন, সার্ শঙ্কর হয়তো ততটা হবেন না।

লেডি তরফদার। তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকলে এ কথা বলতেন না।

ললিত। বটে! তিনি চমৎকার লোক তো! (হঠাৎ গলার স্বর বদলে) মাধবী, কেন তুমি আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করছ? আমাদের সেই পুরনো দিনের কথা কি সব ভুলে গেছ? জান, সেই একমাত্র চিন্তাই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে।

লেডি তরফদার। আশা করি আরও কিছুদিন রাখবে, যতদিন না আর একজন এসে জীবনটাকে মধুময় আর উজ্জ্বল ক'রে তোলে।

ললিত। তুমি আমায় বিদ্রূপ করছ!

লেডি তরফদার। না। বন্ধুভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছি।

ললিত। আমরা কি শুধু বন্ধুই ছিলাম?

লেডি তরফদার। হয়তো তার চেয়ে কিছু বেশি, আরও নিকটতর কিছু সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ভুললে চলবে না, তখন আমরা নেহাত ছেলেমানুষ ছিলাম। আর বাবা আপনাকে একজন পয়সাওয়ালা ক্লায়েণ্ট পেয়ে যত রকম ভাবে ধ'রে রাখা যায়, তার চেষ্টা করে-ছিলেন। বাবার তখন বাজারে খুব বদনাম। চট ক'রে কেউ তাঁর কাছে কাজ করতে আসে না। তাই তিনি আপনাকে পেয়ে ছেড়ে দিতে পারেন নি। দালালি বুদ্ধি তাঁকে নিজের মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে কাজ আদায় করবার পরামর্শ দিয়েছিল। আজ আপনার টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। বাবার কাছে যান, দেখবেন কোন আদরই পাবেন না।

ললিত। কিন্তু তোমার কাছে মাধবী?

লেডি তরফদার। আমি মাধবী নই। আমি এখন লেডি তরফদার।

ললিত। তোমার ভালবাসা, আমায় বিবাহ করবার প্রতিজ্ঞা, তবে কি সব মিথ্যে? তুমিও কি তোমার বাপের সঙ্গে মিশে আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করেছিলে?

লেডি তরফদার। আমাকে ভুল বুঝবেন না ললিতবাবু। তখন আমার আমার বয়স ও সাংসারিক অভিজ্ঞতা দুই খুব কম ছিল। ঝোঁকের বশে যা করেছিলাম, তার মধ্যে বুদ্ধিহীনতার ভাগই বেশি, কিন্তু কপটতা ছিল না। আমি জানি, আমার দোষ অমার্জ্জনীয়। আপনার কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি। কিন্তু মাধবীর ভুলের জের লেডি তরফদার বহন করতে পারে না। মাধবী একজন সংসারে অনভিজ্ঞা বালিকা ছিল, লেডি তরফদার স্ত্রী।

ললিত। কিন্তু তাকে জোর ক'রে স্ত্রী হতে বাধ্য করা হয়েছিল।

লেডি তরফদার। ভদ্রতার সীমা এড়িয়ে যাবেন না ললিতবাবু। মনে রাখবেন, পনরো বছরের বালিকার সঙ্গে আপনি কথা কইছেন না।

ললিত। তাই হ'লে সুখী হতাম। তার প্রাণ ছিল। সে তখনও তোমার মত টাকা এবং নামকেই জীবনের একমাত্র কাম্য ব'লে মনে করতে শেখে নি—

লেডি তরফদার। আপনার আর কিছু বলবার না থাকে তো যেতে পারেন। আপনার কথা শুনতেও আমার অপমান বোধ হচ্ছে।

ললিত। অপমান! বেশ, তবে আমার কথা শুনো না। কিন্তু আমায় আজ এইখানে আসতে অনুমতি দিয়েছিলে কেন, জানতে পারি কি?

লেডি তরফদার। ভেবেছিলুম, ছেলে বয়সের উত্তেজনায় যে চিঠিগুলো আপনাকে লিখেছিলাম, সেইগুলো ফেরত চাইব।

ললিত। কেন?

লেডি তরফদার। কারণ আছে।

ললিত। শুনতে পারি?

লেডি তরফদার। কারণ আমার স্বামীকে আমি ভালবাসি। যদিও চিঠিগুলির মধ্যে দোষের কিছুই নেই, তবুও তাঁর মনে কষ্ট দিতে আমি চাই না।

ললিত। অর্থাৎ স্বামী তোমায় সন্দেহ না করেন তাই?

লেডি তরফদার। বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে।

ললিত। যাচ্ছি। তবে মনে রেখো, আমার সঙ্গে ঝগড়া করাটা সমীচীন হবে না। এই চিঠিগুলো তোমার স্বামীর হাতে পড়লে—

লেডি তরফদার। আপনি নিশ্চয়ই তা করবেন না।

ললিত। করব, কারণ আমি তোমায় ভালবাসি। তোমায় পেতে

আমি কোন কাজ করতে পেছ-পা নই। আমি জানি, তুমি সার্ শঙ্করকে বিবাহ করেছ, ভালবাসার ভান করেছ, কিন্তু সত্যিই তুমি তাকে ভালবাস না। আমি এ অভিনয় করতে দোব না তোমাকে।

লেডি তরফদার। চুপ করুন। আপনি না যান, আমিই যাচ্ছি।

প্রস্থানোদ্যত

ললিত। (দরজা আগলে) না না, যেও না। বিশ্বাস কর, আমি তোমায় ভালবাসি। তোমার গোপন কথা আমি কখনও প্রকাশ করব না—

লেডি তরফদার। গোপন কথা! আপনার সঙ্গে এমন কোন কথা আমার থাকতে পারে না। ছিলও না কোন দিন।

ললিত। (পকেট থেকে চিঠির তাড়া বার ক'রে) কিন্তু এই চিঠিগুলো তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। (হঠাৎ লেডি তরফদারের হাত ধ'রে) বল, তুমি আমায় ভালবাস—

লেডি তরফদার। (হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে) ছেড়ে দিন আমার হাত, ছেড়ে দিন—

পাশের ঘর থেকে সার্ শঙ্করের প্রবেশ। ললিত হাত ছেড়ে দিল। লেডি তরফদার পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল

সার্ শঙ্কর। বড়ই দুঃখিত আপনাদের আলাপে ব্যাঘাত ঘটালাম। কিসের একটা গোলমাল শুনে—

ললিত। আপনার এ সৌজন্য না দেখালেও চলত। আপনার সঙ্গে কথা ছিল—

সার্ শঙ্কর। সেই কথামতই তো এলাম। আমার যেন মনে হ'ল, আপনি হেরেছেন।

ললিত। আপনি জিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও এ অভিনয়ের যবনিকা

পড়ে নি। (ঘণ্টাধ্বনি) বাড়ির চাকর-বাকররা এসে দেখুক, লেডি তরফদারের ঘরে রাত দশটার সময় কি সমারোহে প্রেমের লীলা হচ্ছে !

দেবেনের প্রবেশ

দেবেন। (সার্ শঙ্করকে) হুজুর আমায় ডাকলেন ?

সার্ শঙ্কর। হ্যাঁ।

ললিত। হুজুর ! আপনি—মানে আপনি কে ?

সার্ শঙ্কর। যার সঙ্গে লেডি তরফদার নিঃসঙ্কোচে ন্যায়ত ধর্ম্মত প্রেম করতে পারেন। আমি সার্ শঙ্কর তরফদার। চিঠিগুলো দিন।

ললিতের অবশ হাত হইতে চিঠির তাড়াটা নিলেন

সার্ শঙ্কর। দেবেন, ভদ্রলোককে এগিয়ে দিয়ে এস।

দেবেন। আসুন।

মাথা হেঁট ক'রে দেবেনের সঙ্গে ললিত চ'লে গেল

লেডি তরফদার। আমায় তুমি ক্ষমা কর। আমি দোষী।

সার্ শঙ্কর। তোমার বিবাহের আগের জীবন আমার নয়। তার দোষগুণ বিচার আমি করছি না। তোমার শত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও আজ তুমি আমার স্ত্রী। সে পরিচয়টুকু আমি পেয়েছি।

লেডি তরফদার সার্ শঙ্করের পায়ের কাছে ব'সে পড়লেন

লেডি তরফদার। কিন্তু তুমি তো সব শুনেছ। আর এই চিঠির তাড়া আমার অপরাধের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সার্ শঙ্কর। (তাকে তুলে) সব শুনেছি ব'লেই বুঝেছি, আমার স্ত্রীভাগ্য সত্যই ভাল। আর যারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, আজ এইক্ষণ থেকে তারা হবে লুপ্ত।

পকেট থেকে দেশলাই বার ক'রে চিঠির তাড়ায় আগুন লাগিয়ে দিলেন। দাউদাউ ক'রে সেগুলো জ্বলতে লাগল। সার্ তরফদারের পায়ের কাছে নত হয়ে লেডি তরফদার প্রণাম করলেন। সার্ শঙ্কর তাকে তুলে বুকে টেনে নিলেন

শ্রীযামিনী কর

"সংশ্রেয়দ্রুমে গজভগ্নে"—

ধীরে ধীরে সরি গেল কাল-যবনিকা,
প্রলয়-তাণ্ডব শুরু হ'ল সেইক্ষণ,
নিঃশেষে বিচূর্ণ হ'ল সর্ব্ব-আভরণ,
ধূলায় নিশ্চিহ্ন হ'ল আলোক-কণিকা।

মহাকাল-অধীশ্বর, কি মত কৌতুকে
হেলায় ছিঁড়িলে তব লীলা-শতদল,
কি আনন্দে মনোমাঝে জাগিল পাগল,
ম্লান কর দগ্ধধূমে উমার যৌতুকে।

সভয়ে প্রহর গুনি, ওগো নটরাজ—
জানি এ প্রলয়-শেষে বসি ধ্যানাসনে
আবার নিমীল নেত্রে বিকশিবে লাজ,
খেলিবে নূতন খেলা আপনার মনে।

অন্তিম প্রণাম লহ অস্তগামী রবি,
অনাগত হে ঋত্বিক, দেখি তব ছবি।

শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার

রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ

(১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

বাবুকে জানাইবে, কারণ অন্নদা এখানে আসিতে ইচ্ছুক আছে তাহাকে সত্বর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

C/o. Messrs Thomas Cook & Son
Ludgate Circus, London
[37, Alfred Place, South Kensington, London]
২৯ বৈশাখ ১৩২০

কল্যাণীয়েষু

শ্রীমান সরোজকে বিলাতে আনিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। কারণ, অভিভাবকদের অনভিমতে তাহার জীবনকে চালনা করিবার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিতে পারি না। এইজন্য দেবলকেই এই ব্যবসায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা যাইতেছে। ইহাতে সরোজের মনে আঘাত লাগিতে পারে কিন্তু এই আঘাতে তাহাকে অভিভূত করিবে না। তাহার জীবনের বিধাতাকে স্মরণ করিয়া সরোজ যেন তাহার জীবনের সকল বিধানকেই প্রসন্নচিত্তে ও নতশিরে গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতেই তাহার প্রকৃত কল্যাণ হইবে। জীবনের যথার্থ সার্থকতা কোনো একটা বাহ্য ঘটনার উপরে নির্ভর করে না, অন্তরের সত্য সাধনার দ্বারাই মানুষ সত্য ফল লাভ করে। সে ফল অনেক সময় বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্তর্যামী তাহার হিসাব রাখেন। সরোজকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিয়ো সে যেন সামান্য ইচ্ছার ব্যাঘাতে অবসাদগ্রস্ত না হয়—সুখে দুঃখে আশায় নৈরাশ্যে জীবনের সকল পরীক্ষাতেই সে জয়ী হইবে ইহাই তাহার নিকট হইতে আমরা প্রত্যাশা করি। যেখানে প্রতিকূলতা সেইখানেই তাহার শক্তির পরীক্ষা হইবে। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঔঁ

[বোলপুর]

কল্যাণীয়েষু

তোমরা ত জান এখন আমাদের বিদ্যালয়ে স্থান অত্যন্ত অল্প। যেটুকু আছে সেও যদি বিনা বেতনের ছাত্র দ্বারা পূরণ করা যায় তবে তাতে আমাদের দ্বিগুণ ক্ষতি। এই জন্যে এখন তোমার প্রস্তাবটি গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় কিছুদিন বিদ্যালয় চললে তবে বোঝা যাবে বিদ্যালয়ের আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য ঠিক হবার মত দাঁড়িয়েছে কিনা। আমি নোবেল পুরস্কার পাওয়াতে যেমন বিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্য হয়েছে তেমনি বর্ত্তমানে ব্যয়বৃদ্ধির নানা উপসর্গ দেখা যাচ্চে। সে জন্য এখন থেকে সকল বিষয়েই সাবধান হবার দরকার হয়েছে। বিদ্যালয়ের আয় যতক্ষণ ব্যয়ের চেয়ে বেশি না হবে এবং হাতে কিছু টাকা না জমবে ততক্ষণ এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিঘ্ন ঘটবে। ইতি ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩২০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিগুলিতে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় ব্যতীত যাঁহারা উল্লিখিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বাংলা দেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, নেপালচন্দ্র রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, জগদানন্দ রায় প্রভৃতিকে সকলেই জানেন। তাঁহারা ছাড়া যাঁহাদের উল্লেখ আছে, তাঁহাদের পরিচয় এই—

সরোজ—মনোরঞ্জনবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বর্ত্তমানে শ্রীনিকেতন শিল্প-ভবনের সহকারী সচিব। চুনি—চুনিলাল মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক। গোরা—গৌরগোপাল ঘোষ। দেবল—নারায়ণ কাশীনাথ দেবল—ভাস্কর। বীরেন—বীরেন্দ্রনাথ বসু, অ্যাটর্নী। বিশু—বিশ্বেশ্বর বসু, ডাক্তার। সোমেন্দ্র—ত্রিপুরা স্টেটের কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরের পুত্র—সোমেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা। অন্নদা—অন্নদা বর্দ্ধন। চুনিলাল মুখোপাধ্যায় ব্যতীত ইঁহারা সকলেই প্রাক্তন ছাত্র।

চলচ্চিত্র

শার্দ্দূল অঙ্কিত

১। Speculation in Art

Critic awaits salvation through his exploitations.
The bullet charges with news report

[Read *Modern Review*—Nov. 1941.

২। Art of হিজিবিজি (১)

পেত্নীর প্রলয়নাচন

[টীকার জন্য ১৯৪১ নবেম্বর মাসের মডার্ন রিভিউ দ্রষ্টব্য

৩। Art of হিজিবিজি (২)

পেত্নীর পতিশোক

[১৯৪১ নবেম্বর, মডার্ন রিভিউ দ্রষ্টব্য

সংবাদ-সাহিত্য

শুনিয়া দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের বিয়োগে এখন (১৪।১১।৪১ সকাল) পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় ছাপার অক্ষরে দুই হাজার এক শত তেরোটি প্রবন্ধ ও তেরো হাজার সাতটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়মূলক স্মৃতি-কথা নয় শত বাহান্নটি। বাংলা দেশের সকল পাঠকের পক্ষে সবগুলি রচনা সংগ্রহ করিয়া পাঠ করা সম্ভব নয়। অনেকের হইয়া সে কাজ আমরাই কষ্ট করিয়া করিয়াছি। পাঠকদের সুবিধার জন্য দুই দশ জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির উক্তির মূল কথা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। দুই এক স্থলে সাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে টীকা যোগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই বিশাল সমুদ্র মন্থন করিয়া আমরা যে অমৃত আহরণ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের "মন্দার হিল" হইয়া যাইবার কথা, কিন্তু সে-অঞ্চলে সহসা রেল-লাইন তুলিয়া লওয়া হইতেছে দেখিয়া কোনক্রমে সামলাইয়া লইয়াছি।

* * *

ভারতের শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে কিছুই বলেন নাই। বলিলেও ইংরেজী অথবা ফরাসী ভাষায় বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু বাংলার অরবিন্দ প্রবর্ত্তক-ব্যাঙ্কের শ্রীমতিলাল রায় চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছেন—

> যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু প্রাণবন্ত, রবীন্দ্রনাথ সেইখানেই শ্রদ্ধার্ঘ্য হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন।...তিনি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের জুটমিল-সংস্থাপন কার্য্যের প্রারম্ভে যে উৎসাহ-বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাও এইখানে লিপিবদ্ধ করিলাম: [রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি ব্লক করিয়া ছাপা]—'প্রবর্ত্তক', ভাদ্র, পৃ. ৩৯৪

ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিসম্পন্ন যে কোনও সংসারী লোক রবীন্দ্রনাথের এই "শ্রদ্ধার্ঘ্য"কে বিজ্ঞাপনের কাজে লাগাইতেন। কিন্তু সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীদের রকমই আলাদা। তাঁহাদের বিষয়-বৈরাগ্য আমাদের প্রণিধানের বাহিরে।

* * *

যাঁহাদের বিশ্বাস আমাদের রায়বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সেই ঘড়ি-বিক্রয়ের স্মৃতিটুকুই সম্বল, তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি—অন্য প্রসঙ্গও আছে। যথা—

বাঙ্গালীকে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] যে সুন্দরের স্বপ্ন দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার অলস জড়িমা—বহুদিন পর্যন্ত প্রাণে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইবে।—'ভারতবর্ষ', আশ্বিন, পৃ. ৪২০

অভিধানে দেখিলাম, "জড়িমা" অর্থে জড়ত্ব। অলস জড়ত্ব কি ভাবে প্রাণে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইবে—কাহারও কাহারও মনে এ সংশয় উঠিতে পারে। আমাদের বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা তখনই মনে মনে সরস, সতেজ, সুকৃষ্ণ ও সুমিষ্ট বার্দ্ধক্যের কথা চিন্তা করিবেন—সব সংশয়ের নিরসন হইবে।

* * *

আরও আছে ; আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথাকেও কি ভাবে কৌশলে অন্য উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহার রায়বাহাদুরী দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনারা চমৎকৃত হইবেন। রায়বাহাদুর লিখিতেছেন—

আমরা যে সময়ে ছাত্র, অথবা ছাত্রজীবন অতিক্রম করিয়াছি মাত্র, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে' প্রভৃতি গান শুনিয়া আমরা কত আনন্দ পাইতাম, কিরূপ আত্মহারা হইতাম, তাহা এখন কেমন করিয়া বুঝাইব?—ঐ. পৃ. ৪২০

'গীতিমাল্য' খুলিয়া দেখিতেছি, "তুমি যে সুরের আগুন" গানটি ১৩২০ বঙ্গাব্দের ২৪ চৈত্র অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় মাঝামাঝি কালে লিখিত ; গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তখন লাগে লাগে। ইহার প্রায় দেড় যুগ পূর্ব্বে রায় বাহাদুর ছাত্রজীবন খতম করিয়াছেন! শুনিয়াছি, রায়বাহাদুরের স্বপক্ষ বিপক্ষ বহু পক্ষ আছে। কোন্ পক্ষকে কাবু করিবার জন্য তিনি এই পাশুপত অস্ত্রটি প্রয়োগ করিয়াছেন, জানিতে বাসনা হয়।

* * *

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় যখন শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগদান করেন, তখন

আশ্রমে অল্প বয়সের বিশ-পঁচিশটি ছাত্র। আশ্রমটি তখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ। ছেলেরা ব্রহ্মচারী।...পূর্বে কোন দিন ব্রহ্মচর্য পালন করিনি (sic)। ছেলেদের দেখিয়া উহা পালন করিবার ইচ্ছা হইল।...

এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে জানাইলেন যে, গুরুদেব আমাকে ডাকিতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি গেলাম।...কী উজ্জ্বল মূর্তি! পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন, ইহাতে মুখের রং আরও ধপ-ধপ করিতেছে।...প্রথম দেখামাত্রই কেমন তাঁহাকে ভাল লাগিল, তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম,...যাহাকে সংস্কৃতে "তারামৈত্রক"

বলে আমাদের তাহাই হইয়াছিল। একজনের চোখের তারার সঙ্গে অপরের চোখের তারা মিলিলেই যে ভালবাসা হয় তাহার নাম "তারামৈত্রক"।...—'প্রবাসী', আশ্বিন, পৃ. ৭২০-২১

ব্রহ্মচারী যেদিনই হইয়া থাকুন, শাস্ত্রীমহাশয় বাক্-সংযমী হইতে পারেন নাই। আর একটি কথা, "তারামৈত্রক" হইলে কেশসঙ্কুল মস্তকও মুণ্ডিত দেখায়! রবীন্দ্রনাথ পিতৃশ্রাদ্ধে শ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডন করিয়াছিলেন, মুণ্ডিতমস্তক হন নাই, এইরূপই আমরা জানি।

* * *

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—

সে যাই হোক্, আমরা যারা এখনও ইহলোকে আছি, আমরা কি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাক্‌বিস্তার করবার জন্যই আছি? আশা করি তা নয়।

আমাদের জীবনের বিশেষ কোনও সার্থকতা না থাকলেও এ অবস্থায় লেখা অসম্ভব। —'রবীন্দ্র-স্মৃতি পূর্ব্বাশা', পৃ. ২

এই পংক্তিটির পরে আরও পূরা দুই পৃষ্ঠা নীরবতা আছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে চৌধুরী মহাশয় মাত্র এগারোটি প্রবন্ধে বাক্-সংযম করিয়াছেন।

* * *

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত চৌধুরী মহাশয়ের শিষ্য কি না জানি না। তিনিও লিখিয়াছেন—

এ হল গভীর নৈঃশব্দ্যে অন্তর দিয়ে অনুভব করবার ঘটনা—ভাষা দিয়ে একে ব্যক্ত করে আমরা যেন মহাকবিকে খর্ব্ব করতে না যাই।—'প্রবর্ত্তক', ভাদ্র, পৃ. ৪০৬

ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই অখর্ব্ব; নতুবা সেনগুপ্ত মহাশয়ের সাত সাতটি "গভীর নৈঃশব্দ্যের অন্তর দিয়ে অনুভূতি"র ঠেলায় তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইত।

* * *

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু লিখিয়াছেন—

আমাদের মধ্যে তাঁরই সব মানস পুত্তলিগুলিকে তিনি যখন দেখতেন, এমন কি আমাদের লম্ফঝম্পও যখন তাঁর চোখে পড়তো, তখন তাঁর মনে অবস্থা......

'কবিতা', আশ্বিন, ক্রোড়পত্র, পৃ. ৮

যে বিধাতা শিব গড়িতে গিয়া বারংবার বিফলমনোরথ হইয়াছেন, তাঁহার মত হইত।

কাজী নজরুল ইসলাম "সালাম অস্ত-রবি" জানাইয়াছেন—

মানুষ তাঁহারি তরে কাঁদে, কাঁদে তাঁরি তরে আল্লাহ্,
বেহেশ্‌ত্ হ'তে ফেরেশ্‌তা কহে তাঁহারেই বাদশাহ্।
তুমি যেন সেই খোদার রহম এসেছিলে রূপ ধ'রে
আর্শের ছায়া দেখাইয়াছিলে রূপের আর্শি ভ'রে।
কালাম ঝরেছে তোমার কলমে, সালাম লইয়া যাও...

—'মাসিক মোহাম্মদী', ভাদ্র, পৃ. ৭২৭

কালাম আজাদ! কাজী সাহেবের কলমে যে পরিমাণ 'আজাদ' ঝরিয়াছে, তাহাতে মৌলভী মোহম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের জ্ঞাতি-কুটুম্বদের খুশি হইবারই কথা। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্ব্বে শুধু "খুনে" আপত্তি করিয়াছিলেন। জবেহ খুন নয়। না না, ছন্দের জবাই হওয়ার কথা নয়, "হেরেমে অনায়াসে" ঢোকার কথা নয়; "বীণা, বেণুকা ও বাণী" আছে, "রস-যমুনার পরশ" আছে এবং "ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস" আছে। থাকিলে কি হইবে, গন্ধ মারিবে কে!

* * *

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর আর একটি কথায় আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। তিনি বলিতেছেন—

যেমন একটা কথা আছে ভারতে যা নেই জগতে তা নেই। তেমনি রবীন্দ্রনাথে যা নেই পৃথিবীর কোনো সাহিত্যে কি সাহিত্যিকেই তা নেই, এই প্রবাদও একদিন রাষ্ট্র হবে।—'কবিতা', আশ্বিন, পৃ. ৪০-৪১

এটা অতিশয়োক্তি। রবীন্দ্রনাথে 'সাড়া' নাই, 'কটুগন্ধ অন্ধকার' নাই, 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' নাই, "এরা ওরা এবং আরও অনেকে" নাই; মক্ষিরাণী আছে বটে, কিন্তু এই মক্ষিরাণীতে এবং ঐ মক্ষিরাণীতে কত তফাত!

* * *

পরম বৈষ্ণব অধ্যাপক ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় "সাঁই" মতে চলিয়া রবীন্দ্রনাথকে "বন্ধু রবীন্দ্রনাথ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ফোঁটা-তিলক আসিয়া সাঁইকে ঢাকিয়া দিয়াছে—

শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজজনের—আর্ত্তিহর, ত্রাণকর্ত্তা, সম্পদে বিপদে একমাত্র অবলম্বন এবং সর্ব্বোপরি তিনি গোপগোপী সকলের প্রিয়তম বন্ধু, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সহিত আমাদের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ আর সকল সম্বন্ধকে অনাবৃত করিয়া রাখিয়াছে।—'প্রবর্ত্তক', ভাদ্র, পৃ. ৪০৭

অধ্যাপক মহাশয়ের দুঃসাহসের কথা আমরা জানি, কিন্তু "সকল সম্বন্ধকে অনাবৃত করিয়া রাখা"টা তাঁহার ভাল হয় নাই।

* * *

মুস্তাফীজুর রহমান বলিতেছেন—

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পিতা দেবেন্দ্রনাথ শুধু চালচলনে ও পোষাক-পরিচ্ছদেই ফার্সী সাহিত্যের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত ছিলেন না; আত্ম-সমর্পণেও ছিলেন তাঁরা আমাদের পরম আত্মীয়।—'মাসিক মোহাম্মদী', ভাদ্র, পৃ. ৭৪০

"আমাদের" বুঝিলাম, কিন্তু "আত্ম-সমর্পণ" বলিতে রহমান সাহেব কি mean করিয়াছেন?

* * *

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায় 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পূর্ব্বাশা'য় (পৃ. ৪৬) রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

তেরো বছর আগে প্যারিসের একটি জনাকীর্ণ ভোজনশালায় আমার এক নব-পরিচিত বান্ধবের সঙ্গে আমার বচসা বাধল। পাড়ার লোক তামাসা দেখতে আসার আগে তিনি অন্য টেবিলে উড়ে গিয়ে জুড়ে বসলেন, আমিও বাঁচলুম।

কিন্তু আমরা মরিলাম যে! "তেরো বছর আগে", "প্যারিস", "জনাকীর্ণ ভোজনশালা", "নবপরিচিত বান্ধব" ইহার কোনটিই রবীন্দ্রনাথ নন। ইহার পর যে গল্পটি রায় সাহেব বলিয়াছেন, তাহা বাঁকুড়াতে বসিয়াই বলা চলিত—তাহার জন্য প্যারিস পর্য্যন্ত ধাওয়া করিতে হইত না। কিন্তু তেরো বছরেও রায় মহাশয় কেরায়া-ব্যয়টা ভুলিতে পারিতেছেন না।

* * *

অনুরূপ অবস্থা হইয়াছে আমাদের নরেনদার। অনেক পরিশ্রম করিয়া তিনি অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন। বাংলার ইতিহাসকে একেবারে গুলিয়া খাইয়াছেন তিনি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তিনি লিখিলেন—

চঞ্চলা সৌভাগ্য লক্ষ্মী,—
বীরভোগ্যা বীর্য্যশুল্কা নারী
কাম্য যিনি সমগ্র বিশ্বের,
বিজড়িত বিম্বাধরে যার
রহস্য জড়িত হাস্যরেখা,

একদা সে এসেছিল ভাগীরথী কূলে
স্কন্দগুপ্ত মহীপালে করিতে বরণ
দুর্লভ মন্দার ফুলে
বরমাল্য করি বিরচন !—'ভারতবর্ষ,' আশ্বিন, পৃ. ৪১

"লোকোত্তর প্রতিভার বিচিত্র বিপুল উপহার"ই বটে !

*　　*　　*

শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—

রবীন্দ্র-সৃষ্টির বৃহৎ অধিশ্রয়ণে অন্তত ভারতবর্ষের মানসিক গতির সন্নিপাত হইয়াছে। —'রবীন্দ্র-স্মৃতি পূর্ব্বাশা', পৃ. ৭

*　　*　　*

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত "অন্তত" বলেন নাই, তাঁহার হইতেছে "অগত্যা"—

পৃথিবী সম্বন্ধে আমার যে অল্প অভিজ্ঞতা আছে, তার নির্ব্বন্ধে আমি অগত্যা মানতে বাধ্য যে, নিছক কবিত্বে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হোন বা না হোন, নিপট মনুষ্যত্বে তাঁর সমকক্ষ আমাদের যুগে খুব বেশী জন্মায় নি।—'পরিচয়', ভাদ্র, পৃ. ১৮৬

*　　*　　*

ক্রমশ ব্যাকরণে আসিয়া পড়িতেছি। "অন্তত" ও "অগত্যা"র প্রয়োগ দেখিলাম ; এবারে "অবশ্য" "ও" এবং "উপরন্তু" দেখুন—

বাংলা ভাষা তিনিই গড়ে তুলেছেন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে, যে সৌন্দর্য্যে আমাদের ভাষা অবশ্য বঞ্চিত। উপরন্তু তিনি আমাদের মাতৃভাষাকে অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দান করেছেন—সে ঐশ্বর্য্যের প্রসাদে আমাদেরও ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে।—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পূর্ব্বাশা', পৃ. ২

*　　*　　*

'নাচঘর' (ভাদ্র, পৃ. ৩৮৮) যথার্থই বলিয়াছেন—

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁকে লক্ষ্য ক'রে এরি মধ্যে জন কয়েক কবি কবিতা লিখে প্রকাশ ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রেছেন। কবির উদ্দেশে কবিতায় স্তুতি নিক্ষেপ—এর চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার আর কী হ'তে পারে ? রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে এই কবিযশপ্রার্থীদের করুণ কাৎরানী শুনে দুঃখের বদলে হাসি পায় : এও এক রকমের ক্যারিকেচার।

সত্যই তো, হাসির কথাই বটে ! মিল্টনের উদ্দেশে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, কীট্‌সের উদ্দেশে শেলী, শেক্সপীয়ার ও সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির "ক্যারিকেচারে" পৃথিবীর সাহিত্য ইতিমধ্যেই ভারাক্রান্ত হইয়া আছে, আবার কেন ?

*　　*　　*

কবি অচিন্ত্যকুমার এ কথা স্বয়ং কবিতাতেই স্বীকার করিয়াছেন—

তোমারও বিশেষ-সংখ্যা! সব যেন শেষ এর ওর,
সব যেন অতি সাধারণ!
দিবালোকে দীপাবলী! প্রতিদ্বন্দ্ব চলে পরস্পর
কার কত অরণ্য রোদন!

—'রবীন্দ্র-স্মৃতি পূর্ব্বাশা', পৃ. ৯৬

* * *

কিন্তু, সব মানিয়া লইয়াও এ কথাও তো স্বীকার করিতে হইবে যে, কবির উদ্দেশে কবিতা লেখার রেওয়াজ না থাকিলে আমরা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশের যুগান্তকারী প্রশস্তিটি হইতে বঞ্চিত হইতাম। উক্ত 'পূর্ব্বাশা'রই ৯৭ হইতে ৯৯ পাতায় যে কাব্যরস বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি।—

পঙ্কিল ইঙ্গিত এক ভেসে ওঠে নেপথ্যের অন্ধকারে : অধোভূত আধেক মানব
আধেক শরীর—তবু—অধিক গভীরতর ভাবে এক শব।
অনন্ত আকাশবোধে ভ'রে গেলে কালে ছুফুট মরুভূমি।
অবহিত আগুনের থেকে উঠে যখন দেখেছ সিংহ, মেষ, কন্যা, মীন
ববিনে জড়ানো মমি—মমি দিয়ে জড়ানো ববিন,—
দেয়ালে অঙ্গার, রক্ত, এক্যুয়ামেরিন আলো এঁকে
নিজেদের সংগঠিত প্রাচীরকে ধূলিসাৎ ক'রে
আধেক শবের মত স্থির :
তবুও শবের চেয়ে বিশেষ অধীর :
প্রসারিত হতে চায় ব্রহ্মাণ্ডের ভোরে ;
বৃহস্পতি ব্যাস শুক্র হোমরের হাররাণ হাড়ে
বিযুক্ত হয় না তবু—কি ক'রে বিযুক্ত তবু হয়!
ভেবে তার শুক্ল অস্থি হ'ল অফুরন্ত সূর্য্যময়।
অতএব আমি আর হৃদয়ের জনপরিজন সবে মিলে
শোকাবহ জাহাজের কানকাটা টিকিটের প্রেবে
রক্তাভ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই অভিজ্ঞের দেশে
প্রবেশ করেছি আর ভূখণ্ডের তিসিধানে তিলে।

এই মহামূল্য কবিতাটির জন্য রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুও সার্থক হইয়াছে।

* * *

আর সার্থক হইয়াছে শ্রাবণের 'অলকা'র সম্পাদকীয় এই মন্তব্যের জন্য—

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যারা গুণ্ডা, তাদের পরাক্রমে রবীন্দ্রনাথকে বারবার স্তব্ধ হতে হয়েছে। বহুবার অতি উচ্চ মূল্যে তিনি শাস্তি ক্রয় করেছেন।...রবীন্দ্রনাথের জীবিত-কালেই রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য জন্মলাভ করেছে এবং ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে; ডিক্‌টেটারশিপ থেকে ডেমোক্রাসীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এই রূপান্তরই তার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ জীবনে মাত্র একবার গত ২২এ শ্রাবণ স্তব্ধ হইয়াছেন। স্তব্ধ হইয়াছেন ভালই করিয়াছেন; বাঁচিয়া থাকিলে এই জাতীয় মানহানিকর উক্তির জবাব দিতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত।

'অগ্রগতি'র ভূত 'অলকা'র ঘাড়ে চাপিয়াছে; এই রচনায় সুভগেন্দ্র-সুভগেন্দ্র গন্ধ পাইতেছি।

* * *

'অলকা'র উক্তির জবাব দিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল। তিনি বলিতেছেন—

রবীন্দ্রনাথকে বিগত শতাব্দীর কবি ব'লে অভিহিত করার একটি ফ্যাশান কোনো কোনো মহলে দেখা যাচ্ছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর চিন্তাধারায় যে জটিলতাবাদ এসেছে, কবি নাকি সেখান থেকে অনেক দূরে। এটি বেশ মুখরোচক ধুয়ো সন্দেহ নেই। বর্ত্তমান শতাব্দীর মরশুমী বামনদের কল্পনায় কি কি মৌলিক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, সে আলোচনা অবশ্য হাস্যকর, কিন্তু তার চেয়েও কৌতুক বোধ করি, যখন চেয়ে দেখি কোনো কোনো সাহিত্যিক "মজদুর" ছোট হাতের হাতুড়ির ঘায়ে বিরাট হিমালয়ের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেছে। সান্ত্বনা এই যে, অসুস্থ মস্তিষ্কের সংখ্যা নাম মাত্র।—'প্রাঙ্গণ', রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা, পৃ. ৪৬৬

* * *

'বন্দনা' রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার "রবীন্দ্র-প্রয়াণে" লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন কবিতায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ছন্দদেবীও যে সহমরণে গিয়াছেন, হালদার মহাশয় সে কথা বিস্মৃত হইয়াছেন।

* * *

রবীন্দ্র-বিষয়ক সারসংগ্রহ এবারে শেষ করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদের দেখনহাসি হারীতকৃষ্ণ দেবের রবীন্দ্র-পরিচয় আপনাদের না শোনাইলে অন্যায় হইবে। দেব মহাশয় সম্ভবত একটু ভোজনপ্রিয়, সুতরাং তিনি ঔদরিক পরিচয় দিয়াছেন। কেক, স্যানাটোজেন, চা, চিনি, দুগ্ধ প্রভৃতি বহু প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু যাহা আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহা এই—

একদিন দেখি, টেবিলে প্রাতরাশের আয়োজনের মধ্যে আমাদের গেলাসে সাদা জল কিন্তু ওঁর গেলাসে 'লাল পানী'—একখানি রেকাবী চাপা দেওয়া। তিনি বসেই সহাস্যবদনে রেকাবী খুলে গেলাসটি একটু তুলে ধরে সাদরে নিরীক্ষণ করলেন। পরক্ষণেই আমাদের গেলাসের দিকে নজর দিয়ে বললেন: "ছাখো, অবশ্য এ-দ্রব্যটি তোমাদের দেওয়া হয় নি, তার জন্যে কিছু মনে কোরো না। সব সময়ে সকলকে সব জিনিষ অফার করা সমীচীন নয়। এটা তো বোঝো? আমরা শশব্যস্তে জানালুম, "না না। সে কি কথা! আমাদের সাদা জলই যথেষ্ট, লাল-জলে আমরা অভ্যস্ত নই।" কবি বললেন, "অভ্যস্ত থাকলেও বোধ হয় তোমাদের এ জিনিষ পরিবেশন করতে বলতে আমার দ্বিধা হ'ত। আমার বয়েসের কথাটা ভুলে যেও না। কিন্তু মন তো কারও হাত ধরা নয়। আমাদের দৃষ্টি যে মধ্যে মধ্যে তাঁর গেলাসের দিকে ধাবমান হচ্ছিল সেটা কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে অতিক্রম করতে পারলে না। আড়চোখে যে তিনি হঠাৎ বলে' ফেললেন:— "কিন্তু যা ভাবছ এ তা নয়। এ হচ্ছে পঞ্চতিক্ত।" এ রকম ভাবে গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল, বোধ হয় ওঁর মতো আর্টিষ্টই পারেন।—'উত্তরা', রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা, পৃ. ১৮১

ভাল। কিন্তু দেব মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। লাল জলে রীতিমত অভ্যস্ত না হইলে তো শুধু রং দৃষ্টে প্রাতঃকালে কাহারও এইরূপ ছুঁকছুঁকে ভাব হইবার কথা নয়! মই কাড়ার কথাই বা উঠিবে কেন? সমস্যায় পড়িয়াছি আমরা, কারণ মিথ্যাভাষণ সম্বন্ধে দেব মহাশয় নিজেই ঐ স্থানে বলিতেছেন—

অথচ, একেবারে মিথ্যে বলাও অসম্ভব, কেন-না হেরম্ব মৈত্র মহাশয় তখনও ইহলোকে।

এইরূপ এক ঢিলে দুই পাখী মারার দৃষ্টান্ত বিরল। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিতে গিয়া পরলোকগত হেরম্ব মৈত্র মহাশয়কে এই ভাবে স্মরণ করা সত্যই সহৃদয়তার পরিচায়ক।

* * *

এইবারে কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করা আবশ্যক। 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৪৮—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রবন্ধ—

পৃ. ৬৪১—"তিনি যে ৯ (ন') বৎসর বয়সে শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ অনুবাদ করেছিলেন তা ছেড়ে দিলেও, তিনি লিখেছেনই তো ৬৭।৬৮ বৎসরের অধিককাল।

"৯ (ন') বৎসর" স্থলে "১৩ (তেরো) বৎসর" হইবে।

*

'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৪৮—মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী-লিখিত প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়"—

পৃ. ৭২১—"রবীন্দ্রনাথ নিজেই "সংস্কৃত সোপান" নামে একখানি বই নূতন প্রণালীতে লিখিয়াছিলেন।

"সংস্কৃত সোপান" স্থলে "সংস্কৃত শিক্ষা (দুই ভাগ)" হইবে।

*

'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩৪৮—"বিবিধ প্রসঙ্গ"—

পৃ. ৯২-৯৩ "শ্রীযুক্ত ডক্টর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী আমাদিগকে জানিয়েছেন—

"শেষ লেখা" নামক রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা সংগ্রহে কয়েকটি প্রচলিত ভুল পাঠ সংশোধন করা হয়েছে। সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। কবির মূল রচনাকে এতদিনে অবিকৃতভাবে পাওয়া গেল।

১। "সমুখে শান্তি-পারাবার।" "শান্তির পারাবার" নয়।

২। ঐ গানের আরেকটি পদ, "জ্যোতি ধ্রুব-তারকার।" "জ্যোতির ধ্রুব তারকা" নয়। পাঠ ভুল থাকায় মিলের এবং অর্থ গ্রহণের বাধা ঘটেছিল।

এই ভুল যে সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের নজরে পড়িয়াছিল এবং তিনি ২৩ ভাদ্র মঙ্গলবারের 'যুগান্তর' পত্রিকায় "সমুখে শান্তি-পারাবার" নামীয় প্রবন্ধে তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেদিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য।

*

কার্ত্তিকের (১৩৪৮) 'ভারতবর্ষে'র ৬৬৪ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ একটি ছবির নীচে এইরূপ লেখা আছে—

মুঙ্গেরে "ক্ষুধিত পাষাণ" রচনা-রত রবীন্দ্রনাথ

"ক্ষুধিত পাষাণ" রচিত হয় পাবনার সাজাদপুরে। এই গল্প রচনার কথা ছিন্নপত্রে এইরূপ আছে—

সাজাদপুর,
২৮ জুন, ১৮৯৫

বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি—খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু ক'রে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

*

শ্রাবণের 'মাসিক বসুমতী'তে 'দৈনিক বসুমতী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিয়াছেন—

'বালকে' প্রকাশিত তাঁহার কবিতা পাঠ করিলে তাহাতে তাঁহার ভাষার অধিকার সহজেই বুঝিতে পারা যায়।...ইহার পর হইতেই রবীন্দ্রনাথের রচনা আর প্রথম বয়সের রচনা বলা সঙ্গত হইবে না।—পৃ. ৫৫৬

'বালক' নামেই ঘোষ মহাশয় গোলে পড়িয়াছেন। 'বালক' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রভৃতি উনিশখানি ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তক বাজারে বাহির হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে এবং প্রথম সন্তান মাধুরীলতার আগমনবার্ত্তাও বিঘোষিত হইয়াছে।

*

অগ্রহায়ণের 'ভারতবর্ষে' শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প" লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'করুণা'র নাম যখন তিনি করিয়াছেন, তখন বুঝা যাইতেছে, তিনি শুধু 'গল্পগুচ্ছে'র মধ্যেই তাঁহার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। 'গল্পগুচ্ছে' তাঁহার প্রথম গল্প "ঘাটের কথা", কিন্তু তৎপূর্ব্বেও তিনি একটি ছোট-গল্প লিখিয়াছিলেন—"ভিখারিণী", উহা দুই সংখ্যায় 'ভারতী'তে বাহির হয়। প্রথমার্দ্ধ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ ১২৮৪, পৃ. ৩৫-৪২) এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ ভাদ্রে (পৃ. ৭৯-৮৪) প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোলো। কাঁচা লেখা হইলেও ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প।

*

ভবানীবাবু আর একটি ভুল করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র তিনটি পংক্তির উদ্ধৃতিতে। ভুলের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের রচনা অনেক improve করিয়াছে সন্দেহ নাই, তবু ভুল is ভুল। ভবানীবাবুর উদ্ধৃতি এইরূপ—

'পূজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি নহি,
অবহেলে ফেলিবে তলায় সেও আমি নহি।' পৃ. ১২৫

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে সেও আমি নহি।

* * *

পূর্ব্বে উল্লিখিত কয়েক হাজার প্রবন্ধ ও কবিতার মধ্যে আরও অজস্র মজা এবং ভুল আছে, কিন্তু কাগজের দর যেরূপ হু-হু করিয়া চড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে আতঙ্কেই শুব্ধ হইতে হইল।

—

এই গেল এক দিক। আর এক দিকের কথাও আছে—পাঠকেরা প্রশ্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে, বাপু, সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত কোনও বস্তু কি কোথায়ও বাহির হয় নাই? নিশ্চয়ই হইয়াছে। নিজেদের কথা নিজেরা বলা শোভন নয়, কলিকাতা 'ম্যুনিসিপাল গেজেটে'র বিশেষ সংখ্যার কথা গতবারে বলিয়াছি। আরও দুই চারিটি প্রবন্ধ কবিতার হদিস দিতেছি। কার্ত্তিকের 'প্রবর্ত্তকে' শ্রীযামিনীকান্ত সেনের "রবীন্দ্রনাথ—যেমনটি দেখেছি ও বুঝেছি" (পৃ. ৪৯-৬২); আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে শ্রীসেবিকা লিখিত "রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ কয়দিন" (পৃ. ৭৪১-৭৪৭); ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" (পৃ. ৬৪১-৬৪৪এ); ভাদ্রের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে বেনজীর আহ্‌মদের কবিতা "রবীন্দ্র প্রয়াণে" (পৃ. ৭৩০-৭৩৪); আশ্বিনের 'মন্দিরা'য় শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখিত "রবীন্দ্রনাথ" (পৃ. ৩৬০-৩৬৭) এবং 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পূর্ব্বাশা'য় শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের "রবীন্দ্র-কাব্যের কবি-পুরুষ," শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের "রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার ছন্দ" ও শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের "ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ" (পৃ. যথাক্রমে ৬০-৭৩, ২৬-৩৫ ও ৪৮-৫৯)—এইগুলি পড়িলে পাঠকেরা আনন্দ পাইবেন।

—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'অগ্রগতি'র ভূত 'অলকা'র স্কন্ধে চাপিয়াছে। প্রমাণ আশ্বিনের 'অলকা'র মলাটেই মিলিবে। অস্পষ্ট স্মরণ হইতেছে, গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থিনী হিন্দু মহিলাদের বিস্রস্ত বসন ও শ্লীলতাবোধের অভাবের প্রতি সার্ নৃপেন্দ্র একদা কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যাঁহারা পুন্নাম নরক হইতে বাঁচাইয়াছেন, 'অলকা'-সম্পাদক তাঁহাদের অন্যতম। আশ্বিন সংখ্যাতেই সার্ নৃপেন্দ্রের রচনাও আছে। তিনিও কি 'অলকা'র মলাটটি বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করেন? লিঙ্গরূপী মহাদেবকে ডেভিল-পদী উলঙ্গিনী পার্ব্বতী সবেগে

আক্রমণ করিতেছেন, ইহাই হইল মলাটের বিষয়। ভাল বিষয়, কিন্তু এই ভাবে চলিলে পৈতৃক বিষয় ও সুনাম উভয়ই ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা।

কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পরস্পর মিতালি করিয়া একটি "অতি আধুনিক মাসিক পত্রিকা" বাহির করিয়াছেন, পত্রিকাদৃষ্টে এইরূপই মনে হয়। ইহাদের উদ্দেশ্য ভালই, অন্তত সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখিয়া বুঝা যায়, এই ছাত্রছাত্রীরা লোক খারাপ নন। ইহারা বলিতেছেন—

বিধি নিষেধের বন্ধনকে সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকবার বাহাদুরী নেব না, আবার সুতো কাটা ঘুড়ির মত অনির্দিষ্ট পথে এলোমেলো ভাবে উড়েও মরব না। বাংলার যুবক যুবতী তাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কৃতিকে মহান গৌরবোজ্জ্বল করে তুলবেই।

খুব ভাল কথা। কিন্তু দুই সংখ্যা পত্রিকা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলাম, ভিতরে বেশ সোঁদা সোঁদা গন্ধ। চোর-গাঁটকাটারাই অধিকাংশ গল্প-লেখকের হিরো। কিন্তু পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আরও কঠিন কঠিন ব্যাপার নজরে পড়িতে লাগিল। এ যুগের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তো অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে! একটা গল্প ধরা যাক, "আলাদা জাতের মেয়ে"—

স্কুলের কিশোর ছেলেরা সামনের মাঠে ক্রিকেট খেলে; শ্যামলী নামধেয়া বিবাহিতা ভদ্রমহিলা তাঁহার বাড়ির বারান্দায়ই আরাম-কেদারায় বসিয়া তাহাই দেখেন আর বোনার সরঞ্জাম লইয়া সেলাই করেন। এক আধবার বল বারান্দায় আসিয়া পড়ে। শঙ্কিত ছেলেরা অনেক কষ্টে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া তাঁহার কাছে আসে। প্রদীপ্ত—দীপুর সহিত এই ভাবেই আলাপ। দীপু তাহার এক বছরের ভাইপো শঙ্করকেও লইয়া আসে। একদিনের ব্যাপার—

দীপু চোলে যায়। শ্যামলীর আপনা হোতেই একটা চাপা-নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।—অনুর্বরতার অভিশাপ ওর বিবাহিত জীবনে এনেছে গ্লানিকর অবসাদ। ব্যর্থ ওর রমণীয়তা—'বহু রাতের স্বপন-ভাঙা'। মেটে নি ওর মাতৃত্বের ক্ষুধা। অনুষ্ঠানে ত্রুটি ছিলো না, তবু শিশু-দেবতার শূন্য মন্দির আজো বিগ্রহহীন। নিষ্ফলতার মাঝে তৃপ্তি খোঁজার আজও বিরাম নেই।

* * *

দুই বছর পরে।

শঙ্করের তিনবছর বয়েস হয়। তাকে আর কোলে রাখবার দরকার হয় না। তবু প্রদীপ্ত ওকে অনাবশ্যক শ্যামলীর বুকে তুলে দিয়ে হাত সরিয়ে নিতে অকারণ দেরী করে। শ্যামলী হাসে, বাধা দেয় না ওর এই চুরি কোরে ছোঁয়ার আনন্দ উপভোগে। প্রশ্রয় পেয়ে প্রদীপ্তের উৎসাহ বেড়ে যায়।...

আর এক দিন

"জানো প্রদীপ্ত, আমরা পশ্চিমে যাবো সপ্তা খানেক বাদে," জানায় শ্যামলী, "পাটনা এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ দিল্লী ঘুরে যাবো দেরাদুন মুশৌরী পর্যন্ত, আসবো মথুরা আগ্রা গোয়ালিয়র ঘুরে। অবশ্য বেশীদিনের জন্যে যাচ্ছিনা।—খুব চমৎকার হবে, না।"

"নিশ্চয়ই।" শ্যামলীর আনন্দে প্রদীপ্তও খুশী হোয়ে ওঠে। ভাবে বোলবে, তীর্থগুলোয় ছেলের জন্যে ভগবানের কাছে আর্জি পাঠাতে; কিন্তু ফাজলামির লোভ সামলে নেয় সে। হঠাৎ ও কোথা থেকে একখানা ভারতবর্ষের প্রকাণ্ড রেলোয়ে ম্যাপ এনে মেলে ধরে টেবিলের ওপোর। শ্যামলী ওর পিঠের ওপোর ঝুঁকে দেখে।...রেল-লাইনের ওপোর দিয়ে ওর আঙুল এগিয়ে চলে। "এই পৌঁছলেন পাটনা। ওখান থেকে নেমে এলেন গয়া"—পিঠের ওপোর নেমে' আসে তরল উষ্ণ-পিণ্ডের চাপ; শ্যামলী বড়ো বেশী মনোযোগ দিয়ে দেখছে ওর যাত্রা পথ—"সেখানে আমার পিণ্ডি দিয়ে এলেন এলাহাবাদ। তারপর কানপুর, লক্ষ্ণৌ।" শ্যামলীর মুখ ঝুঁকে আসে প্রদীপ্তের কাছে, তপ্ত সান্নিধ্য কোমলের ছাপ দেয় ওর গালে। ওর মোনে হয়, যেনো সাতটা কাঠবেড়ালী ওর পিঠের শিরদাঁড়ার ওপোর নেচে চোলেছে।

* * *

এর পর স্বপ্নদর্শন

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে প্রদীপ্ত।

শ্যামলীর উষ্ণতা মধুর হোয়ে দিলো ধরা ওর মুঠিতলে। কেশের সুবাস রচে' দিলো কামনার বিরাট ইন্দ্রজাল ওর মস্তিষ্কের কোটরে। লিখে দিলো সে শ্যামলীর পেলব অধরে বাসনা চপল এক বিদ্রোহের ইতিহাস। শিরা-উপশিরাতলে সৃষ্টি হোলো প্রমত্ত রক্তের ঘূর্ণিপাক। অনুভব কোরলো ওরা নমনীয় নিবিড়তা। চরম নির্ভরশীলতার

মধ্যে ওরা নিজেদের বিলীন কোরে দিলো। সভ্যতা-সংস্কার-সমাজ-সংযম-শালীনতার আবরণ খসে গেলো ওদের মাঝ থেকে

তারপর জাগরণ এবং

শ্যামলী ওর সংগে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসে। দরজার কাছে গিয়ে প্রদীপ্ত ঘুরে দাঁড়ায়, দরজায় পিঠ দিয়ে।—দানবীয় বাসনা নিয়ে ওর মনে জেগে ওঠে পুরুষত্বের দাবী, তৃপ্তিহীন রুদ্র চোখে জ্বলে ওঠে পাশবিক লোলুপতা। শ্যামলীর ভাষা-মুখর দৃষ্টি মেশে ওর দৃষ্টিতে। শ্যামলীর হাসিতে উন্মুখ সম্মতি ফুটে ওঠে। এতো আয়ত্বের মধ্যে শ্যামলী, তবু প্রদীপ্ত ওকে স্পর্শ কোরতে পারে না। কোন এক অদৃশ্য জড় শক্তি ওকে রাখে নিশ্চল কোরে।—ওরা যেনো সাপ আর সাপুড়ে। রুদ্ধ কামনা ফেনিয়ে ওঠে প্রদীপ্তের দেহে আর মোনে।

সহসা এক বিষম তথ্য আবিষ্কার কোরলো প্রদীপ্ত—শ্যামলী মা হোতে চোলেছে—তারি ছাপ ওর প্রতি অংগে সুস্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। লালসার আগুন নিভে যায় ওর এক-মুহূর্তে। মরাপ্রবৃত্তির স্তিমিত চিতায় শ্রদ্ধা এসে ধুয়ে যায়।

প্রদীপ্ত নীচু হোয়ে শ্যামলীর পায়ের ধুলো নেয়।

* * *

রুচি-অরুচি অথবা শ্লীলতা-অশ্লীলতার বিচার করিতেছি না। সে বিচারের নিষ্পত্তি অ্যারিস্টটলের সময় হইতে চলিতেছে—আরও চলিবে। আমাদের বক্তব্য দীপুদের অভিভাকদের লইয়া। দীপুরা কিশোর বয়সে যাহা করিবার করুক, অভিভাবকেরাও জানিয়া রাখুন, তাহারা কি চায়। জানা থাকিলে আচমকা অনেক ঝামেলা হইতে তাঁহারা রক্ষা পাইতে পারিবেন।

যদি ইহারা ভাল ছাত্রছাত্রী হন, তাহা হইলেও সে কথাটা প্রকাশ হওয়া আবশ্যক।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

(সম্পাদকীয় উক্তি)

বহুসংখ্যক গ্রন্থ আমাদিগের নিকট অসমালোচিত রহিয়াছে। গ্রন্থকারগণও ব্যস্ত হইয়াছেন। কেন সে সকল গ্রন্থ এপর্য্যন্ত সমালোচিত হয় নাই, তাহা যে বুঝে না, তাহাকে বুঝান দায়। বুঝাইতেও আমরা বাধ্য কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। কিছু বুঝাইলেও ক্ষতি নাই। প্রথম, স্থানাভাব। বঙ্গদর্শনের আকার ক্ষুদ্র; অন্যান্য বিষয়ের সন্নিবেশের পরে প্রায় স্থান থাকে না। দ্বিতীয় অনবকাশ। আজি কালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্ম্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শন লেখকদিগের কাহারও নাই। থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। থাকিলেও, বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ্য করিতে কেহই পারে না।...

অনেকে বলিতে পারেন, যদি তোমাদিগের এ অবকাশ বা ধৈর্য্য নাই, তবে এ কাজে ব্রতী হইয়াছিলে কেন? ইহাতে আমাদিগের এই উত্তর যে আমরা বিশেষ না জানিয়া এ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আর করিব না। বঙ্গদর্শনে যাহাতে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর না প্রকাশ হয় এমত চেষ্টা করিব।

আমাদের স্থূল বক্তব্য এই যে আমাদের নিকট যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে অসমালোচিত আছে বা যাহা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইব, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে না। কোন২ গ্রন্থের সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব প্রথানুসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৪শ বর্ষ] পৌষ, ১৩৪৮ [৩য় সংখ্যা

ব্যাধি ও প্রতিকার

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছি। বাংলা দেশে কিছুকাল যাবৎ বামপন্থী সাম্যবাদী লেখকেরা কার্ল মার্ক্স, সোভিয়েট অথবা ডায়লেকটিক মেটিরিয়ালিজ্‌মের দোহাই পাড়িয়া প্রচার করিতেছিলেন যে, যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই শ্রেণীগত সুতরাং অগ্রাহ্য। শিল্প ও সাহিত্যের পুরাতন বনিয়াদ স্মরণ করিয়া এই কথায় আমরা আতঙ্কিত হইয়াছিলাম। বাংলা দেশের অন্যতম সোভিয়েট-সুহৃদের মুখে আজ শুনিতেছি—

> এই উৎকট 'নূতন-ওয়ালারা' ভুলিয়া যান—শ্রেণীহীন সমাজ এখনো আসে নাই। যে সমাজে আমরা নিঃশ্বাস লইতেছি তাহার বাস্তব রূপ না দেখিয়া কাল্পনিক শ্রেণীহীন সমাজের শ্রেণীহীন কাল্পনিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করা এক কল্পনা-বিলাস। আর কল্পনা-বিলাস সাম্যবাদের বিরোধী। ভারতীয় লেখক-সম্প্রদায়েরও 'কম্যুনিজমি' গল্প ও কবিতা এখন পর্যন্ত ফ্যাসান-গত কল্পনা-বিলাস মাত্র। বাস্তব ভারতীয় চিত্রের সঙ্গে

উহা প্রায়ই সম্পর্কহীন। তাঁহাদের আরও একটি কথা মনে রাখা উচিত—সাম্যবাদ ঐতিহাসিক বনিয়াদের উপরই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে; তাহার দৃষ্টি ঐতিহাসিক। ইতিহাসের অনিবার্য ধারায় বিশ্বাস করেন বলিয়াই সাম্যবাদী জানেন,—মানুষের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির অনুবর্ত্তন মাত্র হইবে না, হইবে রূপান্তর।—পৃ. ১০

এই যুগের বহু নকল সাম্যবাদীর লেখনী-নিঃসৃত মসী-বন্যার প্রবল তাড়নে আমরা সামাজিক বস্তু ও সম্পর্কের যথাযথ মূল্য নির্দ্ধারণে যখন প্রায় দিশাহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন স্পষ্ট ভাষায় আমাদের শোনার প্রয়োজন ছিল—প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর প্রভাব হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য ও স্বরাজ লাভই মানবীয় সংস্কৃতির উদ্দেশ্য, ইহা ক্রমাবিবর্ত্তনের ব্যাপার, আকস্মিক উৎপাত বা বিপ্লব নয়। মানবীয় সংস্কৃতি এখনও দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ মৃণালহীন পঙ্কজের পর্য্যায়ে পড়ে নাই।

মানুষের জীবন-সংগ্রাম মানবীয় সংস্কৃতির মূল কথা। ইহার তিন বিভাগ—এক, উপাদান (material means); দুই, সমাজ-ব্যবস্থা (social structure); ও তিন, মানসবিকাশ (ideational products)। কাব্য সাহিত্য শিল্পকলা যেমন সংস্কৃতির সমগ্র প্রকাশ নয়, তেমনই সমাজ বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও ইহার সবখানি নয়। "সংস্কৃতি বাস্তব জীবন-ব্যবস্থারই এক অঙ্গ; সমাজ-দেহের শুধু লাবণ্য-ছটা নয়, সমগ্র রূপ।"

সংস্কৃতির প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের সহিত আমাদের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া থাকিলেও আমরা সাহিত্যিকেরা প্রধানতঃ তৃতীয় বিভাগের কারবারী। মানবীয় সভ্যতার প্রারম্ভ হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে, মানুষের ক্রমবিবর্ত্তিত সংস্কৃতি তাহার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিদিন নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিয়াছে—তৃতীয় বিভাগের সাধকেরা তাহা দেখিতেছেন এবং তাঁহাদের সৃষ্ট শিল্পে

ও কাব্যে মানবীয় সংস্কৃতির পরিণতির ইতিহাস রাখিয়া যাইতেছেন। শুধু পরিণতি নয়,—বিকৃতির, পথভ্রান্তির কাহিনীও তাঁহাদের শিল্পে কাব্যে লিপিবদ্ধ থাকিতেছে। পরবর্ত্তী মানব-সন্তানদের এইগুলিই করিতেছে পথনির্দ্দেশ।

এই দর্শক ও অভিনেতার ভূমিকায় বিগত শতাব্দীপাদকাল আমরা বাংলা দেশে কি দেখিলাম, কি দেখাইলাম? বিশ্বের পটভূমিকায় নয়, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দীপালোকেও নহে, অতীতের ভিত্তির উপর আধুনিক বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কোন্ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম?

আমরা দেখিতেছি, ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতবর্ষের সুজলা সুফলা মৃত্তিকায় যে নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, বাংলা দেশ বিগত এক শতাব্দীকাল সেই অভিনবত্বের বাহক ও সংরক্ষক হইলেও বর্ত্তমান যুগে বাংলার মাটিতে তাহা সুফল-প্রসূ নয়। রাতারাতি ইংরেজী শিখিবার সুযোগ লইয়া এবং ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায়ের দোভাষীর কাজ করিয়া বাঙালী একদিন সমাজে ও রাষ্ট্রে ভারতবর্ষে যে প্রাধান্য অর্জ্জন করিয়াছিল, ঋজু মেরুদণ্ডের অভাবে সে প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারে নাই; তাহার ক্রমোন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়াছে। এদিকে ভারতবর্ষের অন্যান্য-প্রদেশবাসীরা কালধর্ম্মে তাহার সমকক্ষতা অর্জ্জন করিয়া তাহাকে অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। পুরাতন কৌলীন্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া যে বনিয়াদির অহঙ্কারে বাঙালী আত্মভ্রষ্ট হইয়াছিল, নবাগতেরা সেই বনিয়াদকে ধূলিসাৎ করিবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছে। এই প্রাদেশিক অভিযানের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুঝিবার শক্তি বাঙালী অর্জ্জন করিল না, একটা কল্পিত উপেক্ষার অভিমানে সে এখন পর্য্যন্ত কেবলই আর্ত্তনাদ করিয়া চলিয়াছে। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, প্রবাসে ও স্বদেশে বাঙালীর

একটি মাত্র ভূমিকা—ব্যর্থ নালিশ ও ক্রন্দনের ভূমিকা। আপন হাতে গড়িয়া তোলা দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে এই ক্রন্দন ও নালিশ যে কতখানি লজ্জাকর, এ বোধও এখন বাঙালীর জাগিতেছে না। সত্য বটে—পূর্ব এক শতাব্দী ধরিয়া আধুনিক সংস্কৃতির অভিযানে বাঙালী ভারতবর্ষকে পথ দেখাইয়াছে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মুক্তির সর্ব্ববিধ সাধনায় এখন পর্য্যন্ত তাহার দানের পরিমাণ অধিক, তাহার ত্যাগ ও নিগ্রহের তুলনায় অন্য সকল প্রদেশের সাধনা এখনও অকিঞ্চিৎকর হইয়া আছে; কিন্তু চরিত্রের অভাবে, দৃঢ়তার অভাবে বর্ত্তমান যুগের বাঙালী পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত মহিমা রক্ষা করিতে পারিতেছে কই? তাহার শেষ রক্ষা হইল কই? রক্তরাঙা রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে যোগদান করিয়া এক দিকে সে শাসক-সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইয়াছে, অন্য দিকে অহিংসাবাদী ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সে হইয়াছে ঈর্ষার পাত্র। শুধু বাহিরের দ্বন্দ্বে তাহার শক্তি ক্ষয় হয় নাই, সুকৌশলী ইংরেজের বাঁকা চালে তাহার ঘরেও আগুন লাগিয়াছে। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান এতকাল যে সখ্যতা-বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া এক লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার সাধনা করিয়াছিল, আজ নানা কারণে, প্রধানতঃ স্বার্থের সংঘাতে, পরস্পর-বিরোধী আদর্শ অবলম্বন করিয়া তাহারাই পরস্পরকে খণ্ডিত করিতেছে। এই গৃহবিবাদই বাংলা দেশের বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। দেশের কল্যাণের কাজে আমরা সমবেত হইব, সংঘ-শক্তি অর্জ্জন করিব—মানবীয় সংস্কৃতির ইহাই গোড়ার কথা। এ কথা আমরা আজ গ্রহবৈগুণ্যে বিস্মৃত হইয়াছি। যেদিন আমরা পুনর্ব্বার আত্মস্থ হইয়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারিব, সেইদিনই বাংলা দেশের কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ এক হইবে—হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলিয়া অখণ্ড বাঙালী জাতি গড়িয়া উঠিবে। বাঙালীর পূর্ব্ব-ঐতিহ্যের সম-অংশীদাররূপে আবার আমাদের-

জয়যাত্রা শুরু হইবে। দুর্ব্বল দেহ ও মন লইয়া গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রুর সহিত লড়াই করিবার শক্তি যে বাঙালী হারাইয়াছে, জীবনের বিভিন্ন বিভাগে বারংবার তাহার পরাজয়ের দ্বারা সেই সত্যই প্রমাণিত হইতেছে। আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দনে সত্য কখনও মিথ্যা হয় না।

বাংলা দেশে হিন্দুসমাজে ইংরেজ-সমাগমের পূর্ব্বে, অর্থাৎ মৃতপ্রায় প্রাচ্য ও নব বলদৃপ্ত প্রতীচ্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংঘাতের পূর্ব্বে, দুই ভাবধারা সমানে প্রবাহিত হইতেছিল—শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাবধারা। একটির বিকার তন্ত্র ও বীরাচারের মধ্যে, অন্যটির নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের ধুলি-ধূসর কীর্ত্তন গানে; বাঙালীর জীবন ইহারই মাঝামাঝি পথে চলিতেছিল। সাহিত্যরস তখন খিড়কি-পথে কবি ও পাঁচালি-গানের আকারে বাঙালীকে সঞ্জীবিত করিত, রাজদরবারে এবং বারোয়ারী আটচালায় চলিত বিচিত্র আখরযুক্ত বৈষ্ণব মহাজনী পদ এবং অন্নদা-মঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের পালা; নাগরিক জীবনের চরমতম সংস্কৃতি রূপ পাইয়াছিল আদিরসাশ্রিত বিদ্যাসুন্দর গানে। কিন্তু নানা-বিধ বিকার সত্ত্বেও একটা সহজ রসবোধের ধারা অব্যাহত ছিল। কীর্ত্তিবাসী-রামায়ণ-গানে ও কাশীদাসী-মহাভারত-পাঠে সাধারণ বাঙালীর চিত্ত ছিল সরস। ওদিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় মাতৃভাষাকে ইতর প্রাকৃতজনের উপজীব্য জ্ঞানে কাব্য ব্যাকরণ নব্যন্যায়ের সংস্কৃত মহিমায় থাকিতেন বিভোর। বাঙালীর মূল জীবনধারা—পূজা-পার্ব্বণ, আচার-বিচার, বৈষ্ণব ও শাক্ত দুই পথে অব্যাহত ছিল। হঠাৎ ইংরেজী শিক্ষার ধাক্কায় রসের ক্ষেত্রে আমাদের রুচিবিপর্য্যয় ঘটিল, আমাদের সংস্কৃতি ও প্রাত্যহিক জীবন-ধারায় ছেদ ঘটিল। জীবন-যোগচ্ছিন্ন এক নূতন "কাল্‌চারে"র সর্ব্বগ্রাসী মোহে গড়িয়া উঠিল "ভদ্র-লোক"—শিক্ষিত সম্প্রদায়; দেশের পনরো-আনা মানুষের সঙ্গে এই

এক-আনার সর্ব্বনাশা বিচ্ছেদ ঘটিল। যাহা ছিল সহজ এবং স্বাভাবিক, হিন্দুকলেজের শিক্ষা তাহাকেই কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য করিল। ইংলণ্ডীয় সাহিত্য ও সভ্যতার বিরাট এবং মনোহর আদর্শ সম্মুখে থাকাতে বাংলা দেশের এই শিক্ষিত এক-আনী সম্প্রদায় রাতারাতি বিজাতীয় হইবার স্বপ্ন দেখিলেন; যাহা কিছু আপন, যাহা কিছু স্বদেশীয়, তাহারই উপর জাগিল ঘৃণা, স্বদেশের আবহাওয়াকেও তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছায় সহ্য করিতে লাগিলেন। ঠিক অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাস দশ লাইনে দিবার চেষ্টা করিলাম। সে দিনের এই আঘাত-সংঘাতে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহার যথার্থ প্রকাশ দেখিতে পাইলাম আমরা পরবর্ত্তী কালে।

বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত এই এক-আনা সম্প্রদায় ইংরেজের সহায়তায় বাংলা দেশের নূতন শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রচিন্তার নায়ক হইয়া যে সাহিত্য, ধর্ম্ম, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা এবং আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিলেন, তাহাই হইল নব্য বাঙালীর গৌরব। এই গৌরব হইতে দেশের জনসাধারণ কিন্তু বঞ্চিতই থাকিয়া গেল; এই নবত্ব-আলোকলতার মূল দেশের মাটি পর্য্যন্ত পৌঁছিল না। এইখানেই বাঙালীর নূতন সংস্কৃতির গলদ রহিয়া গেল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এখন চলিতেছে; আধুনিক বাংলা সংস্কৃতি ও সমগ্র বাঙালী জাতির যে যোগসূত্রের অভাবে আমাদের সকল সাধনা পণ্ড হইতে বসিয়াছে, সেই যোগসূত্রকে আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম চৈতন্য জাগিয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মনে; বাঙালী সংস্কৃতির এই বিজাতীয়ত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথম দেশমাতৃকার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মাধ্যমে

যাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিবেকানন্দ সেই চেষ্টাই করিয়া গিয়াছেন ধর্ম্মের আবরণে। আধুনিক যুগে বাঙালীর জ্ঞানগুরু হিসাবে যদি কাহাকেও পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে এই দুইজনকেই আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। পথভ্রষ্ট বাঙালীকে আত্মস্থ করার কাজে ইঁহারাই আমাদের সমাজ-জীবনে প্রথম চৈতন্য সঞ্চার করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই স্বদেশী-আন্দোলনে বাঙালী এক পরম সুযোগ লাভ করিয়াছিল; শিল্পে সাহিত্যে ব্যবসায়ে তাহার বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হইবার দিকেই চলিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ আমাদের সকল সাহিত্যিকই এই বিষয়ে আমাদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু সোনার বাংলাকে ভালবাসার মন্ত্র বাঙালীর কর্ণপথে মর্ম্মে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই, অর্থাৎ আমাদের সাধনা ফলপ্রসূ হইবার পূর্ব্বেই, ইউরোপের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল। সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম ও সাহিত্যের আদর্শ এই যুদ্ধে যে নাড়া খাইল, তাহাতে অস্বাভাবিক উত্তেজনা প্রশ্রয় পাইয়া মানুষের সহজ জীবনযাত্রাকেও আবিল করিয়া তুলিল। তাহার ঢেউ আসিয়া লাগিল আমাদের বাংলা দেশে, শুধু সাহিত্যের বিপর্য্যয় নয়, সমাজে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে ও পারিবারিক বন্ধনেও ঘটিল নানাবিধ বিপ্লব। যে বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া আমরা ভূমিপৃষ্ঠ হইতে কিছু উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিলাম, তাহা মূলসুদ্ধ নাড়া খাওয়াতে আমরা অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গে রূঢ় আঘাত পাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম। এই আর্ত্তনাদই নানা ভঙ্গিতে এ যুগের সাহিত্যে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, পুরাতন ধারার সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হওয়াতে এক দল ফিরিতে চাহিতেছেন ইংরেজসমাগমপূর্ব্ব সেই পুরাতন কবি-পাঁচালির পরিবেশের মধ্যে, আর এক দল দেশকালপাত্রনিরপেক্ষভাবে বিশ্বাকাশে অবাধ বিহার কামনা করিতেছেন।

এই দুইয়ের কোনটিই ঘটা আর সম্ভব নয়। এক-আনা সম্প্রদায়ের গণ্ডি আজ ভাঙিয়া গিয়াছে; পনরো-আনা নিপীড়িত অবহেলিত মূকের কণ্ঠেও ভাষা ফুটিয়াছে। তাহাদের দাবি সমাজে রাষ্ট্রে ও সাহিত্যেও শোনা যাইতেছে। হরিজন শুধু মন্দিরেই প্রবেশ করিতেছে না, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে তাহাদের দাবি উপেক্ষা করার আর উপায় নাই।

এই অবস্থাকে মানিয়া লইয়া শিল্পে সাহিত্যে রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে আমাদের নূতন অভিযান আরম্ভ করিতে হইবে। সাহিত্যিক মাত্রেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই সংঘাতের ফল কি হইয়াছে প্রতিদিনই তাহা দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের কালেই সাহিত্য ঐশ্বর্য্যের কোঠা ছাড়িয়া প্রয়োজনের দপ্তরখানায় আসিয়া বসিতে শুরু করিয়াছে, বলিতেছে, তোমাদের ওই টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবের মধ্যেও আমি আছি; বলিতেছে, এই সাম্যবাদের যুগে নিতান্ত শ্রেণীস্বার্থ লইয়া আর আমি নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিব না; গরম গরম রাষ্ট্রীয় বক্তৃতাতেও আমি আছি; চটকল পাটকলের ধর্ম্মঘটেও। ভোট-যুদ্ধে, বাঘায়' চোঙের আর্ত্তনাদের মধ্যে সাহিত্যের অভিভাষণ শোনা যাইতেছে, দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভেও। সাহিত্যকে দেখিতে পাইতেছি বিজ্ঞাপনের হ্যাণ্ডবিলে, টাইম-টেব্‌লের মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায়। ইহারই মধ্যে আমাদের কাহারও কাহারও মনে এই ধারণা জন্মাইতে আরম্ভ হইয়াছে যে, নিছক সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া আর আমাদের অবসর-বিনোদন সম্ভব নয়; যুগধর্ম্মে আরও চমকপ্রদ ব্যাপারে আমাদের উৎসব-বাসনা চরিতার্থ করিতে হইবে। সাহিত্য ও সাহিত্যিককে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা যাহা করিতেছি, তাহাতে যুগধর্ম্মই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কাহারও কিছু থাকিতে পারে না।

সাহিত্যে এই যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে জীবনের অন্য সকল বিভাগেও,

অনুরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, অনেকেই এই বিপর্য্যয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। কোনও কোনও দেশনেতাকে বলিতে শুনিয়াছি, সাহিত্যের বিশৃঙ্খলতাই এই সব সামাজিক বিশৃঙ্খলতার মূল; সাহিত্য সুস্থ ও সুন্দর হইলে সমাজে ও রাষ্ট্রেও শৃঙ্খলা আসিবে। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে সাহিত্যকে এতখানি দায়ি করা চলে না। আমরা একটা পাপচক্র বা ভিশাস সার্কেলের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি, একের গ্লানি অন্যে যোগাইয়া যাইতেছে বলিয়া চাকা চলিতেছে।

এই অবস্থা হইতে আমাদের মুক্তির উপায় কি—এই বিচারই আজিকার দিনে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিচার; ইহার শেষ নিষ্পত্তি এযুগের তরুণদের হাতে। যে পাপপঙ্কে এবং গ্লানির কুণ্ডে আমরা জাতিগতভাবে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় পতিত হইয়াছি, গোড়া হইতে তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদের ভুল তাঁহাদেরই সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। তাঁহাদের সৌভাগ্য এই যে, দীর্ঘ হাজার বছরের লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের ইতিহাস এযুগের ঐতিহাসিকেরা উদ্ঘাটিত করিয়া তাঁহাদের দেখাইয়াছেন; তাঁহাদের সৌভাগ্য এই যে, রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিম বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের সাধনার ফল তাঁহারা আয়ত্ত করিবার অধিকারী। তাঁহাদের সৌভাগ্য এই যে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব আত্মবিরোধ ও পরনির্ভরশীলতার কুফল তাঁহারা তাঁহাদের জীবনেই ভয়াবহভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সাহিত্যে এবং সমাজে স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাতন্ত্রতার প্রবর্ত্তনে যেভাবে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সুতরাং শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি, তাঁহারা তাহাও দেখিতেছেন। দেশের মাটির সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া অবলম্বনহীন বায়ুলোকে অবাধ বিহার করিতে করিতে ভগ্নপক্ষ পাখীর মত মাটির ধূলায় আমাদের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাঁহারা তাহাও দেখিতে পাইতেছেন। এই সব প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে যদি

তাঁহাদের শিক্ষা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা জাতির দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে।

আজ দেশের অবস্থা দেখিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায় যে, সাহিত্যে বানান অথবা সাম্প্রদায়িকতা, গদ্য-কবিতা অথবা যৌনপ্রবণতা এসবের কোনটাই আমাদের জাতির সমস্যা নয়; আমাদের সমস্যা ইহার অপেক্ষাও অনেক বড়; আমাদের জীবনের সকল বিভাগে মননশীলতা ও শ্রমশীলতার অভাবই আমাদের পরাজয়ের কারণ। আমরা যেন গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসাইয়া চলিতেছি, নিজ জ্ঞানবুদ্ধিমত পথ চলিবার প্রবৃত্তি প্রতিদিন লোপ পাইতেছে। একটা কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, গড্ডলিকা-মনোবৃত্তি সংঘ-মনোবৃত্তি নয়। সংঘের প্রত্যেক ব্যক্তির মননশীলতা ও দেহগত অধ্যবসায়ের সংযোগেই সংঘশক্তি বিকাশ লাভ করে, অন্ধ ভাবানুরাগ ও অনুকৃতির দ্বারা সংঘের কাজ চলে না।

এই শিক্ষা লাভ করে নাই বলিয়া দীর্ঘ দেড় শত বৎসরের আয়োজন ও পরপর পাঁচ পুরুষের সাধনা সত্ত্বেও বাঙালীর গৌরব ধূলিসাৎ হইতে বসিয়াছে। আমাদের এখনও গর্ব্ব এই যে, সাহিত্যে ও শিল্পে আমরা যে মহিমা অর্জ্জন করিয়াছি, ভারতবর্ষের কোনও জাতি তাহার নাগাল পায় নাই, অথবা নাগাল পাইতে পারে না। এ গর্ব্ব ন্যায়সঙ্গত নয়। সাহিত্যের যথার্থ উন্নতি হইলে জাতির ব্যবহারিক জীবনে তাহা প্রতিফলিত হইবেই; পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসই এই সাক্ষ্য দিতেছে। বাংলা দেশে একজন মধুসূদন, একজন বঙ্কিমচন্দ্র ও একজন রবীন্দ্রনাথের জন্ম সত্ত্বেও বাঙালীজাতি যে এখনও কলঙ্কমুক্ত হইতে পারিল না, ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের সাহিত্য-সাধনাতেও সিদ্ধিলাভ হয় নাই; কোথায় যেন ফাঁকি আছে। সেই ফাঁকিটুকু ধরিতে হইবে; আমরা পূর্ব্বযুগের শিক্ষাতেই মানুষ বলিয়া

হয়তো সঠিক ব্যাধিটা ধরিতে পারিতেছি না, উপসর্গ দেখিয়াই আতঙ্কিত হইতেছি।

এই ব্যাধির মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে, কিন্তু সেজন্য প্রেম চাই, শ্রদ্ধা চাই। আধুনিক যুগে এই প্রেম ও শ্রদ্ধার ভয়াবহ অভাব সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাই ভয় হয়—আমাদের বুঝি মুক্তি নাই। শ্রদ্ধেয়কে, পূজনীয়কে, ঐতিহ্যকে সম্মান করিব না—ইহা সবলের কথা নয়—দুর্ব্বলের চিত্তবিকার। পুরাতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া সেই বনিয়াদের উপর নূতন সৌধনির্ম্মাণই সত্যকার সংস্কারকের কাজ; প্রারম্ভেই বলিয়াছি, সত্যকার সাম্যবাদীরও লক্ষ্য তাহাই। দেশের প্রাণ-প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া কল্পিত অথবা পরদেশী সংস্কৃতি বা সাহিত্যের প্রবর্ত্তনে পৃথিবীর কোনও জাতির কখনই মঙ্গল হয় নাই; মূল বৃক্ষের মত সংস্কারকেও একেবারে মাটির অন্ধকার ফুঁড়িয়া উঠিতে হইবে। যে সংস্কার করিতে বসিয়া সংস্কারকের মমতা জাগ্রত হয় না অথবা গ্রন্থিচ্ছেদনে ছেদনকর্ত্তার মর্ম্মচ্ছেদ হয় না, সে সংস্কার নির্ভরযোগ্য নয়। আমরা দেশকে ও দেশবাসীকে আপনার জন না করিয়া, জনসাধারণের সুখদুঃখে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া, দেশের কোনও কাজই করিতে পারিব না। সাহিত্যের নিকট হইতে, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে এই দেশপ্রেম ও জাতিপ্রেমের রসদ সংগ্রহ করিয়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় দেশের দশজনের একজন হইয়া যদি কাজ করিতে পারি, তবেই সত্যকার কাজ হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন, মননশীলতার মধ্য দিয়া দেশপ্রেম; বিবেকানন্দ শিখাইয়াছেন, জনসেবার মধ্যে দেশপ্রেম; রবীন্দ্রনাথ শিখাইয়াছেন, বিশ্বসংস্কৃতিকে স্বীকার করিয়া দেশপ্রেম। আমরা সাহিত্যে সমাজে ও রাষ্ট্রে দেশের প্রতি এই প্রীতিকেই কেন্দ্র করিয়া নিজ নিজ সাধনা করিব, তবেই আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় এই অন্ধকার একদিন বিদূরিত হইবে।

রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ছেলেভুলানো ছড়া।

এই পুস্তিকাখানি এখনও দেখি নাই। ইহা ১৩০১ সালের মাঘ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত "ছেলেভুলানো ছড়া" প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ মাত্র। 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা'য় ভূমিকা-(পৃ. ১৮৯-৯২)-সহ "কলিকাতায় সংগৃহীত ছড়া" (পৃ. ১৯৩-২০২) মুদ্রিত হইয়াছে।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'লোকসাহিত্য' পুস্তকে যে "ছেলেভুলানো ছড়া" মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা ১৩০১ সালের আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যা (পৃ. ৪২৩-৭৪) 'সাধনা'য় প্রকাশিত "মেয়েলি ছড়া" প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ মাত্র; ইহা উপরিলিখিত পুস্তিকা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

গল্প-দশক। ১৩০২। পৃ. ২২০। [৩০ আগস্ট ১৮৯৫]

গল্প-দশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা; ১৩।৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩০২। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

"উৎসর্গ। পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ আশুতোষ চৌধুরীর করকমলে এই গ্রন্থ উপহৃত হইল। গ্রন্থকার। ১৫ই ভাদ্র। ১৩০২।

ইহাতে যে দশটি গল্প মুদ্রিত হইয়াছে, সেগুলি 'সাধনা'র চতুর্থ বর্ষে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল।—

প্রায়শ্চিত্ত	১ম ভাগ,	পৃ. ৪-২৩
বিচারক	ঐ	পৃ. ৯৭-১০৭
নিশীথে	ঐ	পৃ. ১৯৫ ২১৩

আপদ	১ম ভাগ	পৃ. ৩১৭-৩৩
দিদি	ঐ	পৃ. ৪১৫-৩০
মানভঞ্জন	ঐ	পৃ. ৪৮৯-৫০৪
ঠাকুর্দ্দা	২য় ভাগ	পৃ. ৩৫-৪৯
প্রতিহিংসা	ঐ	পৃ. ১৩৯.৫৯
ক্ষুধিত পাষাণ	ঐ	পৃ. ২১৯-৩৭
অতিথি	ঐ	পৃ. ৪৩০-৫৬

নদী। ২২ মাঘ ১৩০২। পৃ. ৩৪। [৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬]

বাল্যগ্রন্থাবলী ২। **নদী।** শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ছয় আনা।

আখ্যা-পত্রের পিছনের পৃষ্ঠা :—

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড। ২২শে মাঘ ১৩০২ সাল।

উপহার-পৃষ্ঠাটি এইরূপ :—

"পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে তাঁহার শুভ পরিণয় দিনে এই গ্রন্থখানি উপহৃত হইল। ২২শে মাঘ, ১৩০২।"

পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" পৃষ্ঠাটিও উদ্ধৃত হইল :—

বিজ্ঞাপন। এই কাব্যগ্রন্থখানি বালকবালিকাদের পাঠের জন্য রচিত হইয়াছে। পরীক্ষার দ্বারা জানিয়াছি ইহার ছন্দ শিশুরা সহজেই আবৃত্তি করিতে পারে। বয়স্ক পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, যে, প্রত্যেক ছত্রের আরম্ভ শব্দটির পরে যেখানে ফাঁক দেওয়া হইয়াছে সেখানে স্বল্পমাত্র কাল থামিতে হইবে। ২২শে মাঘ, ১৩০২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিত্রা। ফাল্গুন ১৩০২। পৃ. ১৫১। [১১ মার্চ ১৮৯৬]

চিত্রা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১।০ টাকা।

আখ্যা-পত্রের পিছনে :—

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফাল্গুন, ১৩০২। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সংস্কৃত শিক্ষা, ১ম ভাগ (পৃ. ৪২) ও ২য় ভাগ (পৃ. ৩৪)। ১৮৯৬। [৮ আগস্ট ১৮৯৬]

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় প্রকাশ, 'সংস্কৃত শিক্ষা'র দুইটি ভাগ একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল; প্রত্যেক ভাগের মূল্য ছিল ৵৹ আনা। আমরা ইহার প্রথম ভাগের সন্ধান এখনও পাই নাই। দ্বিতীয় ভাগের আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> সংস্কৃত শিক্ষা। দ্বিতীয়ভাগ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বাল্মীকিরামায়ণ অনুবাদক শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত। Calcutta : Printed and Published By J. N. Banerjee & Son, Banerjee Press, 119, Old Boytakhana Bazar Road. 1896.

কাব্য গ্রন্থাবলী। ১৫ আশ্বিন ১৩০৩। পৃ. ৪৭৬। [৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬]

> কাব্য গ্রন্থাবলী। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৬৲ টাকা।

আখ্যা-পত্রের পিছন-পৃষ্ঠা এইরূপ :—

> শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশক। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড। ১৫ই আশ্বিন ১৩০৩। মূল্য ৬৲। পৃ. ৪৭৬।

ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম কাব্যসংগ্রহ। ইহার তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়; একটি সাধারণ, একটি সচিত্র, একটি ফটোগ্রাফসহ বিশেষ সংস্করণ। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

> আমার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ একত্র প্রকাশিত হইল।...
>
> এই গ্রন্থে কবিতাগুলি কালক্রমানুসারে সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথমাংশে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। কৈশোরক আখ্যায় যে সকল কবিতা বাহির হইয়াছে তাহা লেখকের পনেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত। ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫।১৬

বৎসর বয়সের লেখা—আবার তাহার মধ্যে গুটিকতক পরবর্ত্তী কালের লেখাও আছে—এগুলি বিষয় প্রসঙ্গে একত্রে ছাপা হইল। গ্রন্থশেষে যে সমস্ত গান প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও এই কথা খাটে।...

"চৈতালী" শীর্ষক কবিতাগুলি লেখকের সর্ব্বশেষের লেখা।...

'কাব্য গ্রন্থাবলী'র সূচীপত্র সংক্ষেপে এইরূপ :—

'কাব্য গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত 'মালিনী' (পৃ. ৩৯১-৪০৬) ও 'চৈতালি' (পৃ. ৪০৭-২৮) ইতিপূর্ব্বে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই ; 'কাব্য গ্রন্থাবলী'তেই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে 'মালিনী' ও 'চৈতালি' ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

STOP PRESS

বিপদে পড়িলে অর্দ্ধ ত্যজে বিজ্ঞজন ;
শাস্ত্রে নাই, কি করেন বোমা যদি পড়ে
চারিদিকে অবিজ্ঞের দেখি আয়োজন—
বিজ্ঞজন মরে, তারে বিপদে কি করে !

হর্ষে দোলাইত মন, অধর কুঞ্চিত অনুরাগে
সোহাগে চুম্বন দিয়া শুধাইত, 'সখি, ভাল লাগে—
আমার প্রণয়-পুষ্প উপহার লইবে কি দেবি,
করিবে আমারে ধন্য ? আমরণ তোমারেই সেবি
লভিবে নির্ব্বাণ মোর এই প্রেম-দীপ্ত আঁখি-তারা,
সৌন্দর্য্য-জলধি-মাঝে চিত্ত-মীন মগ্ন, দিশেহারা।'
হে বিজ্ঞান-ভিক্ষু বীর ! ধন্য হোক তোমার সাধনা,
মৃত্যুর মাঝারে লভ অমৃতের চিত্ত বিনোদনা—
অশরীরী আত্মা মোর মরে নাই মরিবে না কভু
এ শরীর-জীর্ণ-বাস ঘিরি কেন ঘুরে মরি তবু ?
এ ভগ্ন মন্দিরে মোর আরতির প্রতিধ্বনি বাজে
আজিও কপোল পাংশু সঙ্কুচিত স্মরণের লাজে।"

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের অর্থ :

কৃন্তন কর্ত্তরি—dissection knife। সপ্ত অঙ্গ—মস্তক, বক্ষ, উদর, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, (anatomical parts)। কৃশানু—অগ্নি, বিচর্চ্চিকা—চুলকানি, শলভ—পতঙ্গ (moth)। করীষ—ঘুঁটে, আজ্য—ঘৃত, বসা—চর্ব্বি, উদুখল—হামানদিস্তে।

পাদুকা

মানুষ মৃত্তিকার কীটাণুকীট হ'লেও সভ্য মানুষ মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন। এ বিচ্ছিন্নতা হয়তো এক ইঞ্চিরও নয়, জুতোর তলা কতই বা পুরু। শহরে অবশ্য জুতোর তলাতেও মাটি ঠেকে না, আরও কয়েক ইঞ্চি জুড়ে পিচ-পাথর-খোয়ার মধ্যস্থতা। জনশ্রুতি মেনে নিলে জুতোকে আমাদের জাতীয় জীবনে এক মহা অমঙ্গলের কারণই বলতে হয়। শোনা যায়, পলাতক সিরাজদ্দৌলা ধরা পড়েন জুতোর বিশ্বাসঘাতকতায়, আর অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলীকে জুতো পরিয়ে দিতে আশেপাশে কেউ ছিল না ব'লেই হলেন তিনি ইংরেজের কবলিত। সুতরাং বলতে বাধা কি, এই জুতোবিলাসের জন্যেই আমরা আজ বিরাট এক বুটের তলায় পীড়িত। অনেকে রাগ করতে পারেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাণ্ডটাও আমরা ভুলে যাচ্ছি। কেন, প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে 'নীলদর্পণে'র বজ্জাত সাহেবটাকে লক্ষ্য ক'রে তিনি কি নিক্ষেপ করেন নি আস্ত একপাটি তালতলার চটি? দুর্ভাগ্য এই, সে চটি আমাদেরই এক "অর্দ্ধেন্দু"র গায়ে লেগে ফিরে এল। পলাশীর পর আমাদের এই দুই শতাব্দীর ইতিহাস পদলেহনের ইতিহাস; কিন্তু কথাটা একটু ভুল। অধুনা আবরণহীন শুভ্র চরণকমলের দেখা সহজে তো মেলে না। তাই বলতে বাধে, 'দেহি পদপল্লবমুদারম্।' পদলেহন আমরা আর করি না, আজকালকার সভ্যযুগে আমরা করি পাদুকালেহন।

তাই ব'লে পাদুকাধারী মাত্রই যে বিশেষ সম্মানার্হ, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং সভ্যতার পরমপুরুষদের কথা মনে হ'লে উল্টো ভাবতেই ইচ্ছে করে। ধর্ম্ম নামক পদার্থের যাঁরা প্রবর্ত্তক, যাঁদের বলা হয়, পয়গম্বর, 'প্রফেট', অবতার, তাঁরা কেউ জুতো পরতেন না ব'লে মেনে নিতেই কেন জানি আমাদের স্বভাবগত ইচ্ছা। ঈশা, মূসা কার পায়ে জুতো ছিল? হজরত মহম্মদকে জুতো পায়ে কল্পনা সহজ নয়। বুদ্ধ আর কনফুসিয়াস বুঝি জুতো পায়ে দিতেন?

তারপর, কৃষ্ণের হাতে দেখি বাঁশী, কখনও বা সুদর্শনচক্র, কিন্তু পাদুকাপরিহিত কৃষ্ণ চলেছেন কদমতলাতে কিংবা ধেনু চরাতে ভাবা যায় নাকি? শ্রীচৈতন্যই কি কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হয়ে বাহু তুলে জুতো পায়ে নাচতে পারেন? ভাবা যাক তো রামমোহন আর রামকৃষ্ণদেবের কথা, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনায় কার কতটুকু দান উহ্যই থাক। তবু খালি পা খালি গায়ের জন্যেই রামকৃষ্ণদেবকে যতটা অবতার ব'লে মনে হয়, রামমোহনকে চোগা-চাপকান আঁটা মোগলাই জুতো পরা দেখে ঠিক ততখানিই সাধারণ মানুষ ব'লে বোধ হয়। মহাত্মা গান্ধী এখন জুতো পায়ে দিলে তাঁর ওপর দেশবাসীর শ্রদ্ধা বাড়বে, না, স্যাণ্ডাল নামক অর্দ্ধপাদুকা দুটিকে অসহযোগে পাঠিয়ে দিলে সে শ্রদ্ধা আকাশ ছুঁয়ে আসবে? ভেবেচিন্তে তাই আমার বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে, পাদুকাসমন্বিত পাশ্চাত্য সভ্যতায় কোনও অবতারের আবির্ভাব অসম্ভব।

মানচিত্রের পূর্ব্বগোলার্দ্ধেই সমস্ত আদি মহামানবগণের উদয়। জেরুজালেমে যীশু, মক্কায় মহম্মদ, কৌশাম্বিতে বুদ্ধ, সান্‌টাঙে কন্‌ফুসিয়াস। সুতরাং জুতো আবিষ্কার আর আমদানির জন্যে ম্লেচ্ছরাই হয়তো দায়ী। ভারতবর্ষের কবি-ঋষিরা বড় জোর খড়ম পায়ে দিতেন, ছায়াচিত্রের এবং রঙ্গমঞ্চের বিধাতারা অবশ্য শ্রীরামচন্দ্রের পায়ে এক-জোড়া স্যাণ্ডাল পরিয়ে দেন স্বচ্ছন্দে। আশ্চর্য্য নয়, চোদ্দ বৎসর বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হয়তো বা রামচন্দ্রই স্যাণ্ডাল আবিষ্কার করেছিলেন। আমাদের গবেষকেরা যখন রাবণের রথকে আধুনিক বিমানের জ্যেষ্ঠতাত ব'লে প্রমাণ করেন, তখন শ্রীরামচন্দ্রকে কেন যে স্যাণ্ডেল-আবিষ্কারক ব'লে প্রমাণ করতে এখনও তাঁরা বিমুখ বুঝি না। তাঁদের হয়তো এই ভয় যে, অবতার রামচন্দ্রকে অপোগণ্ড ভারতবাসীরা চর্ম্মকার-জনক ব'লেই হয়তো ভাবতে আরম্ভ ক'রে দেবে।

কিন্তু জুতো আবিষ্কার নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা না হ'লেও দ্বিমত দেখা যায়। এক দল আশ্রয় করেন বিজ্ঞান ও ইতিহাসকে। বন জঙ্গল ছিল যে দেশে, কাঁটা ফুটত যেখানে, যেখানে মরুভূমির বালু উঠত আগুনের মত গরম হয়ে, সে সব দেশের লোক পায়ের তলাকে রক্ষা করতে পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিত মোটা চামড়া বা কাষ্ঠখণ্ড। আর যে দেশে

ছিল প্রচণ্ড শীত, তারা পদযুগলের সমস্তটাই কোন চামড়া দিয়ে দিত ঢেকে, কেউ বা মোটা কোন কাঠ কুরে কুরে ক'রে নিত জুতোর মত। এ জিনিস এখনও ইউরোপে চলে শুনেছি, একে বলে স্যাবোট। কালক্রমে ঢাকনা ছাড়া তলা আর তলা ছাড়া ঢাকনা একত্রিত হয়ে জুতোতে হ'ল রূপান্তরিত। এই জুতোরই পরবর্ত্তী বিবর্ত্তন দেখা যায় ভারী ভারী বুট সৃষ্টিতে, তার আবার কত না রূপ! জ্যাক বুট, টপ বুট, হেসিয়ান বুট, ওয়াশিংটন বুট, কত কি নাম! ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হালকা জুতোর বৈচিত্র্যও নাকি বাড়ছে। হালকা জুতোয় হরেক রকমের ফ্যাশন সৃষ্টি করা যেমন সহজ, এমন আর কিছুতে নয়। ইউরোপ আমেরিকার সাধনা—পোশাক-পরিচ্ছদে ছিমছাম ফিটফাট স্মার্ট হওয়া। সেখানে পরিচ্ছদের আভিজাত্য আবার প্রকাশ পায় পাদুকায়। যাঁদের জুতো করে চকচক ঝকঝক, যাঁদের জুতোয় আয়নার মত দেখা যায় মুখচ্ছবি, তাঁরাই অভিজাত। আবার সকালের জুতো যেমন, মধ্যাহ্নের জুতো তেমন হ'লে চলবে না, নৈশ-পাদুকা ও নর্ত্তন-পাদুকা হওয়া চাই তৃতীয় রকমের। এরই মধ্যে ফোর্ডের মত দুই-একজন সাহেব নিজের জুতোয় নিজেই কালি লাগান প্রচার ক'রে পাশ্চাত্যে প্রায় মহাপুরুষ ব'নে গেছেন। ফ্যাশনের মোহ ছাড়া যানবাহনাদির প্রসার, বিশেষ ক'রে মোটরের প্রাচুর্য্য, ভারী বুটের প্রয়োজনীয়তা দিয়েছে ঘুচিয়ে। মোটরের তেমন প্রসার কিংবা বিমানের তেমন উন্নতি হ'লে মোটা মোটা মোজা প'রেই হয়তো অভিজাতদের দিন কাটবে।

জুতো আবিষ্কারের তথ্যানুসন্ধানে অন্য দল আশ্রয় করেন কল্পনা ও কাব্যকে। রাজা হবুচন্দ্র মন্ত্রী গবুচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়ে
ধরণী মাঝে চরণ ফেলা মাত্র।"

গবুচন্দ্র অনেক ভেবেচিন্তে উত্তর দিলেন—

"যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধুলা পাইব কি উপায়ে।"

নাছোড়বান্দা রাজা হবুচন্দ্র, ধুলা অভাবে যদি পদধূলাই না মেলে এত

বৈজ্ঞানিকদের মিছেই তাঁর মাইনে গোনা। উনিশ পিপে নস্য টিপে দেশের সব জ্ঞানী গুণী অবশেষে উত্তর ঠিক করলেন, মাটি গেলে শস্য হবে কোথায়? কমলি তবু ছাড়ে না, মাটি অভাবে শস্যই

"যদি না হবে
পণ্ডিতেরা রয়েছে কেন তবে।"

অতএব ধূলা দূর করতে সাড়ে সতরো লক্ষ ঝাঁটা কেনা ঠিক হ'ল। কিন্তু ঝাঁট দেওয়ার চোটে

"করিতে ধূলা দূর
জগত হ'ল ধূলায় ভরপুর।"

তখন ধূলো দূর করতে একুশ লাখ ভিস্তি ছুটল জল আনতে। ফলে, পুকুরে প'ড়ে বইল পাঁক, নদীতে বন্ধ হ'ল নৌকো-চলা, জল না পেয়ে জলের জানোয়ারেরা লাগল ম'রে যেতে, আর সর্দ্দিজ্বরে দেশটা হয়ে গেল উজোড়। এমন অবস্থায় কেউ চাইলেন ফরাশ পেতে কাদা ঢাকতে; কেউ বললেন, রাজাকেই কেন একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা হোক না, তা হ'লে আর পায়ে ধূলো লাগে না। রাজা হবুচন্দ্রের তাতে আপত্তি দেখা গেল, মাটির ভয়ে রাজ্যই যে হবে মাটি! অবশেষে ঠিক হ'ল, চামড়া দিয়ে পৃথিবীটা ঢেকে দেওয়া হোক। বৃদ্ধ চামারপতি এসে সমস্ত জ্ঞানী, গুণী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকদের পথে বসিয়ে ঈষৎ হেসে বললে—

"বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দু'টি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।"
"...সে দিন হতে চলিল জুতো পরা
বাঁচিল গবু, রক্ষা পেল ধরা।"

জুতো আবিষ্কারের কাব্য-ব্যাখ্যাটাই হয়তো সঙ্গত। কিন্তু দুঃখ এই, জুতো নিয়ে এখনও সত্যিকারের পাদুকা-কাব্য লেখা হ'ল না! আদমের বামবক্ষের মাত্র একখানা অস্থিখণ্ডে যাদের সৃষ্টি, তাদের নিয়ে যুগ যুগ ধ'রে কাব্যসৃষ্টির বিরাম নেই, অথচ ছাব্বিশখানা অস্থি-দলে গড়া যে চরণকমল, না হ'ল তার ওপর একখানা মহাকাব্য রচনা, না

হ'ল সেই চরণের সখী জুতোর ওপর আজও অন্তত একটি গীতিকাব্য লেখা। কবিরা যে প্রেমের ফেনায় বন্ধআঁখি, এর পরে কি আর সন্দেহ থাকে ?

আস্ত কাব্য না হ'লেও জুতোর ওপর খণ্ড ব্যঙ্গকাব্য এতদিনে লেখা হয়েছে একখানাই 'কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল' এবং "লাল একজোড়া ঠনঠনিয়ার শুঁড় তোলা চটিজুতা"র ট্র্যাজেডি অনেক লেক-প্রেমের গল্প-লিখিয়ের কাঁধ থেকেই ভূত ছাড়াবে। গ্রামের ওঝাদের কাছেও শোনা যায়, ভূতগ্রস্তের স্কন্ধ থেকে ভূত নেমে যাবার সময় এক পাটি জুতো মুখে ক'রে একটা গাছের ডাল ভেঙে তবে বিদায় নিয়ে যায়।

কিন্তু জুতোর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা আজকের দিনে সবচেয়ে দরকারী। বর্ত্তমানের সমাজনীতিই বলি আর রাজনীতিই বলি, আসলে সবই জুতো-তত্ত্ব। আমরা ভুলে যাই কেন, হিট্‌লার এবং স্টালিন চর্ম্মকার-সন্তান ? সুতরাং বর্ত্তমানের দুই মূল যুযুধান রাষ্ট্রযন্ত্র যাদের হাতে, তারা সব চামার, তারা সব অখণ্ড আস্ত চামার। আগে নাকি নাপিতেরা ছিল চতুরচূড়ামণি, এখন সে স্থান দখল করেছে নিশ্চয় এই চামারেরা। এরা সমস্ত মানুষের দেহের আর মনের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে যুদ্ধের উত্তাপে ট্যান করাচ্ছে এখন। হিট্‌লার স্টালিনের জন্মসূত্র ধ'রে আমার এক বন্ধু তাঁদের নীতির মূল সূত্রটা ধ'রে ফেলেছেন। জুতোটা কি জিনিস ? Jew-তো, তা ছাড়া আর কি ! জুতো বানাতে হ'লে চামারেরা কি করে ? পেটে, আচ্ছা ক'রে পেটে এবং সুখতলায় মারে অজস্র কাঁটা। হিট্‌লারের ইহুদী-নির্য্যাতনের জৈব ব্যাখ্যা নাকি এই। স্টালিন যেহেতু বর্ব্বর যুগের চর্ম্মকার নন, সেইজন্য আর তাঁর ইহুদী-নির্য্যাতনের দরকার হয় না। মার্ক্সের বিপ্লবতত্ত্ব যন্ত্রবিপ্লবেরই পরিণতি, সুতরাং স্টালিনকে এই বৈজ্ঞানিক যুগে জুতো তৈরি করতে হ'লে পিটতে হয় না, যন্ত্রের নীচে ধরলে সমস্ত জুতোই আপনি তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে। তফাত এই, স্টালিনের পন্থাটা বৈজ্ঞানিক, হিট্‌লারের পন্থা সনাতনী।

কিন্তু জুতো না ব'লে যদি কেউ বলে পাদুকা ?

ভাষাতত্ত্ববিশারদ বন্ধুর মত—পাদুকা নয়, পা ঢুকা। সোজা কথায়

সমস্ত পৃথিবীজোড়া জুতোতে অর্থাৎ International jewery-র মধ্যে পা ঢুকিয়ে দাও, সেইজন্য হিট্‌লার স্টালিনে কোনও ভেদ নেই।

ভাগ্যিস হিট্‌লার স্টালিন বঙ্গভাষা জানে না! কিন্তু জুতো-তত্ত্ব আলোচনার জন্য বাংলা ভাষা সত্যিই নিঃস্ব। কারণ এই নাতিশীতোষ্ণ দেশে একদম জুতো পায়ে না দিলেও দিন কাটে, এবং দারিদ্র্যও একটা পদার্থ বটে। এইজন্যই এই দরিদ্র এবং পরাধীন দেশে জুতো সম্বন্ধে বেশি শব্দ বা বাক্যাংশ গ'ড়ে ওঠে নি, যাও বা উঠেছে তার সব কটিই প্রায় গালাগালির পর্য্যায়ে পড়ে। 'গরু মেরে জুতো দান' বাদ দিলে বাকি থাকে, পাদুকা প্রহার, জুতো-পেটা করা ও জুতো খাওয়া। পাদুকা-প্রহার অতি সভ্য ব্যাপার। জুতো-পেটাকেও রবীন্দ্রনাথ টেনে নিয়েছেন ভদ্র শ্রেণীতে।—

ঘন জঙ্গল। সে রকমের জঙ্গলের ছায়াতে আলোতে বাঘ চোখেই পড়তে চায় না। একটা মোটা বাঁশগাছের গায়ে কঞ্চি কেটে কেটে মইয়ের মত বানানো হয়েছে। জ্যোতিদাদা উঠলেন বন্দুক হাতে, আমার পায়ে জুতোও নেই। বাঘটা তাড়া করলে তাকে যে জুতো পেটা করব তারও উপায় ছিল।—'ছেলেবেলা', পৃ. ৭৫

কিন্তু জুতো খাওয়া এখনও অপাংক্তেয় হয়ে রইল, সে নিজে কাউকে বা কিছুকে ভক্ষণ করতে চায় না, তাকে বাংলা ভাষা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জঠরে পুরলেই সে বর্ত্তে যায়। তবে অসহযোগ-আন্দোলনের সময়, "বন্দে মাতরমে"র প্লাবনের দিনে এক দল অশ্লীল দায়িত্বহীন ছেলের মুখে দেখা গিয়েছিল এর একটা অপরিচ্ছন্ন রূপ।—

বন্দে মাতরম্
ডাল রুটি গরম গরম
না খাও তো জুতো আর খড়ম।

"বন্দে মাতরম্" ডালরুটির মত গরম গরম জিনিস, সেই ডাল রুটি না খেলে জুতো ও খড়ম ভক্ষণের আশ্বাস আছে। খাদ্যটা যে উপাদেয়, তাতে আর সন্দেহ কি!

তারপর জুতো নিয়ে অজস্র নাটক লেখা হবে না কেন? জুতোর মত সচল পদার্থ আর কি থাকতে পারে; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত এত অবিরাম চলে আর কে, এবং নাটকের তত্ত্বকথাই হ'ল গতি আর চলা। তবে হয়তো বিষম চলার ছন্দে জমে না নাটক, স্রোত একটু স্থির না

হ'লে ফুটতে পারে না পদ্ম। জুতোর গতি দেখে মনে হয়, জুতো সেই বর্ব্বর যুগের প্রতীক, যে যুগে মানুষ চরাত জানোয়ার, স্থির থাকত না এক জায়গায়, দানাপানি ফুরোলেই তুলে নিত আস্তানা। এই যুগের Jew তো সেই যাযাবর যুগেরই শেষ প্রতিনিধি ; এরাও তো চির-বিতাড়িত, এদেরও তো কোনও দেশ নেই। জুতো পায়ে না দেওয়াই তবে সভ্যতা !

তবে জুতোর ওপর নাটক লেখা না হ'লেও জুতো যারা তৈরি করে, তাদের নিয়েও যে কোনও নাট্য-চরিত্র সৃষ্টি হয় নি এমন নয়। আমরা কি 'আলিবাবা' নাটকের বাবা মুস্তাফার কথা ভুলতে পারি ? ইংরেজীতে এদের নিয়ে একখানা ভাল নাটক লেখা হয়েছে বই কি—ডেকারের 'সু মেকার্স হলিডে'। তখনকার এলিজাবেথীয় যুগে চামারদের কি প্রচণ্ড শিল্প-গৌরব-বোধই ছিল !

We are the brave bloods of the shoe-makers, heir apparent to Saint Hugh, and perpetual benefactor to all good fellows.

আজকের জীর্ণ সমাজের কোন সূক্ষ্ম শিল্পীও কি পারে এমন আত্ম-শ্লাঘা বোধ করতে ? আর, আমার কাছে সেই কটি পংক্তি অবিস্মরণীয়, যেখানে নববিবাহিত চর্ম্মকার চলেছে যুদ্ধে, তার এমন কি আছে যা সে বিদায়ের আগে পরম আদরে প্রিয়ার হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারে ! জুতো-উপহার আমাদের কাছে নেহাত গালাগালির মতই শোনায়, তবু এই নবীন চর্ম্মকারটি তার প্রিয়তমাকে দিয়ে গেল বন্ধুদের সহযোগিতায় ও নিজের হাতে গড়া এক জোড়া চকচকে ঝকঝকে জুতো।

Now, gentle wife, my loving loving Jane
Rich men, at parting, give their wives rich gifts,
Jewels and rings, to grace their lily hands,
Thou know'st our trade makes rings for women's heels ;
Here, take this pair of shoes, cut out by Hodge,
Stitched by my fellow firk, seamed by meself,
Made up and pinked out with letters for thy name,
Wear them, my dear Jane, for thy husband's sake,
And every morning, when thou pull'st them on,
Remember me, and pray for my return.
Make much of them, for I have made them so,
That I can know them from a thousand mo.

আবার একবার দেখা গেল, প্রেম বিত্তনির্ভর নাও হতে পারে। যাই হোক, নিবিড় বিস্ময়ভরা আনন্দ লাগে তখন, যুদ্ধপ্রত্যাগত এই চর্ম্মকারটি যখন তার হারিয়ে-যাওয়া প্রিয়াকে ফিরে পেল সেই জুতোরই মধ্যস্থতায়।

নানান যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও ধরা পড়েছে জুতোর অসামান্যতা; পশ্চিমের শীতের প্রকোপই অবশ্য তার কারণ। যুদ্ধের জয়-পরাজয় অনেকখানিই যে জুতোর ওপর নির্ভর করে, মিচেলের 'গন উইথ দি উইণ্ড' প'ড়ে এমন ধারণাটা সহজেই মনে উদয় হয়; পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জুতো সরবরাহ করতে পারলে দক্ষিণ হয়তো উত্তর আমেরিকার বিরুদ্ধে ভালমতই তাল ঠুকে দাঁড়াতে পারত, হয়তো বা পারত জর্জিয়ার স্বর্ণভূমি থেকে তাকে ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দিতে। নেপোলিয়নের মহাসৈন্যদলের জুতো সরবরাহ হ'ত ইংলণ্ড থেকে। যখন যুদ্ধ বাধল, তখন রুদ্ধ হ'ল জুতো সরবরাহ, বন্ধ হ'ল চামড়া পাঠানো। ইংলণ্ডের নৌ-বাহিনীর অবরোধে চা, কফি, তামাক ও ফ্যাশনের জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়ে ফ্রান্স যত কাবু হয়েছিল, এক জুতোর অভাবে দুর্ব্বল হ'ল বুঝি তার দ্বিগুণ। নেপোলিয়নের রাশিয়া-প্রত্যাগত সৈন্যদলের অবস্থার কথা ভাবলে এ বিষয়ে মনে আর সন্দেহের কোনও লেশ থাকে না। শোনা যায়, ঐতিহাসিকেরা এ ব্যাপারে প্রায় নীরব—গত ১৯১৪-১৮র যুদ্ধে জার্ম্মানির পরাজয়ের একটা কারণ জুতোর অভাব। লোহালক্কড়ের অজস্র কারখানা জার্ম্মানির থাকলেও ইংলণ্ড আর আমেরিকার হাতেই ছিল জুতোর বড় বড় কারবার। জার্ম্মানি অবশ্য সহজে ঘাবড়াবার চিজ নয়, কাঠের তলা আর মোটা কাগজের ঢাকনা দিয়ে জুতো তৈরি ক'রেই চালাতে লাগল যুদ্ধ। কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে কি মেটে? এবারের যুদ্ধেও রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ভাল জুতোর দরকার হবে জার্ম্মানির। তবে জার্ম্মানির ভরসা, এবারকার যুদ্ধের বড়কর্ত্তা যিনি, তিনি সাক্ষাৎ চামারের ছেলে।

শুধু যুদ্ধই বা কেন, পাদুকা রাষ্ট্রবিপ্লবের আংশিক হেতুও হতে পারে, পারস্য-রাজ আমানুল্লাহ্‌র প্রিয়তমা সুরাইয়া বেগমের পাদুকা পরিধানই

তার প্রমাণ। অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টিতেও পাদুকার শক্তি অনস্বীকার্য্য। পাণ্ডবভ্রাতৃবর্গের জুতো-বিভ্রাটের কথাটা নেপথ্যেই থাক। কলমপেষা চাকুরিজীবীদের অনেক অর্দ্ধাঙ্গিনীর অভিজ্ঞতা আছে, সময়মত ঠিক জায়গাতে জুতো জোড়াটি না পেলে কি প্রলয়ই ঘটতে পারে।

চর্ম্মকারদের কথা উঠলেই মনে প'ড়ে যায় টল্‌স্টয়ের সেই গল্প, "হাউ মেন লিভ বাই"। দরিদ্র চামারের ঘরে তিনটে নীতি শিখতে এল অধঃপতিত দেবদূত মাইকেল। আমাদের স্নায়ুচঞ্চল যুগে মাইকেলের কয়টা শান্ত নীতি মেনে নিতে পারলে শান্তি আছে।

এই সূত্রে আর এক দল জীবের কথা মনে পড়ল, যারা টল্‌স্টয়ের মাইকেলের মতই আকাশের ঈথার-লোকে বিচরণ করতে পারে, যদিও তারা কোনও স্বর্গদূত নয়। ছেলেবেলায় গল্প শুনেছিলাম, মহানগরী কলকাতায় সারাদিন যত অপর্য্যাপ্ত মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত হয়, রাত বারোটার মধ্যেই সব হয়ে যায় নিঃশেষ। এত সব মিষ্টান্নের ক্রেতা আসে কোথা থেকে? একটু রাত হ'লেই আমাদের এই কলকাতা শহরেই মিষ্টান্ন কিনতে নেমে আসে হাজার হাজার জিন আর পরী; তাদের ধন-দৌলতের তো সীমা নেই। ঠিক তোমার আমার মতই মানুষের রূপ ধ'রে তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। তাদের চেনবার একটি মাত্র উপায় আছে। জিন, প্রেত, পরী যখন মানুষের রূপ নেয়, তখন মানুষের সঙ্গে তাদের একমাত্র পার্থক্য থাকে এই যে, তাদের পায়ের গোড়ালিটা থাকে সম্মুখে আর পাতাটা থাকে পশ্চাতে ফেরানো, সুতরাং এদের জুতোর গোড়ালিটাও থাকবে সামনের দিকে। এই গল্প শোনার পরে সন্ধ্যার শেষে ফুট্‌পাথ ধ'রে চলতে চলতে এই সব আকাশচারী জীবের সন্ধানে কত নরনারীর জুতোপরা চরণই যে নিরীক্ষণ করেছি! অপার্থিব বন্ধুদের সঙ্গে মিতালি করার সুযোগ আজও ঘটল না। আমাদের ঔৎসুক্য দেখে তারা সতর্ক হয়ে যেতেও পারে; হয়তো বিরক্তও হতে পারে, যেমন ফুট্‌পাথের মুচীরা আমাদের পাদুকা লক্ষ্য করলে আমাদেরও মেজাজ খোশ হয়ে ওঠে না। তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দ্বারিক ঘোষ ও ভীমনাগ মার্কা কোম্পানিগুলির সঙ্গে এদের নিশ্চয়ই দহ্‌রম-মহ্‌রম চলে।

সাহিত্যের আসরে পাদুকা আর চর্ম্মকারের স্থানটা এখনও বং সঙ্কীর্ণ। সাহিত্যিকদের কল্পনা বুক থেকে নাভিমূল পর্য্যন্ত আসলেও পায়ের দিকে এখনও নামে নি ব'লে ব্যাপকভাবে এদিকে বিশেষ কিছুই লেখা হয় নি, হচ্ছেও না। তবে নামতে যখন শুরু করেছে, তখন আশা রাখা ভাল।

পাদুকা এবং চর্ম্মকার কেন, নগর-সভ্যতার কতটুকুতেই বা সাহিত্যিকের দৃষ্টি পড়ছে! পাট চট ময়দা তেল কাপড়ের কলে, রঙ রেল লোহা অস্ত্রের কারখানায়, চুন সুরকি ইট কাঠ কয়লার কারবারে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জে, শেয়ার মার্কেটে, তেজারতি ব্যবসাতে—কত অজস্র ব্যবসাতে মানুষ যেভাবে নিযুক্ত, সেভাবে তাদের কাজে ও বিশ্রামে, সংগ্রামে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ ক'রে দেখে নিতে আমাদের কজন 'বাস্তব'-সাহিত্যিকের সজাগ সচেতন নীতিমূলক চেষ্টা আছে! এই যে চেকোস্লোভাকিয়াবাসীরা বাটানগরে বিরাট এক জুতোর কারখানা গ'ড়ে তুলেছে, সেটাকে দেখতে ও জানতে কজন বাঙালী ভদ্র সাহিত্যিক উৎসুক? চেকরা দেখছি সম্প্রতি আমাদের পায়ের স্বাস্থ্যের ভার গ্রহণ করেছেন বিনা আবাহনে বিনা আমন্ত্রণেই। চীনবাসীরাও এঁদের সঙ্গে সহকর্ম্মে নিযুক্ত। ভাবি, বিদেশীদের হাতে কেন আমরা পায়ের স্বাস্থ্যটা এমন ক'রে ছেড়ে দিলাম? আমাদের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের ভারটাও এক বিদেশী জাতি নিয়েছে আপন হাতে তুলে,—ডাক্তারদেরও বিদ্যে শিখে রীতিমত ডিগ্রীধারণ ক'রে তবে রোগী দেখতে হয়। ভাবি, এই বিদেশীরা সমগ্রভাবে ডাক্তারি-শাস্ত্রে এমন কি ডিগ্রী লাভ করেছে, যাতে তারা আমাদের সমগ্র স্বাস্থ্যের ভার নিতে পারে? ভাবি, চীনাদের সমাজে একদিন "ছোট পায়ে ছোট জুতো" কেন সৌন্দর্য্যের একটা প্রতীক হয়ে দাঁড়াল? আরও ভাবি, কেবল গৃহকর্ম্ম করতে হ'ত ব'লেই কি আর্য্যনারীদের পক্ষে জুতো পরা নিষিদ্ধ হ'ল? অর্থাৎ, ভাবি না কিছুই, পাদুকাতত্ত্ব আবার কোন্ সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তির ভাবনায় স্থান পায়?

কিন্তু এই ব্যাপক সাম্প্রদায়িক নির্বুদ্ধিতার দিনে একটা কথা স্পষ্ট ক'রেই ভাবি। সরকার বাহাদুরের উচিত এক জোড়া দামী "ডার্বি শু"

কিনে আনা, তারপর উপহারস্বরূপ এক পাটি হিন্দুর চৈতন্যশক্তির লম্বা টিকিতে বাঁধা এবং অন্য পাটি মুসলমানের চিন্তাশক্তির টার্কিশ টুপির লেজুড়ে ঝোলানো। অবশেষে দরকার, আশেপাশে কোনও গাধা থাকলে তার পিঠের ওপর যুগল মূর্ত্তিকে বসিয়ে দেওয়া।

গোলাম কুদ্দুস

চণ্ডীদাসের ভাষার আরও কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দ ও বাগ্বিধি

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কার ও চণ্ডীদাসপদাবলী-রচয়িতার আরও কয়েকটি শব্দ ও বাগ্বিধি বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত রহিয়াছে।

চণ্ডীদাস (নীলরতনবাবু সম্পাদিত, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ)

'চণ্ডীদাসে'র 'সুধা ছানিয়া কেবা' (৬২-সংখ্যক পদ) পদের 'আদলি' শব্দটির অর্থ 'অর্দ্ধস্থালী' বা 'আজ্যস্থালী', যিনিই যাহা অনুমান করুন না, শব্দটি বীরভূমে প্রচলিত আছে। তামাক মাখাইবার বা সূতা ভাতাইবার জন্য ব্যবহৃত কানা-উঁচু অর্দ্ধগোলাকার বা গোলাকার মৃৎপাত্রকে এ অঞ্চলের লোকে 'আদুলি', 'আদ্লা' ও 'আতাল' বলে।

প্রসঙ্গত, 'চণ্ডীদাসে'র 'দেয়াশিনী' শব্দটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। 'দেয়াশিনী বেশ সাজি বিনোদ রায়' (চণ্ডীদাস, ৭৯-সংখ্যক পদ) প্রভৃতি পদের 'দেয়াশিনী' শব্দের উৎপত্তির মূলে কেহ দেখেন 'দেববাসিনী', কেহ বা দেখেন 'দেবসম্ভব'; কিন্তু বীরভূম অঞ্চলে 'দেয়াশী'কে সম্মান ও সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন করিতে লোকে বলে, 'দেবাংশী'। 'দেবাংশী' শব্দের অর্থ 'দেবল', যিনি পূজা তথা পূজাদ্রব্যাদির মালিক। এই 'দেবাংশী' শব্দ হইতেই 'দেয়াশী' শব্দের উৎপত্তি; স্ত্রীলিঙ্গে 'দেয়াশিনী'।

উত্তমপুরুষের 'দেখি' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের স্থানে 'দেখিয়ে' ('চণ্ডীদাস', ৭৫-সংখ্যক পদ) ইত্যাদির প্রয়োগভঙ্গি বীরভূমে চলিতেছে। 'যাই দাঁড়া' বলিতে এখানকার প্রাচীনেরা বলে 'যেয়ে, ডাঁড়া'; 'ভাত খাই নাই'-কে বলে 'ভাত খেয়ে নাই'।

'চণ্ডীদাসে'র ৮৬-সংখ্যক পদে আছে,—'কুহায়ে সুরতিরঙ্গ'; 'কুহায়ে' মানে 'কুয়াতে'; বীরভূমের লোকে 'কুয়াসা'কে 'কুয়া' ও 'কুয়ো' বলে।

'বটে' শব্দটা বাংলা অব্যয়পদরূপে সর্ব্বত্র চলে; কিন্তু বীরভূম অঞ্চলে 'বটে' ক্রিয়াপদ। 'আমি না হয় মন্দ বটি', 'তুমি তো ভাল বট', 'তু তো ভাল বটিস', 'সে

দুষ্ট বটে', প্রভৃতি এখানে নিত্য-প্রচলিত। 'চণ্ডীদাসে'র 'আমি কি বটিয়ে' (১৬৯-সংখ্যক পদ) প্রভৃতি স্থানে 'বটিয়ে' উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদ।

সাধারণত 'বচন' শব্দের পদ 'টচন' লব্‌জোটি যোগ করিয়া অন্যত্র ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বীরভূম অঞ্চলে বলে 'বচন-সচন',—'তার বচন-সচন তো বেশ!' 'চণ্ডীদাসে'র ১২৭-সংখ্যক পদেও এই 'বচন সচন' ব্যবহৃত হইয়াছে;—'কিশুন নাতিয়া বচন সচন কেমনে শুনহ রাই'।

গায়ে 'ধান দিলে খই হয়' বীরভূমের আটপৌরে বাগ্বিধি। কাহারও গায়ে জ্বরের উত্তাপ বেশি হইলে এখানকার লোকে বলে,—'জ্বরে গা আগুন, ধান দিলে খই হয়।' 'চণ্ডীদাসে'র ২৪১-সংখ্যক পদে আছে,—'হাত দিয়া দেখ বড়াই মোর কলেবর। ধান দিলে খই হয় বিরহ অনল।'

'চণ্ডীদাসে'র ২৫০-সংখ্যক পদে আছে,—'স্বামী ছায়াতে মারে বারি।' সে আমাকে একবারে দেখিতে পারে না—এই ভাবটি প্রকাশ করিতে বীরভূমের মেয়েরা 'সে আমার ছ্যাঁয়ে (ছায়াতে) বাড়ি মারে' বা 'সে আমার ছ্যাঁয়ে তিন বাড়ি মারে' ভাষা ব্যবহার করে।

'কানুর পিরীতি মরণের সাথি' ('চণ্ডীদাস', ৩৪৩-সংখ্যক পদ) পদে আছে,—'আসিয়া মদন দেয় কদর্থন অন্তরে উঠয়ে উকি'। 'উকি' মানে 'আগুনের ফিনকি'; আগুন জ্বলিবার সময় কুটি-কুটি ফিনকি উপরে উঠিতে থাকিলে বীরভূম অঞ্চলের লোকে বলে, 'উকি' বা 'উকো' উঠছে।

বীরভূমের লোকের কাছে 'ড়' ও 'র' উচ্চারণের বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই, ইহা প্রায় সর্ব্বজনবিদিত। 'চণ্ডীদাসে'র ১১৮-সংখ্যক পদের 'বাড়ি' (লাঠি অর্থে) এবং ১২৭-সংখ্যক পদের 'বারি' বানানে বীরভূমত্বটুকু বজায় আছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'ও এই প্রকার বীরভূমগত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'পরিহাসে' শব্দটি বহু স্থানে 'পরিহাসে' বানানে, আবার অনেক স্থলে 'পড়িহাসে' বানানে চলিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

তাম্বুলখণ্ডের 'তোর মুখে সুনী' পদের 'তোহ্মেসি' আজও বীরভূম অঞ্চলে 'তুমিসি' আকারে প্রচলিত; লোকে বলে,—'তুমিসি যাবে না, তমু (তবু) যাব যাব করবে'। 'আমিসি', 'তুসি' প্রভৃতিও এখানে হামেশা ব্যবহৃত হয়: 'আমিসি দেখিই নাই', 'তুসি খেঁয়ে এলি, দেখলাম', 'তোকেসি বললাম, ওখানে যাস না' ইত্যাদি। 'আহ্মেসি', 'সেসি' প্রভৃতি শব্দ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' বহুস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

দানখণ্ডের 'মেদনি যোড়িলো হালে' পদে আছে, 'সুমেরু আক্ষাক গঢ়ে। তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে'। 'মেঢ়' শব্দটি বীরভূমে প্রচলিত রহিয়াছে। প্রতিমার কাঠামোর পশ্চাদ্‌ভাগের চারিপাশের আবেষ্টনীকে এ অঞ্চলে 'মেঢ়' বা 'মেড়' বলে।

দানখণ্ডের 'আইস গোআলিনী' পদের 'কড়াচারী কড়ীধনে' বাগ্বিধিটি এ অঞ্চলে সুপরিচিত। লোকে বলে,—'ভারী আমার বড় নোক রে, পুঁজি তো কড়াচার কড়ি ধন।'

দানখণ্ডের 'আঁচলে না ধর কাহ্ন' পদে আছে,—'না জানেঁ। শিশুমতী সুরতির ভায়'; এই 'ভায়' বীরভূমে 'ভ্যাই' বা 'ভ্যাঁই' উচ্চারণে চলিতেছে। 'কোন কিছুর 'বিন্দুবিসর্গ' বা 'টের' জানি না' প্রকাশ করিতে এখানকার লোকে বলে,—'আমি এর ভ্যাই জানি না।' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'মিছে ছাঁচে' (তোক্ষে যবেঁ বোল বড়ায়ি পদ, দানখণ্ড) বীরভূমের নিত্যপ্রচলনের বাগ্বিধি। লোকে বলে,—'মিছে ছাঁচে ভুলিঞেঁ-ভালিঞেঁ কাজ হাঁসিল করা তার অভ্যেস'।

দানখণ্ডের 'এ তোর আড় নয়নে আল' পদের 'গোর' উচ্চারণ বীরভূম আজও বজায় রাখিয়াছে। এখানকার একটি সর্ব্বজনবিদিত মেয়েলি কথা,—'একে গোর গা, তাতে বেটার মা'।

'প্রথমে কাঢ়িআঁলৈন' পদের (দানখণ্ড) 'পাসলী' বীরভূম আজও ভুলে নাই। বৃদ্ধারা সাবেকের গহনার জায় দিবার সময় বলেন,—'এগু বিয়ের বউ'র গ'না ছিল, গলায় হাঁসুলী, পায়ে পাসুলী, হাতে তাবিজ···' ইত্যাদি। এই 'পাসলী' হইতেই বীরভূমের 'পাউড়ো' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; 'পাউড়ো' মানে 'মল'; 'মল' বড় আকারের বলিয়া ইহাকে বলে 'পাউড়ো', আর পায়ের আঙুলের চুট্‌কি বা আঙ্গুঠি ছোট বলিয়াই ইহাকে 'পাউড়ি' অর্থাৎ 'পাসলী' বলা হইত।

ভারখণ্ডের 'যতন করিআঁ রাধা' পদের 'চৌহালিনী' শব্দের উৎপত্তি যাহা হইতেই হউক না কেন, ইহার অর্থ, যে সব গোলমাল ক'রে দেয়, বা প্রকাশ ক'রে দেয়। বীরভূম অঞ্চলে সব ফাঁস বা প্রকাশ হইয়া গেল বুঝাইতে ভাষা ব্যবহার করে, 'সব চৌল-বৌল বা চল্ল-মল্ল হঞেঁ গেল'। 'চৌহালিনী'র বিদ্বদ্বল্লভমহাশয়-ধৃত 'শঙ্কাপরা' বা 'সতর্কা' অর্থ ধরিলে পদের অর্থ-সঙ্গতি করা কঠিন হইয়া পড়ে। বিশেষ, যখন শব্দটি সুস্পষ্ট অর্থে বীরভূম অঞ্চলে চলিত আছে, তখন ইহার প্রচলিত সহজ অর্থ ধরাই সঙ্গত।

'মথুরানগর বড় সজন সমাজ' (ভারখণ্ড) পদে আছে,—'কি পুছিব বড়ায়ি রাধা আহ্মে সব জানী। না দেখিল তোহ্মা হেন কথাহোঁ চউহানী'। 'চউহানী' শব্দ 'চেবানী' উচ্চারণে বীরভূমে প্রচলিত। 'চেবানী' মানে নেকী বা শঙ্কাপ্রবণা।

তুমুল অর্থে 'তোল' শব্দ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' একাধিক স্থানে ব্যবহৃত আছে। ভারখণ্ডের 'অনেক যতন করে' পদে পাই,—'তেকারণে দেহ মোর ঘামে তোল বলে'; বৃন্দাবনখণ্ডের 'মোনাহিঁ নাশি' পদেও আছে,—'মো যবেঁ জানি তোঁ হেন করিবে তোল'। বীরভূমের লোকে বলে,—'গরমে তোল ঘাম ছুটছে'।

দানখণ্ডের 'নিতিনিতি যাসি রাধা' পদে আছে,—তিরী 'কলা'; 'কলা' কথাটা 'ঠার' বা 'ছল' অর্থে বীরভূমে নিত্যব্যবহৃত। লোকে বলে,—'সি কলা ক'রে প'ড়ে আছে'। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কার একাধিক স্থানে উক্ত অর্থে এই 'কলা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

বৃন্দাবনখণ্ডের 'আল রাধে। একেঁ একেঁ ঋতুগণে' পদে পাই 'অফের'। বিদ্বদ্বল্লভ

মহাশয় ভাষাটীকায় 'অফের' শব্দের টীকা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—'অফের বোধ হয় 'সফরি' (পেয়ারা), লিপিকার প্রমাদে 'স' স্থানে 'অ' হইয়া গিয়াছে।' তাই যদি হয়, তবে বীরভূমে শব্দটি অপ্রচলিত তো নয়ই, ব্যাপকভাবেই চলিতেছে। 'সফরে' বা 'সঁফরে' বা 'সঁফুরে' এখানকার লোকে সর্ব্বদা ব্যবহার করে। 'সঁফরে' দুই প্রকারের; 'লঙ্কা'কে 'সঁফরে' বলে এবং 'পেয়ারা'কে বলে 'আম-সঁফরে'। 'লঙ্কা' হইতে পার্থক্য রাখিবার জন্যই ফলবাচক 'আম' শব্দ পূর্ব্বে যুক্ত করিয়া 'পেয়ারা' অর্থে 'আম-সঁফরে' কথাটার ব্যবহার হয়।

রাধাবিরহখণ্ডের 'আইস ল বড়ায়ি হের' পদে আছে,—'আর কভোঁ না ঝঙ্কায়িবী মোরে'। 'ঝঙ্কায়িবী' মানে 'ঝেঁকাবি', 'ভৎর্সনা করিবি'। বীরভূমের লোকে বলে,—'এই কথা শুনে সি একবারে ঝেঁকিএঁ উঠল'।

প্রাচীন কবিদের, বিশেষত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কার ও চণ্ডীদাসপদাবলী-রচয়িতার প্রিয় 'নিছন' শব্দটির প্রসঙ্গত একটু আলোচনা করা যাউক। 'নিছন' (সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'নির্ম্মছন') মানে সাধারণত 'বালাই'। বৈষ্ণবপদকর্ত্তারা শব্দটাকে স্থিতিস্থাপকত্ব দান করিয়া বিভিন্ন অর্থে ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক, 'নিছন' কথা 'নেসন' আকারে বীরভূমে বহুলপ্রচলিত। 'দম্বল'কে এখানকার লোকে 'নেসন' বলে। 'দম্বল' নিশ্চয়ই দুধের 'বালাই'; সুতরাং 'নেসন' শব্দ 'বালাই' অর্থে বীরভূমে চলিতেছে।

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ

এরা আর ওরা

আসছে গো ঐ তারা আসছে,
নীল আকাশের গায়ে রজতবিন্দু-শোভা,
তাদের সম্ভাবনা ভাসছে।
ভাসছে মানসে নব সন্তাষ-শঙ্কা,
জননী জন্মভূমি চির-অকলঙ্কা;
সুদূর সাগর পারে দ্বীপে যারা চিরদিন
আমাদের বহু ভালবাসছে
তারা প্রস্তুত আছে, সতীরা পেও না ভয়
পথে নব নাগরের ইঙ্গিত-কাসি নয়
ঐ ঐ ঐ যারা আসছে,
বন্দ্মা ধরেছে বুঝি শূন্য বিমানপথে
মৃত্যুর কাসি তারা কাসছে।

পঞ্চম পক্ষ

(চলচ্ছন্দে লিখিত)

বাংলা দেশের একখানি গ্রাম। ঠিক গ্রাম নয়, মহকুমা-শহর। তার গ্রামত্ব এখনও কাটে নি, শহর হয়ে উঠ্‌ছে। কলকাতা থেকে মাইল কুড়িকের মধ্যে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ছত্রিশ জাতেরই বাস সেখানে। আধুনিক কাল। একটি লাইব্রেরি ও সেই সঙ্গে থিয়েটারের ক্লাবও আছে।

কাল—ঘরের বাইরে বিকেলের শেষ, ঘরের মধ্যে সন্ধ্যের প্রথম।

এই আলো-আঁধারে লাইব্রেরি-ঘরের মধ্যে ব'সে স্বরপ্রিয় মুখুজ্জে ওরফে গ্রামের যুবকদের খুড়ো, আর সকলের স্বরো বুড়ো হরলালের সঙ্গে দাবা খেলছে। স্বরপ্রিয়র বয়স একচল্লিশ।

স্বরপ্রিয় একসময় ক্লাবের খুব উৎসাহী সভ্য ছিল, কিন্তু আজকাল সে আর ক্লাবে আসে না। অনেকদিন পরে তাকে ক্লাবে আসতে দেখে উপস্থিত সবাই খুশি এবং বিশেষ উৎসাহিত। তাদের খেলার চারপাশে আরও পাঁচ-ছ-জন ব'সে খুব মনোযোগের সঙ্গে খেলা দেখছে। উপরি চাল বলা একদম বারণ। দুজনেই ভাল খেলোয়াড়, তবে স্বরপ্রিয় অনেকদিন খেলে নি। খেলা বেশ জ'মে উঠেছে।

দাবার পাশ থেকে ঘোড়া তুলে নিয়ে এক ঘরে টিপে দিয়ে স্বরো হাঁকলে, এই পড়ল কিস্তি।

কাট্‌

গাঁয়ের আর একদিকে একখানা দোতলা বাড়ি। বাড়ির আয়তন ও অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়, মালিকের অবস্থা ভাল। দালানের পেছনে উত্তর দিকে প্রকাণ্ড দীঘি—টল্‌টলে কানায়-কানায় জল। দীঘির এক কোণে কলাবাগানের ঝোপে একটি তরুণী ও একজন তরুণ দাঁড়িয়ে। বাগানের চারিদিকে উঁচু পাঁচিল, বাইরে থেকে কারুর দেখতে পাবার উপায় নেই—কাজেই তারা একটু বেপরোয়া।

তরুণী হচ্ছেন সুরপ্রিয় মুখুজ্জে অর্থাৎ ওরফে খুড়োর পত্নী; তরুণ যিনি, তিনি গ্রামেরই এক যুবক,—নাম নন্দলাল নন্দী, ডাকনাম বাঁটুল। এই বছর বি. এস-সি. পাস ক'রে ভেরেণ্ডা ভাজ্‌ছেন।

তরুণ তরুণীকে half embrace-এ জড়িয়ে ধ'রে বললে, রাগ করলে?

তরুণী—রাগ করি নি, কিন্তু সত্যি যদি আমায় ভালবাস, তা হ'লে এখুনি আমায় এখান থেকে নিয়ে চল। আর এক মুহূর্ত্তও আমার এখানে সহ্য হচ্ছে না।

—তোমায় বলেছি তো রাধা, আমার যতদিন না একটা কাজকর্ম্ম জোটে, ততদিন কোথায় নিয়ে গিয়ে তোমায় রাখ্‌ব?

রাধারাণী বাঁটুলের দিকে মুখ তুলে চাইলে। তার চোখে ফুটে উঠ্‌ল অশ্রুমুকুতা, আর বাঁটুলের চোখে ফুটল করুণা ও আতঙ্কমিশ্রিত এক অপূর্ব্ব ভাব।

বাঁটুলের চোখ থেকে চোখ নামিয়ে রাধারাণী তার কাঁধের ওপর হেলে প'ড়ে শ্রুতিমূলে বিচিত্র গুঞ্জন আরম্ভ করলে। বাঁটুলের মনে হতে লাগল, যেন রাধিকার বিরহাশ্রু সঙ্গীতধারায় তার কানে বর্ষিত হচ্ছে। কাতর মিনতিতে যমী যেন যমকে অনুনয় করছে।* তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল, ইদন উদ্যানের বিচিত্র শোভা, ইভ যেন সবেমাত্র নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলটি ছিঁড়ে আদমকে চোখ ঠার্‌ছে।

বিহ্বল বাঁটুলের অবস্থা দেখে রাধারাণী তার কাঁধ থেকে মুখ তুলে নিয়ে বললে, তুমি পাঁচ মিনিট দাঁড়াও, আমি বাড়ির ভেতর থেকে খানকয়েক শাড়ি নিয়ে আসি। এখুনি, এই মুহূর্ত্তেই আমি তোমার সঙ্গে চ'লে যাব। পোড়ারমুখোর মুখ যেন আর না দেখতে হয়।

বাঁটুল মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললে, তোমাকে নিয়ে চ'লে যাই এ কি

---

* ঋক্ বেদে যমী ও যমের আখ্যায়িকাকার সত্যযুগের লোক হ'লেও অতি-আধুনিকত্বের একটু touch তাঁর মধ্যে ছিল। যমী ও যম ভাই বোন তারা, যমীর মুখ দিয়ে ভাইকে দেহদানের প্রস্তাব করিয়ে তিনি অমন একটা tense situation তৈরি করলেন বটে, কিন্তু Cinema sense না থাকায় Climaxটি murder করলেন।

আমার অসাধ রাধারাণী! কটা দিন সবুর কর, আমার এই চাকরিটা হোক—

বাঁটুলের কথা থামিয়ে দিয়ে রাধারাণী ব'লে উঠল, চুপ কর। খালি চাকরি, চাকরি, কাজ আর কাজ! তুমি কি পুরুষমানুষ! ধিক্! শত ধিক্ তোমাকে।

রাধারাণী ছুটে বাড়ির দিকে চ'লে গেল।

অপস্রিয়মানা রাধামূর্ত্তি দেখতে দেখতে বাঁটুলের দেহ-মন কি রকম একটা বিহ্বলতায় আবিষ্ট হয়ে পড়তে লাগল। ঠিক সেই সময় দূরে আমগাছে পাপিয়া ডেকে উঠতেই তার মনে হ'ল, গাছের ওপর থেকে কে যেন চীৎকার ক'রে তাকে ধিক্কার দিচ্ছে। কাছেই ছা'য়ের গাদায় লুটিয়ে প'ড়ে একদল ছাতারে পাখি চ্যাঁ-চ্যাঁ করছিল। বাঁটুলের মনে হতে লাগল, একদল বোষ্টম যেন কেত্তনের শেষ অঙ্ক অভিনয় করছে।

চারিদিকে শব্দ। রাধার ধিক্কারে যেন আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। বাঁটুলের কানে আর কোন শব্দ যাচ্ছে না। কেবল ধিক্ ধিক্ ধিক্। ঠিক সেই সময় পুকুরের পূব দিকে শোনা গেল, গ্রামের অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র গাইতে গাইতে চলেছে—

ধিক্ ধিক্ তোরে নিঠুর কালিয়ে
ধিক্ তোরে শত ধিক্—
তোরেও ধিক্ তোর প্রেমেও ধিক্—

উত্তেজনায় বাঁটুলের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ তার বাঁ পায়ের মাঝের আঙুলটায় খিল ধরতেই সাপে কামড়েছে মনে ক'রে সে ব'সে প'ড়ে আঙুলটা চেপে ধরলে। একটু সম্বিৎ ফিরে পেতেই বাঁটুল উঠে দাঁড়াল। ভয়ে তার বুকের ভেতরটা তখনও টিপটিপ করছিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে খানিকটা কলাপাতা চড়্‌চড়্ ক'রে ছিঁড়ে মুখের মধ্যে পুরে সে চিবোতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

অন্ধ কেষ্টর গান অস্পষ্ট হয়ে এলেও তখনও শোনা যাচ্ছিল—

ধিক্ ধিক্ তোরে নিঠুর কালিয়ে
ধিক্ তোরে শত ধিক্—

এক ঢোঁক কলাপাতপিষ্ট পেটে যেতেই বাঁটুল প্রকৃতিস্থ হয়ে থু থু ক'রে বাকিটা মুখ থেকে ফেলে দিলে। তারপরে মনে মনে দৃঢ় হয়ে স্থির করলে, আজকের মতন কোন রকমে রাধারাণীকে নিবৃত্ত করতেই হবে।

মন যখন প্রায় স্থির হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় রাধারাণীর আওয়াজ এল, চল।

বাঁটুল মুখ ফিরে দেখলে, হাতে তার দুটি পুঁটলি—একটি ছোট একটি বড়, চোখে তার বিশ্বজোড়া ক্ষুধা, কানে তার খ'সে-পড়া আড়-ঘোমটা, অধরপল্লবে অস্ফুট ভাষা, একটি মাত্র ছোট্ট অনুনয়—আমায় নিয়ে চল।

বাঁটুল কি একটা বলবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তার মুখে ভাষা যোগাবার আগেই রাধারাণী তার বাম বাহু একখানা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে ডান হাতে ছোট পুঁটলিটা দিয়ে বললে, ধর। ওজনেই বুঝতে পারা গেল, তার মধ্যে—রুধিরের স্রোত বইছে।

বাঁটুলের দেহ-মনে বৈদ্যুতিক প্রবাহে উৎসাহ সঞ্চারিত হতে লাগল। এক হাতে কামিনী, আর এক হাতে কাঞ্চন—এবার তো সে বিশ্বজয়ে বের হতে পারে। মুহূর্ত্ত মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির ক'রে সে বললে, চল রাধারাণী।

কাট্

বাঁটুল ও রাধারাণীর দু-জোড়া ছুটন্ত পা দূরে দেখা যেতে লাগল।

ফেড্ আউট্

ফেড্ ইন্

ক্লাব-ঘরে আলো দেওয়া হয়েছে। লোকজন বিশেষ নেই। এক কোণে স্বরপ্রিয় ও হরলাল তখনও দাবা টিপ্‌ছে। স্বরপ্রিয় বললে, নাও, এই কিস্তি মাত।

বার বার তিনবার হেরে হরলাল উঠে প'ড়ে বললে, আজ তোমার দিন ভাল হে।

স্বরো বাড়িমুখো চলেছে। মন তার খামকা খুশিতে ভরপুর। আজ সত্যিই তার দিন ভাল। সকালবেলা ছিপ নিয়ে বসতে না

বসতে একটা পাঁচ-সেরী কাতলা উঠেছে। দুপুরবেলা নায়েব মশায় এসে ব'লে গেছে, এগারো হাজার টাকা ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়েছে। সন্ধ্যেবেলা উপরি-উপরি তিনবার হরলালকে মাত করেছে। আজ ছেলেরা বড্ড ধরেছে, আবার তাকে অভিনয় করতে হবে। পুরোনো দিনগুলোর কথা স্বরোর মনে পড়তে লাগল, আবার কি সে দিন ফিরবে!

ছেলেদের অনুরোধে স্বরো নিমরাজি হয়েছে অভিনয় করতে। এবার তারা ঠিক করেছে 'সীতা' অভিনয় করবে। তাকে নিতে হবে রামের পার্ট। সন্ধ্যার একটু পরেই রিহার্স্যাল বসবে। অষ্টমীর দিন প্লে।

আজ কার মুখ দেখে সে ঘুম থেকে উঠেছিল! তার মনে পড়ল, আজ সকালে—সকাল মানে বেলা প্রায় নটার সময়, ঘুম থেকে উঠেই প্রিয়তমার কণ্ঠস্বর তার কানে গিয়েছিল, পোড়ারমুখোর কি রাত পুইয়েছে যে এখুনি উঠবে!

বাগানের দিকে যেতে যেতে একবার রাধারাণীর মুখখানা তার চোখে পড়েছিল। হোক্‌গে সে রাগত মুখ, কিন্তু সে বরাবর দেখেছে যে রাধারাণীর মুখ দেখলে তার দিন ভাল যায়। আজকের দিনটা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

স্বরপ্রিয় ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে, আচ্ছা, রাধারাণী তাকে এত অশ্রদ্ধা করে কেন? তার তো রাধারাণীকে ভালই লাগে। রাধার কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে হ'ল, এমনও তো হতে পারে যে, শতজন্মের পাকচক্রের ঘোরে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দ্বাপরের রাধাই তার ঘরে এসে জন্মেছে। রাধার হালচালই কি ঐ রকম! সে যে ভালবাসতে জানে না তা নয়, তবে স্বামীকে তার ভাল লাগে না। পুরুষের যেমন পরস্ত্রীর প্রতি সহজাত উদারতা আছে, স্ত্রীজাতিরও কি পরপুরুষের প্রতি তেমনই ঔদার্য্য আছে? তা তো নয়। স্ত্রী-জাতির প্রতি পুরুষের যে স্বাভাবিক আনুকূল্য, সারা প্রকৃতির মধ্যে তার তুলনা কোথায়! পরপুরুষের প্রতি স্ত্রীজাতির আনুকূল্য অনেক দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রায়ই তো তা ক্ষেত্রবিশেষে সীমাবদ্ধ।

স্ত্রী-পুরুষের এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সামঞ্জস্য কে কোথায় করতে পেরেছে!

চিন্তা করতে করতে সুরপ্রিয় হেসে ফেললে।

এখনও বাড়ি খানিকটা দূরে। সুরপ্রিয় একটু জোরে পা চালালে। বাড়ি গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু জলযোগ ক'রে এখুনি তাকে ফিরতে হবে ক্লাবে। ছেলেরা অনেক ক'রে ধরেছে, রামের পার্ট তাকে করতেই হবে। সামনেই পুজো, মহাষ্টমীর দিন প্লে। আচ্ছা, রাধারাণী যদি সত্যিই শ্রীরাধিকা হ'ত! তা হ'লে তো তাকে আয়ান ঘোষ হতে হয়। দূর দূর, আয়ান ঘোষ হতে তার মন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। বরং শ্রীকৃষ্ণ হ'লে—আরে ছ্যা ছ্যা, হাজার হোক সে হিন্দুর ছেলে, আর শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। ওঁ অক্ষরের দোলনায়-ঝোলা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি তার মানসপটে ফুটে উঠল। তা থেকে শ্রীরাধার ছবিটুকু বাদ দিয়ে বংশীধারীর উদ্দেশ্যে বারবার নমস্কার ক'রে বললে, দোহাই বাবা ভগবান, কিছু মনে ক'র না। মন ফস্‌কে ওটা ভেবে ফেলেছি।

সুরপ্রিয় বাড়িতে এসেই তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ফেললে। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা তরিবৎ ক'রে সে সিদ্ধি খেত। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন সে চুল আঁচড়াচ্ছে, সেই সময় কাচের গেলাসে ক'রে বৃন্দা সিদ্ধির শরবৎ নিয়ে এল। এক চুমুকে সেটা শেষ ক'রে সুরপ্রিয় বললে, তাড়াতাড়ি জলখাবার দিতে বল।

বৃন্দা চ'লে গেল।

খাবার খেতে খেতে চাকরকে সুরপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলে, তোর মা কোথায় রে?

—কোথায় গিয়েছেন।

—কোথায় গেছেন?

—তা তো জানি না।

বৃন্দাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল। সে বললে, মা তো বাড়ি নেই।

—কোথায় গেছেন?

বৃন্দা বললে, তা তো জানি না, বিকেল থেকেই দেখতে পাচ্ছি না।

কাট্

ক্লোজ্ আপ্

সুরপ্রিয়র মুখ।

ফেড্ আউট্

ফেড্ ইন্

রাত্রি দশটা। সুরপ্রিয় শোবার ঘরের জানলার ধারে গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে। পাশে রাধারাণীর শূন্য শয্যা।

ফ্ল্যাশ্ ব্যাক্

সুরপ্রিয়র উনিশ বছর বয়েস। বাড়ি লোকজনে গম্‌গম্ করছে। তাঁর বাবা ফিরে এসেছেন তার ভাবী পত্নীকে আশীর্ব্বাদ ক'রে। সামনের সপ্তাহে বিয়ে, মহা হৈ-চৈ চলেছে। কন্যার বাবা মা নেই, মধ্যবিত্ত* মামার বাড়িতে সে মানুষ হচ্ছে। মামী ভদ্র, তাই বেচারার কষ্ট কিছু নেই। দিতে-থুতে কিছু পারবে না, কিন্তু মেয়ের মুখ দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না, এমনই লক্ষ্মীশ্রী।

কাট্

সুরপ্রিয় এক ঘরে ব'সে ভাবছে, ড্যাম ইওর দেওয়া-থোওয়া।

কাট্

আর একদিন। সুরপ্রিয় বউ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। সুধার রং শ্যামলা হ'লেও তাকে তার খুবই ভাল লেগেছে। বাসরঘরে ঐ ভিড়ের মধ্যে সুধার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেছে।† সুরপ্রিয় তাকে অকপটচিত্তে জানিয়েও ফেলেছে যে, সে তাকে ভালবাসে। সুধাও অম্‌নিধারা কি একটা কথা তার কানে-কানে বলেছে, যার রেশটা সানাই ও ঢক্কানিনাদের মধ্যেও ডুবে যায় নি।

কাট্

---

* গৌরবে মধ্যবিত্ত অর্থাৎ বিত্তহীন।

† ইতিপূর্ব্বে নিঃসম্পর্কীয়া কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে সুরপ্রিয়র কোনও সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি।

সুধার যেমন মিষ্টি মুখ, তেমনই তার মিষ্টি ব্যবহার। শাশুড়ীর নয়নের মণি সে। তিনি তাকে বুকে আগ্‌লে থাকেন, আহা, বাপ-মা-মরা মেয়ে, একমাত্র ছেলের বউ।

সংসারে এক একটি মেয়ে আছে, যারা বাঙালীর ঘরের গিন্নী হয়েই যেন জন্মগ্রহণ করে। মামার বাড়িতে অতি ছোট অবস্থা থেকেই সে মামীর গিন্নিত্বের ভার লাঘব করত, শ্বশুর-বাড়িতে এসে অতি সহজেই সে অতবড় জমিদার-বাড়ির গিন্নীত্ব ধীরে ধীরে নিজের কাঁধে তুলে নিতে আরম্ভ করলে। গ্রামসুদ্ধ লোক সুধার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন লক্ষ্মী মেয়ে নাকি তারা আর দেখে নি।

কাট্

সুরপ্রিয়র বিয়ের পর মাস-পাঁচেক যেতে না যেতেই তার বাবা হরপ্রিয় মুখুজ্জের মৃত্যু।

সুধার লক্ষ্মীত্ব সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সন্দেহ।

কাট্

আবার ছ-মাস বাদে হঠাৎ একদিন সকালবেলা সুরপ্রিয়র মা হার্টফেল হয়ে মারা গেলেন।

সুধার লক্ষ্মীত্ব সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সন্দেহ কেটে গেল।

ওয়াইপ্

পনেরো বছরের সুধা সংসারের বিশাল ভার ঠেলে নিয়ে চলেছে হাসিমুখে। সুরপ্রিয় খায়-দায় তাস পেটে, ক্লাবে রিহার্স্যাল দেয়। দুপুরবেলা ঘুম মেরে ঘণ্টা-দুয়েক জমিদারির কাজ দেখে। দিন স্বচ্ছন্দে কাটছে। সুধা প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা শ্বশুর-শাশুড়ীর বড় ছবি দুটোতে নতুন ফুলের মালা পরিয়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। বেরোবার মুখে কোনদিন সে দৃশ্য চোখে পড়লে সুরপ্রিয়র বাবা-মার কথা মনে পড়ে। ক্লাবে যেতে যেতে পথেই সে কথা ভুলে যায়।

ওয়াইপ্

রাত্রি গভীর। সুরপ্রিয়ও গভীর নিদ্রায় অচেতন। আশ্বিন মাস, সেবারে কার্ত্তিকে পূজো। ক্লাবে 'রঘুবীরের' রিহার্স্যাল চলেছে। তার

হীরোর পার্ট। এর আগে সে হীরোর পার্ট করে নি। খুব জোর রিহার্স্যাল—স্বরপ্রিয় শয়নে-স্বপনে নিদ্রায়-জাগরণে রিহার্স্যাল চালিয়েছে। স্বপ্নের ঘোরে নর্ম্মদা ব'য়ে চলেছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে সে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে, উত্তালতরঙ্গময়ী ভীষণা নর্ম্মদা—

একটা জোর ধাক্কা লেগে তার ঘুম ভেঙে গেল। সুধা বললে, ওগো, বাতিটা একবার জ্বাল তো।

স্বরপ্রিয় তড়াক ক'রে উঠে বাতি জ্বালিয়ে দেখলে সুধা বিছানার ওপর ব'সে তার দিকে অবাক হয়ে দেখছে। স্বরপ্রিয় তার কাছে গিয়ে ব'সে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে?

—আমার যেন কি রকম মনে হচ্ছে!

—কি মনে হচ্ছে? ভয় পেয়েছ? এই তো আমি রয়েছি, ভয় কিসের?

সুধার মুখে হাসি। লজ্জার হাসি—তাই তো তুমি রয়েছ, তবুও আমার ভয়!!!

স্বরপ্রিয় এক গেলাস জল গড়িয়ে নিয়ে এল, জল খেয়ে সুধা একখানা হাত স্বরপ্রিয়র গায়ে রেখে শুয়ে পড়ল। স্বরপ্রিয় তার মাথা চুলকে দিতে লাগল।

ওয়াইপ্‌

আর এক রাত্রি। পূজো শেষ হয়ে গেছে। অঘ্রাণ মাসের মাঝামাঝি, বেশ জেঁকে শীত পড়েছে। নিশ্চিন্ত আরামে স্বরপ্রিয় ঘুমুচ্ছে, সুধা তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললে, তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বাল একবার—শিগ্‌গির।

স্বরপ্রিয় তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দেখলে, সেই দিনের মত সুধা বিছানায় উঠে ব'সে হাঁপাচ্ছে। তার চোখে-মুখে একটা হতাশা।

সুধার পাশে ব'সে স্বরপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে? অমন করছ কেন?

—আমার মনে হচ্ছে এক্ষুনি বুঝি ম'রে যাব।

—অ্যাঁ! আমি ডাক্তার ডেকে আনছি—হরিপিসীকে ডাকি, ততক্ষণ তোমার কাছে বসুক—

স্বধা হাঁপাতে হাঁপাতে দু-হাত দিয়ে তার একখানা হাত জড়িয়ে ধ'রে বললে, না না, তুমি যেও না, তুমি আমার কাছে ব'স।

স্বরপ্রিয় স্বধাকে একরকম বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললে, কি রকম লাগছে বল তো?

—আমার যেন কি রকম ভয়-ভয় করছে।

স্বরপ্রিয় হেসে বললে, ভয়! কিসের ভয়? এই তো আমি রয়েছি।

স্বধা আর কিছু না ব'লে স্বরপ্রিয়র গায়ে হেলান দিয়ে তার বুকে মুখ রাখলে। স্বরপ্রিয় তাকে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে যেতে লাগল, দিনরাত শুধু খাটবে, অথচ দাসদাসীতে ঘর ভর্ত্তি। তোমায় এত বারণ করি, কথা তো শোন না, কালই তোমায় নিয়ে কলকাতায় চ'লে যাব।

স্বধার কোন উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। স্বরপ্রিয়র মনে হতে লাগল, স্বধার বাহুবন্ধন যেন শিথিল হয়ে আসছে। ঘুমিয়ে পড়েছে মনে ক'রে সে তাকে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করতেই তার দেহ আপনিই বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

কাট্

ক্লোজ্ আপ্

স্বধার প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহ।

স্বরপ্রিয় বুঝতে পারলে, স্বধা ম'রে গেছে। কিন্তু সে ম'রে যাওয়াটা এত অসময়ে এমন অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত যে, তার ধাক্কায় সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে ভাবটা কেটে যাওয়ার পর তার একবার চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠবার ইচ্ছা হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে বাপ-মার কথা মনে প'ড়ে গেল। তারপরেই মনে হ'ল কতখানি অসহায় সে।

স্বরপ্রিয় চীৎকারও করলে না, উঠলও না। স্বধার মৃত্যুমলিন মুখের দিকে চেয়ে ব'সে রইল।

রাস্তা দিয়ে সেই শেষরাত্রে কোন্ রসিক ছোকরা গান গাইতে গাইতে চ'লে গেল, ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি উড়ে গেল আর এল না।

স্বরপ্রিয় স্থির হয়ে ব'সে আছে। তার চোখ দুটি নিষ্কম্প দীপশিখার

মত অবিচল, সুধার মুখের ওপর ন্যস্ত। নয়নে অশ্রু নেই, অন্তরে বিশেষ কোন চিন্তা নেই।

প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক এই ভাবে কেটে যাওয়ার পর অনেকদূরে কোথায় যেন একটা অজানা পাখি ডেকে উঠল। তারপর কিছুক্ষণের জন্যে প্রকৃতি নিস্তব্ধ। তারপরে এখানে-সেখানে নিকটে-দূরে পাখির ডাক শুরু হ'ল। ক্রমে আর পাখির ডাক শোনা যায় না, তার মধ্যে অন্য শব্দও প্রবেশ করেছে, আলোর মধ্যে যেমন আলো মিলিয়ে থাকে। তারপরে সেই সমস্ত শব্দ এক অখণ্ড শব্দসাগরে মিলিয়ে গেল। তার মধ্যে আছে পুরুরবার মর্ম্মভেদী আহ্বান—কোথায় তুমি উর্ব্বশী, আমার কাছে এস। আর আছে উর্ব্বশীর সেই শাশ্বত সত্য উত্তর—আমাকে তুমি আর দেখতে পাবে না।

আর এক সূর্য্যোদয়।

লঙ্ ফেড্ আউট্

ফেড্ ইন্

স্বরপ্রিয় একদম সন্ন্যাসী।

কাট্

স্বরপ্রিয় ঠিক সন্ন্যাসী নয়, তবে কিছু উদাসীন।

কাট্

স্বরপ্রিয় ধর্ম্মকর্ম্মানুরাগী।

কাট্

ক্লাবের উন্নতিতে স্বরপ্রিয় গভীর মনোযোগী।

ফেড্ আউট্

বাইশ বছর বয়সে স্বরপ্রিয় বিপত্নীক হয়েছিল, এখন তার ত্রিশ বছর বয়স। মা বাপ না থাকলেও মাসী-পিসীর দল বাড়িতে গজ্ গজ্ করছে। তাঁদেরই আগ্রহে তাকে আবার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে হ'ল।

স্বরপ্রিয়র দ্বিতীয়ার নাম নিভা অর্থাৎ নিভাননী অর্থাৎ ইন্দুনিভাননী। সুধা ও নিভার মধ্যে কোনও মিলই নাই। সুধা ছিল গরিবের মেয়ে, সংসারে তার তেমন আপনার কেউ ছিল না। নিভা বড়লোকের মেয়ে তার সবই আছে। সুধা ছিল ধীর স্থির সংযতবাক্, নিভার উচ্ছল কলহাস্যে জমিদার-বাড়ি মুখর। কি ভাল লাগে আর কি ভাল লাগে

না, সে কথা সুধা কোনদিন মুখ ফুটে বলে নি। নিভার পছন্দ অপছন্দ অত্যন্ত বেশিমাত্রায় স্পষ্ট। সুধার ছিল শ্যামবর্ণ, নিভা উজ্জ্বল সুবর্ণ-গৌরী। সুধার চোখ মুখ কান নাক ছিল প্রতিমার মতন সুন্দর, তাকে দেখলে কমলবাসিনী ব'লে ভ্রম হ'ত, নিভার মুখ দেখলে এ দেশের লোকের ভ্রম হবে, সে নিপ্পনবাসিনী, আর জাপানীদের মনে হবে, সে ভারতবাসিনী। সুধাকে দেখলে মনে হ'ত, পর্ব্বতসানুদেশে যেন সে ক্ষীণা পাহাড়ে নদী, অতি সন্তর্পণে ধরণীর বুকের ওপর দিয়ে ঝির-ঝির ক'রে ব'য়ে চলেছে। উষ্ণ বায়ু তাকে শোষণ করছে, ধরণী তাকে শোষণ করছে—কখন কোথায় তার অস্তিত্ব মুছে যাবে, তা সে জানে না, কিন্তু সে নিত্যই প্রস্তুত। নিভা যেন কূলপ্লাবিনী কীর্ত্তিনাশা, আপনার প্রাণশক্তিতে আত্মহারা।

ফুলশয্যার রাত্রে নিভা যখন কাছে এল, তখন সুরপ্রিয় তার সঙ্গে কথা কইতে পারলে না। তার মনে পড়তে লাগল, বছর দশেক আগে এই রকম ফুলের বিছানায় সুধা এসেছিল তার পাশে, তখন তার উনিশ বছর বয়স। জীবন ছিল একটা বিরাট রামধনুর ফ্রেমে আঁটা কল্পচিত্র। আজ তার ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, অভিজ্ঞতার অশ্রুধারায় রামধনুর অনেক রংই মলিন হয়েছে। হঠাৎ তার চিন্তাকে চমকে দিয়ে নিভা বললে, কি গো, আমার সঙ্গে কথা কইবে না? আমাকে বুঝি পছন্দ হয় নি? আবেগে সুরপ্রিয় তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললে।

কাট্

স্বর্গে সুরপ্রিয়র আসরে তুম্‌-দেওট চলেছে, নাচতে নাচতে উর্ব্বশী তালকানা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের অভিশাপ।*

নিভাননীর প্রাণশক্তি সুরপ্রিয়র মুমূর্ষু জীবনে অনুপ্রাণিত হতে লাগল। আবার তার মনে হতে লাগল, পিতা মাতা, এমন কি সুধা না থাকলেও এ জীবন মধুময়, নিভা যদি তার পাশে থাকে।

কাট্

---

* উর্ব্বশী স্বর্গের ইয়ে হ'লেও, তিনি আমার নমস্যা। মর্ত্তাবাসিনীদের প্রতি ঈর্ষাবশত তিনি মাঝে মাঝে ইচ্ছা ক'রে এইভাবে তালকানা হয়ে ইন্দ্রের শাপে মর্ত্ত্যের সুখভোগ ক'রে থাকেন। 'শাপে বর' এই বাক্যটি উৎপত্তির ইতিহাস এই। ইন্দ্রের আসর-ফেরতা একাধিক ব্যক্তির কাছে এ কথা শুনেছি।

তিন বছর কেটে গেল।

একদিন, ফাগুন মাসের শেষাশেষি। সুরপ্রিয় পুকুরে সাঁতার কাটছে আর নিভা ঘাটে দাঁড়িয়ে তার কেরামতি দেখছে। নিভা শহরের মেয়ে, জলে তার বড় ভয়। দুজনে গল্প চলেছে। সুরপ্রিয়র আগ্রহে নিভা সাঁতার শিখতে রাজি, সে গাছ-কোমর বেঁধে জলে নেমে পড়ল।

পুকুরের মধ্যে এক-কোমর জলেই নিভা খুব ঝাঁপাই ছুঁড়তে লাগল। ডুব-জলে যেতে সে কিছুতেই রাজি নয়, সুরপ্রিয় সঙ্গে রয়েছে, তবুও নয়। ডাঙায় সে হাজার বার স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে পারে, কিন্তু জলে বড় ভয় হয়। বাড়ির ভেতর থেকে ঘড়া এল। সুরপ্রিয় তাকে শেখালে ঘড়া উল্টে ধ'রে কেমন ক'রে ভেসে থাকা যায়—নিভার ভারী মজা লাগল। সে সারা পুকুর তোলপাড় করতে লাগল। সুরপ্রিয় বললে, এইবার চল ওঠা যাক, কিন্তু সে কথা কে শোনে! পুকুর-ঘাটে ঝি-চাকর এসে দাঁড়াল। বাড়ির ভেতর থেকে মাসী পিসী ছুটে এল, এ কি ঢলাঢলি! নিভার গ্রাহ্য নেই।

কাট্

সেদিন বিকেলে সুরপ্রিয় ক্লাবে ব'সে দাবা টিপ্‌ছে, এমন সময় বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে লোক এসে বললে, শিগ্‌গির আসুন।

কাট্

জমিদার-বাড়িতে হাঁকডাক, লোকলস্কর, হৈ-হৈ প'ড়ে গেছে। জমিদার-গিন্নী সাঁতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে গেছে।

পুকুরে লোক ডুবছে আর উঠছে পানকৌটির মত। জাল পড়ছে হুপাছপ—

ঘণ্টাখানেক পরে নিভার দেহ উঠল, সে ছিল অন্তঃসত্ত্বা।

কাট্

First Aid, Second Aid, Third Aid—নিভার নিশ্বাস নেই, দেহে স্পন্দন জাগল না।

ডাক্তার বললেন, লাশ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, Fourth Aid-এর জন্তে।

কাট্

ক্লোজ. আপ.

উপস্থিত নরনারীদের বিস্মিত মুখমণ্ডল, জমিদার-গিন্নীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে কি ?*

ফেড. আউট্

ফেড. ইন্

সুরপ্রিয় গুরুর সামনে গরুড়টি হয়ে বসেছে। সংসারে বীতরাগ। বন্ধুরা বলে, সুরোর পত্নীভাগ্য ভাল। তারা তাকে ভালও বাসে এবং সময়মত স'রেও পড়ে।†

তবুও সুরপ্রিয় ব্রহ্মবিদ্যাভিলাষী।

গুরু বললেন, বৎস, অন্নের সাধনা কর, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হবে।

সুরপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলে, প্রভু, পানীয়ের কি হবে ?

গুরু বললেন, পানীয়ের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ পানীয়, তা অন্নের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে, রিসার্চ ক'রে আবিষ্কার কর, মোক্ষলাভের উপায় হবে।

সুরপ্রিয় অন্নেরই সাধনায় মন দিলে। তার দিব্যদৃষ্টি ক্রমেই প্রসারিত হতে লাগল। অন্নেই এই ভূতজগৎ সৃষ্ট এবং অন্নেই তা পুষ্ট—এই জ্ঞানের বীজ বাল্য থেকেই তার মধ্যে নিহিত ছিল,‡ এখন সাধনবলে তা জাগ্রতচেতনায় আসতে লাগল। কিন্তু অন্নেই এ 'প্রবিষ্ট হচ্ছে এবং বিশেষরূপে প্রবিষ্ট হচ্ছে§—এই হেঁয়ালির অর্থ ভাল ক'রে বোধগম্য হচ্ছে না, এমন সময়ে একদিন হরি-পিসী আর মধু-মাসী কাঁদতে কাঁদতে এসে বললেন, হ্যাঁ বাবা সুরো, এমন ক'রেই নিজে ভেসে যাবি আর সংসারটাকে ভাসিয়ে দিবি ? আমরা এখনও মরি নি।

কাট্

ক্লোজ. আপ.

সুরপ্রিয় ত্রস্ত, চমকিত।

কাট্

---

* হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় নি, manage করা হয়েছিল।

† ভাগ্যবানের পত্নী মারা যায়—কিম্বদন্তী।

‡ সুরপ্রিয় জমিদার-সন্তান। গৃহ তার আজও অন্নদাসদাসীতে পরিপূর্ণ।

§ যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি—তৈঃ উঃ

আবার গুরুদেবের সামনে স্বরপ্রিয় গরুড়াসনে উপবিষ্ট। গুরু বললেন, বৎস, দ্বিধা ক'র না। দু-বার যখন ঝুলেছ, তখন তৃতীয়বারও ঝুলে পড়তে পার, মাভৈ।

স্বরপ্রিয় কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে বললে, কিন্তু প্রভু, সুধা ও নিভার প্রতি আমার প্রেম এখনও সমভাবেই আছে। এক্ষেত্রে—

গুরুদেব চমকে উঠে বললেন, কি বললে! সুধা ও নিভার প্রতি এখনও তোমার প্রেম আছে! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! কিন্তু তাঁরা তো এখন বিদেহী, তাঁদের দেহ তো নষ্ট হয়েছে, তাঁদের প্রতি প্রেমভাবাপন্ন হওয়া তো বাতুলতার নামান্তর মাত্র।

স্বরপ্রিয় আরও কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে বললে, আমার এই প্রেম দেহাতীত। তাদের আত্মার সঙ্গে আমার আত্মার মিলন ঘটেছে—

গুরুদেব উষ্ণ হয়ে বললেন, এসব ছেঁদো কথা, সাজানো কথা এবং ঘোরতর মিথ্যা কথা। একবার অন্তরের অন্তস্তলে অবগাহন ক'রে দেখ, তোমার জাগ্রতচেতনার মধ্যেই তাদের দেহের প্রতিই কামভাব তোমার অন্তরে এখনও বর্ত্তমান আছে। যে দেহ একদিন তুমি উপভোগ করেছ, যার চরিত্রের মাধুর্য্য একদিন তোমার মানসলোকে স্বর্গরচনা করেছিল, সেই সাহচর্য্যের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত তুমি বলছ, এখনও তাদের প্রতি তোমার প্রেম আছে এবং সেই প্রেম দেহাতীত। বৎস, তাঁদের দেহ ভস্মীভূত হয়েছে বটে, কিন্তু তোমার প্রেমটি তাঁদের দেহকেই ঘিরে আছে। কারণ দেহাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত প্রেম অসম্ভব। এইজন্যই যোগীরা কোনও আধারকেই মানসলোকে স্থান দেন না। কাম ও প্রেম শব্দ দুটির মধ্যে ধ্বনিগত পার্থক্য যতই থাকুক, দুটির অর্থ একই। সংস্কৃত-সাহিত্যিকরা একই অর্থে কথা দুটি ব্যবহার করেছেন। প্রেমের সঙ্গে, দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত—এই ভাবগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক আবিষ্কার। বৈষ্ণব-সাহিত্যিকরা প্রেম ও কাম কথা দুটিকে পৃথক পর্য্যায়ে ফেলে এই দেহাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত ভাবের আরোপ করেছেন। অবশ্য—

গুরুদেব একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন, অবশ্য তার বিশেষ কারণ ছিল।

সুরপ্রিয়র নাক দিয়ে তার অজ্ঞাতসারেই সাঁ ক'রে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস বেরিয়ে গেল।

গুরুদেব আবার আরম্ভ করলেন, সত্যিকারের দেহাতীত প্রেমের কল্পনা করতে পেরেছে ক্রীশ্চানেরা। যেমন ধর, "ঈশ্বর জগতের প্রতি এমত প্রেম করিলেন যে, মনুষ্যের কল্যাণের জন্য তাঁহার একমাত্র পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন।" অতি-আধুনিক যৌন রসায়নাগারে বিশ্লেষণ করলেও এই প্রেমের সঙ্গে দেহের কোন সম্পর্ক পাবে না।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ।

গুরুদেব আবার শুরু করলেন, আত্মার ফুটানি করছ! আত্মাকে চিনেছ? আগে আত্মাকে চেন—আত্মানাং বিদ্ধি। আত্মাকে উপলব্ধি কর, তখন বুঝতে পারবে, তার অন্য কোন কামনা নাই। আত্মার একমাত্র কামনা পরমাত্মার সঙ্গে মিলন।

সুরপ্রিয় বললে, প্রভু, আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, বৈষ্ণব-কবিরাও—

গুরুদেব হুঙ্কার দিলেন, হ্যাঁ, বৈষ্ণব-কবিরাও। বুঝতে পার না, চণ্ডীদাস বলেছেন, রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়। ভাল ক'রে কান পেতে শোন। কথাটা কি ওকালতির মতন শোনাচ্ছে না? অতি-আধুনিকভাবে যদি এই লাইনটিকে প্রকাশ করা যায়, তা হ'লে লিখতে হবে—বারো বছর ধ'রে ছিপ চাগিয়ে বগলে বিচি তুলে যে মাছটি ধরেছি—হে জগদ্বাসী, তোমরা বিশ্বাস কর তাতে আমিষের গন্ধমাত্র নেই।

সুরপ্রিয় বললে, চণ্ডীদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়ে রজকিনীর প্রতি কামাবিষ্ট হয়েছিলেন—এ কথা বিশ্বাস করতে মন চায় না প্রভু।

মন না চাইলেও বৈজ্ঞানিক সত্যে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। রজকিনী তো দূরের কথা, কালিদাস বলেছেন, কামার্ত্তা হি প্রকৃতকৃপণা-শ্চেতনাচেতনেষু—কাব্যের অবতারণায় এত বড় সত্যকথা খুব কম কবিই বলতে পেরেছেন। এই বাক্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ তোমাকে একটি কাহিনী শোনাই, মনে রেখো—ক্রীশ্চান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি এক ইংরেজ মহাপুরুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কুষ্ঠরোগীদের সেবায় আত্ম-উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর প্রশংসা-গানে সারা পৃথিবীর

লোক সে সময় গাইয়ে হয়ে উঠল। সাময়িক-পত্রাদিতে তাঁর ছবি বেরুতে লাগল রং-বেরঙের। একেবারে হৈহৈ ব্যাপার! তারপরে তাঁর আশ্রমে এলেন এক সুন্দরী তরুণী, মহাব্যাধিতে তার সর্ব্বাঙ্গ গলিত। তরুণীর প্রতি দয়া, সহানুভূতি, তৎপরে অনুরাগ এবং তজ্জনিত ঘনিষ্ঠতার ফলে মহানুভবও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়ে অচিরাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হলেন।* ভদ্রলোক কবিতা লিখতে জানতেন না, তাই তাঁর হয়ে ওকালতি করবার আর কিছুই রইল না, নিন্দায় সারা পৃথিবী ভ'রে উঠল।

—সাধারণ মানুষের কাছে প্রেম যতই দেহাতীত ব'লে প্রতীয়মান হোক না কেন, যোগীর পক্ষে নয়। মনে রেখো, যোগীর পক্ষে আত্ম-প্রবঞ্চনা মহাপাপ।

—বৎস সুরপ্রিয়, এই কাম অথবা প্রেমভাব পরমাত্মার দান, এর দ্বারা মনুষ্যসন্তান দেবতায় এবং দেবতা পশুতে পরিণত হয়। এর মধ্যে দিয়ে মানব-মনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। যদিও তোমার চিত্ত যোগীজনোচিত, তবুও তোমার মনে প্রেমভাব এখনও প্রবল মাত্রায় বর্ত্তমান। সুখের বিষয় যে, বিশেষ কোন আধারের প্রতি তা সীমাবদ্ধ নয়। তোমার আরও কিছু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। মনে রেখো, অভিজ্ঞতাই মোক্ষলাভের সোপান।† বিনা দ্বিধায় তুমি তৃতীয়াকে গৃহে নিয়ে এস।

মিস্লেস ইনটু

সুরপ্রিয় বরসজ্জায়।

মিস্লেস ইনটু

ফুলশয্যার রাত্রি, দশটা বাজে। লোকজন খাওয়ানো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না রাত্রি। সুরপ্রিয় জানলার ধারে দাঁড়িয়ে

---

* My Life and Loves—(4 vols. Frank Harris). এই বইখানি ইংরেজ রাজত্বে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ। ফরাসী রাজ্যে বসিয়া পঠিত।

† এই theory আধুনিক আবিষ্কার। ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে পঞ্চতন্ত্র অবধি কোন শাস্ত্রেই মোক্ষলাভের এই সরল পন্থার উল্লেখ নাই।

বাইরের বাগানের দিকে চেয়ে আছে। অদূরে ফুলশয্যা, ঘরের মধ্যে তীব্র ফুলের গন্ধে দু-চারটে মাছি উড়ছে।*

পরশু রাতে সে চতুর্থবার† পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে, রাধারাণীর সঙ্গে। রাধারাণী সুন্দরী, সুধা ও নিভা দুজনের সৌন্দর্য্যই যেন তার অঙ্গে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তাকে দেখেই সুরপ্রিয়র মনে হয়েছিল, গুরুদেব ঠিকই বলেছেন, আরও কিছু অভিজ্ঞতা তার জীবনে প্রয়োজন।

সুধা, নিভা ও রাধারাণীর চিন্তায় সুরপ্রিয় বিভোর, এমন সময় রাধারাণী ঘরের মধ্যে এল। তাকে দেখে সুরপ্রিয়র মনে হ'ল, রঙ্গমঞ্চে যেন মন্দোদরী প্রবেশ করলেন। রাধারাণী একবার চারিদিকে চেয়ে সোজা খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বিয়ের দিন থেকে এখনও পর্য্যন্ত রাধারাণীর সঙ্গে তার একটিও বাক্য-বিনিময় হয় নি। সে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, রাধারাণী চিত হয়ে শুয়ে আছে, তার একখানা নিটোল গৌর হাত চোখ দুটোর ওপরে চাপা। দূর থেকে সে সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে সুরপ্রিয়র মনে হতে লাগল, গুরুদেব ঠিকই বলেছেন, আরও কিছু অভিজ্ঞতা তার বাকি আছে। অভিজ্ঞতাই মোক্ষলাভের সোপান।

"জয় গুরু" ব'লে সে খাটের ওপর গিয়ে রাধারাণীর পাশে শুয়ে পড়ল। প্রথমটা তার সঙ্কোচ হতে লাগল। ইতিপূর্ব্বে দু-দুবার তার ফুলশয্যা হয়ে গেছে। রাধারাণীর অগ্রবর্ত্তিনীদের প্রতি কথা, প্রত্যেকটি ভঙ্গি, তাদের চোখের চাহনি মূর্ত্তিমতী হয়ে তার মনের সামনে ভাসতে লাগল। নববধূ তাকে কি মনে করছে! তার সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করতে তার লজ্জা করতে লাগল—কি ভাবে কথা আরম্ভ করা যায়!

হঠাৎ দেওয়ালের ঘড়িটা তাকে ধমকে দিয়ে এগারোটা বেজে

---

* এক দলের মাছি আছে যারা ব্রণও ইচ্ছন্তি মধুও ইচ্ছন্তি—এরা সেই দলের।

† যে ব্যক্তির বার বার স্ত্রী মারা যায়, তৃতীয়বার বিবাহ করবার আগে তার সঙ্গে কোন ক্ষীণপ্রাণ গাছের চারার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তৃতীয় পক্ষ কাটিয়ে দেওয়া হয়; সাধারণের বিশ্বাস যে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী মারা যায় না। ঐ বিশ্বাসের মূলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কি না, সে সম্বন্ধে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলেছে।

গেল। সুরপ্রিয় প্রায় মরিয়া হয়ে ব'লে ফেললে, কি গো, কথা বলবে না ?

রাধারাণী যেন এই কথাটা শোনবার জন্তেই অপেক্ষা করছিল। সে বললে, কি কথা বলব! যে গোম্‌ড়া মুখ ক'রে রয়েছ, যেন আমিই তেজপক্ষে বিয়ে করেছি।

রাধার কথাগুলি কিছু স্পষ্ট।

ফেড আউট্

ফেড্ ইন্

মাসী পিসী সব কাশী চললেন।

কাট্

সুধা ও নিভার ছবি দুখানা শোবার ঘর থেকে বাইরের বৈঠকখানায় আশ্রয় নিলে।

কাট্

সুরপ্রিয়র জীবনে মোক্ষলাভের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে লাগল। তাকে তামাক খাওয়া ছাড়তে হ'ল। তামাক খেলে মুখে গন্ধ হয়, মুখে গন্ধ হ'লে বাইরের ঘরে সুধা ও নিভার ছবি দেখতে দেখতে রাত কাটাতে হয়, কিন্তু তাতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যত্যয় ঘটে। এতদিনে সুরপ্রিয় কিছু কিছু বুঝতে পারছে, দেহাতীত প্রেম জিনিসটা কিছু নয়।

কাট্

সুরপ্রিয়র আচারে-ব্যবহারে, চলনে-বলনে যে এত দোষ আছে, তা সে কখনও লক্ষ্যই করে নি। জমিদারের একমাত্র সন্তান সে, সবার কাছে আবদারই পেয়ে এসেছে। সুধা ও নিভা ছিল প্রেমেই মশগুল, তার দোষের দিকে তাদের নজরই পড়ে নি, কাজেই তা সংশোধন করবার প্রয়োজন হয় নি। রাধারাণীর শাসনে আত্মত্রুটির দিকে তার চোখ পড়ল। অতি আদরে পোষিত ও লালিত অভ্যাসগুলি একে একে তার চরিত্র থেকে খ'সে পড়তে লাগল, তবু রাধারাণীর নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভাজ্যোতিতে প্রতিদিনই তার কোন না কোন দোষ ধরা পড়তে লাগল।

কাট্

স্বরপ্রিয়র জীবনে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন আসতে লাগল। আগে সামান্য কথা-কাটাকাটি হ'লেই রাধারাণী তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিত, বারান্দায় ব'সে সে রাত্রি কাটিয়ে দিত। এখন সে বাইরের ঘরেই শোয়। সুধা ও নিভার ছবি ঝুলে আছন্ন—সেদিকে চোখ পড়লেও তার মনে কোন ভাবই আসে না। সুধা, নিভা, রাধারাণী ও সদু মেথরানীর মধ্যে কোনও প্রভেদই সে বুঝতে পারে না। গুরুদেব বলেন, তোমার চেতনাকে আরও বিস্তার কর।

কাট্

আশ্বিন মাসের একদিন। শরতের সোনালী আলোয় সকালটা ঝলমল করছে। রাধারাণীর তীব্র চীৎকারে এইমাত্র স্বরপ্রিয়র ঘুম ভেঙেছে, দেরি ক'রে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আজও তার যায় নি। রাধারাণীর গালাগালিতে আগে তার মনে দুঃখ হ'ত, সুধা ও নিভার কথা মনে প'ড়ে চোখ জলে ভ'রে উঠত, আজ তার মনে কোন বিকারই নেই। নিন্দা, প্রশংসা, গালাগালি প্রায় সমান হয়ে এসেছে। রাধারাণীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করার অভিজ্ঞতাও প্রায় শেষ হয়েছে।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে স্বরপ্রিয় বাগানে এসে দাঁড়াল। স্বরপ্রিয়র বাবা শৌখিন লোক ছিলেন। দীর্ঘ লাল-কাঁকর-ফেলা বীথিকা—একদিকে কামিনী আর একদিকে কাঞ্চনের সারি। কামিনীর সৌন্দর্য্যের প্রতি তার আর কোন আকর্ষণই নেই, কাঞ্চনের প্রতিও আজ সে তেমনই উদাসীন। উদাসীনের মতন সে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে, তার মনের বাসনাগুলি বাগানে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে গুচ্ছে গুচ্ছে। শরতের সোনালী রোদে সেগুলো জলজল করছে। সেগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। এ কি আনন্দের প্রবাহ নিয়ে এল আজ শরতের সকাল! এই আনন্দই কি—

—পোড়ারমুখোকে এইবার যমে ধরেছে, মরেও না, ছাড়েও না—

স্বরপ্রিয়র হাসি থেমে গেল। হঠাৎ এই প্রেম-ভাষণে বিগলিত-চিত্ত হয়ে ঘাড় ফেরাতেই সে দেখতে পেলে, বৃন্দা ঝি সলজ্জবদনে ঝাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে আছে, অদূরেই রাধারাণী।

বৃন্দার চোখে চোখ পড়তেই সে বললে, আজ দুপুরবেলা কয়েকজনকে খেতে বলা হয়েছে, কিন্তু বাজারে মাছ পাওয়া গেল না। মা বলছেন, একবার ছিপ নিয়ে বসতে।

—কাকে খেতে বলা হয়েছে ?

—বাঁটুলবাবু, সিধুবাবু, মধুবাবু, আরও জানি কে কে খাবে।

স্বরপ্রিয় বিনা চারেই ছিপ ফেললে। এই পুকুরেই দশ বছর আগে নিভা ডুবেছিল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় রাধারাণীর অন্তর্দ্ধান।

ফেড্ আউট্

ফেড্ ইন্

সকাল হতেই জমিদার বাড়িতে লোকারণ্য। রাধারাণী পালিয়েছে, সে কথা সকলেই জানে। বৃদ্ধারা বললেন, পালিয়ে কেলেঙ্কারি বাড়াবার কি দরকার ছিল, ঘরে ব'সেই তো সব চলছিল।

বৃদ্ধরা বললেন, প্রথম থেকেই যদি হাত চালাতে স্বরো, তা হ'লে আজ এ কেলেঙ্কারিটা হ'ত না। তোমরা লেখাপড়া শিখে সায়েব হয়েছ, পুরোনো রীতির প্রতি তো তোমাদের শ্রদ্ধা নেই।

যুবতীরা কিছু বললে না।

স্বরপ্রিয়র প্রতি সকলেই সহানুভূতিসম্পন্ন, বিশেষ ক'রে যুবকেরা। তারা বললে, খুড়ো, তুমি একবার হুকুম দাও, বাঁটুল কতবড় বাপের ব্যাটা একবার দেখে নিই।

সিধু আর মধুর বুকে যেন আঘাতটা লেগেছে বেশি। সিধুর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল।

মধু বললে, খুড়ো, তুমি হুকুম দাও আর না দাও, বাঁটুলে শালাকে আমি খুন করবই।

সিধু আর মধুকে কিছুতে ঠেকিয়ে রাখা যায় না! স্বরপ্রিয় আর এক বিপদে পড়ল।

সিধু বললে, বাঁটুলের মত বিশ্বাসঘাতককে বাঁচতে দিলে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হবেন, আরও অনেক পরিবারের সর্ব্বনাশ করতে পারে সে।

মধু বললে, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতিকাকেও—

বিশ্বাসঘাতিকাকে শেষ করা নিয়ে সিধুতে আর মধুতে হাতাহাতি হয় আর কি! অনেক কষ্টে বিবাদ থামিয়ে স্বরপ্রিয় সেদিনকার মত তাদের বিদায় করলে।

ওয়াইপ্‌

গুরুদেবের ঘর। রাধারাণীর গৃহত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা চলেছে গুরু-শিষ্যে। গুরু বললেন, রাধারাণী হচ্ছেন সেই জাতীয়া স্ত্রীলোক, পুরুষ যাঁদের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়, অথচ কোনও পুরুষের সঙ্গেই তাঁরা একত্রে বাস করতে পারেন না।

স্বরপ্রিয় বললে, গুরুদেব, স্ত্রী গৃহত্যাগ করায় আমার মনে কোন বিকারই হয় নি, তিনি থাকলেও আমার কোন ক্ষোভ ছিল না, কিন্তু পড়শীদের সহানুভূতির ঠেলায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি, বিশেষ ক'রে মধু ও সিধুর।

—তারা কারা?

—আজ্ঞে, গ্রামেরই যুবক তারা। রাধারাণীর অন্তর্দ্ধানে তারা সত্যিই অত্যন্ত আঘাত পেয়েছে, অথচ এতকাল আমার সম্বন্ধে তারা নিরপেক্ষই ছিল।

—কি বলে তারা?

—তারা বাঁটুলকে হত্যা করতে চায় প্রভু। মধু তো রাধারাণীকেও হত্যা করতে চায়। উভয়ের উদ্দেশ্য প্রায় এক হ'লেও তাদের নিজেদের মধ্যে বিশেষ মিল আছে ব'লে বোধ হয় না। ব্যাপারটা আমাকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করেছে।

গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন, বিচলিত হ'য়ো না, কোন কিছুতে বিচলিত হ'লেই যোগভ্রষ্ট হবে। সংসারে এ ঘটনা নিত্যই ঘটছে। কাব্যে অসঙ্গতি-অলঙ্কারের মতন মানব-জীবনের মধ্যেও এমন বহু অসঙ্গতি দেখতে পাবে। এগুলি সাংসারিক অলঙ্কার হিসাবে ধ'রে নিও। গভীরভাবে চিন্তা করলে এর মধ্যেও সঙ্গতি দেখতে পাবে। এ সম্বন্ধে একটি চলিত কথা আছে। শোন বলি—

জস্‌সেঅ বণো তস্‌সেঅ বেঅণা ভণই তং জণো অলীঅং।
দন্তক্‌খঅং কবোলে বহুএ বেঅণা সবত্তীণং ॥ *

এর মর্ম্মার্থ হচ্ছে—যেখানেই ব্রণ সেখানেই বেদনা, বৃথাই লোকে এ কথা ব'লে থাকে। যেমন নবপরিণীতা বধূর কপোলে দংশনক্ষত হ'লে বেদনা বাজে তার সতীনের বুকে। শ্লোকটি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হ'লেও এর অর্থটি অতিপ্রাকৃত। সতীনের বুকের বেদনার কারণটি যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন, বেদনাটি অবহেলনীয় নয়। অতএব হে বৎস সুরপ্রিয়, মধু ও সিধুর বুকে যে বেদনা বেজেছে, তা অতি প্রচণ্ড। অবিলম্বে তাদের শান্ত করবার ব্যবস্থা কর, বৃথা জগতে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে কোন লাভ নেই।

ফেড্‌ আউট্‌

ফেড্‌ ইন্‌

রাধারাণী ও বাঁটুল সপ্তাহখানেক হ'ল কলকাতায় এসেছে। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে একখানি ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করা হয়েছে। কিছু আসবাব-পত্রও কেনা হয়েছে। দুদিন আসবও পান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কালীঘাটে পুজো দেওয়া, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও পরেশনাথের মন্দির দেখা শেষ হয়েছে।

কাট্‌

মাসখানেক কেটে গেছে। সিনেমার লোকেরা আসা-যাওয়া করছে। রাধারাণীর ভুরু চাঁছা হয়েছে, ঠোঁটে লালিকা লেগেছে। টাকা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু গয়নাগুলো এখনো ইন্‌ট্যাক্ট্‌। বাঁটুলের সঙ্গে ইতিমধ্যে রাধারাণীর বার তিনেক বেশ বচসা হয়ে গেছে।

কাট্‌

আরও তিন মাস কেটেছে। রাধারাণী বলতে আরম্ভ করেছে, পোড়ারমুখো, এমন যদি ইচ্ছে ছিল তো আমার এ সর্ব্বনাশ করলি কেন? দিনরাত বাড়িতে ব'সে থাকলে কি চাকরি জুটবে? ব'সে ব'সে আর কতদিন পিণ্ডি গিলবে?

---

* কাব্যপ্রকাশ—মম্মটভট্ট।

বাঁটুল দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে চাকরির সন্ধানে বেরোয়, সেই সময় সিনেমার লোক আসে রাধারাণীর সঙ্গে দেখা করতে। রাধারাণী ভাবে, দূর থেকে এদের নামে কত বদনামই না শোনা যায়, অথচ এরা কি ভীষণ ভদ্রলোক! কাছে না এলে লোক চেনা যায় না।

বাঁটুল সারাদিন চাকরির সন্ধানে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে লেকে গিয়ে বসে—এ জায়গাটা তার বেশ লেগেছে।

একদিন দুপুরবেলায় বাঁটুল চাকরির সন্ধানে বেরুচ্ছে, এমন সময় ডাক-পিয়ন এসে হাঁক দিলে—নন্দলাল নন্দী।

—আমার নাম।

মনি-অর্ডার আছে, দুশো টাকা। পাঠাচ্ছেন ইন্দ্র শর্ম্মা।

চিন্‌তে না পারলেও বাঁটুল নাম সই ক'রে টাকাগুলো গুনে নিলে,—পিয়ন চ'লে গেল। টাকাগুলো ট্যাঁকস্থ করতে করতে বাঁটুল ভাবছিল, এই বেলা স'রে পড়ি, এমন সময় রাধারাণীর আবির্ভাব। সে ভেতর থেকে সব দেখেছে ও শুনেছে।

বাঁটুল বললে, এক জমিদার বন্ধুকে সে চিঠি লিখেছিল, সেই পাঠিয়েছে টাকা। রাধারাণী হেসে টাকাগুলো গুনে নিয়ে বাক্সের মধ্যে পুরে ফেললে।

অর্থের ভাবনা আর রইল না। প্রতি মাসের পনরো তারিখে দুশো টাকা আসতে লাগল বাঁটুলের অজ্ঞাত জমিদার বন্ধুর কাছ থেকে।

কাট্

দার্জিলিংয়ের ম্যাল। স্ল্যাক্‌স-পরিহিতা ভ্রূ-চাঁছা রাধারাণী উঁচু হিলের জুতো প'রে দু-পাশের লোককে সচকিত ক'রে নজগজ করতে করতে পায়চারি করছে। পাশে বাঁটুল।

কাট্

তাজমহলের চত্বরে বাঁটুল ও রাধারাণী।

কাট্

কুতবের চূড়ায়।

কাট্

কলকাতার ফ্ল্যাটে। বাঁটুল গোম্‌ড়ামুখে এক কোণে ব'সে আছে।

তার বাঁ চোখের নীচে কালো দাগ। গত রাত্রের প্রেমদ্বন্দ্বের চিহ্ন। রাধারাণী ঘরে নেই। সিনেমার লোকদের সঙ্গে ফোটো তোলাতে গেছে, সেখান থেকে মার্কেট ঘুরে বাড়ি ফিরবে।

কাট্

বাঁটুলের অন্তর্দ্ধান। কিন্তু কুছ্ পরোয়া নেই। রাধারাণীর শিগ্‌গিরই সিনেমা কোম্পানিতে চাকরি হবে। এখন থেকেই তালিম চলেছে। সকালে একজন আসে—এগারোটায় যায়, বেলা একটায় আর একজন আসে—সে পাঁচটায় যায়, রীতিমত তালিম চলেছে। নতুন কোম্পানি খোলা হবে, সে হবে হিরোইন।

রাত্রে একা থাকতে রাধারাণীর ভয় করে। কোম্পানির একজন সহকারী কথা দিয়েছে, আসছে মাস থেকে রাত্রে সে তাকে আগলাবে। তরুণ সে, তার আশা আছে দিন পনরোর মধ্যেই তার পত্নীর ডানা গজাবে।

ফেড আউট্

সুরপ্রিয় নির্জ্জন ঘরে ব'সে আছে। তার চিত্ত একেবারে শান্ত। কোথাও কোন মালিন্য বা উদ্বেগ নেই। মধু ও সিধু শান্ত হয়েছে। তারা সুরপ্রিয়র পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে, বাঁটুল বা রাধারাণীকে কিছু বলবে না। সিধু ঠাণ্ডা হয়ে এবার সামাজিক কাজে মন দিয়েছে। বিশ্বনাথ কর্ম্মকার, বয়স তার ষাট পেরিয়ে গিয়েছে। ঘড়ির কাজ ক'রে ক'রে চোখ দুটি প্রায় অন্ধ। কলকাতায় কোন বড় ঘড়ির দোকানে কাজ করে, অনেক দিনের লোক ব'লে তারা জবাব দেয় নি। কাজকর্ম্ম করতে হয় না বটে, তবে নিত্য হাজিরা দিতে হয়। উপরি-উপরি তিনটি স্ত্রী গত হওয়ায় বিশ্বনাথ সংসার-রক্ষার জন্য চতুর্থ পক্ষ করেছে, সিধু আজকাল সারাদিন তাকেই আগলায়।

মধু আজকাল কলকাতায় চাকরি পেয়েছে। বড্ড কাজের চাপ, তাই রাত্রি বারোটার ট্রেনে বাড়ি ফেরে। স্টেশনের কর্ম্মচারী যারা সে সময় স্টেশনে থাকে, তাদের মধ্যে দু-একজনের মুখে শোনা যায়, মধু আজকাল এক রকম নতুন ধাঁজে চলে, কি রকম হেলে-দুলে।

কাট্

কিছুদিন থেকে সুরপ্রিয় কিছু চিন্তিত। পাঁচ মাস উপরি-উপরি তার মনি-অর্ডার ফেরত আসছে। ডাকঘর-ওয়ালারা খবর দিয়েছে, নন্দলাল নন্দী সেখানে নেই। রাধারাণী দেবীর নামে টাকা পাঠাবে কি না ভাবছে, এমন সময় একদিন সিধু এসে সংবাদ দিলে, খুড়ো, বাঁটুল ফিরে এসেছে যে !

কাট্

সুরপ্রিয় বাঁটুলকে ধরবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু কিছুতেই তাকে ধরতে পারছে না। রোজই শোনে, সে কলকাতায় গেছে। এর মধ্যে একদিন সে শুনতে পেলে, ইতিমধ্যে তার বিয়েও হয়ে গেছে। কোথায় নাকি একটা ভাল চাকরিও যোগাড় হয়েছে, বাঁটুল বি. এস-সি. পাস।

কাট্

বাঁটুল ফিরে আসার পর প্রায় বছর-খানেক কেটে গেছে। কার্ত্তিক মাসের শেষাশেষি, অনেকের কাঁধেই র‍্যাপার চড়েছে, এমনই একটা সময়ে একদিন সুরপ্রিয় দূর গ্রাম থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। দু-পাশে দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত, কেউ কোথাও নেই, একলা সে মন্থরগতিতে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে, সন্ধ্যোনাগাদ বাড়ি পৌঁছবে—এই আন্দাজে। চলতে চলতে একটা চৌমাথায় হঠাৎ বাঁটুলের সঙ্গে দেখা, একেবারে চারি চক্ষুর মিলন। বাঁটুল একবার মুখ ফিরিয়ে স'রে পড়বার উদ্যোগ ক'রেই আবার ঘুরে একেবারে সুরপ্রিয়র পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, কি খুড়ো, ভাল আছ ?

—ভাল আছি। তুমি কেমন আছ ?

—আছি একরকম।

—বিয়ে করেছ শুনলুম।

মাথা নেড়ে বাঁটুল জানালে, কথাটি সত্য। কিন্তু তখুনি সে মুখ ফুটে বললে, সবাই জেদাজেদি করতে লাগল।

একটু চুপ ক'রে থেকে বাঁটুল আবার বললে, আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না।

তারপর কিছুক্ষণ কারুর মুখে কোন কথা নেই। নীড়-প্রত্যাগত

পাখিদের কলধ্বনি, শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে লাগল। সুরপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলে, রাধারাণী কোথায়?

—কাশীতে বেড়াতে গেছে।

—কতদিন তাকে দেখ নি?

—বছরখানেক হবে। সেই চ'লে এসেছি, তারপরে আর তো যাই নি। তবে বরাবর তার খোঁজ রেখেছি।

—আমি যে টাকা পাঠাতুম, তা ঠিক পেতে?

বাঁটুল নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর সুরপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলে, কতদিন একসঙ্গে ছিলে?

—প্রায় ছ মাস হবে।

—চ'লে এলে কেন? টাকার অভাব তো তোমার ছিল না। আর ভাল লাগল না বুঝি?

—থাকতে পারলুম না খুড়ো। সে অত্যেচার জানোয়ারেও সহ্য করতে পারে না।

সুরপ্রিয় দেখলে, বাঁটুলের চোখ জলে ভ'রে উঠেছে। কি একটা রূঢ় কথা বলতে গিয়ে সে থেমে গেল। আবার চুপচাপ, কেউ কারও মুখের দিকে তাকাতে পারে না। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটবার পর সুরপ্রিয় বললে, তাই তো হে, ঐ স্ত্রীলোককে নিয়ে আমি ছ-বছর ঘর করেছি, আর তুমি ছ-মাস ঘর করতে পারলে না?

বাঁটুল চট ক'রে সুরপ্রিয়র পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বললে, খুড়ো, তুমি দেবতা, তোমার সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না।

সুরপ্রিয় পকেট থেকে কাগজ বার ক'রে বাঁটুলের কাছ থেকে পেন্সিল চেয়ে নিয়ে রাধারাণীর ঠিকানাটা লিখে নিলে।

শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।

ফেড্ আউট্

ফেড ইন্

সুরপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলে, নায়েব মশায়, একবার দেখুন তো কাশী যাবার ট্রেন কখন আছে?

নায়েব মনে করলে, কর্ত্তা বোধ হয় এবার কাশীবাসী হবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কাশী যাবেন? কবে?

—কাল।

বিকেল হতে না হতে পাড়াময় র'টে গেল, স্বরপ্রিয় সংসার ত্যাগ ক'রে কাশীবাসী হবে।

প্রাচীনরা বললেন, কাশীবাসী হবে কি হে? দেশে ব'সে কি আর ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না?

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে, কাশী চললে কেন হে?

—বিশেষ প্রয়োজন আছে।

—আবার কি—

—ঠিক ধরেছ।

—বল কি হে! এই বয়সে আবার?

—বয়স আর এমন কি হয়েছে! এখনও তো পঁয়তাল্লিশ পেরোয় নি।

—কোন পক্ষ হ'ল?

—এটি পঞ্চম পক্ষ।

—কবে ফিরবে?

—দিন সাতেকের মধ্যে।

—মানে! ফুলশয্যা হবে না?

—সেখানেই হবে। এ বাড়িতে ফুলশয্যা সহ্য হয় না।

কাট্

ভোরের ট্রেনে স্বরপ্রিয় কাশী যাত্রা করলে।

ফেড্ আউট্

সাতদিন ধ'রে সদরে-অন্দরে স্বরপ্রিয়র বিয়ে নিয়ে আন্দোলন চলল।

যুবকেরা বললে, এ অত্যন্ত অনুচিত।

বৃদ্ধরা বললেন, সুরো ঠিক করেছে।

তরুণীরা হাসলে। সে হাসির অর্থ তারাই জানে।

বৃদ্ধারা বিড়বিড় ক'রে কি বললে, তা শোনাও গেল না, বোঝাও গেল না।

আটদিন পরে সারা পল্লীকে সচকিত ক'রে জমিদার-বাড়ির সামনে একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল সুরপ্রিয়, তারপরে হরি-পিসী, তার পেছনে নববধূ। বৃন্দা ঝি তাদের অভ্যর্থনা করলে।

চারিদিক থেকে বুড়ো-বুড়ী তরুণ-তরুণী ছুটল জমিদার-বাড়িতে। উনুনে ভাত, তরকারি, ডাল, মাছের ঝোল বেপরোয়াভাবে পুড়তে থাকল।

শঙ্খরব-উলুধ্বনিতে শান্ত জমিদার-বাড়ি ফেটে পড়তে লাগল। বৃদ্ধারা নববধূর ঘোমটা উন্মোচন ক'রে দেখলে, এ যে হুবহু সুরোর চতুর্থ পক্ষ গো !!!

নববধূর মুখে হাসি, মোনা লিজার রহস্যময়ী হাসি।

অন্ধ কৃষ্ণচন্দ্রের গান শোনা যেতে লাগল—

ছি ছি কি ছার দারুণ মানের লাগিয়ে বঁধুরে হারায়েছিনু—

ফেড আউট্

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

সরোজিনী

২

পরদিন—রবিবার, বেলা আটটা। মুখ হাত ধুইয়া চা খাইয়া একটু স্কুলের কাজ করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে গ্রামের চৌকিদার গোষ্ঠ ডোম আসিয়া ডাক দিল, ম্যাষ্টর বাবু রইছেন গো? হাঁক দিয়া কহিলাম, কে? গোষ্ঠ? কি খবর রে? গোষ্ঠ কহিল, তেমন কিছু লয় বাবু। কর্ত্তাবাবু আপনাকে একবার ডাকছেন, এখনই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন রে?

জানি না বাবু, আপুনি এখনই এস একবার।

জামা জুতা চাপাইয়া বাহির হইলাম। গাঙুলী মশায়ের বাড়ি আসিয়া দেখিলাম, বৈঠকখানা খালি। বাড়ির ভিতরে ঢুকিতেই দেখিতে পাইলাম, দিদিমা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া তরকারি কুটিতে-ছেন। বদন প্রসন্ন। পদশব্দে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিলেন এবং পরক্ষণেই আবার মুখ নামাইয়া তরকারি কুটিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায়?

দিদিমা মুখ তুলিয়া ভ্রূর ইঙ্গিতে জানাইলেন, শোবার ঘরে।

ডাক শোনা গেল, এখানে এস হে।

বার্দ্ধক্য-জীর্ণ শ্লথ কণ্ঠের স্বর। দাদামশায়ের অসুখ করিয়াছে নাকি!

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু একি! দাদামশায়ের শয়ন-কক্ষে, দাদামশায়ের শয্যায়, দিদিমার চিত্তে হর্ষ ও বদনে হাস্য বিকশিত করিয়া কে আসিয়া জুটিয়াছে? বিগলিতদন্ত বিকৃত মুখ, গাল দুইটাতে এক ইঞ্চি করিয়া গভীর গর্ত্ত, চিবুকটা চ্যাপ্টা হইয়া গিয়া নীচের ঠোঁট-টাকে সামনের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। দিদিমা শক্ত-পোক্ত দাদামশায়কে বর্জ্জন করিয়া শেষে এই বাহাত্তুরে বৃদ্ধের হাতে আকৈশোর সযত্নে রক্ষিত সতীত্ব-রত্নটিকে তুলিয়া দিলেন?

বৃদ্ধ ফোকলা মুখে হাসিয়া জড়িত স্বরে কহিলেন, ভায়া, চিনতে পারছ না? আমি—

কাছে আসিয়া সবিস্ময়ে কহিলাম, দাদামশায়! আপনি!

দাদামশায় ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইলেন।

প্রশ্ন করিলাম, অসুখ হয়েছে? কখন থেকে হ'ল? কি অসুখ?

দাদামশায় ডান হাতটি মুখের উপর বাম কর্ণ হইতে দক্ষিণ কর্ণ পর্য্যন্ত বুলাইয়া দিলেন।

কহিলাম, মুখের অসুখ? দাদামশায় ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, না। তারপর আলগা ঠোঁট দুইটাকে ফাঁক করিয়া মাড়ি দুইটা দেখাইতেই দেখিলাম, সমস্ত মাড়িতে একটিও দাঁত নাই।

হঠাৎ দাদামশায়ের বাঁধানো দাঁতের কথা মনে পড়িল, কহিলাম, দাঁত কই?

দাদামশায় কহিলেন, ঐ মাগীকে জিজ্ঞাসা করগে, ওই জানে। কাল রাত্রে খুলে রেখে শুয়েছিলাম, রোজই তাই করি, সকালে উঠে দেখি, নেই। মাগী বলছে, ইঁদুরে নিয়ে গেছে; আমি বিশ্বাস করি না। ওরই কাজ। ওই লুকিয়ে রেখেছে, আমি যাতে প্রবোধের বাড়ি না যেতে পারি এইজন্যে।

আমি দিদিমার পক্ষাবলম্বন করিয়া কহিলাম, তা কি হয়! দিদিমা কখনও এ কাজ করতে পারেন না।

ঠিক ওর কাজ! কোন দিন ইঁদুরে নিলে না, আর কালই হঠাৎ নিয়ে গেল? ওর কাজ, তুমি দেখে নিও।

আপনি চেয়েছিলেন?

কথাবার্ত্তা না কইলে চাইব কি ক'রে?

কাল কথাবার্ত্তা কন নি?

দাদামশায় ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হ্যাঁ কয়েছে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে, আর ঠেস দিয়ে দিয়ে, যেমন—'রাত অনেক হয়েছে, বাইরে আর কার পিত্তিক্ষেয় থাকা,' 'খেতে দেওয়া হয়েছে', 'এবার শুলেই ভাল হয়', 'বুড়ো বয়সে রাত জেগে অসুখ হ'লে কোনও মুখপুড়ী ঠ্যালা সামলাতে আসবে না', এমনই আর কি! সারা রাত্রি মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়েছে।

রাগ তা হ'লে যায় নি এখনও। আচ্ছা, আমি একবার ব'লে দেখি।

দিদিমা আড়ি পাতিতেছিলেন। চোখোচোখি হইবামাত্র হাত নাড়িয়া কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া কহিলেন, কি বলছিল বুড়ো?

সবই তো স্বকর্ণে শুনেছেন।

শুনেছি তো; কিন্তু অমন তবল তবল ক'রে কথা বললে কি বোঝা যায়?

আপনিই তো বুড়ো ক'রে দিয়েছেন।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তির সহিত দিদিমা কহিলেন, তার মানে?

মানে—দাঁতগুলি লুকিয়ে রেখেছেন। এখন দয়া ক'রে বার ক'রে দিয়ে দাদামশায়ের বার্দ্ধক্য দূর করুন।

দিদিমা রুষ্ট স্বরে কহিলেন, ঐ সব বাজে কথা শুনলে রাগ ধরে। আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ঐ এঁটো দাঁতগুলো নিয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে লুকিয়ে রাখব! কিছু জানি না আমি। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, যা ইঁদুর ঘরে! কতদিন বলেছি, একটা জাঁতি-কল এনে দাও। দেয় নি। ইঁদুরই নিয়ে কোন গর্ত্তে ঢুকিয়েছে।

তা হ'লে তো মুশকিল!

কিসের মুশকিল?

মানে, বাইরে যেতে পারছেন না।

শ্রীরাধার কুঞ্জে যেতে পারছেন না!

মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, তা, তার জন্যে ভাবনা নেই, শ্রীরাধাকে খবর দিয়েছি, এখনই এসে হাজির হ'ল ব'লে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তার মানে?

সকাল থেকে কোঁত পাড়ছে শুনলাম, বুকটা বোধ হয় ভারী টনটন করছে। তাই শ্রীরাধাকে খবর দিয়ে পাঠালাম, নাগরের ভারী অসুখ, এখনই একবার দেখা দিয়ে—নাকী বক্তৃতার সুরে,—তাপিত প্রাণ শীতল ক'রে যাক।

মাস দেড় আগে গাজনের সময় দুই দিন কৃষ্ণ-যাত্রা হইয়াছিল

একদিন 'মান' ও আর একদিন 'মাথুর', দিদিমা বোধ হয় বিরহী কৃষ্ণ অথবা বিরহিণী রাধিকা, যাহারই হউক বক্তৃতার নকল করিলেন।

চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দিদিমা কহিলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও বলগে, আর ধড়ফড় করতে হবে না, প্রাণেশ্বরী এসে হাজির হ'ল ব'লে। আর তুমিও একটু এর মধ্যেই ঠিকঠাক হয়ে নাও, কপালে থাকলে তোমার ওপরও নেকনজর প'ড়ে যেতে পারে।

দিদিমাকে আর না ঘাঁটাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। দাদামশায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল?

বললেন, জানি না, ইঁদুরে নিয়েছে বোধ হয়।

দাদামশায় এপাশ ওপাশ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, ওরই কর্ম্ম। রাধানাথ ছুঁড়ীটার সর্ব্বনাশ না করা পর্য্যন্ত ফিরে দেবে না। মেয়েটার অদৃষ্ট। আমি আর কি করব?—বলিয়া প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

হঠাৎ দিদিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আপ্যায়ন-সহকারে কহিতেছেন, এস ভাই, এস, এই রোদেই এলে!

দাদামশায় চক্ষের ইঙ্গিতে কহিলেন, কে? বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তবু একটু ঝুঁকিয়া দেখিয়া কহিলাম, কে একটি বিধবা মেয়ে, দাদামশায় ফিসফিস করিয়া কহিলেন, বয়স কত?

কম, প্রবোধ গাঙুলীর স্ত্রী বোধ হয়।

তাই নাকি!—বলিয়া দাদামশায় পলকমধ্যে বিছানার চাদরটা টানিয়া লইয়া আপাদনাসিকা ঢাকা দিলেন, শুধু মাথা, কপাল ও চোখ দুইটি খোলা রহিল। কহিলেন, সকালে যাই নি কিনা, তাই খবর নিতে এসেছে। ভারী বিপদে পড়েছে বেচারা! আমি ছাড়া যে গাঁয়ে তার আপনার আর কেউ নেই, কদিন ধ'রে সেই কথাই বুঝিয়েছি কিনা। আর এমনই ক'রে বুঝিয়েছি যে, রাধানাথ, রাধানাথ কেন—স্বয়ং জনার্দ্দন (গাঙুলী মশায়ের কুল-দেবতা) এলেও আর কল্‌কে পাবেন না।

মধুর মৃদু ও কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, বঠ্‌ঠাকুর কেমন আছেন? দিদিমা বিনাইয়া বিনাইয়া এবং আমাদের শুনাইয়া শুনাইয়া কহিলেন, ঐ তো সকাল থেকে প'ড়ে আছেন, এক ঢোঁক জল পর্য্যন্ত গেলেন নি।

এই বয়েস, এত হাঁটাহাঁটি ছুটোছুটি কি সহ্যি হয়! তুমি নিজে গিয়ে দেখে এস না ভাই। তাতে আর দোষ কি?

দাদামশায় কহিলেন, এই দেখ মাগীর কাণ্ড! এখানে দিচ্ছে পাঠিয়ে, আমি ঘুমোলাম, ডাকাডাকি করলে জাগব, যা বলবার তুমিই ব'ল।

বারান্দায় লঘু পদধ্বনি শুনিয়া দাদামশায় চোখ বুজিয়া টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস ফেলিতে শুরু করিলেন। পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, দরজার সামনে জীবন্ত মর্ম্মরপ্রতিমার মত সরোজিনী দাঁড়াইয়া আছে। পরিধানে এক-ইঞ্চি কালাপাড় সাদা শাড়ি, সাদা শেমিজ, সাদা আদ্দির ব্লাউজ। পা দুইটি খালি। দুই হাতে দুইগাছি করিয়া সোনার চুড়ি, গলায় একটি সরু বিছা-হার। মুখখানি তাজা স্থল-পদ্মের মত ঢলঢল করিতেছে। মাথায় এলো খোঁপা বাঁধা, চুলের উপর স্বল্প অবগুণ্ঠন। সাত বৎসর আগে সরোজিনীকে দেখিয়াছিলাম, কৃশাঙ্গী, রঙেরও বিশেষ জলুস ছিল না। পাড়াগাঁয়ের পিতৃহীনা গরিবের মেয়ে, বিধবা মা পরের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করিয়া নিজের ও মেয়ের পেট চালাইত। কাজেই যত্ন-আত্তি ছিল না, ঘষা-মাজাও ছিল না। কিন্তু প্রবোধ গাঙুলীর কাছে আদরে-যত্নে, সুখে-স্বচ্ছন্দে, বিলাসে ও আলস্যে থাকিয়া সরোজিনী কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী হইয়াছে, গাত্রবর্ণও প্রায় বিলাতী মেমসাহেবদের মত হইয়া উঠিয়াছে।

সরোজিনী আগাইয়া আসিয়া অবগুণ্ঠনে হাত দিয়া টানার ভঙ্গি করিয়া সপ্রতিভভাবে আমাকে প্রশ্ন করিল, ঘুমুচ্ছেন নাকি?

উত্তর দিলাম, হ্যাঁ।

কি হয়েছে?—বলিয়াই দাদামশায়ের বিছানায় পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, এবং পায়ে হাত দিয়া কহিল, জ্বর নেই তো! দাদামশায়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, কে? আমি ও সরোজিনী দুই-জনেই নীরব রহিলাম। দাদামশায় কিছুক্ষণ সরোজিনীর দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি এসেছ মা! জনার্দ্দন তোমার মঙ্গল করুন, তোমার—

সরোজিনী আশীর্ব্বচনে বাধা দিয়া কহিল, কি হয়েছে আপনার?

দাদামশায় গলায় হাত দিয়া আমার দিকে চাহিলেন। কহিলাম, দাঁতের গোড়া ফুলেছে, ভারী যন্ত্রণা, হাঁ করতে পারছেন না।

মিহি স্বরে সরোজিনী কহিল, খাওয়া-দাওয়া ?

দাদামশায় ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। কহিলাম, অতিকষ্টে চামচে দিয়ে—

কিন্তু কাল তো বেশ ভাল ছিলেন!

দাদামশায় জবাব না দিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। কহিলাম, হ্যাঁ, ভালই তো ছিলেন। ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে—

সরোজিনী সন্ত্রস্তভাবে কহিল, প্লেগ নয় তো ?

আশ্বাস দিয়া কহিলাম, না, এ রকম প্রায়ই হয়।

তাই নাকি ? সাবধানে থাকুন, সেক-টেক দিন, সেরে যাবে বোধ হয়। আমি চললাম।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাদামশায় কহিলেন, বাড়ি যাচ্ছ ? একা এসেছ তো, কেউ সঙ্গে যাক।

সরোজিনী কহিল, রাধানাথ ঠাকুরপোর বাড়ি যাচ্ছি। আজ নেমন্তন্ন করেছেন। ওঁদের ঝি সঙ্গে এসেছে।

দাদামশায় ঢোঁক গিলিয়া কোনমতে কহিলেন, আচ্ছা, যাও মা।

সরোজিনী আর একবার দাদামশায়ের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল এবং আমার দিকে চাহিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল না আজ। যাব একদিন আপনাদের বাড়ি।—বলিয়া প্রস্থান করিল।

দাদামশায় কহিলেন, শুনলে ? রাধানাথের বাড়ি নেমন্তন্ন; সারাদিন বোধ হয় ঐখানেই থাকবে। কি পরামর্শ হবে কে জানে ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সরোজিনী আমাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিয়াছে। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা মেয়ে সে; সতরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিজেদের পল্লীর বাহিরে পা বাড়ায় নাই; পুরুষমানুষের ছায়া দেখিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত। সাত বৎসরের মধ্যে তাহার এই পরিবর্ত্তন! পাড়াগাঁয়ে ভাশুর-ভাদ্রবধূ সম্পর্ক, বহু বিধি-নিষেধের বেড়ি দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কেহ কাহারও মুখ দেখিবে না, কেহ

কাহাকেও স্পর্শ করিবে না, কেহ কাহারও সহিত কথা বলিবে না। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া কেহ কোন দিন কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিবে না। এই সকল নিয়ম যে সরোজিনী জানে না, তাহা নহে। তবু সে কেমন সঙ্কোচহীন, সহজ অথচ ভদ্র-ভাবে আসিল, কাছে বসিল, কুশল জিজ্ঞাসা করিল এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত এক মুহূর্ত্তও কালক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেল। আমি তো এক রকম তাহার অপরিচিত, তথাপি আমার সহিত ব্যবহারেও তাহার সৌজন্যের বিন্দুমাত্র অভাব হইল না।

দাদামশায় দন্তহীন মাড়ি দুইটা ঘষিয়া সক্রোধে সরোজিনীর উদ্দেশ্যে কহিলেন, খুব তো সেজেগুজে ফেরতা দিয়ে যাওয়া হচ্ছে, রাধানাথের ফন্দিবাজিতে যখন পথে দাঁড়াবে, তখন মজা বুঝবে বাছা।

বেলা হইয়াছিল। বাড়ি যাইবার জন্য বাহির হইতেই দিদিমা কাছে ডাকিয়া কহিলেন, কেমন দেখলে হে, নয়ন-প্রাণ সার্থক হ'ল তো?

চুপ করিয়া রহিলাম। দিদিমা কহিতে লাগিলেন, ভাদ্রবউয়ের ভাশুরের গায়ে ঢ'লে পড়া জন্মে দেখি নি। ছি ছি! সাতজন্ম আগুনে পুড়লেও ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না যে! ধারালো কণ্ঠে কহিলেন, গাঁয়ে যে মানুষের মত মানুষ নেই, তাই মেমসাহেব সেজে সারা গাঁয়ের চোখের সামনে এই কীর্ত্তি ক'রে বেড়াচ্ছে। থাকত তেমন লোক তো ওর চুল কেটে, মুখে ছ্যাকা দিয়ে, থান পরিয়ে ওকে এতদিন ঢিট ক'রে দিত।

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পরে শুইয়া শুইয়া সরোজিনীর কথা ভাবিতেছিলাম। সুশ্রী সপ্রতিভ মেয়েটি। কেমন সহজ সুন্দর ব্যবহার! বিদায় লইবার সময়ে কেমন মিষ্ট করিয়া হাসিয়া, স্ফুটনোন্মুখ কমল-কোরকের মত যুক্তপানি কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল! আমাদের বাড়ির মেয়েরা কি অপরিচিত অথবা স্বল্পপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতে পারে? স্বামীদের কাছে যতই বিক্রম প্রকাশ করুক বাহিরের কোন পুরুষ দেখিলেই একেবারে তিন'হাত ঘোমটা টানিয়া কনেবউ সাজিয়া বসে (স্বামীদের তাহারা পুরুষ বলিয়াই গণ্য করে

না বোধ হয়)। এই লজ্জাসর্ব্বস্ব পল্লীরমণীদের মধ্যে সরোজিনী নিজেকে খাপ খাওয়াইবে কি করিয়া? ইহারা ইহাকে কিছুতেই সহ্য করিবে না। হয় টানাটানি করিয়া ইহাকে নিজেদের স্তরে নামাইয়া আনিবে, কিংবা ইহাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া, ঘৃণায় ও ঈর্ষায় ইহার প্রতি মারমুখী হইয়া উঠিবে।

সরোজিনীর জন্য দুঃখ হইল। সারাজীবন কাটাইবে কি লইয়া? প্রবোধ গাঙ্গুলী অবশ্য বিস্তর অর্থ ও সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে, খাওয়া-পরার অভাব কোন দিন তাহার হইবে না। কিন্তু শুধু খাইয়া ঘুমাইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে—বিশেষ করিয়া মেয়েমানুষ? তাহার স্বামী চাই, সংসার চাই, সন্তান চাই। না পাইলে রাজ-সিংহাসনে বসিয়া সে সুখ পায় না, পাইলে দুই বেলা আধ-পেটা খাইয়া, ভাঙা শাঁখা ও ছিন্ন মলিন বসন পরিয়া, নিজেকে রাজরাণীর চেয়েও সুখী মনে করে। কিন্তু সরোজিনীর কোন অবলম্বনই নাই। যদি একটা ছেলে থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে নাওয়াইয়া, খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া, মানুষ করিয়া ও ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন দেখিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিত। যদি শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাশুর-দেওর, জা-ননদ লইয়া মস্ত সংসার থাকিত, তাহা হইলেও সংসারে গিন্নী সাজিয়া, সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া, জা ও ননদদের ছেলে-মেয়ে মানুষ করিয়া কোনমতে দিন কাটাইয়া দিত। অবশ্য আজকাল বাংলা দেশে সন্তানহীনা ধনী বিধবা, বিশেষ করিয়া বাল-বিধবাদিগকে জীবন ও যৌবন দুইই পার করিয়া দিবার জন্য স্বামীজী-আখ্যাধারী কতকগুলি কাণ্ডারীর আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু সরোজিনী তাহাই বা জুটাইবে কি করিয়া?

পত্নী আসিয়া কহিলেন, হ্যাঁ গা, শুনতে পাচ্ছ না? জবাব দিলাম না। গায়ে হাত দিয়া নাড়িয়া কহিলেন, শুনছ! ঘুমোচ্ছ নাকি?

কহিলাম, হুঁ।

ওঠ দেখি, মনু চক্রবর্ত্তী কি জন্যে তোমাকে ডাকছে দেখ।

ডাকুক, ব'লে পাঠাও ঘুমোচ্ছি।

পাগল নাকি! বেচারা রোদে রোদে ছুটে এসেছে, নিশ্চয় খুব দরকার।

শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে বিরক্তির সহিত কহিলাম, দরকার তো ভারী !

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, মন্টু বৈঠকখানার বারান্দার এপ্রান্ত হইতে ওপ্রান্ত পর্য্যন্ত ঘনঘন পায়চারি করিতেছে। এটি মন্টু চক্রবর্ত্তীর অভ্যাস, উত্তেজিত হইলেই পায়চারি করে। কিন্তু হঠাৎ এই উত্তেজনার কারণ ?

মণীন্দ্র ঢ্যাঙা, কাহিল; সরু ও লম্বা গলা; মাথার চুল চারিদিকে সমান করিয়া ছাঁটা; গা ও পা দুইই খালি, কাপড়টি কোমর বাঁধিয়া পরা। মণীন্দ্রর মেজাজ ও কথাবার্ত্তার প্রায়ই কোন ঠিক থাকে না; স্বভাবের গুণে নয়, নেশার গুণে; মণীন্দ্র গাঁজা খায়।

কোমরের দুই পাশে দুই হাত দিয়া মণীন্দ্র একেবারে সামনে আসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কি ব্যাপার বল দেখি ?

জবাব না দিয়া কহিলাম, এস, ব'স।

মণীন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া বসিয়া কহিল, বসতে পারব না বেশিক্ষণ, অনেক কাজ। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারখানা খুলে বল দেখি সব।

কহিলাম, কিসের ব্যাপার ?

মণীন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিল, কিসের ব্যাপার, জান না ? কেন, আমার বোন সরোজিনীর ব্যাপার।

সপ্রশ্ন মুখে চাহিয়া রহিলাম।

মণীন্দ্র বলিতে লাগিল, আমার বোন; আমিই বিয়ে দিলাম। আসবার খবর শুনে আমিই আনতে ইষ্টিশানে গেলাম। কিন্তু সেখান থেকে কেড়ে এনে যে নিজের ঘরে ঢোকালে, তা কোন্ আইনে বলতে পার ?

প্রতিবাদ করিলাম, আমি আবার ঢোকালাম কখন ?

তুমি না হোক, তোমাদের পাণ্ডাটি তো বটে। সে একই কথা, ভাগ তোমরাও পাবে।

কিসের ভাগ ?

টাকা-কড়ি, গয়না-গাঁটি, জমি-জায়গা—তার লোভেই তো এত কাণ্ড। না হ'লে তো আরও কচি কচি বিধবা গাঁয়ে রয়েছে, তাদের জন্যে তো তোমাদের কারও মাথাব্যথা দেখি নি।

কথাটা সত্য। আমাদের গ্রামে, শুধু আমাদের গ্রামে কেন, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক সংসারে গড়ে একজন করিয়া বাল-বিধবা আছে; আমাদের চোখের সামনে অশেষ দুঃখে ও যন্ত্রণায় প্রতিদিন তিল তিল করিয়া দেহে ও মনে মরিতেছে, কিন্তু কয়জনের কথা ভাবি আমরা?

মণীন্দ্র বলিতে লাগিল, ভাবলাম, যা হোক, এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। এতগুলো ছেলে-মেয়ে, বড় মেয়েটি তো বিয়ের যুগ্যি হয়েছে, এক পয়সা কোন দিকে আয় নেই, বড়লোক বিধবা বোনটা বাড়িতে এলে একটু সুরাহা হবে। ও বাবা! আসবামাত্র চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে গেল!

দম লইয়া কহিল, কিন্তু কদিন রাখতে পারলি? চুরির ধন বাটপাড়ে নিয়ে গেল, আর নিজে শাপের মুখে মরলি—

সবিস্ময়ে কহিলাম, সাপ?

না হে, শাপ। আধোয়া মুখে শাপ দিয়েছিলাম না সেদিন, বেটা, যেমন বামুনের গরাসে বাগড়া দিলি, তেমনই ভোগ করতে হবে না তোকে, মরবি, মরবি। তা ঠিক ফ'লে গেছে। তিন দিনও পেরোয় নি। বাবা! নেশাই করি আর যাই করি, সকাল-সন্ধ্যে গায়ত্রীটি তো এখনও ছাড়ি নি।

বাক্যস্রোত কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইবামাত্র প্রশ্ন করিলাম, কার কি হয়েছে?

দুই ভ্রূ চাড়াইয়া কহিল, কেন? গাঙুলী বুড়োর। পেলেগ হয়েছে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিলাম, দূর।

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া মণীন্দ্র কহিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, পেলেগ, রাধানাথ নিজে দেখে এসেছে, গাল গলা ফুলে ফেঁপে ঢোল।

আর প্রতিবাদ করিলাম না। মণীন্দ্র আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হইয়া কহিল, ও বেটা টেঁসে যাবে, তুমি দেখো। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, কিন্তু রাধানাথটাকে কি উপায়ে ঢিট করা যায় বল দেখি?

ওকেও শাপ দিয়ে দাও।

তা কি আর দিচ্ছি না ভাবছ, দিন রাত দিচ্ছি। কিন্তু বেটা যা

নীরেট বজ্জাত, তাতে কিছু হবে ব'লে মনে হচ্ছে না।—বলিয়া কিছুক্ষণ চিন্তাকুলভাবে থাকিয়া আবার উত্তেজিতভাবে কহিল, কিন্তু কি বদমায়েসী বুদ্ধি দেখেছ! আজ আবার নেমন্তন্ন করেছে। আমার নিজের বোন, আমি কিছু করলাম না, আর কোথাকার কে, ও কিনা—

বাধা দিয়া কহিলাম, তা তোমার এত মাথাব্যথা কেন বল দেখি?

মণীন্দ্র খ্যাঁক করিয়া উঠিল, মানে? আমারই মাথা তো আমার ব্যথা হবে না? হবে বুঝি তোমাদের ঐ বুড়ো গাঙুলীর আর ঐ বেটা রাধানাথের?

আমি বলছি, তোমার ভাবনার কোন দরকার নেই। রাধানাথ যদি ওর আদায়-উশুল ক'রে দিতে পারে, সে তো ভাল কথা। তোমার তো ওসব করবার সাধ্য নেই।

বলিলাম না যে, প্রজা ও খাতকরা কেহ তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কিছু দিবে না।

মণীন্দ্র রুষ্টকণ্ঠে কহিল, কেন? আমি কি পাঠশালায় পড়ি নি, না ধারাপাত মুখস্থ করা আমাদের আমলে ছিল না? মণকষা, কড়িকষা, মাস-মাহিনা, বিঘাকালি একেবারে ভাত-জল করেছিলাম যে একদিন, কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে, কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্জে, হাঁ৷ বাবা! যেমন তেমন লোক পাও নি, ঝাড়া মুখস্থ ব'লে দিতে পারি এখনও।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আর রাধানাথই বা কি এমন রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পাস করেছে শুনি?

তা বলছি না। কত কাজ তোমার! অত হাঙ্গামা কি তোমার পোষাবে? এই ধর না, আমি কি ওসব পারি? যারা ঐ সব নিয়ে থাকে, তাদেরই সাজে—

ঘাড় নাড়িয়া মণীন্দ্র কহিল, তা বটে, তা বটে। তা হ'লে রাধানাথই করুক। গাঙুলী বুড়োর চেয়ে তো ভাল। কাপড়ের দোকানে ধার-ধোর দেয়। রাধানাথ কিন্তু—কিছুক্ষণ কপাল কুঁচকাইয়া চিন্তা করিয়া কহিল, শেষ পর্য্যন্ত সব সাবড়ে দেবে না তো? কিছু অসাধ্যি নেই ওর। সেই মেয়েটার কথা মনে নেই?

মনে আছে, বৎসর কয়েক পূর্ব্বে রাধানাথ তাহার পিসতুতো ভাইয়ের শক্ত অসুখের সংবাদ পাইয়া খবর লইতে গেল। ভাই দিন কয়েক ভুগিয়া মারা গেল, এবং মরিবার আগে স্বীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও সহধর্ম্মিণীর ভার রাধানাথের হাতেই দিয়া গেল। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিলে রাধানাথ সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিজের জিম্মায় রাখিয়া ভ্রাতৃবধূকে লইয়া বাড়িতে ফিরিল। বৎসর খানেক পরে একদিন দুপুর-রাত্রে রাধানাথের বাড়িতে হৈ-হৈ উঠিল, সেই বিধবা মেয়েটি নাকি নিজের শয়নকক্ষে বাড়ির চাকরের সহিত ধরা পড়িয়াছে, এবং ধরিয়াছে স্বয়ং রাধানাথ। গ্রামে নিন্দার ঢেউ বহিয়া যাইতে লাগিল। পরের দিন রাত্রে মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়া নিন্দার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

কহিলাম, না, সে ভয় নেই। তোমার বোনটি যা চালাক শুনছি, রাধানাথ তার কাছে বেশি কিছু করতে পারবে না। বরং উল্টো ওই রাধানাথকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে।

মণীন্দ্র সায় দিবার ভঙ্গিতে কহিল, সত্যি। যা বলেছ। ভারী চালাক মেয়ে। কদিনই বলছি, গোটা কয়েক টাকা দে, কতকগুলো দেনা আছে, শোধ ক'রে দিই। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, কিছুতেই দিচ্ছে না। ক্ষোভের সহিত কহিল, অমন একটা বোন থাকতে যদি আমার কষ্ট হয় তো কি বলব বল? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, অদৃষ্ট! অভাগার হাতে পড়লে কপিলা গাইয়েরও বাঁট শুকিয়ে যায়।

কহিলাম, গোটা কয়েক ছেলেমেয়েকে বোনের ওখানে পাঠিয়ে দিলেও তো পার। তুমিও অনেকটা হালকা হবে, ওরও একা একা মনে হবে না।

মণীন্দ্র হাসিয়া কহিল, দিই নি নাকি? ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে জন চার, তা ছাড়া বড় মেয়েটাকেও দিয়েছি পাঠিয়ে। সেদিকে কসুর কিছু করি নি। এতেও একা মনে হয় তো বললেই পারে, গুষ্টিসুদ্ধ তুলে নিয়ে গিয়ে গাজন বসিয়ে দোব এখনই।

হাসি চাপিয়া কহিলাম, তবে আর দুঃখ কিসের? ওদিকেও তো অনেকটা সাহায্য পাচ্ছ।

চোখ পাকাইয়া মণীন্দ্র কহিল, ধুৎ! ও আবার সাহায্য কিসের? বড় মেয়েটা পনরো পেরিয়ে গেছে, চোখের সামনে ধ'রে দিয়েছি, বিয়ে দিয়ে দিক। আমি ওর বিয়ে দিয়েছিলাম ব'লেই তো এত ঐশ্বয্যি! ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, একটা কথা বলে না। কত রকম ভাবে কথাটা পাড়বার চেষ্টা করেছি, এড়িয়ে যায়। আমার ভিণ্টেটা তো দেখতে শুনতে মন্দ নয়। চার পার হয়ে পাঁচে পড়ল। যদি পোষ্যপুত্র নিতে চায় তো ওকেই নিক। তাতে আমারও একটা উপকার হয়, ওরও মরার পর পিণ্ডি পাবার একটা ব্যবস্থা হয়। মুখটা বিরক্তিতে কুঞ্চিত করিয়া মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, না না, ওসব খেয়াল নেই। কি যে মতলব কে জানে! হঠাৎ কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিল, তোমার সঙ্গে আলাপ-টালাপ হয়েছে?

কহিলাম, না।

ঘাড় নাড়িয়া মণীন্দ্র কহিল, ভেবো না, হবে। যেন আলাপ করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। মণীন্দ্র বলিতে লাগিল, আমি বলেছি কিনা! খুব প্রশংসা করেছি তোমার; বলেছি, গাঁয়ের নাক আমাদের মাস্টার; যদি কথা কইতে চাস, ওর সঙ্গে ক'গে, বাকি সব গলাকাটা। বলিয়া প্রসারিত দক্ষিণ করতল নিজের গলার ঠিক মাঝখানে ছুরির মত করিয়া বসাইয়া বার কয়েক ঘষিয়া দিল।

মণীন্দ্রকে উঠাইবার জন্য কহিলাম, রাধানাথের ওখানে গিয়ে বোনটিকে একবার দেখে এস না।

মণীন্দ্র হাসিয়া কহিল, ঐজন্যেই তো বেরিয়েছি। খেতে বসেছে কিনা, খাওয়া হোক, যাব এখনই, কি পরামর্শটা হয় শুনব। কিন্তু ভায়া! যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়, আমার কথাটা ব'ল। ভিণ্টেটার ব্যবস্থা না হয় যখন হোক হবে, তাড়া নেই, কিন্তু মেয়েটার বিয়ে আর দেরি করা চলে না, এখনই লোকে নিন্দে করতে শুরু করেছে।

মণীন্দ্র যাইতেই পত্নী আসিয়া কহিলেন, হ্যাঁ গো! গাঙুলী বুড়োর কি হয়েছে?

গম্ভীর মুখে কহিলাম, প্লেগ।

স্ত্রী আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, ওমা! সে কি গো! কি সব্বনাশ! তবে তুমি রাতদিন যাচ্ছ যে বড় ?

বল কি! খবর নোব না ? রোগে-শোকেই তো বন্ধু।

স্ত্রী কহিলেন, তা বটে! তবে বেশি ছোঁয়া-নাড়া ক'র না। গাঙ্গুলী-গিন্নী কি করছে ? একদিন দেখতে যাব নাকি ?

যেও, তোমাকে এত স্নেহ করেন ওঁরা দুজনেই—

স্ত্রী একটু চিন্তিতভাবে থাকিয়া কহিলেন, ঐ মেয়েটাই বোধ হয় রোগের বিষ এনেছে, পশ্চিমে শুনেছি প্লেগের আড্ডা।

তা হবে।

কিঞ্চিৎ ধারালো কণ্ঠে কহিলেন, তা বেশ হয়েছে, যেমন বুড়ো ছুঁড়ীর সঙ্গে মাখামাখি করতে গিয়েছিল। ভগবানের কৃপায় ভাল হয়ে উঠুক, কিন্তু শিক্ষা হয়েছে।

চুপ করিয়া রহিলাম।

তুমিও যেন বেশি মাখামাখি ক'রো না। তোমার সঙ্গেও তো ভাব করতে আসবে শুনছি।

প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, করিলামও না।

কণ্ঠস্বর শাণিত করিয়া কহিলেন, সাপিনীর সঙ্গে প্রেম করা সাপেরই সাজে। অন্য কেউ কিছু করতে গেলেই ছোবল খেয়ে বিষে জ'রে যেতে হবে, এই কথাটা না ভুলে যার সঙ্গে পার ভাব ক'রো গিয়ে, আমি কিছু বলব না।—বলিয়া কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

দমিয়া গেলাম, ইহার মধ্যেই চব্বিশ বৎসর বয়সের সাপিনীর সাপ হইবার যোগ্যতা হারাইয়াছি নাকি ?

৩

পরদিন সন্ধ্যার পর, বৈঠকখানায় বসিয়া পড়াশুনা করিতেছিলাম। গুমট গরম, তাহার উপর মশার উপদ্রব। কাজেই, উর্দ্ধাঙ্গ একেবারে

নিরাবরণ করিয়া, নিম্নাঙ্গে কোনমতে পরিধেয় বস্ত্রখানি ধারণ করিতেছিলাম, এবং বাম হাতে একটি হাত-পাখা লইয়া ঘন ঘন সঞ্চালন করিতেছিলাম। হঠাৎ পত্নীর কণ্ঠস্বর শুনিলাম, ওগো, শুনছ ?

অন্যমনস্কভাবে কহিলাম, কি ?

একেবারে পাশে আসিয়া হাজির হইয়া কহিলেন, দেখ, কে এসেছে।

চাহিয়া দেখিলাম, সরোজিনী স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া আছে, কেশ ও বেশ পূর্ব্ববৎ।

দেখুন দেখি কি কাণ্ড! এই অর্দ্ধনগ্ন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কোন দিন কোন সুন্দরী তরুণীর, বিশেষ করিয়া সরোজিনীর, সম্মুখীন হইব কখনও ভাবিয়াছিলাম কি ? যখনই শুনিয়াছিলাম, সরোজিনী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে, তখনই তাহার সম্মুখে কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিব, সে সম্বন্ধে একটি প্ল্যান মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। ধোপদস্ত একখানি ধুতি গুছাইয়া পরিব ; গায়ে থাকিবে খদ্দরের ধবধবে সাদা পাঞ্জাবিটি (আমি যে স্বদেশপ্রেমিক, ইহা দেখিয়া বুঝা যাইবে) ; পুরাতন চটি জোড়াটি ঝাড়িয়া মুছিয়া পায়ে পরিব ; টেবিলটি টেবিলক্লথ অভাবে ধোয়া বিছানার চাদর দিয়া ঢাকিয়া, তাহার উপরে দুই-চারিখানি মোটা মোটা বই সাজাইয়া রাখিব। সরোজিনীর আগমনবার্ত্তা পাইবামাত্র সুবিধামত একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া, যে কোন একটা বই খুলিয়া তাহার প্রসারিত পত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব। সরোজিনী হয়তো কাছে আসিয়া স্বভাবসুলভ মিহি ও মিষ্ট স্বরে কহিবে, নমস্কার। সাড়া দিব না। সুগভীর তত্ত্বের মধ্যে যেভাবে নিমজ্জিত হইয়া থাকিব, তাহাতে সহস্র সরোজিনী সমস্বরে ডাকিলেও সাড়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। হঠাৎ ভাবাকুললোচনে কড়িকাঠের দিকে তাকাইতে গিয়া সরোজিনীর সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাদরে তাহাকে বসাইব। তারপর, কথায় বার্ত্তায়, আচারে আচরণে, ভাবে ভঙ্গিতে, আমার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ, হৃদয়ের ঔদার্য্য, মনের কুসংস্কারবিমুক্ত প্রগতিশীলতা, এমন নির্ঘাতভাবে প্রকাশ করিব যে, সরোজিনী হাঁ করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া ভাবিতে থাকিবে, এই অজপাড়াগাঁয়ে, রাধানাথ ও গাঙ্গুলী মশায়দের সমাজে

এমন একটা লোক থাকা সম্ভব? হয়তো মনের কোণে প্রবোধ ও আমাকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া একটি ক্ষীণ ক্ষোভের নিশ্বাসও ফেলিবে।

কিন্তু তাহার বদলে কি হইল বলুন দেখি? গৃহিণীর কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ঘটিতেছে, না আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া এই কাণ্ড করিয়াছেন?

পাখাটা ফেলিয়া, বইটা ঠেলিয়া, কাপড় সামলাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া কহিলাম, কখন এলেন? বসুন।—বলিয়া একটা চেয়ারের উদ্দেশ্যে আগাইবার উপক্রম করিতেই সরোজিনী কহিল, থাক, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? বসছি।—বলিয়া নিজেই একটা চেয়ার টানিয়া আমার স্ত্রীকে কহিল, বসুন। এবং আর একটা চেয়ার টানিয়া নিজে বসিয়া মিহি গলায় বিনাইয়া বিনাইয়া কহিল, 'আসুন, বসুন' ব'লে আমাকে অপরাধী করবেন না। আমি আপনার ছোট বোনের মত।

বোকার মত হাসিয়া কহিলাম, তা বটে, তা বটে—

সরোজিনী কহিল, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

এই যে বসছি।—বলিয়া বসিয়া পড়িলাম।

সরোজিনী আমার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, কদিনই মনে কয়েছি, আসব, নানা ঝঞ্ঝাটে ঘ'টে ওঠে নি। ঘরদোর যা হয়েছিল, পা দেওয়া যায় না, যাক, কোনমতে—। হঠাৎ আমার দিকে চাহিয়া কহিল, আপনি ঘেমে নেয়ে গেলেন যে, পাখাটা দিন দেখি, একটু বাতাস ক'রে দিই।—বলিয়া পাখাটার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াইতেই 'থাক থাক, আমিই করছি' বলিয়া পাখাটা তুলিয়া লইলাম। সরোজিনী আমার হাত হইতে পাখাটা প্রায় ছিনাইয়া লইয়া, চেয়ারটা একটু আমার কাছে টানিয়া আনিয়া বসিয়া কহিল, বা রে! ছোট বোন কাছে থাকতে আপনি নিজে পাখা করবেন?—বলিয়া পাখা করিতে লাগিল। সরোজিনীর দেহ হইতে একটি মৃদু সুগন্ধ নাকে আসিল; এসেন্স মাখিয়াছে বোধ হয়; পুলকিতচিত্তে নাক ভরিয়া নিশ্বাস লইবার আগে পত্নীর দিকে কটাক্ষে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার চক্ষে ও ওষ্ঠে বিদ্রূপের হাসি, অগত্যা নিশ্বাস লওয়া বন্ধ করিলাম। কিন্তু আমার কি অপরাধ

বলুন দেখি ? আমি ইচ্ছা করিয়া ঘামি নাই বা কাহাকেও পাখা করিতে বলি নাই।

সরোজিনী কহিতে লাগিল, উনি আপনার কথা প্রায়ই বলতেন। গাঁয়ের মধ্যে আপনিই নাকি তাঁর একমাত্র সত্যিকার বন্ধু ছিলেন।

বন্ধু ! প্রবোধের কাণ্ড দেখুন ! পঞ্চাশ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ আমার বন্ধু ! সরোজিনী কি মনে করে আমাকে ? সোজাসুজি প্রতিবাদ না করিয়া ঘুরাইয়া বলিলাম, হ্যাঁ, আমাকে ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহ করতেন তিনি।

উৎসাহিত হইয়া সরোজিনী কহিল, সত্যি। প্রায়ই বলতেন—যদি কোন দিন আমার কিছু হয়, আর যদি গাঁয়ে গিয়ে বাস করতে চাও তো, আপনার নাম ক'রে বলতেন, ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে, গাঁয়ের আর কাউকে বিশ্বাস ক'রো না।

সরোজিনী ধাপ্পা দিতেছে ! যদি স্বামী তাহার এই কথাই বলিয়াছিল তো রাধানাথ ও গাঙুলী মশায়ের সঙ্গে আগে সলা-পরামর্শ না করিয়া আমার কাছেই আসা উচিত ছিল। কাজেই কথাটার মোড়টা ফিরাইবার জন্য কহিলাম, কি হয়েছিল ওঁর ?

প্রথমে জ্বর, তারপর পেটের অসুখ। ডাক্তারবাবু অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। দিন দিন অবস্থা খারাপ হতে লাগল। ডাক্তারবাবু শেষে বললেন, আমার দ্বারা সুবিধে হচ্ছে না, বাইরে থেকে কাউকে আনাবার ব্যবস্থা হোক। উনি আমাকে বললেন, কাউকে আর ডাকতে হবে না, কেউ আমার কিছু করতে পারবে না। গুরুদেবকে খবর দাও, ওঁর চরণামৃত খেয়ে সারি তো সারব। গুরুদেবকে তার করা হ'ল ; ভারী ভালবাসতেন ওঁকে, তার পেয়েই চ'লে এলেন। এসে দেখে আমাকে বললেন, আগে খবর দিস নি কেন ? ভারী দেরি হয়ে গেছে। মৃত্যু অনেকটা গ্রাস ক'রে নিয়েছে। যাক, তবু যদি মাথার কাছে ব'সে এক লক্ষ একবার নাম জপ ক'রে উঠতে পারি তো প্রবোধকে আমি টেনে বের ক'রে নিয়ে আসব। তারপর তিনি আসন ক'রে শিয়রে বসলেন, নামজপ শুরু হ'ল, কিন্তু এমনই আমার কপাল—। সরোজিনীর কণ্ঠে অশ্রু ঘনাইয়া আসিল,

ধরা গলায় কহিল, জপ শেষ হতে না হতে ওঁর সব শেষ হয়ে গেল। শেষের দিকটায় সরোজিনী কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া ফেলিল এবং চক্ষে অঞ্চল দিয়া বারংবার চক্ষু দুইটি মার্জ্জনা করিতে লাগিল।

করুণরসের সৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া প্রসঙ্গান্তরে চলিলাম, প্রশ্ন করিলাম, গুরুদেবটি কে?

বাষ্পলেশহীন কণ্ঠে দুই চোখ ডাগর করিয়া সরোজিনী কহিল, আনন্দময় স্বামীকে জানেন না? সারা পৃথিবীর লোক ওঁর নাম জানে যে। কত বড় বড় লোক যে ওঁর শিষ্য, তার ইয়ত্তা নাই।

অপরাধীর মত কহিলাম, নাম শুনেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না, বাঙালী, না—

সরোজিনী কহিল, বাঙালী বইকি। পূর্ব্ববঙ্গে বাড়ি ছিল। রেলে মস্তবড় চাকরি করতেন। একদিন ভগবান স্বপ্নে তাঁকে বললেন, করছিস কি? তোর কি এই কাজ? জীব উদ্ধার করবার জন্যে তোকে পাঠিয়েছিলাম, ভুলে গেছিস? এই শুনে উনি অতবড় চাকরি ছেড়ে দিয়ে হিমালয়ে চ'লে গেলেন। সেখানে বারো বৎসর সাধনা ক'রে সিদ্ধ হয়ে ফিরে এলেন। রেলের যত বড় বড় চাকুরে ওঁর শিষ্য, শুধু বাঙালীরাই নয়, বেহারী, মারাঠী, সিন্ধী, গুজরাটী, মান্দ্রাজী সব দেশের লোক, এই দেখুন না, আমাদের ডাক্তারবাবু গুজরাটী, তিনি গুরুদেবের একজন প্রধান শিষ্য।

প্রশ্ন করিলাম, যিনি প্রবোধদাদার চিকিৎসা করেছিলেন?

ঘাড় নাড়িয়া সরোজিনী কহিল, হ্যাঁ। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, ভারী ভাল লোক তিনি। এতবড় ডাক্তার, এত রোজগার, কিন্তু অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। আর চেহারাও চমৎকার, যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনই টকটকে গায়ের রং। স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, সত্যি, এমন চেহারা বাঙালীদের মধ্যে কোন দিন দেখি নি।

স্ত্রী ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না।

কিন্তু ডাক্তারবাবুর গুণের প্রশংসা করিতে গিয়া সরোজিনী যে তাঁহার রূপের প্রশংসায় গদগদ হইয়া উঠিতেছে দেখি!

পত্নী হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমরা গল্প কর, আমি আসছি এখনই।

সরোজিনী কহিল, বসুন না বউদিদি, কোথায় যাবেন?

স্ত্রী কহিলেন, আসছি ভাই, বেশি দেরি হবে না।

কিন্তু কিছু হাঙ্গামা করবেন না যেন।

পাগল! হাঙ্গামা আবার কি করব? বাড়িতে নতুন এলে, একটু মিষ্টিমুখ করতে হয় কিনা, তারই একটু ব্যবস্থা—। বলিয়া কথা শেষ না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

সরোজিনী অনুযোগের সুরে কহিল, দেখুন দেখি, বউদিদি আবার কি সব পাগলামি শুরু করলেন!

গম্ভীর মুখে কহিলাম, দাদার বাড়িতে এলে বউদিদির অত্যাচার একটু সহ্য করতে হবে বইকি।

সরোজিনীর দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, কহিল, ভারী ভাল লাগল আপনার কথা শুনে। আজ থেকে কিন্তু সকলের সামনেই 'দাদা' ব'লে ডাকব।

বেশ তো, ডেকো।

বউদিদিকেও বউদিদি ব'লে ডাকব।

হাসিয়া কহিলাম, তা তো ডাকতেই হবে। দাদার স্ত্রীকে অন্য কিছু ব'লে ডাকা উচিত হবে না বোধ হয়।

সরোজিনী হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, না না, তা বলছি না। মানে, সকলের সামনে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, শুধু দাদা হ'লেই তো হবে না, তার দায়িত্বও নিতে হবে কিন্তু।

যেন দাদা হইবার জন্য ঝুলোঝুলি করিতেছিলাম এতক্ষণ। দয়া করিয়া কাজে বহাল করিয়া কাজের ফিরিস্তি দিতেছে।

কহিলাম, কি দায়িত্ব?

অনাথা ছোট বোনটার দিকে একটু দৃষ্টি রাখা, তাকে একটু সাহায্য করা।

দৃষ্টি আমি রাখব। কিন্তু সাহায্য কি করব বল? মাস্টার মানুষ,

বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার কিছু বুঝি না, তবে নিজ বুদ্ধিমত পরামর্শ দিতে পারি।

তাতেই আমার হবে। সম্প্রতি একটা পরামর্শ দিন দেখি। গাঙুলী বঠ্‌ঠাকুর তো অসুখে পড়েছেন। রাধানাথ ঠাকুরপোকে বলতেই তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু বলছেন, তাঁকে রেজিস্টরি ক'রে একটা ক্ষমতা-পত্র দিতে হবে।

কহিলাম, কেন?

বলছেন, বিধবার সম্পত্তি, শেষে লোকে তাঁকে দোষ দিতে পারে। আমিও নাকি ভবিষ্যতে ইচ্ছে করলে তাঁকে বিপদে ফেলতে পারি।

কহিলাম, এত সব করবার দরকার আমি দেখি না। উনি প্রজা-খাতকদের ডেকে ব'লে দিন। তারা এসে তোমাকে খাজনা দিয়ে যাবে। তোমার মন্টুদাকে বললে সে দাখলে-টাখলে লেখা, তা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারে।

আমিও তো তাই বলেছি। উনি বলছেন, না, এতে তাঁর সম্মানের হানি হবে; লোকে বলবে, রাধানাথ প্রবোধ গাঙুলীর স্ত্রীর গোমস্তা।

কিছুক্ষণ বিজ্ঞের মত চিন্তাকুলভাবে বসিয়া থাকিয়া কহিলাম, আমার কিন্তু ওসব হাঙ্গামা ভাল মনে হচ্ছে না, তবে তোমার যদি—

সরোজিনী বাধা দিয়া কহিল, আমারও ভাল মনে হয় নি। আমি কালই রাধানাথ ঠাকুরপোকে ব'লে দোব, ওসব দরকার নেই। তা ছাড়া, তাঁর নিজে করবার দরকার কি? দোকানে এতগুলো কর্ম্মচারী রয়েছে, যে কোন একজনকে দিয়ে করালেই পারেন। আমি বরং তাকে মাসে কিছু ক'রে দোব। অবশ্য আমি নিজে লোক রাখতে পারতাম, তবে রাধানাথ ঠাকুরপোর লোক হ'লে কাজ বেশি হবে।

পত্নী আসিয়া হাজির হইলেন, হাতে একটা থালা, তাহাতে খানকয়েক লুচি ও মিষ্টি।

সরোজিনী কহিল, দেখুন দেখি কি কাণ্ড! আমি কিন্তু কিছু খেতে পারব না।

পত্নী কহিলেন, বেশি কিছু নয়, একটুখানি।

কিঞ্চিৎ বাদ-প্রতিবাদের পর সরোজিনী 'মিষ্টমুখ' করিল এবং আরও কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইল।

রাত্রে আহারের সময়ে কহিলাম, মেয়েটি ভারী চমৎকার, নয়?

পত্নী মুখ টিপিয়া হাসিলেন, চমৎকারই তো, পাখা করছিল যখন।

না না, সেজন্যে বলছি না, এমনই মেয়েটি বেশ ভাল।

পত্নী গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিলেন, ভালই তো, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তবে পাখা তোমাকে যত না করুক, নিজেকেই করছিল বেশি। না হ'লে ঘামে মুখের পাউডারটা ধুয়ে যেত কিনা।

দূর! পাউডার আবার কোথায়?

কেন? ড্যাবড্যাব ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলে, আর পাউডার দেখতে পাও নি?

পাউডার যাক, প্রতিবাদ করিলাম, তাকিয়ে আবার ছিলাম কখন?

খুব ছিলে। তোমার কি হুঁস ছিল কিছু? আমারই লজ্জা করছিল। ভাবছিলাম, কি মনে করছে ও!

কহিলাম, তোমার যেমন কথা!

সত্যি বলছি। কিন্তু তুমি আমাকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছ।

সন্দিগ্ধস্বরে কহিলাম, কেন?

ভাবতাম, তুমি যা মানুষ, পরের মেয়ে দেখলে হয়তো লজ্জায় জড়সড় হয়ে যাবে। ওমা! দেখলাম, বেশ চনচনে ভাব, গা ঘেঁষে বসতেও একটু ইতস্তত করতে দেখলাম না, আর কত প্রাণের কথা, আমি যে একটা জীব কাছে ব'সে আছি, খেয়াল নেই।

বা রে! তুমি গোঁজ হয়ে ব'সে থাকলে আমি কি করব?

আমি কি করব! কিন্তু বেশি লাফিও না। ডাক্তারের রূপের ব্যাখান করতে করতে যা 'ধর-ধর' ভাব দেখলাম, ওর কাছে বেশি সুবিধে হবে না।

কি যে বল! দাদা পাতিয়ে গেল না!

দাদা!—বলিয়া পত্নী অধর ও ওষ্ঠ সহযোগে শ্লেষসূচক শব্দ করিলেন।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

বিদ্যাসাগর

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ম্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলোর সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। একদল সাঁওতাল নর-নারী মনের আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে। মাদল, বাঁশী এবং সরল প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দে স্থানটা ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। খানিকক্ষণ নৃত্যগীত চলিবার পর একটি বাবুগোছের ভদ্রলোক আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পিছনে একজন কুলি, কুলির মাথায় একটি মোট। ভদ্রলোক ট্রেন হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, এই সাঁওতালের ভিড় তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার আগমনে সাঁওতালদের নাচগান বন্ধ হইয়া গেল। সকলে কৌতূহলী হইয়া আগন্তুককে দূর হইতে দেখিতে লাগিল। একটি বৃদ্ধ মাঝি আগাইয়া আসিল। তাহার কাঁধে মাদল দুলিতেছে

মাঝি। তুই কে বটিস? কুথা থেকে আলি?

বাবু। আমি কলকাতা থেকে আসছি। বিদ্যাসাগর মশাই কি এইখানেই থাকেন?

মাঝি। হঁ। উই যে তার ঘর।

বাংলোটা দেখাইয়া দিল। বাবু কুলিকে লইয়া বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কুলি জিনিস রাখিয়া চলিয়া গেল। বাবু বাহিরে আসিলেন

বাবু। বিদ্যাসাগর মশাই কোথায়?

মাঝি। হুথাকে নাই?

বাবু। কই, না।

একটি মেয়ে। উ যে রূপনিকে দেখতে গেল গো।

বাবু। রূপনি কে?

মেয়েটি। এতোয়ারি মাঝির বিটি, তার বড্ডা অসুখ।

বাবু। তোমরা এখানে নাচগান করছ যে?

মাঝি। [হাসিয়া] হামরা হেথাকে রোজ আসি। বিদ্যেসাগর বাবুটি লোক বড়া ভাল যে গো! হামরা ঝুড়ি, সুপ, মোড়া বুনে বুনে আনি, উ পয়সা দিয়ে কিনে লেয়—

মেয়েটি। হামাদের খেতে দেয়, পয়সা দেয়, চুড়ি কিনে দেয়—এই দেখ্ না কেনে!

হাতের চুড়ি দেখাইল। ইহাতে তাহার সঙ্গিনীরা সাঁওতালী ভাষায় তাহাকে কি বলিল এবং সকলে কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিল

মাঝি। তুমি উয়ার কে বট?

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবেশ করিলেন। শরীর শীর্ণ, মুখে বার্দ্ধক্যের ছাপ। বাবুটি প্রণাম করিলেন

বিদ্যাসাগর। হরেন যে, কি খবর?

হরেন। রাজকৃষ্ণবাবু এই চিঠিটি দিয়েছেন।

একটি পত্র বাহির করিয়া দিলেন

বিদ্যাসাগর। তোমার হাতে চিঠি পাঠাবার মানে? পোস্টাফিস তো আছে।

হরেন। আমারই দরকার, তাই ভাবলাম—

বিদ্যাসাগর। তা বুঝেছি। [সাঁওতালদের প্রতি] তোরা ওদিকে চ, তোদের জন্যে মকাই পুড়িয়ে রেখেছি।

মেয়েটি। রূপনকে কেমন দেখে আলি তুই?

বিদ্যাসাগর। বেশ ভাল আছে সে।

সাঁওতালরা কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল এবং পত্র পাঠ শেষ করিয়া যখন তিনি চক্ষু তুলিলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার দৃষ্টি দিয়া আগুন ছুটিতেছে। কিন্তু তিনি কথা বলিলেন ধীরে ধীরেই—

বিদ্যাসাগর। আমায় ক্ষমা কর তোমরা, আমি আর পারব না। আমার আর সামর্থ্য নেই।

হরেন। [ইতস্তত করিয়া] কিন্তু—

বিদ্যাসাগর। [ঈষৎ উত্তেজিত] তুমি যা বলবে তা আমি জানি, না ব'লে যে ছাড়বে না, তাও জানি; কিন্তু আমার কথাটা আগে শেষ করতে দাও। ক্রমাগত বিধবা-বিবাহ দিয়ে দিয়ে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। মানসিক শক্তি যা ছিল তাও নিঃশেষ হয়েছে। আমাকে রেহাই দাও তোমরা।

হরেন ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন

হরেন্। আমি বড় মুশকিলে পড়েছি। আপনি যে বিধবাটির সঙ্গে আমার ভায়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, সে তাকে পরিত্যাগ ক'রে পালিয়েছে। মেয়েটি এখন আমার ঘাড়েই এসে পড়েছে, শুধু তাই নয়, পাড়াগাঁয়ে বাস করি, সবাই একঘরে করেছে আমাকে, ধোপা নাপিত বন্ধ—

বিদ্যাসাগর। আমাকে ব'লে কি হবে! তার নামে আদালতে নালিশ করগে যাও।

হরেন। আদালতে!

বিদ্যাসাগর। জোচ্চোর পাজি বদমাইসদের শাসন করবার অধিকার আদালতের, আমার নয়।

হরেন। আপনিই তো বিয়ে দিয়েছিলেন, এখন যদি—

বিদ্যাসাগর। তোমার ভাই কচি খোকা কিনা, তাকে ভুলিয়ে আমি তার বিয়ে দিয়েছি! বণ্ডে সই ক'রে নগদ টাকা নিয়ে তবে বিয়ে করেছে সে, অমনই করে নি!

হরেন চুপ করিয়া রহিলেন। বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন

সে হারামজাদা গেল কোথায়!

হরেন। সে শান্তিপুরে গিয়ে লুকিয়ে আবার একটা বিয়ে করেছে।

বিদ্যাসাগর। আবার বিয়ে করেছে! [সহসা যেন কোন অস্পৃশ্য বস্তুর সান্নিধ্যে সঙ্কুচিত হইলেন] স'রে যাও, স'রে যাও এখান থেকে, চণ্ডাল চণ্ডাল তোমরা, তোমাদের ছায়া মাড়ালে পাপ হয়!

হনহন করিয়া বাংলোর দিকে আগাইয়া গেলেন

হরেন। [অর্দ্ধস্বগত] ভগবানের বিধান উল্টে দেবার বেলায় পাপ হয় না!

বিদ্যাসাগর যে ইহা শুনিতে পাইবেন তাহা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই, কিন্তু বিদ্যাসাগর শুনিতে পাইলেন এবং শুনিয়াই ফিরিলেন

বিদ্যাসাগর। ভগবানের সঙ্গে আলাপ আছে নাকি তোমার? তাঁর বিধান নিয়ে আলোচনা করেন তোমার সঙ্গে তিনি?

হরেন অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন

হরেন। না, মানে আমি বলছিলাম যে, ভগবানের বিধান ওল্টানো যায় না। এত বিধবার তো বিয়ে হ'ল, কিন্তু ফের আবার অনেকে বিধবা হয়েছে। অদৃষ্টে যা থাকে, তা—

বিদ্যাসাগর। এত বড় অদৃষ্টবাদী যদি তুমি, তা হ'লে বিপদে প'ড়ে প্রতিকারের আশায় এতদূর ছুটে এসেছ কেন? ঘরে ব'সে থাকলেই হ'ত অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে!

হরেন। [আমতা আমতা করিয়া] না—তা—বিধবারা—

বিদ্যাসাগর। যাদের স্বামী দ্বিতীয় বার ম'রে গেল, আবার বিয়ে করুক না তারা, পথ তো বন্ধ নেই, পুরুষরা তো হরদম করছে।

হরেন। [বিস্মিত] আবার বিয়ে করবে!

বিদ্যাসাগর। করুক না, ক্ষতি কি, তুমি যে পাঁচবার ফেল ক'রে বি. এ. পাস করেছ, তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে! দুবার ফেল করবার পর বিধাতার বিধান ব'লে কপালে হাত দিয়ে ব'সে থাকলেই পারতে।

হরেন। [প্রতিবাদেচ্ছু কিন্তু ভীত] পরীক্ষা পাস করা আর বিয়ে করা—

বিদ্যাসাগর। কিচ্ছু তফাত নেই, পরীক্ষা পাস করলে ছেলেদের হিল্লে হয়, আর বিয়ে করলে মেয়েদের হিল্লে হয়—

হরেন। [সবিনয়ে] আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে আসি নি, সে ক্ষমতাও নেই আমার, আমাকে—

বিদ্যাসাগর। [অধীর ভাবে] না, আমি কিছু করতে পারব না। গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে লোককে ঘুষ দিয়ে দিয়ে এই হতভাগা সমাজের ভাল করবার চেষ্টা যতদিন পেরেছি করেছি। [সহসা উচ্চতর কণ্ঠে] আমার জন্যে আমার কাছে কেউ কখনও আস নি তোমরা, তোমরা বরাবর এসেছ আমাকে দোহন করতে, শোষণ করতে। আর কিছু নেই, দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে গেছে, যাও এবার।

হরেন। আপনি তাড়িয়ে দিলে কোথায় যাব বলুন?

বিদ্যাসাগর। উচ্ছন্ন যাও! তোমাদের জ্বালায় অস্থির হয়ে এই

তেপান্তর মাঠে পালিয়ে এসে সাঁওতালদের ভেতর বাস করছি, তবু আমায় রেহাই দেবে না তোমরা?—এ কি পাপ!

হরেন একটু অপমানিত বোধ করিলেন, ঈষৎ বিচলিতও হইলেন

হরেন। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। ওই বিধবাটিকে নিয়ে আমি কি করব ব'লে দিন।

বিদ্যাসাগর। ওর গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলগে যাও, আপদ চুকে যাক।

হরেন নীরব। বিদ্যাসাগর বলিয়া চলিলেন

ও ছাড়া আর কিছু করবার নেই, ওদের ছেঁচে থেঁতলে দ'লে পিষে শেষ ক'রে দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে থেলো হুঁকোয় তামাক টানগে যাও। অনেক রকম ক'রে দেখলাম, ওদের বাঁচবার উপায় নেই এ দেশে—এ পিশাচের দেশ।

কুলিটি একটি অবগুণ্ঠিতা নারীকে লইয়া প্রবেশ করিল

এ কি! এ কে?

হরেন। [কাঁচুমাচু] আমি একে একবারে এখানে আনতে সাহস পাই নি, স্টেশনে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম। [কুলির প্রতি] একে আনলে কেন?

কুলি। উনি কাঁদতে লাগলেন যে!

হরেন। তা হ'লে—

কুলি। আমার পয়সা দিন।

হরেন কম্পিত হস্তে ব্যাগ বাহির করিয়া পয়সা দিলেন। তাড়াতাড়িতে যে টিকিটখানা পড়িয়া গেল লক্ষ্য করিলেন না। কুলি চলিয়া গেল

হরেন। [একটু ইতস্তত করিয়া] ইনিই—এঁকেই আমার ভাই—

বিদ্যাসাগর স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। নিদারুণ ক্রোধভরে কি একটা বলিতে গিয়া তিনি থামিয়া গেলেন, অবনতমুখী মেয়েটির দিকে চাহিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন

বিদ্যাসাগর। [হরেনকে] ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থেকে আর কি হবে, যাও, নিয়ে গিয়ে ঘরে বসাওগে।

হরেন মেয়েটিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের প্রস্থানপথের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিদ্যাসাগর স্বগতোক্তি করিলেন

কোন্ পাপে এই হতভাগীরা এদেশে এসে জন্মেছে কে জানে!

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং একখানি চিঠি দিয়া গেল। পত্রখানি পড়িতে পড়িতে বিদ্যাসাগরের মুখ আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল

বাঃ, চন্দ্রমুখী এম. এ. পাস করেছে!

এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে হরেন বাংলো হইতে বাহির হইয়া আসিলেন

কি, খুঁজছ কি?

হরেন। আমার টিকিটখানা কোথায় প'ড়ে গেল! ও, এই যে!

টিকিট কুড়াইয়া লইয়া ব্যাগ বাহির করিয়া সেটি যথাস্থানে রাখিলেন

বিদ্যাসাগর। রিটার্ন টিকিট কেটে এসেছ বুঝি! একে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পরের ট্রেনেই লম্বা দেবে!

হরেন নিরুত্তর

দেখ, এ সব তোলা থাকছে, সুদে আসলে কড়ায় ক্রান্তিতে সব শোধ দিতে হবে একদিন তোমাদের। মনে রেখো, ওরাও ছেড়ে কথা কইবে না, বুঝেছ?

হরেন। [বুঝিতে না পারিয়া] কারা?

বিদ্যাসাগর। এই মেয়েরা। ওদেরও সুদিন আসছে, ওরাও লেখাপড়া শিখছে। আমি তখন বেঁচে থাকব না হয়তো। [সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া] তখন আর একবার আমি জন্মাতে রাজি আছি এ দেশে, যেদিন আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েরা বাধা না হয়ে শক্তি হবে, আপদ না হয়ে অলঙ্কার হবে, সেদিন আবার যেন জন্মাই আমি এ দেশে—

বলিতে বলিতে আবেগভরে তিনি থামিয়া গেলেন। দূর চক্রবালরেখায় স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি যেন সেই অনাগত ভবিষ্যৎকেই দেখিতে লাগিলেন। কয়েকটি নিবিড় মুহূর্ত নীরবে অতিবাহিত হইয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা। দিনময়ী ও দীনবন্ধু কথা কহিতেছেন

দিনময়ী। তুমি আমাকে কর্ম্মাটাঁড়ে নিয়ে চল ঠাকুরপো, শুনছি সেখানে ওঁর শরীরটা ভাল নেই, আমি দুর্গা ঠাকুরপোকেও খবর দিয়েছি।

দীনবন্ধু। তা বেশ করেছ। কিন্তু তুমি নারাণকে নিয়ে যাও, আমার ছুটি কম।

দিনময়ী। নারাণকে নিয়ে যাবার হ'লে আগেই যেতুম।

দীনবন্ধু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন

দীনবন্ধু। কেন বাধাটা কি ?

দিনময়ী। বলেছেন, তার মুখদর্শন করব না।

দীনবন্ধু। কেন, হঠাৎ ?

দিনময়ী। দোষ নারাণেরই। [একটু থামিয়া] আমার কপালেরই দোষ।

দীনবন্ধু। বিধবা বিয়ে ক'রেই ওর মতি-গতি বিগড়ে গেল, যে যাই বলুক, এই বিধবাগুলো অপয়া।

দিনময়ী। ও কথা ব'লো না, ও কথা বলতে নেই। [অস্ফুট স্বরে] কেউ অপয়া নয়, কেউ অপয়া নয়, সবাই ভাল।

দীনবন্ধু। এখানে এসেই আর একটি যা খবর পেলাম, তা তো ভয়ঙ্কর।

দিনময়ী। কি ?

দীনবন্ধু। এই পাড়াতেই আজ একটি বিধবা-বিয়ে হবে, বরপক্ষের লোকেরা নিমন্ত্রণ-পত্রে ছাপিয়ে দিয়েছে যে, দাদা নাকি বিয়েতে থাকবেন। বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা একদল গুণ্ডা ঠিক ক'রে রেখেছে যে, বিয়ে পণ্ড ক'রে দেবে ; দাদা যদি তাতে বাধা দিতে চান, দাদাকে মারবে।

দিনময়ী। [শিহরিয়া উঠিলেন] ওমা, মারবে !

দীনবন্ধু। তাই তো শুনেছি, ভাগ্যে দাদা এখানে নেই ; তা ছাড়া তুমি যখন যেতে চাইছ, তখন আসবারও কোন খবর নেই নিশ্চয়।

দিনময়ী। অনেক দিন কোন চিঠিপত্র পাই নি, তুমি আমাকে আজই নিয়ে চল ঠাকুরপো, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে, ডান চোখের পাতাটা ক্রমাগত নাচছে কাল থেকে।

দীনবন্ধু। দেখি, ছুটি তো বেশি নেই, এর মধ্যে বীরসিংহায় যাওয়া দরকার একবার।

দিনময়ী। আমাকে পৌঁছে দিয়েই চ'লে এসো তুমি।

দীনবন্ধু। দেখি।

বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে অবগুণ্ঠিতা সেই মহিলাটি, যাঁহাকে হরেন কর্ম্মাটাঁড়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন

দীনবন্ধু। [প্রণামান্তে] আপনি চ'লে এলেন যে?

বিদ্যাসাগর। আমাকে কি সুস্থির হয়ে থাকতে দেবে এরা? হরেন একে নিয়ে গিয়ে হাজির, এর একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে আসতে হ'ল, কি যে করব তাও জানি না। [দিনময়ীকে] আপাতত এইখানেই থাক।

দিনময়ী। বেশ তো। [মহিলাটিকে] এস।

তাঁহাকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। তোমার এখন ছুটি নাকি?

দীনবন্ধু। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি, আজ বউঠানকে নিয়ে কর্ম্মাটাঁড়ে যাব ভাবছিলাম, আপনার শরীরটা খারাপ শুনলাম, সেখানে—

বিদ্যাসাগর। তুমি একবার রাজকেষ্টকে খবর দাও দিকি, এ মেয়েটির একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলি।

দীনবন্ধু। ডেকে আনব তাঁকে?

বিদ্যাসাগর। পারলে ভালই হয়।

দীনবন্ধু। যাচ্ছি।

চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় ডাক্তার দুর্গাচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দুর্গাচরণ। এই যে তুমিই এসে গেছ দেখছি, তোমার শরীর খারাপ শুনে বউঠান আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তারপর, আছ কেমন?

বিদ্যাসাগর। খাসা আছি।
দুর্গাচরণ। বিয়ের নিমন্ত্রণে এসেছ বুঝি?
বিদ্যাসাগর। কার বিয়ে?
দুর্গাচরণ। এ পাড়ায় আজ যে একটি বিধবা-বিবাহ হচ্ছে—এ খবর পাও নি তুমি? নিমন্ত্রণ-পত্রে তো তোমার নাম ছাপা হয়েছে দেখলাম।
বিদ্যাসাগর। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। না, আমি সেজন্যে আসি নি, আমি এসেছি অন্য কাজে।
দুর্গাচরণ। ও বিয়েতে না যাওয়াই ভাল।
বিদ্যাসাগর। এসেছি যখন, যাব না কেন?
দুর্গাচরণ। শুনছি, বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা একটা মারপিট ক'রে বিয়েটা পণ্ড ক'রে দেবার চেষ্টায় আছে, এমন কি তোমাকেও মারবে ব'লে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে।
বিদ্যাসাগর। তা আর আশ্চর্য্য কি, বীরপুরুষের তো অভাব নেই দেশে।
দুর্গাচরণ। যত সব ছোটলোকের কাণ্ড, যেও না ওখানে। কি দরকার?
বিদ্যাসাগর। এই স্যাঁতসেঁতে দেশে পুতুপুতু ক'রে বেঁচে থাকারই বা কি দরকার?
দুর্গাচরণ। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে—একজন দেখা করতে চায় তোমার সঙ্গে, নিয়ে আসি তাকে। ভারী আগ্রহ তার।
বিদ্যাসাগর। কে?
দুর্গাচরণ। দাঁড়াও, নিয়ে আসি, এলেই দেখতে পাবে। তুমি কোথাও বেরিও না, আসছি আমি।

চলিয়া গেলেন। বাহিরে দূরে একটা কোলাহল উঠিল। রাজকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। এস, দীনো কোথা গেল।
রাজকৃষ্ণ। আসছে, কার সঙ্গে কথা কইছে।

বিদ্যাসাগর। দীনোর মুখে শুনেছ বোধ হয়, আমি এসেছি হরেনের সেই—

রাজকৃষ্ণ। হ্যাঁ, শুনেছি সব। হরেনের ভাইটা সত্যিই আবার বিয়ে ক'রে পালিয়েছে। কি করা যায় বল তো?

বাহিরের কোলাহল নিকটবর্ত্তী হইল

রাজকৃষ্ণ। এরা বিয়েটাকে সত্যি সত্যি পণ্ড করবে দেখছি। শুনেছ সব ঘটনা?

বিদ্যাসাগর। শুনেছি।

রাজকৃষ্ণ। কি কাণ্ড দেখ দিকি, আশ্চর্য্য!

বিদ্যাসাগর। এখনও আশ্চর্য্য হচ্ছ তুমি এইটেই আশ্চর্য্য। আমার নিজেরই এখন মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো আমিই ভুল করেছি, সারাজীবন সর্ব্বস্ব ব্যয় ক'রে পুঁইগাছে আঙুর ফলাবার চেষ্টা করেছি। [সহসা] কিন্তু ভাই রাজু, সত্যি ক'রে বল তো, একটা বিধবার মুখেও কি হাসি ফোটাতে পারি নি আমি, একজনের জীবনেও কি সুখ ফিরিয়ে আনতে পারি নি, এত দিনের এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে?

রাজকৃষ্ণ। সকলের খবর তো জানি না, তবে সুখী হয়েছে বইকি কেউ কেউ।

বিদ্যাসাগর। [সাগ্রহে] হয়েছে?

রাজকৃষ্ণ। নিশ্চয়ই হয়েছে, হবার তো কথাই।

বাহিরের কোলাহলটা আরও নিকটবর্ত্তী ও স্পষ্টতর হইল। দিনময়ী বাহির হইয়া আসিলেন

দিনময়ী। কিসের এত গোলমাল?

ব্যস্তসমস্ত হইয়া দীনবন্ধু প্রবেশ করিলেন ও তাড়াতাড়ি কপাটে খিল লাগাইয়া দিলেন

বিদ্যাসাগর। কি হ'ল?

দীনবন্ধু। একদল গুণ্ডা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে হল্লা করছে।

বিদ্যাসাগর। করলেই বা, কপাট বন্ধ করছিস কেন?

দীনবন্ধু। মানে তারা বলছে—
বিদ্যাসাগর। আমাকে মারবে, এই তো?
দীনবন্ধু। মানে, তারা বিয়েটা পণ্ড ক'রে দিতে চায়।
বিদ্যাসাগর। কারও সাধ্য নেই বিয়ে পণ্ড করে, এ বিয়ে হবেই।

কোলাহল আরও নিকটবর্ত্তী হইল, বিদ্যাসাগর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন

রাজকৃষ্ণ। কি দরকার এখন বাইরে যাবার?
দীনবন্ধু। আপনাকে অনুনয় করছি, আপনি এখন বাইরে যাবেন না।
দিনময়ী। তোমার পায়ে পড়ছি, এখন বেরিও না তুমি।

বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না, কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন

দিনময়ী। ঠাকুরপো, তুমি যাও ওঁর সঙ্গে।
রাজকৃষ্ণ। আমি যাচ্ছি।

চলিয়া গেলেন

দীনবন্ধু। কোন ভয় নেই, দাদাকে দেখলেই ব্যাটারা পালাবে সব, ওদের মুখেই যত আস্ফালন।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। যে মাঠাকরুণটি এখন এলেন, তিনি কেমন যেন করছেন।
দিনময়ী। কি?
দীনবন্ধু। যাও তুমি, দেখ গিয়ে।

দিনময়ী চলিয়া গেলেন

দীনবন্ধু। ছুটি নিয়ে এলাম একটু বিশ্রাম করতে, এ এক ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি।

বাহিরের গোলমাল কমিয়া গেল। দীনবন্ধু ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় নারায়ণচন্দ্র আসিয়া প্রবেশ করিলেন

নারায়ণ। [চুপিচুপি] শুনলাম বাবা এসেছেন?
দীনবন্ধু। হ্যাঁ, তুই এতক্ষণ ছিলি কোথা?
নারায়ণ। বাড়িতেই ছিলাম, তবে—

দীনবন্ধু। কি, ব্যাপার কি বল তো, হয়েছে কি, কি করেছিস তুই?

নারায়ণ। তা আমি আপনাকে বলতে পারব না, কিন্তু আমি আমার অপরাধের জন্যে সত্যিই দুঃখিত, বাবার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে চাই, কিন্তু তাঁর কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না আমার। আপনি যদি একটু তাঁকে—

দীনবন্ধু। ও বাবা, সে আমি পারব না, তোমারই মাকে গিয়ে ধর বরং, তিনি যদি কিছু—[বাহিরের খোলা দ্বারের দিকে চাহিয়া] দাদা আসছেন, চল, আমরা ভেতরে যাই।

উভয়ের প্রস্থান। বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। হেরে গেলাম, ভেঙে চুরে পণ্ড ক'রে দিয়ে গেল সব।

রাজকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন

রাজকৃষ্ণ। শুনছি এর পরেই আর একটা লগ্ন আছে, দেখি যদি তাতে বিয়েটা হয়ে যায়, আমি একটু সামলে-সুমলে দিইগে। আমি যাচ্ছি, বুঝলে?

বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না। রাজকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। উঃ, কি দেশ!

দিনময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দিনময়ী। মেয়েটি পাগল নাকি?

বিদ্যাসাগর। কেন, কি করছে?

দিনময়ী। ঘ'ষে ঘ'ষে মাথার সিঁদুর তুলে ফেলেছে, বলছে, আমাকে একটা থান দিন।

মেয়েটি প্রবেশ করিল। সত্যই সে মাথার সিঁদুর ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে। চুল আলুলায়িত

মেয়েটি। [দিনময়ীকে] কই, আমাকে একটা থান-কাপড় দিন।

বিদ্যাসাগর। তুমি অমন করছ কেন? তোমাকে তো বলেছি, তোমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আমি—

মেয়েটি। [তিক্তকণ্ঠে] আর আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে না। আপনার ব্যবস্থা আমি জানি, ও নোংরামি আমি আর করব না, বিধবা হয়ে—ছি ছি ছি ছি—আমারও মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, তাই—

বিদ্যাসাগর। তুমি অমন কথা বলছ কেন? তুমি তো কোন অন্যায় কর নি মা, শাস্ত্রে—

মেয়েটি। আপনাদের শাস্ত্র থাক, হিঁদুর ঘরের বিধবা আমি, বামুনের মেয়ে—ছি ছি ছি—আমায় ছেড়ে দিন, আমি কাশী চ'লে যাই। [কাশীর উদ্দেশ্যে নমস্কার করিল] আমার আর কোন গতি নেই, শাড়ি সিঁদুর আর চাই না আমি, আমাকে একটা থান দিন দয়া ক'রে।

দিনময়ী বিদ্যাসাগরের দিকে চাহিলেন। বিদ্যাসাগর নতমুখে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন

বিদ্যাসাগর। দাও, তাই দাও, থানই দাও একখানা।

দিনময়ী। এস।

মেয়েটিকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। মাটির গুণ, কুসংস্কার সহজে ঘুচতে চায় না।

নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন

এই তো হ'ল! সারা জীবন ধ'রে কি করলাম! যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কেউ বুঝল না; শাস্ত্র ঘেঁটে বিধান বার করলাম, কেউ মানল না; আইন পাস করালাম, তাতেও কিছু হ'ল না; ঘুষ দিয়ে লোক ধ'রে ধ'রে বিয়ে দিলাম, তারা দু হাত পেতে টাকাগুলো নিলে, কিন্তু মেয়েগুলোকে ফেলে পালাল; আজ দেখলাম,

গুণ্ডা লাগিয়ে বিয়ে ভেঙে দিচ্ছে ; যাদের দুঃখ মোচনের জন্যে এত করলাম, তারাও সুখী নয়—এই তো গাল দিতে দিতে সিঁদুর মুছে থান প'রে কাশী চলল। [কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন] আমিই হয়তো ভুল করেছি—ভুল, ভুল, মহাভুল—হয়তো রসিককৃষ্ণ-বঙ্কিমের কথাই ঠিক, জোর ক'রে কিছু করা যায় না ; কিন্তু, অ্যাঁ—[আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন] হ্যাঁ, ভুলই করেছি—নিজের গোঁ নিয়ে মেতে ছিলাম, চোখ চেয়ে ভাল ক'রে দেখি নি হয়তো।

দুর্গাচরণ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি মেয়ে, মাথায় চওড়া সিঁদুর, পরনে লালপেড়ে শাড়ি, কোলে সুন্দর একটি শিশু

দুর্গাচরণ, ব্যর্থ—ব্যর্থ—সব ব্যর্থ হয়ে গেল—হেরে গেলাম।

দুর্গাচরণ। কিসে হেরে গেলে ?

বিদ্যাসাগর। সব দিক দিয়ে হেরে গেলাম ভাই। এ মেয়েটি কে ?

দুর্গাচরণ। এটি তোমারই কীর্ত্তি, বালবিধবা ছিল, অতি কষ্টে দিন কাটছিল বেচারীর এর ওর তার দুয়ারে, আবার বিয়ে ক'রে সুখে ঘরকন্না করছে কেমন দেখ! কি চমৎকার ছেলেটি হয়েছে দেখ দিকি!

মেয়েটি বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করিল

বিদ্যাসাগর। তাই নাকি! [সহসা উচ্ছ্বসিত] এই তো, এই তো, এই তো, এই তো, দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির মাঝখানে এই তো একটি সবুজ শিষ গজিয়েছে—বাস্!

—যবনিকা—

"বনফুল"

ওস্তাদের মার

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

হাত একবার এসে গেলে তারপর আর বাঘই বল, গণ্ডারই বল, মারা কিছু শক্ত নয়। আদতে শক্ত হচ্ছে আরম্ভ করাটা। গোড়ার ট্রেনিং যার কাঁচা থেকে যাবে, সে হাজার বছর বন্দুক ঘাড়ে ছুটোছুটি ক'রেও শিকারী হতে পারবে না। সে রকম লোকের শিকার করা মানে লটারি খেলা, দেখলাম বাঘ, ছুঁড়লাম গুলি, লাগল তো বাঘ মরল, না লাগল তো নিজে মরলাম। ওকে শিকার বলে না। সত্যিকার শিকারী যে হবে, তাকে জীবজন্তুর চলাফেরা আচার-ব্যবহার পছন্দ-অপছন্দ সব নখদর্পণে জেনে নিতে হবে; জানতে হবে কখন তাকে কি অবস্থায় পাওয়া যায়, কোথায় গুলি বসাতে পারলে সে মরে। তা নইলে অদৃষ্টের ওপর হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে ঘোড়া টানা, সেটা ছেলেমানষি তো বটেই, শিকারীর নিজের পক্ষেও বিপজ্জনক। এইজন্যেই বলে, বই প'ড়ে শিকার শেখা যায় না, শেখা যায় শিকারের গল্প। শিকার শিখতে হয় গুরুর কাছে। আসলে শিকার ব্যাপারটা ক্ষাত্রধর্ম্মের একটা অঙ্গ কিনা, একটা সাধনার সামিল। তাই খাঁটি গুরুর সাক্ষাৎ যে পেয়ে যায়, সে তাঁর আশীর্ব্বাদে শিকারী ব'লে নাম পায়; আর সেটি যে না পায়, তার শিক্ষাও হয় না, বাঘ হয়তো তার হাতেও দৈবাৎ দুটো একটা মরে, কিন্তু তাই ব'লে শিকারী তাকে বলা চলে না।

আমার যাঁর কাছে বাঘ মারার হাতে-খড়ি হয়, তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য্য পুরুষ, যাকে বলে—গুরুর মত গুরু। অমন গুরুর দেখা পেয়েছিলাম ব'লেই কান্তি চৌধুরী আজ কান্তি চৌধুরী। আর তা যদি না পেতাম, তবে হয়তো কান্তি চৌধুরীর নামও কেউ জানত না দেশে, চাকুরে ছিলাম, চাকরি করতাম, পেন্‌শন পেতাম, তারপর একদিন ম'রে যেতাম ডিসেন্টি বা কালাজ্বর হয়ে, লোকে টেরও পেত না।

আজ যদি কান্তি চৌধুরী মরে, দেশে একটা জানাজানি হবে, দশজনে বলবে—একটা লোকের মত লোক মরেছে। এ সমস্তই আসলে তাঁর আশীর্ব্বাদ। অথচ তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল একেবারে হঠাৎ, যাকে বলে—দৈবের খেলা। বাঘ মারতে আমারও সেই প্রথম যাওয়া। সেই গল্প তোমাদের বলছি।

কলেজ ছেড়ে তখন বেরিয়েছি, চাকরিতেও ঢুকেছি কিছুদিন। শিকারের নেশা তখন জ'মে গেছে, কিন্তু হাতে-কলমে বিদ্যের দৌড় হরিণ আর বরা অবধি। বাঘ মারবার শখ প্রাণে এসেছে কিছু কিছু, এক-আধবার ছোটখাটো বাঘকে কায়দা করবার চেষ্টাও করেছি, কিন্তু বন্দুক ঘাড়ে ক'রে কাদাকিচড় ভাঙা আর রাত জেগে মাচানে ব'সে চোখ লাল করাই সার হয়েছে, রাত পোয়ালে ঝিমুতে ঝিমুতে আর খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির ছেলে বাড়িতে ফিরে এসেছি। বাঘ মারতে পারাটাকে তখন দেবদুর্লভ ঘটনা ব'লেই জেনে রেখেছিলাম। সেই কাণ্ড একদিন আমার কাছে ডালভাতের সামিল হয়ে যাবে, এ কথা তখন ভাবতেও পারতাম না।

আপিসে দিন চারেক ঈস্টারের ছুটি ছিল, ভাবলাম, এই ফাঁকে একবার যেদিকে হোক বেরিয়ে পড়া যাক। আপিসের একটি বন্ধু, আমাদেরই বয়সী, বললেন, চলুন আমার দেশে, রংপুর। দেশেও যাওয়া হবে, বেড়ানোও হবে।

আমি বললাম, দেশে তো আপনার যাওয়া হবে বুঝলাম, কিন্তু আমার বেড়ানোটা হচ্ছে কোথায় মশায়? রংপুরে তো শুনেছি খালি তামাকের চাষ, তামাক-ক্ষেতে গিয়ে কি শুঁয়োপোকা মারব?

সে ভদ্রলোকের নাম যতীনবাবু, যতীন বোস। তিনি বললেন, আরে ভাই, চলুনই না আগে, তারপর দেখা যাবে কত জানোয়ার মারতে পারেন আপনি।

আমি বললাম, তার মানে? মারবার মত জন্তুজানোয়ার সত্যি আছে নাকি আপনাদের দেশে?

যতীনবাবু বললেন, বলছি তো গিয়েই দেখবেন। বন্দুক কামান

আপনার যা যা নেবার আপনি গুছিয়ে নেবেন, জন্তুজানোয়ারের ভার আমার।

আমি বললাম, বেশ।

রেল-স্টেশন থেকে গরুর গাড়ি, তারপর নৌকো, তারপর আবার গরুর গাড়ি, এমনি ক'রে চলতে চলতে সন্ধ্যে নাগাদ তাঁদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। ভোর সকালে ট্রেন থেকে নেমেছি, সারাদিন গরুর গাড়ির ঝাঁকানি খেয়ে আর গাড়োয়ানের চ্যাঁচানি শুনে দেহের মনের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, সে কহতব্য নয়। বাড়ি পৌঁছে সে রাত্রে আর বাড়ির লোকজনদের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় করবার মত উৎসাহ রইল না, কোনমতে চান সেরে নাকে মুখে দুটি গুঁজে শুয়ে পড়লাম, একঘুমেই রাত কাবার।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা হয়ে গেছে। উঠে মুখহাত ধুয়ে বাইরে বৈঠকখানা-ঘরে এসে বসলাম। সেখানে ইতিমধ্যে বেশ আড্ডা জ'মে উঠেছে, বাইরের লোকও অনেক এসেছে। আমি ঢুকতেই যতীনবাবু বললেন, কি শিকারী, বাঘ মারতে যাবেন? যান তো বলুন, ব্যবস্থা করি।

আমি বললাম, আছে নাকি?

যতীনবাবু বললেন, তাই তো বলছে এরা। বাঘ আছে, গরুও নাকি মেরেছে। কই হে, এগিয়ে এস তো, বাবুকে বল কিরকম বাঘ তোমাদের, বাবু মেরে দিয়ে যাবেন।

দোরের কাছ থেকে একটি মানুষ ঘরের ভেতর এগিয়ে এল। রোগা পাতলা কালো চেহারা, মাথায় সাদা চুল, দেখলে মনে হয়, একটা শরের ডাঁটার মাথায় ফুল ধরেছে। শুনলাম, সে নাকি গুণী লোক, সে অঞ্চলে শিকারের যা কিছু সুলুক-সন্ধান সব সে রাখে। সামনে এসে সেলাম ক'রে উবু হয়ে মেঝেতে বসল, বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, আছে বাঘ।

আমি বললাম, কি বাঘ, গো-বাঘা?

সে বললে, আজ্ঞে না, বড়।

হয়তো শুনিয়ে দিতাম তাকে, যতীনবাবুর এক দাদা আমার কানে কানে বললেন, কিছু মনে করবেন না আপনি। ওর কথার রকমই ঐ, আমরা তো আমরা, আমাদের বাবা কাকাদের সঙ্গেও অমনি ক'রে কথা কয় ও।

আমি বললাম, স'য়ে যান কেন আপনারা? এক দিন ধমক খেলেই আর দ্বিতীয় দিন সাহস করবে না।

তিনি বললেন, ওরে বাপ, ওকে ঘাঁটাবে এমন সাহস কারু নেই। আসল কথা কি জানেন, গ্রামের অনেক শত্রু ও নিকেশ করেছে, একা হাতে শুধু বল্লম নিয়ে বুনো ভালুক বুনো বরা মেরেছে অনেকবার। আমাদের দেখছেনই তো বনের মধ্যে বাস, জন্তুজানোয়ার নিয়ে নিত্যি কারবার, তার হাত থেকে যে বাঁচিয়ে রাখছে, সে মেজাজ দেখালেও সইতে হবে বইকি।

এনায়েৎ তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। যতীনবাবু বললেন, ঐ কথা রইল তা হ'লে?

এনায়েৎ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বিকেল নাগাদ এসে খবর দিয়ে যাব আমি। ব'লে সেলাম ক'রে চ'লে গেল।

খেতে ব'সে যতীনবাবুর বাবা বললেন, শিকারে সত্যি যাচ্ছ নাকি তোমরা?

যতীনবাবু বললেন, খোঁজ যদি পাই, যাব। দেখি, এনায়েৎ কি খবর আনে।

তাঁর বাবা বললেন, এনায়েৎ যখন ব'লে গেছে, সে ঠিকই আনবে খবর। এনায়েৎ বাজে কথা কয় না।

আমি বললাম, এনায়েৎ লোকটি কে?

যতীনবাবুর বাবা বললেন, ও লোকটি হচ্ছে আমাদের একজন আশ্রিত প্রজা। ওদের বংশের ব্যবসাই ঐ, জানোয়ারের সুলুক-সন্ধান রাখা, শিকারের স্কাউট বলতে পারেন এদের। এনায়েতের বাপকে আমার বাবা অন্য জায়গা থেকে এনে বসিয়েছিলেন এইজন্যে। তখনকার দিনে জমি রাখা সোজা কথা ছিল না তো, বাঘ-ভালুকের সঙ্গে লড়াই

ক’রে তবে জমি চষতে হ’ত, ফসল বুনতে হ’ত। এখন তো জঙ্গল নেইই বলতে গেলে। এখানে ছিল গহন বন, সেই বন কাটাবার সময় এনায়েতের বাবাকে আমার বাবা নিয়ে আসেন। এনায়েৎ ছেলেবেলা থেকে এই কর্ম্মই শিখেছে, আর কোন কাজ জানেও না ও। একটি মুসলমান তালুকদার আছেন এখানে খানসায়েব ব’লে, এখন বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু এক কালে সত্যি খুব বড় শিকারী ছিলেন। এনায়েৎ চিরকাল তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই শিকার ক’রে বেড়াত। তিনি এখন শিকার ছেড়ে দিয়েছেন। আমরাও বড় একটা কেউ যাই না, যতীনই বাড়ি-টাড়ি এলে কালেভদ্রে একদিন বেরোয়। এনায়েতের হয়েছে মুশকিল, কাজও নেই, ব’সেও থাকতে পারে না, অভ্যাসের বশেই খুঁজে খুঁজে জেনে রাখে, কোথায় কোন্ জানোয়ার আছে।

আমি বললাম, খানসায়েব লোকটি কে বলুন তো? এনায়েৎও এঁর নাম করছিল তখন।

যতীনবাবুর বাবা বললেন, করবার কথা, তাঁর হাতেই একরকম ও মানুষ হয়েছে বলতে গেলে। আর লোকটিও চমৎকার, একবার আলাপ হ’লে আর ভোলা যায় না। যতীন, এঁকে একবার নিয়ে যাও না তাঁর কাছে।

আমি বললাম, বেশ তো, আজই বিকেলে যাওয়া যাবে এনায়েৎ এলে।

বিকেলবেলা এনায়েৎ এসে খবর দিলে, বাঘ আছে। গাঁয়ের বাইরে একটেরে এক মজা দীঘি আছে, তার ওপরে তারাগাছ আর নলখাগড়ার বন, দীঘির পাড়ে এক দিকে বড় বড় গাছের জঙ্গল, আরেক দিকে হোগলা-বন। সেইখানেই বাঘ আড্ডা গেড়েছে। কাদের একটা বাছুরও নাকি মেরেছে সেই দিনই।

যতীনবাবু বললেন, তবে আর কি, চল বেরিয়ে পড়ি।

এনায়েৎ বললে, এখন যাবেন কোথায়? বন ঠেঙিয়ে তাকে বার করা যাবে না। যা নলখাগড়ার বন হয়েছে, বাঘ যদি একবার তার তলায় ঢুকে জলে ডুবে ঘাপটি মারে, ঠেঙাড়ের বাবার সাধ্যি নেই তাকে

খুঁজে বার করবে। ও আদার বেঁধে মাচান ক'রে মারতে হবে, তার ব্যবস্থা কাল।

যতীনবাবু বললেন, বেশ কাল সকালেই তা হ'লে আসবে তুমি। কিন্তু কাল পর্য্যন্ত দেরি করব, এর মধ্যে যদি বাঘ জায়গা ছেড়ে চ'লে যায়?

এনায়েৎ বললে, যাবে না। গাঁয়ে এখনও খবর চাউর হয় নি, লোকেও গরু বাছুর সামলাচ্ছে না, এইখানে থাকলেই তার সুবিধে। আর তার থাকবার মত এমন সুবিধের জায়গাও মাইল দশেকের ভেতর আর নেই। খুব জোর তাড়া না খেলে আর সে ঠাঁই ছেড়ে নড়ছে না।

আমি বললাম, বেশ, তুমি ব্যবস্থা কর। লোকজন যা দরকার নিয়ে যাও।

যতীনবাবু বললেন, সে বলতে হবে না, সেসব ওর জানা আছে, ওই ব্যবস্থা ক'রে নেবে 'খন।

একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম, বাঘ মারাটাকে যতখানি বৃহৎ ব্যাপার ব'লে আমি তখন ভাবতাম, এরা দেখলাম মোটেই তা ভাবে না। যতীনবাবুকে জানতাম আপিসের নিরীহ চাকরে, চুপচাপ আসেন যান কাজকর্ম্ম করেন, তাঁর ভেতরে যে আবার এ বস্তু আছে, তা কথাবার্ত্তায় চালচলনে কোন দিন টেরও পাই নি। তাঁর বাবাও দেখলাম নির্ব্বিকার—ছেলে বললে বাবা বাঘ মারতে যাচ্ছি, বাপ বললেন যাও, মোজাটা প'রে যেয়ো, নইলে মশায় কামড়াবে। পরে অবিশ্যি এরকম নির্ব্বিকার অবস্থা আমারও এসে গিয়েছে, কিন্তু তখন সত্যি বলছি, দেখেশুনে আমার বুকের ভেতর দুড়দুড় করতে লাগল। খালি মনে হতে লাগল, এবার বাবা শক্ত ঘানিতে পড়েছি। খুব তো বাহাদুরি ক'রে এসেছি শিকার করতে, অথচ এসে দেখছি, এরা সবাইই সে বিদ্যেয় ওস্তাদ, একা আমিই আনাড়ী। কেলেঙ্কারি যদি কিছু ক'রে ফেলি, তবে আর মুখ ঢেকে এখান থেকে পালাবার উপায় থাকবে না। বলব কি ভাই, সে রাত্তিরে আমার ঘুমই হ'ল না ভাল ক'রে,

[illegible] জেগে জেগে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, হে মা কালী, তোমার নাম নিয়ে ঝুলে পড়লাম, শেষরক্ষাটা তুমি ক'রো।

দুপুরবেলা এনায়েৎ এসে জানালে, মাচানের জায়গা ঠিক হয়ে গেছে, মাচান করতে লোকও লাগিয়ে দিয়ে এসেছে সে। বললে, টাকা দিন, তাদের মাইনে দিতে হবে, আর আদার কিনতে হবে।

যতীনবাবু বললেন, দিচ্ছি। আদার কি কিনবে?

এনায়েৎ বললে, দেখি, বাছুর একটা কার কাছে পাই!

আমি বললাম, বাছুর কেন, পাঁঠা নেই? তাই একটা পাও কিনা দেখ।

এনায়েৎ আমার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে। বললে, পাঁঠা খাবে না। কই, দিন টাকা।

মনে হ'ল, তার কথার মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব রয়েছে। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠল, ধমকে বললাম, না, খাবে না তোমাকে ব'লে পাঠিয়েছে। বাছুর-টাছুর মারা হবে না, যা বলছি তোমাকে তাই কর। পাঁঠা কিনে নিয়ে এস।

এনায়েৎ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালে, আগের দিন যে রকম ক'রে আমাকে দেখেছিল, ঠিক তেমনই ক'রে যেন চোখ দিয়ে আমাকে মেপে মেপে দেখলে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, বেশ, তাই আনব।

যতীনবাবু টাকা বার ক'রে দিলেন, টাকা বাজিয়ে গুনে নিয়ে এনায়েৎ চ'লে গেল, আর একটিও কথা কইলে না। যতীনবাবু বললেন, একটু অফেণ্ডেড হয়েছে ও।

আমি বললাম, হোকগে। একটু ধমক খাওয়া দরকার ওর, বড্ড বেশি ইম্পার্টিনেণ্ট।

বিকেলবেলা যতীনবাবু বললেন, খানসায়েবের ওখানে যাবেন বলছিলেন, যাবেন?

আমি বললাম, চলুন।

খানসায়েবের বাড়িটা এদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। খানসায়েব বাড়িতেই ছিলেন, আমাদের নাম শুনে তাড়াতাড়ি ক'রে বেরিয়ে এলেন, অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন।

এক-একজন লোক থাকে, তাদের দেখলেই মনে শ্রদ্ধা আসে। এই ভদ্রলোককে দেখেই মনে হ'ল, কাজের লোক বটে। লম্বা ফর্সা চেহারা, সুন্দর মুখের কাট, টিকোলো নাক, সত্যিকার সুপুরুষ যাকে বলে। তায় আবার চেহারার দিকে ভদ্রলোকের নজরও আছে দেখলাম, বাবরি চুল, লম্বা দাড়ি, সমস্ত পেকে সাদা ধবধব করছে, অপূর্ব্ব সুন্দর দেখতে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য দেখলাম তাঁর চোখ দুটি। বড় বড় টানা টানা চোখ, চোখের দৃষ্টিটি ভারি কোমল, ভদ্রতা আর বিনয় যেন ঝ'রে পড়ছে চোখ থেকে। অথচ এই চোখকেই আবার দেখেছি এক মুহূর্ত্তে আগুনের মত জ্ব'লে উঠতে। বন্দুক হাতে ধরবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি বদলে যেত, চোখের কোণ সামান্য কুঁচকে যেত, চোখের মণি উঠত তীক্ষ্ণ হয়ে, মনে হ'ত যেন সে চোখের দৃষ্টি মানুষের গা ফুঁড়ে পেছনকার দেওয়াল পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

খানসায়েব আমাকে বললেন, আপনাদের কথা শুনেছি। আজই যাচ্ছেন মাচানে?

আমি বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল না হোক, পরশুতক কলকাতায় ফিরতেই হবে। কাজেই যা করার আজকালের মধ্যে।

খানসায়েব বললেন, করার আর কিই বা এমন, বাঘ কাছে এলে সময় লাগবার কথা নয়। এক সাবধান থাকতে হয়, চোট খেয়ে সে না পালিয়ে যেতে পারে। সেইটি হ'লেই মুশকিল, চোট-খাওয়া বাঘ বড্ড উৎপাত করে।

আমি বললাম, দেখা যাক, আশা তো করি কায়দা করতে পারব।

খানসায়েব যতীনবাবুকে বললেন, মাচান করতে গেল কে, এনায়েৎ?

যতীনবাবু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, সে থাকতে আর কে করবে?

খানসায়েব বললেন, তা বটে। কাজটা বোঝে ও।

আমি বললাম, কিন্তু কথাবার্ত্তা বড় খারাপ, মান রেখে কথা কয় না। *

খানসায়েব হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, এরই মধ্যে র পেয়ে গেছেন সেটা?

তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, মুখফোঁড় একটু বটে। বাঘ-ভালুকের সঙ্গে থেকে থেকে ওর মেজাজটাই বাঘমার্কা হয়ে গেছে, নইলে মনটা ভাল। আমি কিন্তু ভারি স্নেহ করি ওকে, যদিও ক্যাটক্যাট ক'রে কথা শোনাতে আমাকেও রেয়াত করে না।

আমি বললাম, কি জানি। আমি তো আজ দিলাম এক ধমক লাগিয়ে।

খানসায়েব একটু হেসে বললেন, ঐটি করতে নেই। যাদের নিয়ে শিকার করবেন, তাদের চটিয়ে দিলে চলবে কেন? ওরা বুনো জাত, খুব মাজাঘষা ভদ্রলোকি কথা বলবে, এটা ওদের কাছে আশা করাই ভুল।

আমি আর কথা বললাম না। চ'লে আসবার সময় খানসায়েব বললেন, মাচানে যাচ্ছেন কখন?

যতীনবাবু বললেন, সন্ধ্যের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে, ধরুন নটা নাগাদ।

খানসায়েব বললেন, অত তাড়াতাড়ি না করলেও হয়। ডোরাদার বাঘ গভীর বনের জীব, হঠাৎ লোকালয়ে এসে পড়েছে, চারদিক নিঃঝুম না হ'লে বাসা ছেড়ে বেরোবে না। সে বেরোত গোবাঘা হ'লে, তাদের ভয় কম। আচ্ছা, এস তা হ'লে, কাল সকালে নিশ্চয়ই খবর পাব বাঘ মরেছে?

আমরা বললাম, আশা তো করি।

খেয়েদেয়ে বন্দুক কম্বল আর বোতলে ক'রে চা নিয়ে আমরা গিয়ে মাচানে বসলাম, রাত তখন দশটা বেজে গেছে। আমি, যতীনবাবু আর এনায়েৎ। আমাদের হাতে বন্দুক, এনায়েৎ বন্দুকের ওপর আবার একটা বল্লম নিয়ে এসেছে। মাচানে চ'ড়ে কম্বল দিয়ে গা পা বেশ ক'রে মুড়ে আমরা দুজনে বসলাম, তা না হ'লে এক তিল টেঁকবার উপায় নেই। এক তো সে অঞ্চলে শীতের আমেজ তখনও বেশ রয়েছে, তার ওপর মশা। মাচানটি দেখলাম, বেশ চমৎকার হয়েছে।

নড়াচড়া করতে কিছু অসুবিধা নেই। সেদিক দিয়ে এনায়েতের ... একেবারে পাকা। পাঁঠা একটা এনায়েৎই যোগাড় ক'রে এনেছিল। সে বিরাট পাঁঠা। তার যেমন চেহারা তেমন গলা, তেমনই গায়ের গন্ধ। পাঁঠাটাকে সামনেই একটু ফাঁকা জায়গাতে খোঁটায় বেঁধে দিয়ে এনায়েৎ এসে মাচানে উঠল।

অন্ধকারে একা একা পাঁঠাটার বোধ হয় মন কেমন করছিল, খোঁটায় বাঁধতে না বাঁধতে সে ভ্যা ভ্যা ক'রে চারদিক বাজিয়ে তুলল।

এনায়েৎকে হেসে বললাম, মালটি যোগাড় করেছ ভাল, এর যা গলা আর যা গন্ধ ছেড়েছে, তিন মাইলের ভেতর বাঘ থাকলেও ছুটে এসে হাজির হবে।

ভেবেছিলাম, এনায়েৎ খুশি হবে। সে কিন্তু মোটেই খুশির ভাব দেখালে না, ঘোঁত ঘোঁত ক'রে বললে, মাচানে ব'সে কথা কইবেন না। ভুল আমারই, আমি আর কথা না ক'য়ে চুপ ক'রে গেলাম।

রাত বাড়তে লাগল। চারদিক নিস্তব্ধ, কোথাও সাড়াশব্দ নেই, খালি পাঁঠার চীৎকার, আর মশার ডাক। কম্বল জড়িয়ে জবুথবু হয়ে তিনজনে ব'সে রইলাম। কান খাড়া ক'রে আছি, কোন নতুন শব্দ কানে আসে কি না—একটু নল-পাতার খসখসানি, একটু বা শুকনো কাঠি ভাঙার শব্দ। বাঘের চলতে তার বেশি শব্দ হয় না, সেইটুকু শব্দ পেলেই সতর্ক হয়ে উঠতে হয়। কিন্তু কোথায় শব্দ! কোথায় কি! পাঁঠার মনে পাঁঠা ডেকে যাচ্ছে, বাঘের সাড়াশব্দ নেই। এদিকে পাঁঠার চ্যাচানির ঠেলায় কান ফেটে যাবার যোগাড়।

অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে আমরা যথাসাধ্য চেয়ে আছি। এনায়েৎ মাচানে উঠে একধারে গুঁড়ি মেরে ব'সে পড়ল, তারপর আর তার সাড়াশব্দ নেই। অমন নিস্তব্ধ হয়ে না ন'ড়ে-চ'ড়ে মানুষ থাকতে পারে জানতাম না। হিংসে হ'ল লোকটার ওপর, শ্রদ্ধাও হ'ল, বুঝলাম, মুখ তার যতই খারাপ হোক, সাধনা তার মধ্যে আছে।

একটা কথা আছে, বাঘের ভয় প্রথম দিন। কথাটা সত্যি, প্রথম শিকার করতে গিয়ে মন যে রকম চঞ্চল হয়ে ওঠে, পরে আর কখনও

য় না। সেদিন রাত্রে আমার যা অবস্থা হ'ল, সে ব'লে বোঝানো । থেকে থেকে কেন জানি না চমকে যাচ্ছি, একটু পাতার শব্দ, একটু পোকার ডাক কানে যেতেই লাফিয়ে উঠছি, বন্দুকের গায়ে হাতের মুঠোটা নিজে থেকেই আঁট হয়ে ব'সে যাচ্ছে, সমস্ত নার্ভ-সিস্টেমটা যেন ঝমঝম ক'রে বাজছে। সে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। যতীনবাবু নড়ছেন না, চড়ছেন না, একই ভাবে ঠায় চেয়ে ব'সে আছেন, এনায়েৎ সেই একই ভাবে গুঁড়ি মেরে ব'সে আছে, সে যে পৃথিবীতে কিছু দেখতে শুনতে পাচ্ছে এমন কোন লক্ষণই নেই। পাঁঠাটাও শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, সমানে ডেকে যাচ্ছে। তার চ্যাচানির চোটে মাথা ধ'রে গেল আমার। আর হাওয়ার দমকা যখনই আসে। সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের বিকট গন্ধ, সে গন্ধে নাড়ীভুঁড়ি উলটে আসে, এক-একবার এমন রাগ হতে লাগল, ইচ্ছে হ'ল বন্দুক চালিয়ে দিই ব্যাটাকে সাবাড় ক'রে, নাই বা হ'ল শিকার করা। কিন্তু ধৈর্য্য দেখলাম আমার সঙ্গী দুটির। যতীনবাবুর কানে তার ডাক যাচ্ছে, এমন কোন লক্ষণই দেখতে পেলাম না। এনায়েতের তো কথাই নেই, সে একেবারে ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি। দেখে বুঝলাম, এ ধ্যান বাঘ না এলে আর ভাঙবে না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল। রাত কত বোঝবার উপায় নেই—ঘড়িতে টিকটিক শব্দ হয় ব'লে এনায়েৎ ঘড়ি নিয়ে যেতে দেয় নি, বাঘেদের নাকি শ্রুতিশক্তি অত্যন্ত বেশি। আকাশে চাঁদ নেই, তারার দিকে চেয়ে সময় ঠাহর করা আমার বিদ্যের বাইরে। যতীন-বাবুকে একবার ঠেলে জিজ্ঞেস করলাম, রাত কত এখন আন্দাজ?

যতীনবাবু ফিসফিসিয়ে বললেন, অনেক, চুপ করুন। বুঝলাম, তাঁর কাঁধেও শিকারীর ভূত ভর করেছে।

ব'সে ব'সে শেষে আমার মুখে চোখে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগল, বুঝলাম রাত শেষ হ'য়ে এসেছে। সারা রাত জাগার পরে সেই হাওয়া লেগে আমার হঠাৎ কেমন ঝিমুনি এল, ব'সে ব'সেই আমি চোখ বুজলাম। বোধ হয় পাঁচ মিনিটও যায় নি, এমন সময় যতীনবাবুর হাতখানা নিঃশব্দে এসে আমার হাতের ওপর চেপে বসল। চমকে চোখ চেয়ে বললাম, কি?

যতীনবাবু হাত বাড়িয়ে আকাশের একটা দিক দেখিয়ে দেখুন।

দেখলাম, আকাশে বড় একটা তারা দপদপ ক'রে জ্বলছে, আর তার চারপাশের আকাশ হঠাৎ কেমন ঝাপসা সাদা মতন হয়েছে। বললাম, কি ?

যতীনবাবু বললেন, ভোর হয়ে গেছে, আর ব'সে থেকে লাভ নেই।

এনায়েৎ তখনও সেই একই ভাবে ব'সে। যতীনবাবু হাত বাড়িয়ে তার হাঁটুতে সামান্য একটু ধাক্কা দিলেন, সে চোখ না খুলেই বললে, রাত পুইয়েছে ?

যতীনবাবু বললেন, তার মানে ? তুমি কি ঘুমুচ্ছিলে নাকি ?

এনায়েৎ চোখ মেললে, চট ক'রে একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, ঘুমোব না তো কি করব ?

তিনজনে মই বেয়ে নেমে এলাম। পাঁঠাটা তখনও সমানে চ্যাচাচ্ছে। এনায়েৎ তার দড়িটা খুলে হাতে নিলে। মানুষের সাড়া পেতেই তার চ্যাঁচানি থেমে গেল।

আমি বললাম, যা যন্ত্রণা দিয়েছে সারা রাত, চল, আজ তোকে আমরাই কেটে ভোগ লাগাব।

বাড়িতে আসতেই যতীনবাবুর বাবা বললেন, সারা রাত জেগেছ, আগে চান ক'রে কিছু খেয়ে নাও, তারপর শুয়ে পড়।

আমরা চান করতে গেলাম, চান ক'রে কিছু জল খেয়ে বাইরের ঘরে এসে দেখি, খানসায়েব স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন। আমরা বললাম। এত ভোরে ?

খানসায়েব বললেন, খবর নিতে এলাম কি হ'ল। বাঘ এল না চারে ?

আমি বললাম, না। অথচ ও ব্যাটা ডিউটি ফাঁকি দেয় নি। সারা রাত যা চেঁচিয়েছে, বাঘ নেহাত কালা না হ'লে তার তিন মাইল দূর থেকে শুনতে পাবার কথা।

খানসায়েব একটু হাসলেন, তারপর বললেন, তারপর, আজও যাচ্ছেন তো ?

বললাম, রক্ষে করুন, আমার শখ মিটেছে। আমি আজকেই ফিরছি কলকাতায়।

খানসায়েব একটুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন, মনে হ'ল যেন তাঁর চোখের দৃষ্টি বুক ফুঁড়ে আমার মনের মধ্যে পর্য্যন্ত ঢুকে গেল। তারপর বললেন, কেন?

'কেন'র কোন জবাব ছিল না; আসল কথা, আমার কেমন বিরক্তি লেগে গিয়েছিল। বেশ বুঝছিলাম, আমাকে অভদ্রায় ধরেছে, এ যাত্রা আর কাজে স্থবিধা হবে না। বললাম, এমনিই।

খানসায়েব বললেন, তা হ'লে আজকের দিনটা থেকে যান। শিকার করতে গিয়ে না ক'রে ফিরতে নেই। ওতে স্বভাব হালকা হয়ে যায়।

আমি বললাম, কিন্তু আজ গেলেই যে পাব তাকে, তার তো কোন ঠিক নেই।

খানসায়েব হেসে বললেন, আছে, আমিই এনে দোব তাকে। আমি বাঘের মন্তর জানি, এনায়েৎ বলে নি আপনাকে? তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, ভয় নেই, আমিও সঙ্গে থাকব।

আমার অভিমানে বাধল, বললাম, ভয় আমার নেই। কিন্তু সত্যি বলছেন আপনি যাবেন?

খানসায়েব বললেন, যাব। সেই কথাই বলতে এসেছি। কাল বাঘ পাবেন না আমি জানতাম।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, কি ক'রে?

খানসায়েব বললেন, আছে আছে, বাঘেরা এসে ব'লে যায় আমাকে। বললাম না আমি মন্তর জানি?

যতীনবাবু বললেন, সত্যি যাবেন আপনি?

খানসায়েবের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন, আমাকে মিথ্যে বলতে দেখেছ কখনও?

যতীনবাবু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, সে কথা বলি নি। কিন্তু আপনি তো শিকার ছেড়ে দিয়েছেন জানি, হঠাৎ আবার খেয়াল হ'ল যে?

খানসায়েব বললেন, হ'ল। নইলে বিদেশী মানুষ শখ ক'রে এসেছেন,

শুধু হাতে ফিরে গেলে দেশের বদনাম হবে না? তারপর আন
দূরের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কের মত বললেন, শামলীটাকে মেরেছে
যতীনবাবু বললেন, শামলী মানে? আপনার সেই
বাছুরটা?
খানসায়েব বললেন, হ্যাঁ। আমার ভাগনীকে দিয়েছিলাম, কাল রাতে গোয়ালে ঢুকে মেরে রেখে গেছে।
এমন ক'রে তিনি কথা কটা বললেন, যেন তাঁর নিজের মেয়েরই মৃত্যুর কথা বলছেন।
আমরা কেউ কথা কইলাম না। খানসায়েব অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে শান্ত গলায় বললেন, এনায়েৎ কোথায়?
যতীনবাবু বললেন, বাড়ির দিকে গেছে বোধ হয়, ডেকে পাঠাচ্ছি। সে যা খুশি হবে শুনে!
খানসায়েব ধীরে ধীরে বললেন, তা হবে।
এনায়েৎকে ডেকে পাঠাতে হ'ল না, সে নিজেই এসে হাজির হ'ল একটু পরে। খানসায়েব শিকারে যাবেন শুনে সে খুশির চোটে আমার পর্য্যন্ত পায়ের ধুলো নিয়ে ফেললে; বললে, হুজুর, তবে বন্দোবস্ত করি?
খানসায়েব বললেন, কর।
এনায়েৎ আনন্দে ডগমগ হয়ে বললে, মাচান তো সাজানোই আছে, খালি আদার একটা ভাল দেখে আনলেই হয়।
পাঁঠাটার ওপর আমি চ'টে গিয়েছিলাম, তার সম্বন্ধে তাই কিছু বললাম না। খানসায়েব বললেন, হ্যাঁ, বাছুর নয়, শূয়োরছানা একটা কিনে নিয়ে আয় ডোমপাড়া থেকে। এনায়েৎ চ'লে গেল। খানসায়েবও উঠে পড়লেন, বললেন, চলি, রাত্রে আবার দেখা হবে।
রাত দশটায় আবার গিয়ে মাচানে উঠলাম—আমি, খানসায়েব, যতীনবাবু আর এনায়েৎ। এনায়েতের উৎসাহটা মাচান দেখেই বোঝা গেল; কাল ছিল খালি বাঁশের চালা বাঁধা, আজ তার ওপর সে গদি বানিয়েছে, তোষক দিয়ে কাঁথা দিয়ে নরম ক'রে দিয়েছে, যেন বসতে না লাগে। শূয়োরছানাটাকে খোঁটায় বেঁধে দেওয়া হ'ল, তারপর এক মিনিটের মধ্যেই তার চ্যাচানি শুরু হ'ল।

সে কি চ্যাঁচানি—কানের ভেতর যেন ছ্যাঁদা ক'রে ঢুকে [illegible]র ডাক এর চাইতে ভাল ছিল। আমি বললাম, জ্বালালে। [illegible]নসায়েব আমার উরুতের ওপর আঙুলের চাপ দিয়ে বললেন, চুপ। [illegible] তাকিয়ে দেখলাম, মাচানে চড়ার পর এই ক মিনিটের ভেতর [illegible]র চেহারা একদম বদলে গেছে, যেন একেবারে অন্য মানুষ। মাচায় ওঠবার একটু আগেও বেশ হেসে হেসে কথা বলছিলেন, এখন আর তাঁর মধ্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। হাতে বন্দুক, ঠোঁট দুটি সরু হয়ে এঁটে বসেছে, নাকের ডগাটা সরু দেখাচ্ছে, সেই অন্ধকারেও দেখছি তাঁর চোখের মণি তীক্ষ্ণ হয়ে জ্ব'লে উঠেছে যেন দুটি হীরের টুকরো, তাতে খরত্ব আছে শুধু, কোমলতা নেই। সে যেন সেই পাকাদাড়ি খানসায়েব নন, যেন কোন্ সন্ন্যাসী ধ্যানে বসেছেন, আর কোন দিকে ফিরে তাকাবার মত এক মুহূর্ত্ত সময়ও তাঁর নেই। দেখে বুঝলাম, কিসের জোরে তিনি অতবড় শিকারী হয়েছেন, কিসের জন্যে এনায়েৎ তাঁকে দেবতা বানিয়ে পূজো করে। নড়াচড়া ক'রে তাঁর ধ্যান ভেঙে দেবার সাহসই হ'ল না মোটে; মনে মনে তাঁকে প্রণাম ক'রে যেমন ছিলাম ঠায় ব'সে রইলাম। বসবার সময় তাড়াতাড়িতে ডান পাটা বেকায়দায় চেপে ব'সে ছিলাম, কষ্ট হচ্ছিল, তবু একটু ন'ড়ে সেটাকে সোজা ক'রে নিতেও কেমন ভয় হ'ল। ইচ্ছে হ'ল, চুলোয় যাক বাঘ, তাঁর দিকেই তাকিয়ে ব'সে থাকি। ভাগ্যে থাকলে বাঘ অনেক দেখা যাবে, এমন ধ্যানের মূর্ত্তি হয়তো জীবনে আর দেখতে পাব না। পাছে তাঁর ধ্যান ভাঙে, সেই ভয়ে তাও পারলাম না, জোর ক'রে মুখ ফিরিয়ে অন্ধকার বনের দিকেই চেয়ে রইলাম। ব'সে ব'সে একটা জিনিস বেশ লক্ষ্য করলাম, নার্ভাস টেন্‌শন সেদিনও লাগছে, কিন্তু আগের দিনের মত অতটা নয়। আগের দিনের অভিজ্ঞতার জন্যেই সেটা ক'মে গেল, না খানসায়েব সঙ্গে আছেন ব'লে মনে মনে ভরসা পেলাম ব'লে, কিছুই বুঝলাম না। পরে অবশ্য জেনেছি, ভয় বা নার্ভাস টেন্‌শন যাই বল, সেটা প্রথম প্রথমই জোর হয়, ক্রমে অভ্যাস হয়ে গেলেই কেটে যায়, তারপর আর তার চিহ্নও থাকে না।

শুয়োরছানাটা একভাবেই চ্যাঁচাচ্ছে। আধঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ

তার চ্যাঁচানি থেমে গেল, বার দুই কুঁই কুঁই ক'রে আওয়াজ পরই একদম চুপচাপ। তখন লক্ষ্য হ'ল, চারদিক আশ্চর্য্য রকম নিঝুম হয়ে গেছে, একটা ফড়িং ওড়ার শব্দ পর্য্যন্ত হচ্ছে না কোথাও। যতীনবাবুর একখানা হাত নিঃশব্দে আমার গায়ে এসে লাগল। ইঙ্গিতে বুঝতে দেরি হ'ল না—বাঘ এসেছে। তখন বুঝলাম, শূয়োরছানার চুপ করার মানে কি; বুঝলাম, এনায়েৎ কেন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পেরেছিল কাল—পাঁঠা যতক্ষণ চ্যাঁচাচ্ছে ততক্ষণ সেও জানতে পারছে, বাঘ ধারে কাছে নেই।

আরও মিনিটখানেক এমনি কাটল। সে এক অদ্ভুত প্রতীক্ষার মুহূর্ত্ত—উত্তেজনায় মনে হ'ল যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তারপর খানসায়েবের একটি হাত আলগোছে আমার হাতে এসে ঠেকল। তাকিয়ে দেখলাম, বনের কিনারে দুটি মার্বেলের মত আলো স্থির হয়ে আছে। বাঘ! দেখেই গায়ের মধ্যের সমস্ত রক্ত এক ঝলকে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একবার ঘুরে চ'লে এল। আমি বন্দুক তুলে নিলাম। তুলে নিশানা করলাম, দেখলাম, নিশানা করতে পারছি না। ভয়ে নয়, ভয় পাই নি, কিন্তু উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপছে, নিশানা ঠিক হচ্ছে না, তবু প্রাণপণে হাত শক্ত ক'রে বন্দুক তুলে ধরলাম। ঘোড়া টানতে যাব, এমন সময়ে খানসায়েবের ধ্যান ভাঙল, মুখ ফিরিয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমিও তাকালাম। এক সেকেণ্ড মাত্র, সেই এক সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি আমার মনের তলা পর্য্যন্ত দেখে নিলেন। নিঃশব্দে হাত তুলে আমার বন্দুক সুদ্ধ হাতটাকে একটু ছুঁয়ে দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিলেন, তারপর নিজের বন্দুক তুলে ধরলেন। আর এক সেকেণ্ড, তারপরই খট্-ক্রম ক'রে আওয়াজ। বাঘের তরফ থেকে কিন্তু কোন জবাবই এল না, খালি দেখলাম, সে মার্বেল দুটি আর সেখানে নেই। একবার খালি একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনলাম, যেন মাটির ওপর কে কি ঘষছে—তারপর সব চুপচাপ।

বন্দুকের আওয়াজ হতে না হতে আরেকটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। এনায়েৎ 'আল্লা' ব'লে হাঁক দিয়ে বল্লম হাতে মাচা থেকে লাফিয়ে পড়ল, প'ড়ে একেবারে এক দৌড়ে যেখানে বাঘের চোখ দুটো জ্বলেছিল,

গেল। যতীনবাবু ডাকলেন, এই! এনায়েৎ জবাব
আমার সঙ্গে টর্চ ছিল, আমি টর্চ জ্বালালাম, তার আলোতে
[illegible] এনায়েৎ মরা বাঘের একটা পা ধ'রে টানাটানি করছে মাটির
[illegible] [illegible]য়ে। আমরা সবাই মাচান থেকে নেবে এলাম। যতীনবাবু
বললেন, না দেখেশুনে অমন ক'রে লাফিয়ে পড়লে তুমি, বাঘ যদি জ্যান্ত
থাকত?

এনায়েৎ ভ্রূক্ষেপও করলে না, বেশ সহজভাবেই বললে, হুজুর গুলি
ছুঁড়লে বাঘ জ্যান্ত থাকে না।

খানসায়েব বললেন, নে নে, হয়েছে। এখন বাড়ি চল, হিম
লাগছে।

আমি বললাম, বাঘটা?

খানসায়েব বললেন, ও আর এই রাত্রে কি হবে! থাক প'ড়ে,
কাল সকালে নেওয়ানো যাবে। বাঘকে কেউ ছোঁবে না।

বাঘের কাছে গিয়ে টর্চ জ্বেলে তাকে দেখলাম। বন্দুকের গুলি ঠিক
দুই চোখের মাঝখানে বিঁধেছে, ঢুকে মাথাটাকে সুদ্ধু ফাটিয়ে চৌচির
ক'রে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। মেপে দেখলাম, ঠিক সাড়ে ছ হাত হ'ল,
এনায়েতের নজরের বাহাদুরি বলতে হবে।

বাঘকে সেইখানে ফেলে রেখে আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম।
শূয়োরছানাটাকে খালি খুলে নিয়ে এলাম, ওখানে রেখে এলে শেয়ালে
মেরে ফেলবে।

খানসায়েবের বাড়ি পার হয়ে তবে এ বাড়িতে আসতে হয়।
বাড়ির সামনে এসে খানসায়েব থামলেন, বললেন, আমি তবে এবার
বিদায় নিই। আপনি কবে যাবেন?

আমি বললাম, কাল ভোরেই। আপনার সঙ্গে আর হয়তো দেখা
হবে না।

খানসায়েব শান্তস্বরে বললেন, খোদার যদি ইচ্ছে থাকে, হবেই
আবার। তারপর আমার হাত দুটি ধ'রে বললেন, বুড়োকে মনে
থাকবে তো?

আমি বললাম, নিশ্চয়।

খানসায়েব একটু হাসলেন, বললেন, অত জোর ক'রে বলছেন কথা।

আমি বললাম, একশোবার বলব। আজ যা দেখলাম, তাতে আপনাকে শিকারের গুরু ব'লে স্বীকার করতে পেলে ধন্য হয়ে যাব আমি।

খানসায়েব বললেন, সে কি কথা, আপনাদের নতুন বয়স, কত সায়েব-সুবোর সঙ্গে কারবার মেলামেশা—আমার চাইতে ঢের বড় বড় গুরু পাবেন আপনি। আর গুরুতে কিচ্ছু হয় না এতে, এর জন্যে চাই নিজের সাধনা। বুড়োর এই কথাটি মনে রাখবেন, আখেরে কাজ দেবে। তারপর একটু থেমে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন, একটি কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে ?

আমি বললাম, বিলক্ষণ, অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ?

খানসায়েব বললেন, বুড়োদের কথা কিন্তু মিষ্টি হয় না। আপনার এই প্রথম বাঘ মারা, নয় ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

খানসায়েব বললেন, বড় বাঘ মারতে আর যানও নি কখনও ?

আমি বললাম, না।

খানসায়েব বললেন, তা হ'লে আমার একটি উপদেশ শুনে রাখুন, খুব ভাল ক'রে সব না জেনেশুনে এ খেলা খেলতে যাবেন না। এ বড় বিপদের খেলা। আজই আমি না সঙ্গে থাকলে মারা পড়তেন, সেটা টের পেয়েছেন ?

আমি বললাম, পেয়েছি। কিন্তু সত্যি কেন এমন হ'ল বুঝলাম না। মনে ভয় নেই, অথচ হাত কাঁপছে—এ রকম হয় জানা ছিল না।

খানসায়েব বললেন, ওটা হয় নার্ভাস টেন্‌শনের ফলে, আবার একটু অভ্যাস হ'লেই কেটে যায়। ওতে দ'মে যাবার কিছু নেই, নার্ভ আপনার ভাল আছে, যা দেখলাম।

আমি বললাম, কিন্তু কাল বাঘ এলেই তো বিপদে পড়তাম দেখছি।

খানসায়েব বললেন, পড়তেন না। বাঘ কাল আসতই না।

বললাম, তা বটে, বাঘ কাল অন্য জায়গায় ছিল। কিন্তু নাও পারত ?

খানসাহেব হেসে বললেন, তার জন্যে নয়। রয়াল বেঙ্গল পাঁঠা খায় না, গন্ধ পায়। ও খায় গোবাঘারা।

যতীনবাবু বললেন, তার মানে ? এনায়েৎ জানত না এ কথা ?

এনায়েৎ জবাব দিলে না। খানসায়েব বললেন, এই বাঁদর, জেনে-শুনে ইচ্ছে ক'রে পাঁঠা কিনেছিলি তুই ?

এনায়েৎ তাঁর দিকে পিছন ক'রে দাঁড়ালে, বিড়বিড় ক'রে বললে, জানলে কি হবে, যা ধমকের চোট। ভাবলাম, হবেও বা, কলকাতায় হয়তো বাঘেরা পাঁঠাই খাচ্ছে আজকাল।

কথা বলবার মত মুখ ছিল না, বললাম, তা হ'লে যাই এবার খানসায়েব ?

খানসায়েব বললেন, যাই বলে না, আসুন।

আমি হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিলাম। খানসায়েব আমাকে একবার বুকে জড়িয়ে ধ'রে, তক্ষুনি আবার ছেড়ে দিয়ে সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। আর পেছন ফিরে তাকালেন না পর্য্যন্ত। যতীনবাবু বললেন, ছেলে মারা গিয়ে অবধি খানসায়েব কেমন যেন হয়ে গেছেন।

আমরা বলিলাম, তারপর ?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, তারপর আর কি! বাড়ি ফিরে এলাম, এনায়েৎ তার বাড়ি চ'লে গেল। ভোরবেলা লোকজন পাঠিয়ে বাঘকে নিয়ে এসে চামড়া খোলা হ'ল, গাঁয়ের লোকে তার দাঁত, নোখ চর্বি সব নিয়ে গেল। সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে সেইদিনই কলকাতায় রওনা হলাম, পরদিন এসে অফিস করলাম।

আমরা নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইলাম। কান্তি চৌধুরী বলিলেন, কি, হ'ল কি, বল না শুনি ?

আমরা ইতস্তত করিয়া বলিলাম, ধ্যেৎ, এটা যেন কিরকম—

কান্তি চৌধুরী বিকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, শুনতে ভা এই তো?

আমরা মরিয়া হইয়া বলিলাম, আপনার আগের গল্পগুলোয় যেমন একটা বেশ মজার ইয়ে থাকত—

কান্তি চৌধুরীর মুখভঙ্গি আরও বিকট হইল। বলিলেন, এটাতে তেমন মজার ইয়ে নেই, না? জিজ্ঞেস করি, কি শুনতে আস সব, শিকার, না মজার প্যাঁচ? যত সব বেল্লিকের দল। যা পালাঃ, হনুমানদের আমি গল্প বলি না।

আমরা পলাইয়া আসিলাম।

"সম্বুদ্ধ"

তীর্থপথে

জীবন-সাগরে মানুষ আমরা ভাসিতেছি তৃণসম,
ঢেউয়ের তাড়নে আসি কাছাকাছি পুন চ'লে যাই দূরে;
কাছ আর দূর মাঝখানে শুধু স্মৃতিটুকু মনোরম—
বন্ধুর স্নেহ-ছোঁওয়া যতটুকু ছুঁয়ে যায় বন্ধুরে।
জঞ্জাল শুধু করিতেছি জড় ধরণী-প্রবাসে মোরা,
ভয়ে ভয়ে থাকি, থাকি কাছাকাছি—আত্মীয় পরিচয়;
ভুলে যাই বহে তীর্থের পথে প্রেমের আলথঝোরা,
স্নান করে যেবা, সেই হতে পারে চিরদিন নির্ভয়।

সংবাদ-সাহিত্য

এমনও যে অতীতের সম্পূর্ণ বিপরীত, আধুনিক যুদ্ধ-ব্যাপারে তাহাও প্রমাণিত হইয়া গেল। অতীত কালে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে উলুখড়ের প্রাণ যাইত। ফিগারেটিভ্‌লি ধরিলে উলুখড় আমরা বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বর্ত্তমানে আমাদের প্রাণ যাইতেছে—এ কথা সত্য ; কিন্তু বাস্তবতার যুগে ফিগারেটিভতার ইয়ারকি চলে না। এ যুগে কি দেখিতেছি ? রাজায় রাজায় অর্থাৎ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ হইতেছে, ফলে উলুখড়ের প্রাণ বাঁচিয়া যাইতেছে। উলুখড় এক জাতীয় জলজ ঘাস— উত্তর-ইউরোপ (স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া) ও উত্তর-আমেরিকায় (কানাডায়) জন্মে। এই উলুখড়ের সাহায্যে মেকানিক্যাল অর্থাৎ নিউজ্‌-রীলের কাগজ প্রস্তুত হয়। নানা কারণে, বিশেষ করিয়া আমদানি-রপ্তানির অসুবিধার জন্য এই সকল দেশে ব্যাপকভাবে কাগজ-প্রস্তুত বন্ধ আছে, অর্থাৎ যুদ্ধের কল্যাণে উলুখড়ের বিনাশ স্থগিত আছে।

*　　*　　*

কিন্তু শাস্ত্রবাক্য—মহাজন-বাক্য কি মিথ্যা হইবে ? মধুর অভাবে যদি গুড়ের ব্যবস্থা থাকে, গুড়ের অভাবে মধুর ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই আছে ; উলুখড় না মরিলে বিকল্পে মরিবার জন্য আমরা উলুখড়াধম মানুষ আছি। রাজায় রাজায় যুদ্ধ—রাজকীয় ব্যবস্থা এমনই চমৎকার যে, হয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্য করিয়া খাইয়া মর, অথবা অর্থনৈতিক চাপে না খাইয়া মারা যাও। এ চাপ 'বিদ্যাসুন্দর'-বর্ণিত দায়ে কুমড়া-কাটার মত। এক দিকে একান্ত-প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্যবৃদ্ধির মার ; অন্য দিকে অবশ্য-দেয় ট্যাক্স ও বেতন-হ্রাস জনিত মার। গৃহস্থ যখন, তখন সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতেই হয় ; চারিটি চাউল ফুটাইয়া আহার করিতে হয় ; রাত্রির অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালাইয়া ভাশুর-ভাদ্রবউয়ের সম্পর্কের মর্য্যাদাও রাখিতে হয়। অথচ চাল কয়লা কেরোসিনতেল অগ্নিমূল্য—ছুঁইবার জো নাই। কম রোজগারে অধিক মূল্যের জিনিস কিনিয়া গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন যদি হার্কিউলিসের দ্বাদশ কঠিন কর্ম্মের একটি হইত, তাহা হইলে বিশ্বখ্যাত গ্রীকবীর চক্ষে সরিষাফুল দেখিতেন! আমরা উলুখড় বলিয়া, মরিতে বদ্ধপরিকর বলিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি।

সাদা কাগজ লইয়া আমরা কারবার করিয়া থাকি; [illegible] একদিন দুই টাকা রীম খরিদ করিতাম, এই মাসে তাহা [illegible] টাকা রীম বিকাইতেছে। লাট-মেজাজসম্পন্ন বিক্রেতা ইহার উপর শাসাইতেছেন যে, যাহা পাইলাম পাইলাম, অতঃপর আর স্বর্ণমূল্যেও কাগজ পাওয়া যাইবে না। ইহার প্রতিকার কর্ত্তারা করিবেন না। অথচ 'দেবী চৌধুরাণী'র হরবল্লভ রায়ের মত শ্বশুর-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া ইহারা বলিয়াও দিবেন না, ডাকাতি করিয়া খাও। না বলিলেও কেহ কেহ ঐ পন্থা অবলম্বন করিতেছে। কাগজের দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যদি পত্রিকার দর আরও বাড়াইতে পারিতাম, তাহা হইলেও কথা ছিল। মারিব কাহাকে? সেখানেও যে মধ্যবিত্ত উলুখড়-সম্প্রদায়। আর একটু চাপ পড়িলেই "দুত্তোর" বলিয়া ইহারা সর্ব্বাগ্রে পত্রিকা-বিলাসই পরিত্যাগ করিবেন। সুতরাং কৌশলে পাতা চুরি করা ছাড়া উপায় নাই।

* * *

"কৌশলে" বলাটা ঠিক হইল না, "সততার সহিত" বলিলেই ঠিক হইত। মাল আমরা কমাইতেছি না। দুই পংক্তির ভিতরকার ন্যায্য "লেড"গুলি সরাইয়া দিয়া পাতা কমাইয়া সমান ওজনের মাল কোনও প্রকারে সরবরাহ করিতেছি বটে, কিন্তু টাইপগুলির মাথা খাওয়া হইতেছে। এক দিকের লাভের গুড় অন্য দিকের পিপীলিকায় মারিয়া দিতেছে। আমরা নাচার। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ জীবন-সার্কাসে হাসিমুখে তারের নৃত্য দেখাইতেই হইবে। দেখাইতেছি এবং দেখাইবও।

* * *

গোপালদা বলিতেছেন, থিয়েটার-বায়স্কোপে তো লোক কমে নাই বাপু; রাত্রি আটটার ঘুটঘুটে অন্ধকারে গ্রে স্ট্রীটের এপারে ওপারে তো পিলপিল করিয়া লোক বাহির হইতে দেখি। কি তাহাদের উৎসাহ, কতই তাহাদের উল্লাস! প্রত্যহ ট্রাম বাস অচল হইয়া যায়। গোপাল-দা একা মানুষ, গৃহস্থদের হালচাল জানিবেন কেমন করিয়া! তাহারা যে কত দুঃখে অপোগণ্ড শিশুদের অবশ্যপেয় এক সের দুধ মারিয়া দুই ঘণ্টার আত্মবিস্মরণ খরিদ করে, গোপালদাকে তাহা জানিতে হয়

না। পাঁচ আনার বিনিময়ে অর্দ্ধভুক্ত গৃহিণীর মুখে পাঁচ টাকার হাসি দেখিতে পাইলে তিনি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন না।

উলুখড় মরিবে বলিয়া কি হাওয়ায় একটু দুলিবেও না!

* * *

জাপানের যুদ্ধাবতরণে এই উলুখড়-সমস্যা আরও সহজ হইয়া আসিয়াছে। আমরা যাহারা বাধ্য হইয়া অথবা বীরত্ব করিয়া কলিকাতায় রহিয়া গেলাম, তাহাদের প্রসঙ্গে কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু বলিব না। শুধু এইটুকু আভাস দিতে পারি যে, যাহা বলিতাম তাহা বিশুদ্ধ দর্শন হইত। পয়সা খরচ করিয়া বিশুদ্ধ দর্শন শুনিবার মত মনোবৃত্তি যে আমাদের নয়, তাহার প্রমাণ স্যর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। খাঁটি দর্শন বলেন না বলিয়াই ইঁহাদের খ্যাতি; খাঁটি দর্শন যাঁহারা বলিতে পারেন, তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত আমরা জানি না।

—

পৌষের 'ভারতবর্ষে' কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের "সীতার প্রতি রাম" কবিতাটি পাঠ করিয়া "কালিদাসের প্রতি সরস্বতী" নামক অলিখিত কবিতাটি মানস-'ভারতবর্ষে' জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। পরশ-পাথর খুঁজিতে খুঁজিতে ক্ষ্যাপা একদিন আপনার অজ্ঞাতসারে তাহা কুড়াইয়া পাইয়া পর্ণপুটে রাখিয়াছিল; তারপর খেয়ালবশে আধার-আধেয় দুইই সে পথের মাঝে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। সমুদ্রও কাছে নাই যে, সৃষ্টিছাড়া পাগলের ব্যাপার দেখিয়া ফেনহাস্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে! অভ্যাসের দাসত্ব বড় ভয়ঙ্কর, অশীতিপর বৃদ্ধকেও সন্ধ্যার অন্ধকারে নারিকেল-তৈলগন্ধের প্রতি ধাবিত করায়।

—

অনভ্যাসের অর্থাৎ নূতনত্বের দাসত্বও কম ভয়ানক নয়। যিনি চিরটাকাল জমিদারী সেরেস্তার বাংলা লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন, বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে লপেটা-বাংলায় পাইলে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" অপেক্ষাও মারাত্মক ব্যাপারের সৃষ্টি হইতে পারে। প্রমাণ, পুরাতন 'প্রবাসী'র আধুনিক "বিবিধ প্রসঙ্গ"। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ কান্টীয় দর্শনের সহিত ভারতীয় দর্শনের পথিমধ্যে কোলাকুলি ঘটাইয়া সম্ভবত আপনার কীর্ত্তিতে আপনি অট্টহাস্য করিতে পারিতেন, কিন্তু সকলেই তো আর

দ্বিজেন্দ্রনাথ নন! তা ছাড়া এ তো পথিমধ্যে নয়, পথের শেষে। 'পথের শেষে' যে কি পরিমাণ ট্র্যাজিক, রঙ্গমঞ্চবিলাসীরাই অবগত আছেন। অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে"র নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটিতে এই ট্র্যাজেডি প্রায় কিংলিয়ারীয়—

রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন সবুজদের, কাঁচাদের পক্ষপাতী ছিলেন। নিজে শেষ পর্যন্ত অন্তরে চিরযৌবনসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর কাছে সবুজদের কৃতজ্ঞতার ঋণ কারো চেয়ে কম নয়।—পৃ. ২৩৫

পাকা ঘুঁটি কাঁচাইবার অসাধারণ ক্ষমতাও রবীন্দ্রনাথের ছিল।

—

ফল কাঁচা হইতে ডাঁশা হয়, পাকে, পচে—তারপর একদিন টুপ করিয়া বৃক্ষশাখা হইতে ভূতলে পতিত হয়। বাংলা দেশের হিন্দুরা পাকিয়া পচিয়া পড়িয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা বেশ ডাঁটো এবং ডাঁশা ছিলেন। চাকরির বাজারে, পরীক্ষার ব্যাপারে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদিন আমরা যাহা যাহা করিয়াছিলাম, একে একে তাঁহারা তাহাই করিয়া চলিতেছিলেন—রঙে জলুসে পক্বতা বেশ খুবসুরৎই হইয়া উঠিয়াছিল। অগ্রহায়ণের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে হঠাৎ "বদবু"র সন্ধান পাইয়া চমকাইয়া উঠিলাম। হায় রে, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতি অল্পেই ভাল জিনিসে পচ ধরিয়া যায়। "আধুনিকী"র ছোঁয়াচ বড় মারাত্মক!

ইতস্ততঃ ছড়ানো
তরকারীর খোসা
মাছের আঁস
 আর
পচা ইঁদুরের "বদবু"তে
বাতাস হোয়েছে গন্ধাক্রান্তা।
... ...
ফুটপাথেই যাদের বাসর-শয্যা
জন্ম
জীবন
এবং মৃত্যু
এরি মধ্যে তাদের অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে।
স্তম্ভিত —পৃ. ১০১

এই স্তম্ভের মধ্য হইতেই নৃসিংহাবতারের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল একদিন।

—

রবীন্দ্র-স্মৃতিসংখ্যা 'পরিচয়ে'র (অগ্রহায়ণ) ৪৭২ পৃষ্ঠায় সম্পাদক হিরণকুমার সান্যাল রবীন্দ্রনাথকে হস্তী ও বুদ্ধদেব বসুকে অন্ধ বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপত্তি করি না, কারণ এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, মৃত হস্তীর মূল্যও লক্ষ মুদ্রা। কিন্তু বুদ্ধদেববাবুর অন্ধত্ব আমরা অস্বীকার করি, 'হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি' তো তাঁহারই লেখা।

—

বড় কবিতা লেখার যে বিপদ অনেক, কবিরা কিছুতেই তাহা বুঝিবেন না। প্রথমত ধরুন, এই বাজারে লেখার কাগজ মেলাই ভার, দ্বিতীয়ত "অ"-কলঙ্কিত হইলে বারংবার নকল করার পরিশ্রম। ছোট হইলে দ্বিতীয় অসুবিধাটি প্রায়শই ভুগিতে হয় না। 'প্রবাসী'র মত পত্রিকাতেও পৃষ্ঠাপূরণে পদ্যাকারে নিলামী ইস্তাহারও সহজেই চলিয়া যায়। অথচ ভাল একটি কবিতা ইঞ্চি-মাপের বাহিরে চলিয়া গেলেই বাতিল। বন্ধুত্ব, চাকুরি বা অন্য কোনও খাতিরে বড় কবিতা যদি বা চলে, অত্যন্ত বেজায়গায় ছাঁটাই হইবার আশঙ্কা থাকে। যেমন ধরুন, অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে সহঃসম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার "কবি-প্রয়াণ" কবিতাটি। ভদ্রলোক ঘরের লোক হইয়াও ভাবাতিশয্যে মাপের এক পংক্তি অধিক লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন, এক লাইন কম হইলে দুই পৃষ্ঠায় টায়েটোয়ে ধরিয়া যাইত। এক লাইন অধিক হওয়াতে সম্পাদকীয় বিভাগ "অতি নিদারুণ সহস্র নাগের মত" পংক্তিটির মিল-পংক্তিটি কাটিয়া দিয়াছেন। শৈলেন্দ্রবাবুর "ক্রুদ্ধ বায়ু ফুঁসি ওঠে শ্বসি বার বার" হইলেই বা কি হইবে! কাব্যের যাহাই হউক, মাপ ঠিক থাকা চাই তো!

—

কার্ত্তিকের 'মাসিক বসুমতী'র "বিমান বোটে বোম্বেটে" পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। লেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা; বিশেষত, যেদিন তাঁহারই মুখে সংবাদ পাই, জলধর-সেন লিখিত 'হিমালয়' গ্রন্থখানি তাঁহারই লিপিকুশলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার সাক্ষ্য দিতেছে, সেই দিন হইতেই তাঁহার প্রতি কেমন

যেন একটা সহানুভূতির আকর্ষণ অনুভব করি। আহা, ভদ্রলোক সাধু এবং সৎ বলিয়াই হৃতসর্ব্বস্ব দরিদ্র, এবং দরিদ্র বলিয়াই লাঞ্ছিত।

হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ মেলিয়া চাহিয়াই চমকিয়া উঠিলাম—জলধর দাদা! সেই চিরপরিচিত মূর্ত্তি; বাম হস্তে নিঃশেষিতপ্রায় চুরুটের শেষাংশ ধৃত, পক্কগুম্ফ এবং অযত্নবর্দ্ধিত কাঁচা পাকা শ্মশ্রুসমন্বিত মুখমণ্ডল চোখের কোলে কুঞ্চিত, কপালের আবটি তেমনই ভাবব্যঞ্জক। চশমাটি খুলিয়া লইয়া আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া অত্যন্ত পরিচিত সহৃদয়তার সহিত দাদা বলিলেন, এই যে ভায়া, চিনতে পারছ? তাড়াতাড়ি দাদার পদধূলি লইয়া চীৎকার করিয়া কহিলাম, পারছি না আবার! আপনি গিয়ে ইস্তক রবি-বা—

দাদা হাসিলেন, আপন কানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শান্ত ধীর কণ্ঠে বলিলেন, আজকাল বেশ শুনতে পাচ্ছি ভাই, চোখে দেখতেও পাচ্ছি। দূরে থেকে অবাক হয়ে দেখছি; তোমরা কিন্তু আর দেখতে শুনতে পাচ্ছ না। দাদার এ অনুযোগের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বোকার মত ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দাদা কৌতুকহাস্যে প্রসন্ন মুখখানিতে আরও প্রসন্নতা বিস্তার করিয়া প্রশ্ন করিলেন, কি পড়ছিলে এতক্ষণ?

দাদার কাছে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নাম করিতে স্বতই সঙ্কোচ ছিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, এই "বিমান বোটে বোম্বেটে" পড়ছি। ভারী কৌতূহলোদ্দীপক!

পড় নি এতদিন? আমি তো অনেক—অনেক দিন আগে পড়েছি এ গল্প, তা বারো বছর হ'ল বই কি!

বলিলাম, তা হবে, ইংরেজীতে পড়েছেন বোধ হয়?

দাদা বলিলেন, না হে না, বাংলাতেই পড়েছি, আমার দীনেন্দ্রকুমারের লেখা বাংলা।

বুঝিলাম দাদার স্মৃতিভ্রংশের ব্যাপারই চলিয়াছে। নহিলে সবে গত মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে যাহা সদ্য-প্রকাশিত, বারো বৎসর পূর্ব্বে দাদা তাহা পড়িবেন কোথা হইতে?

দাদা আমার মনের কথাটা বুঝিলেন, বলিলেন, যা মনে করেছ, তা নয় ভায়া, আমি এখন বেশ সুস্থ আছি। এমন সুস্থ আমি কখনই ছিলাম না। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? "রহস্য-লহরী উপন্যাস মালা"র ১৪০ নং উপন্যাস 'পেশাদারী প্রতিহিংসা' বইখানা পরিষৎ-লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ ক'রে প'ড়ে নিও, আরও অনেক মজা দেখতে পাবে। বইখানা ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে বেরিয়েছিল। আচ্ছা ভায়া, চললাম।

*

ভোরের স্বপ্ন। মনটা কেমন খুঁতখুঁত করিতেছিল। বেলা দুইটা বাজিতেই পরিষৎ-মন্দির হইতে 'পেশাদারী প্রতিহিংসা' বইখানি আনাইয়া লইলাম। দেখিলাম—কি দেখিলাম? পুকুর চুরি! 'মাসিক বসুমতী'র ২৯ পৃষ্ঠা হইতে "একাদশ তরঙ্গ—প্রথম ধাক্কা"—হুবহু 'পেশাদারী প্রতিহিংসা'! "ওয়াল্ডো" "ওয়াইল্ড" হইয়াছে—ভাষাও একটু আধটু বদলাইয়াছে এই পর্য্যন্ত। অনুমানে বুঝিলাম, দশম তরঙ্গে পূর্ব্বতন কোনও 'রহস্য-লহরী'র পুনরাবৃত্তি শেষ হইয়াছে; একাদশ তরঙ্গ হইতে নূতন সিরিজ আরম্ভ হইয়াছে। 'মাসিক বসুমতী'র পাঠকেরা ঠকিতেছেন কি না জানি না, কিন্তু স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথের অতি হুঁশিয়ার খোকা যে ঠকিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে সংশয় নাই। দীনেন্দ্রকুমারের উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল।

কিন্তু অজাতশত্রু জলধরদাদা এ কি করিলেন! তিনিও কি শেষ পর্য্যন্ত পেশাদারী প্রতিহিংসার শরণাপন্ন হইলেন? জানাজানির অপরাধ যদি কিছু হয় তাঁহারই হইবে; আমি নিমিত্ত মাত্র। এ যদি তাঁহার প্রতিহিংসাই হয়, তাহা হইলে ইহাকে হিমালয়ান প্রতিহিংসা বলিতে হইবে।

বসুমতী যে সর্ব্বংসহা—এই সত্যও নূতন করিয়া প্রমাণিত হইল।

শিবরাম চক্রবর্ত্তীকে চেনেন কেউ আপনারা? Pun ও Satire-এর রাজা শিব-ram শিশু-সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছেন—এই কথা অভিভাবকেরা বলিয়া থাকেন। যুগান্তর না আনিলেও ভাষান্তর যে আনিয়াছেন—এ কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারিব না।

গত পূজায় দেব সাহিত্যকুটীর হইতে প্রকাশিত শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত শিশুদের 'সোনালী ফসল' আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন। ৩৩৮ হইতে ৩৫১ পৃষ্ঠায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "হাওড়া-আমতা-রেল লাইনে দুর্ঘটনা" নামক মৌলিক গল্পটি পড়িয়া আপনারা না হাসিয়া পারিবেন না; তেমন পেট-আলগা লোক হইলে হাসিতে হাসিতে কোমরের কাপড় ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। বাংলা ভাষার মাহাত্ম্যই এই; যথাযথ প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহা দিয়া ভেল্‌কি খেলানো যায়; শিবরাম ভাষা ও সিচুয়েশনের যাদুকর, তাক লাগাইয়া দিয়াছেন আমাদের। অথচ এই জিনিসই ইংরেজী চেহারায় কিরূপ tame শোনায়, Hutchinson & Co. কর্ত্তৃক প্রকাশিত *The Second Century of Humour* পুস্তকের 363-81 পৃষ্ঠায় প্রকাশিত W. A. Darlington-এর "A Chain of Circumstance" গল্পটি পড়িয়া দেখুন! শিবরামের পিতা-পুত্র এই গল্পে বিবাহপ্রার্থী নারী-পুরুষ হইলেও বাকি সব ঠিক আছে; এমন কি, মাঝে মাঝে হুবহু অনুবাদ বলিয়াও ভ্রম হইতে পারে, যেমন—

শিবরামের—

ছেলে চারিধারে তাকায়—গাড়ীর কাঁধে-লাগানো একটা নোটিশের ওপর তার নজর পড়ে হঠাৎ। হাওড়া-আমতা-রেলোয়ে খুব সম্ভব তার উপকারের নিমিত্তই নোটিশখানা যেন ওখানে ঝুলিয়ে রেখেছে। ছন্দোবদ্ধ ভাষায় উক্ত নোটিশে লেখা:

থামাতে হলে এ ট্রেণ্ (হাওড়া-আমতা বল্‌ছেন)
টানো ধরে' এই চেন্! পৃ. ৩৪৩

ডার্লিংটনের—

She glanced about her, and her eye fell on a notice which the L. & H. O. Railway, in an unwonted fit of levity, had put into Nerse for her benefit.

To stop the train (said the L. & H. O.)
Pull down the chain. —p. 374

মিলের দিকেও শিবরাম শ্রেষ্ঠ, তাঁহার তিন মিল, ডার্লিংটনের দুই। আবার শিবরামের—

এর ফলে চৈতন্য-সম্পাদন না হয়ে যায় না! বাবাকে উঠে বস্‌তে হোলো। পানাগুলো তাঁর চুলে জড়িয়েছে, গাল বেয়ে কয়লা আর কাদা গড়িয়ে পড়ছে, আর

ব্যাঙাচিরা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে' তাঁর কোলের ওপর নাচানাচি লাগিয়ে দিয়েছে।
—পৃ. ৩৫০

ডার্লিংটনের—

It certainly brought the victim to. George sat up, gasping. Duckweed was in his hair, a mixture of mud and soot was running down his cheeks, tadpoles leapt uneasily in his lap.—p. 380

এইরূপ আপাদমস্তক। শিবরামের দুর্ভাগ্য, তাঁহার এইরূপ বহু মৌলিক গল্পই আর মৌলিক নাই, তৎসত্ত্বেও তাঁহার মৌলিকত্ব অস্বীকার্য্য, তিনি যে শিব-ram !

—

রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব পাকাপাকি রকম প্রমাণিত করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত 'সব পেয়েছির দেশে' নামক পুস্তকের দ্বারা। পুস্তকখানি বুদ্ধদেববাবুর দৃষ্টিতে সব-পেয়েছির দেশ শান্তি-নিকেতন সম্বন্ধে লিখিত, প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথও আছেন। ভূমিকায় বুদ্ধদেববাবু লিখিয়াছেন—

বইটি রবীন্দ্রনাথের হাতে দিতে পারলে ধন্য হতাম, আমার এ-সামান্য উপহার তিনি হয়তো খুশি হ'য়েই গ্রহণ করতেন। কিন্তু তা আর হলো না।

রবীন্দ্রনাথ খুশি হইয়া একটা প্রশংসাপত্রও নিশ্চয়ই লিখিয়া দিতেন। তাহা হইল না বলিয়া বসু মহাশয়ের দুঃখটা আরও মর্ম্মান্তিক হইয়াছে। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের সকল খবর রাখিলে তাঁহাকে এ দুঃখ পাইতে হইত না। ঋষি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মৃত্যুর পরে এই পুস্তকের আবির্ভাবের কথা জানিতেন এবং ইহার একটা সমালোচনাও তিনি তাঁহার 'খেয়া' নামক পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা এই—

এক রজনীর তরে হেথা
দূরের পান্থ এসে
দেখতে না পায় কি আছে এই
সব-পেয়েছির দেশে।

গত কয়েক মাসের মধ্যে বাংলা ভাষায় কবিতা-কাব্য-গল্প-উপন্যাস ছাড়াও কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ভাষা-ভাষী মাত্রেই সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। আমাদের ভাষা ও সাহিত্য যে দিনে দিনে প্রসারলাভ করিতেছে, এই পুস্তকগুলিই তাহার প্রমাণ। বাঙালী পাঠকের মন আর শুধু রস-পিপাসুই নয়, চিন্তাশীলতার খোরাকও যে তাহার প্রয়োজন হইতেছে—লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হইয়াছে, ইহা সুলক্ষণ। পুস্তক-গুলির নাম এবং লেখক, প্রকাশক বা প্রাপ্তিস্থান ও মূল্যের নির্দ্দেশ দিতেছি—

১। বিচিত্র কথা—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, আড়াই টাকা
২। বিবিধ কথা— ঐ মিত্র ও ঘোষ, আড়াই টাকা
৩। ঘরোয়া—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, দুই টাকা
৪। প্রাণতত্ত্ব—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ এক টাকা
৫। রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ীপরিকল্পনা—শ্রীসরসীলাল সরকার, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, এক টাকা
৬। মনঃসমীক্ষণ—ডক্টর শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, দুই টাকা
৭। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ঐ দুই টাকা
৮। মাইকেল মধুসূদন (জীবন-ভাষ্য)—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ঐ দুই টাকা
৯। সাভারকর—জগদানন্দ বাজপেয়ী ঐ এক টাকা
১০। কৃষ্ণকান্তের উইল (চরিত্রালোচনা)—শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু, বিশ্ববিদ্যালয়, দাম দেওয়া নাই
১১। আজকার কথা -কাজী আবদুল ওদুদ, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, এক টাকা
১২। সংস্কৃতির রূপান্তর—শ্রীগোপাল হালদার, পুঁথিঘর, কলিকাতা, আড়াই টাকা
১৩। মহাপরিনিব্বান সুত্তং অর্থাৎ তথাগতের অন্তিমাবদান—রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির আনন্দারাম, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম, দুই টাকা
১৪। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু (২য় সং)—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, দেড় টাকা
১৫। আত্মঘাতী হিন্দু—শ্রীশাক্যসিংহ সেন, হিন্দু মিশন, আট আনা
১৬। আমাদের পরিচয়—শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত, বীণা লাইব্রেরি, দুই টাকা
১৭। বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু (দুই খণ্ড)—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরি, চার টাকা
১৮। কাব্য-জিজ্ঞাসা (২য় সং)—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, দেড় টাকা

বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র অষ্টম খণ্ড ও ঐ অচলিত-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৯ম গ্রন্থ 'রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী' (শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মূল্য চার আনা) পুস্তকের প্রকাশও উল্লেখযোগ্য।

আলোচনা

বাংলা শব্দের শ্রেণী বিভাগ

'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাংলা বুলি' প্রবন্ধের ১৫১ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বাক্যাংশ আছে—"বাংলা ভাষার শত-করা পঁচাশিটি শব্দই সংস্কৃত ভাষার তৎসম ও তদ্ভব শব্দ..."। ফুটনোট দৃষ্টে বুঝা যায় ঐ হিসাব উইলিয়ম কেরীর অভিধানের ভূমিকা হইতে গৃহীত। এই অভিধানে আশি-হাজার শব্দ ছিল। ইহা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগের কথা। তারপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে এবং বাংলা সাহিত্য ও ভাষা গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং এখন, আধুনিক বাংলা ভাষার তৎসম ও তদ্ভব শব্দের শত-করা অনুপাত জানিবার আগ্রহ কৌতূহলী পাঠকের হইতে পারে মনে করিয়া উহা সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাংলা অভিধানের যে নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহাকে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিধান বলা যাইতে পারে। তাহাতে প্রায় সওয়া লক্ষ শব্দ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অভিধান ঘাঁটিয়া উহাতে যত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রকারভেদে তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।*

তৎসম শব্দ	৪৪·০০
তদ্ভব ও দেশজ শব্দ	৫১·৪৫
বিদেশী (আরবী পারসী)	৩·৩০
অন্য বিদেশী	১·২৫
	১০০·০০

* জগদীশ ঘোষ—আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ, ৭ম সংস্করণ, ১৯৪০, পরিশিষ্ট, বাংলা শব্দের গোত্রভেদ।—পৃ. ১৩

সুনীতিবাবু তদ্ভব ও দেশজ শব্দের হিসাব একসঙ্গে দেখাইয়াছেন বলিয়া কেরী সাহেবের আমল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের শত-করা অনুপাতের পরিবর্ত্তন কতটা হইয়াছে, তাহা সঠিক বুঝা যাইবে না। কিন্তু উহা হইতে আধুনিক বাংলা ভাষার শব্দ-সংখ্যা ও তাহার শ্রেণীবিভাগ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

শ্রীক্ষিতিনাথ সুর

অতি-আধুনিক মাসিক পত্রিকা

কলেজের ছাত্রছাত্রীরা 'মিতালি' করিয়া যে একটি 'অতি-আধুনিক মাসিক পত্রিকা' বাহির করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে অগ্রহায়ণের "সংবাদ-সাহিত্যে" আপনাদের সমালোচনা পড়িলাম। আপনাদের গোটাকতক কথা জানানো দরকার।

এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই সম্পাদক মহাশয় পত্রিকায় ছাপিবার জন্য আমার নিকট হইতে একটি গল্প চাহিয়া লন, কিন্তু প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই আমার গল্প ছাপাইবার ইচ্ছা একেবারে উবিয়া যায়। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সংখ্যায় আমার গল্প প্রকাশিত হয়।

সেই সময়ে সম্পাদকের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের "ভিতরের" কথা জানিতে পারিয়াছি। সম্পাদকের নিজের গল্পই গোটাকতক কল্পিত মেয়ের নাম লইয়া প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মহাশয়, 'সম্পাদকীয় মন্তব্যে' যে সকল ব্যক্তিকে পত্রের উত্তর জানান, তাহারা সবই কাল্পনিক। আপনি যদি তাহাদের ঠিকানা চাহিয়া বসেন, তাহা হইলে সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয়ই বিপদে পড়িবেন।

সেইজন্য বলিতেছি আপনাদের অনুমান যে ইঁহারা জাল ছাত্রছাত্রী হইতে পারেন, সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে। সম্পাদক মহাশয় ছাত্র ছিলেন বটে, কিন্তু এখন তিনি ছাত্র নন। সেইজন্য ছাত্রছাত্রীরা না করিলেও তাহাদের পক্ষ হইতে আমি ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। প্রতিবাদ করিতেছি রুচি-অরুচি বা শ্লীলতা-অশ্লীলতার নয়, প্রতিবাদ করিতেছি জুয়াচুরির। ইতি

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
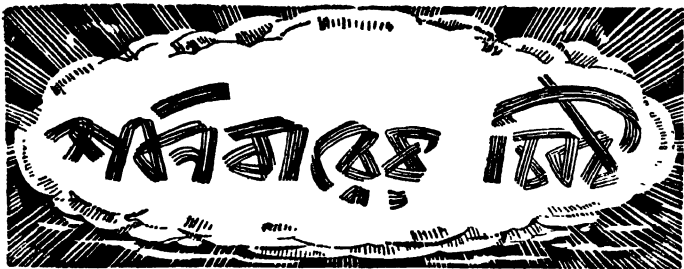
January 1942.

১৪শ বর্ষ] মাঘ, ১৩৪৮ [৪র্থ সংখ্যা

১৯৪২

১

আসন্ন সঙ্কট মাঝে জন্ম নিলে হে বর্ষ নবীন,
রক্তরাঙা বেদনায় পূর্ব্বাচলে তোমার উদয় ;
তব পঞ্জিকায় বন্ধু, তিন শত পঁয়ষট্টিটি দিন
একটি একটি কা'র না জানি কেমনে হবে ক্ষয় !
শিয়রে উড়িছে তব পৃথ্বীধ্বংসী করাল বিমান,
আচম্বিতে মহাকাল দিবে দেখা দিন গণনায়—
কাল-ভয় বক্ষে ল'য়ে পলে পলে কাল-পরিমাণ !
নভোভয়ে ধরণীতে এ প্রথম কালিমা ঘনায় ।

তোমারে সম্মুখে ল'য়ে চেয়ে আছি পূর্ব্ব দিগঙ্গনে,
সূর্য্যের উদয় অস্তে একদিন তুমি হবে শেষ ;
আলোছায়া খেলিবে কি ততদিন আমার নয়নে,
নামিবে অকাল-রাত্রি, আঁখিপক্ষ্ম হারাবে নিমেষ ?

মৃত্যুর প্রতীক্ষা-ক্ষুব্ধ এল রাত্রি বিভীষিকাময়,
সন্তরি তিমির-সিন্ধু হবে প্রাণ-সূর্য্যের উদয়।

২

বহু দীর্ঘ শতাব্দীর তিলে তিলে সঞ্চিত কালিমা,
দেহ আর মস্তিষ্কের পুঞ্জীভূত যুগান্ত জড়তা,
মনের হীনতা যত—খর্ব্ব করি কল্পনার সীমা
রেখেছে গোপন করি নব সূর্য্য-উদয়-বারতা।
মহাকাল-মহাযজ্ঞে তুমি হবে অরণি-সম্ভার,
জ্বালাইয়া আপনারে সুপবিত্র হোম-হুতাশনে
দিবে কি খুলিয়া বন্ধু, মোহ-অন্ধ নয়নের দ্বার,
তব ভস্ম-স্তূপ ভেদি উত্তরিব নূতন জীবনে?

নূতন জীবন, জানি সর্ব্বারিক্ত মহৎ জীবন,
বর্ত্তমান বস্তু-মূল্য—মূল্য তার হবে অর্থহীন—
আমরা তখনো যদি ছিন্ন কন্থা করিয়া সীবন
নগ্নতা ঢাকিতে চাই—দীনের সে চরম দুর্দ্দিন!

বর্ত্তমান গ্লানি আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মাঝে
স্বর্ণসূত্র বর্ষ, তব জয়ধ্বনি শূন্যে শুন বাজে।

৩

জাগো নিত্য বর্ত্তমান, ভয়ঙ্কর এসো মনোহর,
জয় সত্য অনাবৃত, ধমনীর শোণিত-প্রবাহ—

মর্ত্ত্য-মৃত্তিকার জয়, চিরশান্ত যেথা চিত্তদাহ—
দুর্দিনে বীভৎসে ঢাকি শ্যামশস্যে করিছে সুন্দর।
ঊর্দ্ধশিখা অগ্নি নয়, মৃত্তিকার স্তুতিগান গাহ,
বহ্নি এবে নিম্নমুখী, ধরাপ্রেমে ঝরি নিরন্তর
করিছে শ্মশান-দগ্ধ অসহায় মানুষের ঘর,
সুনীল আকাশে ঢাকে চলমান যত বহ্নিবাহ!

মেঘ রহে প্রতীক্ষিয়া, মাটি ফাটিতেছে প্রতীক্ষায়,
একদা সমাপ্ত হবে অগ্নিগর্ভ-শলাকা-বর্ষণ,
স্নিগ্ধ মেঘ পুনঃ আসি দেখা দিবে আকাশের গায়,
রক্তসিক্ত ধরণীতে হলমুখে চলিবে কর্ষণ।
নববর্ষ হবে শেষ, নববর্ষা নামিবে ধরায়—
জীবের সমাধি নয়—মৃত্তিকায় জীবন-দর্শন।

৪

একদিন ঊর্দ্ধে ছিল আমাদের পরম আশ্বাস,
সে আশ্বাস ভেঙে গেছে, নিম্নে করি আশ্রয় সন্ধান;
নিশীথে ক'জন জানি নিশি শেষে কেটে যাবে ত্রাস,
নৃমুণ্ডমালিনী করে এক হস্তে বরাভয় দান?

চলে সংহারের লীলা, শূন্যে শূন্যে ছুটে রক্তধার,
ডাকিনী যোগিনী আসে, অট্টহাসে কাঁপিছে বিমান;
শিব শুয়ে পদতলে, পদে তাই প্রণত সংসার—
নৃমুণ্ডমালিনী করে এক হস্তে বরাভয় দান।

অমাবস্যা-বর্ষ এই, মহাকালী ভেঙেছে শাসন,
উলঙ্গিনী রণসাজে ধরাবক্ষ করিছে শ্মশান—
মৃত্তিকায় পথমাঝে নীলকণ্ঠ শিবের আসন,
নৃমুণ্ডমালিনী করে এক হস্তে বরাভয় দান।

দেখিতে না পাই চোখে মোহ-ভয়ে ধেঁধেছে নয়ান,
নৃমুণ্ডমালিনী করে এক হস্তে বরাভয় দান।

৫

তোমারে প্রণাম করি, নববর্ষ সুন্দর ভয়াল,
স্বার্থ-সংঘাতের পঙ্কে পঙ্কজের মৃণাল স্বরূপ—
তোমারে প্রণাম করি হে পাবকরূপী খণ্ডকাল,
তব স্পর্শে একদিন শুচি হবে জঞ্জালের স্তূপ।
বিলাসের শয্যা 'পরে তুমি বন্ধু, রোগের সাধনা,
মৃতকল্প শান্তি মাঝে তুমি এলে জীবন-সংগ্রাম,
বিদীর্ণ মন্দিরে পুনঃ দেবতার নব আরাধনা—
তোমার সুকীর্ত্তি স্মরি ভাবীকাল জানাবে প্রণাম।

ঘিরিয়াছে মুগ্ধ জনে বন্দী-জীবনের শান্তিজাল,
পরম অমৃতজ্ঞানে তাহারা করিল বিষপান ;
নীলকণ্ঠ মহাদেব জাগিবে না হয়ে মহাকাল ?
পীঠে পীঠে বিখণ্ডিত সতীদেহ পাবে না কি প্রাণ ?

নিষ্ক্রিয়-সমাধি ভেঙে জাগো জাগো জাগো নটনাথ,
তাণ্ডব-নৃত্যের তালে এ ভারতে কর পদপাত।

৬

সুচারু জীবনযাত্রা শৃঙ্খলিত খাঁচার পাখীর,
যুগান্তের দাঁড়ে ব'সে পড়া নিত্য যত্নে শেখা বুলি—
ভেঙে দাও ভেঙে দাও, এ আরাম মিথ্যা ও ফাঁকির,
দুয়ার না যদি খোলো, নয়নের দৃষ্টি দাও খুলি।
লেগেছে ঝড়ের দোলা, কাঁপিতেছে নিশ্চিত আশ্রয়,
পিঞ্জরের হাড়ে হাড়ে গৃহভিত্তি হানিছে আঘাত,
ভাঙিয়া পড়িল বুঝি, তবু চিত্তে জাগে না সংশয়,
যে তোরে আশ্রয় দিল এ কি শুধু তারি ঝঞ্ঝাবাত ?

ভাঙিবে খাঁচার দ্বার, মেঘে মেঘে তাহারই আভাস,
উড়িবে গৃহের চূড়া, শুনিছ না বজ্রের গর্জ্জন ?
কাটে না শৃঙ্খল-মায়া তবু, হায় অন্ধ ক্রীতদাস,
ঝড়ের বিষম ঘায়ে ছিঁড়ে যাবে পাখার বন্ধন।

ঝড়রূপী মুক্তি এল, আকাশ দিতেছে তোরে ডাক,
অকাল-বৈশাখী নয়, শীত-অন্তে মুক্তির বৈশাখ।

৭

দুদিনের সহযাত্রী, এল ঝড়, হ'ল ছাড়াছাড়ি,
এক কুলায়ের পাখী দুই পারে বাঁধে দুই নীড় ;
পাহাড়ের জলধারা অকস্মাৎ প্লাবি দুই তীর
প্রান্তরের মানুষের ভাসাইল যত্নে-গড়া বাড়ি।
ঝড়ের কারণ খুঁজি, মেপে মরি তটিনীর নীর,
তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ জলে চাহি পুনঃ জমাইতে পাড়ি,

নবতর ঝঞ্ঝা আসে বাকি যাহা তাও লয় কাড়ি,
পাকা ঘুঁটি যায় কেঁচে, চিরস্থির নিয়ত অস্থির।

চোরাবালি-ভিত্তি 'পরে আমরা বাঁধিয়া আছি ঘর,
সে ঘর তাসের ঘর, নিয়তির নিষ্ঠুর নির্দ্দেশ,
গড়ার নিয়তি ভাঙা ; তত দুঃখ যত আড়ম্বর—
অকরুণ হত্যা তারো উপলক্ষ্য মাটি আর দেশ!
মদমত্ত মানুষের লোভ নিল নাম মনোহর—
দুই পক্ষে শক্তিহীন সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ।

৮

শ্মশানের ধ্বংসস্তূপে জীবনের জাগে নবাঙ্কুর,
দধীচির অস্থি হতে বড় আরো দধীচির প্রাণ,
বজ্র-গর্জ্জনের ঊর্দ্ধে শুনা যায় বাঁশী সুমধুর,
যুগে যুগে মহাকাল শিবরূপে করেন কল্যাণ।

চৌদিকে তাণ্ডব হেরি আজ মোরা ভয়ার্ত্ত সকলে,
হেরি না ক বরাভয়, পশে কানে মৃত্যুর আহ্বান!
স্তব্ধ রহে চিরন্তন—ক্ষণিকের ক্ষণ কোলাহলে,
যুগে যুগে মহাকাল শিবরূপে করেন কল্যাণ।

প্রজ্বলন্ত ধাতুবাষ্পে বন্দী ছিল প্রচণ্ড জীবন,
সে জীবনে বার বার মৃত্যু হানিয়াছে মৃত্যুবাণ,
হয়েছে বিফল, হবে, মরণের সব আয়োজন,
যুগে যুগে মহাকাল শিবরূপে করেন কল্যাণ।

জাবন পবিত্র হয় রহি রহি করি মৃত্যু-স্নান—
যুগে যুগে মহাকাল শিবরূপে কবেন কল্যাণ।

৪।১।৪২

"বশীকরণ" ও 'ফাল্গুনী'

১৩২২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস, ইংরেজী ১৯১৫, ডিসেম্বর। কাশ্মীর-ভ্রমণ সমাপনান্তে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল শিলাইদহে বাস করিয়া কলিকাতা হইয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। ১০ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার রামমোহন-লাইব্রেরি-হলে "শিক্ষার বাহন" প্রবন্ধপাঠ এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা: পৌষের প্রারম্ভেই কবি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এই সময়ে নাটক সম্বন্ধে আলোচনায় বিশেষ করিয়া 'রাজা' 'ডাকঘর প্রভৃতি নূতন রচিত নাটকগুলির ব্যাখ্যানে তাঁহার খুবই উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এই সব আলোচনায় যোগ দিতেন। একদিন স্কুলে নব-অধিকৃত কুঠিবাড়িতে ঘটা করিয়া বনভোজন হয়। সকলে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব করেন। এখানেও নাটক সম্বন্ধে আলোচনার একটি বৈঠক বসে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের প্ররোচনায় একজন ছাত্র রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার "বশীকরণ" নাটিকাটি পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, তিনি ঐ নামীয় কোনও নাটিকা কোনও দিন রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে একখানি 'ব্যঙ্গ-কৌতুক' আনিয়া দেওয়া হইল; তিনি সকৌতুক উৎসাহে যেন সম্পূর্ণ-অপরিচিত কোনও রচনা পাঠ করিতেছেন—এই ভাবে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি থামিয়া থামিয়া যাইতে লাগিলেন, স্থানে স্থানে সামান্য আদিরসের ইঙ্গিতজনিত লজ্জায় তাঁহার মুখচোখ কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে লঘু হাস্যরসের

অবতারণা থাকাতে তিনি ঈষৎ আনত হইয়া বইখানির উপর মুখ রাখিয়া উচ্ছ্বসিত হাসি দমন করিতে লাগিলেন। সে এক অপরূপ দৃশ্য!

এই ভাবে বাধার মধ্য দিয়া নাটিকাপাঠ সমাপ্ত হইল। ভাগ্যবান যাঁহারা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ হইয়া সলজ্জ সস্মিত বিশ্বকবির মুখে এই নাটিকাপাঠ শ্রবণ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে কৌতুকহাস্যে আসর গমগম করিতে লাগিল।

এই সময়ে 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর দুঃখ-নিবারণকল্পে অর্থ-সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় এই অভিনয় হইবে স্থির হইয়াছিল। শান্তিনিকেতনে অভিনয়ের মহড়াও আরম্ভ হইয়াছিল। "বশীকরণ" পাঠ শেষ হইবার কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ বলিয়া উঠেন, ভালই হ'ল, 'ফাল্গুনী'র গোড়াতে এই "বশীকরণ"কে জুড়ে দিলে আরম্ভটা মন্দ হবে না। কি বল তোমরা?

'ফাল্গুনী'র সহিত "বশীকরণ" কি ভাবে খাপ খাইতে পারে, ইহা উপস্থিত কাহারও বোধগম্য না হওয়াতে কেহই কোনও উত্তর করিলেন না; প্রসঙ্গটা সেদিনের মত চাপা পড়িল।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র ভদ্র তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক। এই ঘটনার পরের দিন তাঁহার কলিকাতায় যাইবার কথা ছিল; তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ খুব গম্ভীরভাবে তাঁহাকে বলিলেন, যাওয়া হবে না তোমার। কাজ আছে।

ইহার উপর কথা চলে না। উপেন্দ্রবাবু রহিয়া গেলেন। কবি বলিলেন, 'ব্যঙ্গকৌতুক' আন একখানা।

উপেন্দ্রবাবু তাঁহার নিজের 'ব্যঙ্গকৌতুক'খানি হাজির করিয়া

দিলেন। রবীন্দ্রনাথ বইখানি লইয়া "বশীকরণ" সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার উপেন্দ্রবাবুর ডাক পড়িল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হাতে 'ব্যঙ্গকৌতুক' বইখানি দিয়া বলিলেন, এইবার কলকাতায় যাও। জুড়ে দিয়েছি "বশীকরণ"কে 'ফাল্গুনী'র সঙ্গে। অবনকে গিয়ে দেখাও। স্টেজটা নতুন ক'রে এই ভাবে তৈরি করতে হবে, তুমি বুঝে নাও।

এই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি কাগজে কম্‌বাইণ্ড স্টেজটি আঁকিয়া দেখাইয়া দিলেন। "বশীকরণ" নাটিকাটির সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে, ২২ এবং ৪৯ এই দুইটি নম্বরের দুইটি বাড়ি লইয়া এই নাটকের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি বাড়িকে একটি প্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে রাখিয়া পথের মাঝখানে 'ফাল্গুনী'র মঞ্চ স্থাপন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

উপেন্দ্রবাবু যথাসময়ে অবনীন্দ্রনাথের নিকট 'ফাল্গুনী' নাটকের এই নূতন সংযোজনাটুকু দাখিল করিয়াছিলেন; অবনীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন; কিন্তু "বশীকরণে"র স্ত্রী-ভূমিকায় যাঁহাদের মঞ্চে অবতীর্ণ হইবার কথা ছিল, তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত অতখানি দুঃসাহস প্রকাশ করিতে রাজি না হওয়াতে "বশীকরণ"-অংশ বাতিল হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া 'ফাল্গুনী'র ভূমিকাস্বরূপ "বৈরাগ্যসাধন" নামক একটি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিয়া দেন। "বৈরাগ্যসাধন" ও 'ফাল্গুনী' ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জোড়াসাঁকো বাটীতে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ "বৈরাগ্যসাধনে" কবিশেখর ও 'ফাল্গুনী'তে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অভিনয় ঐতিহাসিক ঘটনা, অনেকেই এ বিষয় অবগত আছেন।

কিন্তু "বশীকরণ" নাটিকার কয়েক ঘণ্টার স্বর্গপ্রাপ্তির ইতিহাসটুকু

উপেন্দ্রবাবুর 'ব্যঙ্গকৌতুক' বইখানির মধ্যে থাকিয়া যায়। উপেন্দ্রবাবু* পরে কর্ম্মব্যপদেশে শ্রীহট্টে অবস্থান করেন এবং সেখানে তাঁহার সুসজ্জিত লাইব্রেরি-ঘরে "বশীকরণে"র এই কৌতুককর ইতিহাস চাপা পড়িয়া থাকে।

উপেন্দ্রবাবু স্বয়ং এতদিন পরে সেই ইতিহাসের উপকরণ আমাদের হাতে দিয়াছেন ; সেকালের ঘটনা তাঁহারই মারফৎ প্রাপ্ত হইয়া আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম। রবীন্দ্রনাথ কি পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইবার জন্য "বশীকরণে"র পঞ্চম অঙ্কের শেষাংশ কতকটা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইল। "বশীকরণ" হইতে গৃহীত অংশ বর্জাইস অক্ষরে এবং নূতন সংযোজিত অংশ পাইকা অক্ষরে নিম্নে ছাপা হইল।—

হুলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে স্ত্রীদলের প্রবেশ

(অন্নদার বামে মাতাজির উপবেশন ও তাহার হস্তে হস্তস্থাপন)

অন্নদা। এটা বেশ লাগছে, কিন্তু ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে পারচিনে !

রমণীগণের গান

এবার সখি সোনার মৃগ
দেয় বুঝি দেয় ধরা !
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা
আয় সবে আয় ত্বরা !
ছুটেছিল পিয়াসভরে
মরীচিকা-বারির তরে,
ধ'রে তারে কোমল করে
কঠিন ফাঁসি পরা' !

---

* আশ্বিন সংখ্যা (রবীন্দ্র-সংখ্যা) 'শনিবারের চিঠি'তে "রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ" ও "রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে" উপেন্দ্রবাবুর উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত অতুল সেনের সহিত তিনিও কালিগ্রাম পরগণার পল্লীসংস্কার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

দয়ামায়া করিসনে গো,
ওদের নয় সে ধারা!
দয়ার দোহাই মানবে না যে
একটু পেলেই ছাড়া!
বাঁধন-কাটা বন্যটাকে
মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তাকে বাঁশির ডাকে
বুদ্ধিবিচারহরা!

অন্নদা। বুদ্ধিবিচার একেবারেই যায় নি! অতি সামান্যই বাকি আছে। তার থেকে মনে হচ্চে, ঐ যে যাকে জন্তু-জানোয়ার বলা হ'ল সে সৌভাগ্যশালী আমি ছাড়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে, আর কেউ হতেই পারে না! গানটি ভাল, সুরটিও বেশ, কণ্ঠস্বরেরও নিন্দা করা যায় না—কিন্তু রূপক ভেঙে সাদাভাষায় একটু স্পষ্ট কোরে সবটা খুলে বলুন দেখি—আমার সম্বন্ধে আপনারা কি করতে চান! পালাব এমন আশঙ্কা করবেন না, আপনারা তাড়া দিলেও নয়। কিন্তু কোথায় এলুম, কেন এলুম, কোথায় যাব, এ সকল গুরুতর প্রশ্ন মানবমনে স্বভাবতই উদয় হ'য়ে থাকে।

মাতাজি। তোমার স্ত্রীকে কি মাঝে মাঝে স্মরণ কর?

অন্নদা। কোরে লাভ কি, কেবল সময় নষ্ট! তাঁকে স্মরণ কোরে যেটুকু সুখ, আপনাদের দর্শন কোরে তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দ।

মাতাজি। তোমার স্ত্রী যদি তোমাকে স্মরণ কোরে সময় নষ্ট করেন?

অন্নদা। তা হ'লে তাঁর প্রতি আমার উপদেশ এই যে, আর অধিক নষ্ট করা উচিত হয় না—হয় বিস্মরণ করতে আরম্ভ করুন, নয় দর্শন দিন, সময়টা মূল্যবান জিনিষ!

মাতাজি। সেই উপদেশই শিরোধার্য্য। আমিই তোমার সেবিকা শ্রীমতী মহীমোহিনী দেবী।

অন্নদা। বাঁচালে। মনে যে রকম ভাবোদ্রেক করেছিলে, নিজের স্ত্রী না হ'লে গলায় দড়ি দিতে হ'ত। কিন্তু নিজের স্বামীর জন্যে এ সমস্ত ব্যাপার কেন?

মাতাজি। গুরুর কাছে যে বশীকরণমন্ত্র শিখেছিলেম, আগে সেইটে প্রয়োগ কোরে তবে আত্মপরিচয় দিলেম, এখন আর তোমার নিষ্কৃতি নেই।

অন্নদা। আর কারো উপর এ মন্ত্রের পরীক্ষা করা হয়েছে?

মাতাজি। না, তোমার জন্যেই এতদিন এ মন্ত্র ধারণ কোরে রেখেছিলেম। আজ

এর আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষফল পেয়ে গুরুর চরণে মনে মনে শতবার প্রণাম করচি। অব্যর্থ মন্ত্র। মন্ত্রে তোমার কি বিশ্বাস হ'ল না।

অন্নদা। বশীকরণের কথা অস্বীকার করতে পারি নে। এখন তোমাকে এক বার এই মন্ত্রগুলো পড়িয়ে নিতে পারলে আমি নিশ্চিন্তই হই।

(দাসীকর্ত্তৃক সম্মুখে আহার্য্য-স্থাপন)

অন্নদা। এও বশীকরণের অঙ্গ। বন্যমৃগই হোক, আর সহুরে গাধাই হোক, পোষ মানাবার পক্ষে এটা খুব দরকারী। (আহারে প্রবৃত্ত)

আশুর দ্রুত প্রবেশ। মাতাজি প্রভৃতির প্রস্থান

আশু। ওহে অন্নদা, ভারি গোলমাল বেধে গেছে। বাঃ, তুমি যে দিব্যি আহার করতে বসেছ। তোমার এ কি রকমের সাজ! (উচ্চহাস্য) ব্যাপারখানা কি! নরমুণ্ড, খাঁড়া, বাতি, জবার মালা? তোমার বলিদান হবে না কি!

অন্নদা। হোয়ে গেছে।

আশু। হোয়ে গেছে কি রকম?

অন্নদা। সে সকল ব্যাখ্যা পরে করব। তোমার খবরটা আগে বল।

আশু। তুমি বিবাহের জন্যে যে কন্যাটিকে দেখবে বোলে স্থির করেছিলে, তাঁরা হঠাৎ উনপঞ্চাশ নম্বর থেকে বাইশ নম্বরে উঠে গেছেন। আমি কন্যার বিধবা মাকে মাতাজি মনে কোরে বরাবর এমন নির্ব্বোধের মত কথাবার্ত্তা কয়ে গেছি যে, তাঁরা ঠিক কোরে নিয়েছেন—আমি মেয়েটিকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছি। এখন তুমি না গেলে ত আর উদ্ধার নেই!

অন্নদা। মেয়েটি দেখতে কেমন?

আশু। দেবকন্যার মত।

অন্নদা। তা হোক, বহুবিবাহ আমার মতবিরুদ্ধ।

আশু। বল কি? সেদিন এত তর্ক করলে—

অন্নদা। সেদিনকার চেয়ে ঢের ভাল যুক্তি পাওয়া গেছে—

আশু। একেবারে অখণ্ডনীয়?

অন্নদা। অখণ্ডনীয়।

আশু। যুক্তিটা কি-রকম দেখা যাক!

অন্নদা। তবে একটু বোস। (প্রস্থান ও মাতাজিকে লইয়া প্রবেশ) ইনি আমার স্ত্রী শ্রীমতী মহীমোহিনী দেবী।

আশু। অাঁ! ইনি তোমার—আপনি আমাদের অন্নদার—কি আশ্চর্য্য তা হ'লে ত হ'তে পারে না!

অন্নদা। হ'তে পারে না কি বল্‌চ! হয়েছে, আবার হ'তে পারে না কি! একবার হয়েছে, এই আবার দু'বার হ'ল, তুমি বল্‌চ হ'তে পারে না! বহুবিবাহ কাকে বলে এবার সেটা নতুন করে বুঝেচি।

আশু। কি রকম শুনি।

অন্নদা। একের সঙ্গেই আমাদের বহুবার করে মিলন হচ্চে। একটি পুরাতনকেই আমরা বারে বারে নূতন করে পাচ্চি।

আশু। আমি ত এই তত্ত্ব তোমাকে এর আগে বোঝাতে চেয়েছিলুম তখন তুমি কান দেওনি।

অন্নদা। এখন ভাল গুরু পেয়েছি বলেই সব বোঝা এত সহজ হ'য়ে গেছে। তোমাকেও কতবার আমি বোঝাতে চেয়েছি, মন্ত্র জিনিষটা খুবই সত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সে ত পুঁথির মন্ত্র নয়—মন্ত্র আছে চোখে মুখে হাসিতে ইসারায়। আমার কথা বিশ্বাস কর নি—এখন মন্ত্রদাতা যেমনি পেয়েছ অম্‌নি সব সন্দেহ ঘুচে গেছে।

আশু। চল্লেম। এক ঘণ্টার মধ্যেই যাবার কথা আছে। আর কুড়ি মিনিট বাকি।

অন্নদা। একটা কথা বলে নিই। তোমার ত অনেক কবি বন্ধু আছে—আমাদের এই বহুবিবাহের উৎসবে একটি নাটক ফরমাস দিতে চাই।

আশু। বিষয়টা কি হবে বল দেখি?

অন্নদা। হারাধনকে ফিরে পাওয়া।

আশু। যেমন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমরা পুরোনো জীবনকে আবার নতুন করে পাই।

অন্নদা। আশু, তোমার ওসব তত্ত্ব কথা রাখ। এখন আমার কবিত্বে ভারি দরকার। এমনি হয়েছে যদি শীগ্‌গির একটা কাব্য জুটিয়ে না দিতে পার তাহলে আমিই লিখ্‌তে বসে যাব—সম্পাদক, পাঠক, মাষ্টার মশায়, পুলিস্‌ম্যান, কাউকে মান্‌ব না। সেই বিপদ থেকে গৌড়জনকে রক্ষা কর।

আশু। আচ্ছা বেশ, বিষয়টা তাহলে এই রইল, শীতের ভিতর দিয়ে একই বসন্তের বারবার নতুন হয়ে ফিরে ফিরে আসা। যখন মনে হচ্চে সবই ঝরে পড়ল তার পরেই দেখি সবই গজিয়ে উঠ্‌চে, বনলক্ষ্মীর আঁচল যেই শূন্য হয় অমনিই তা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভরে ওঠে। এম্‌নি করে একই ধনকে বারবার করে পাওয়া।

অন্নদা। বাহবা আশু! এ'কেই ত বলে কবিত্ব! কিন্তু বহুবিবাহ করলুম আমি, আর তোমার মাথায় তার কবিত্ব গজিয়ে উঠ্‌ল কি করে?

আশু। বলব? বাইশ নম্বরে আমি যাঁর কাছে আজ মন্ত্র নিয়ে এসেছি, মনে হল এ মন্ত্র তাঁরই চোখ মুখ হাসি থেকে যেন আমি বারে বারে নিয়েছি—নতুন নতুন নম্বরের গলিতে, নতুন নতুন ভাষায়। তোমার মহীমোহিনী যেমন

তোমার একবারই মোহিনী নয়, আমার মনোরমাও তেমনি আমার লক্ষ যৌবনের লক্ষবারকার মনোরমা।

অন্নদা। হয়েচে, হয়েচে হে, আর বলতে হবে না। জীবনের লুকোচুরি খেলার রসটি আমরা দুই বন্ধুই ঠিক এই মুহূর্ত্তে ধরতে পেরেচি।

আশু। (মহীমোহিনীর দিকে ফিরিয়া) দেবী, তোমাদের কল্যাণে আমরা অমৃতকে চক্ষে দেখেচি—আমরা চিরজীবনকে পাক্‌ড়াও করেচি। আমরা এখন থেকে পৃথিবীর সেই বুড়োটাকে আর বিশ্বাস করব না—তার মুখস খসে গেছে, সে চিরযৌবন, সে চিরপ্রাণ। তাকে যেম্‌নি ধরতে যাই অমনি দেখি সে নেই—তার জায়গায় তোমরা—হে চিরসুন্দর, হে চির আনন্দ।

অন্নদা। আরে আরে আশু, কর কি, কর কি! তুমি আমার মুখের সব কথাই যে কেড়ে নিলে কিছু আর বাকি রাখ্‌লে না! ভুলে যাচ্ছ তোমার কুড়ি মিনিটের আর বারো মিনিট মাত্র বাকি।

আশু। ঠিক বটে চল্লুম।

অন্নদা। কাজ সারা হলে তোমার কবিকে একবার ঠেলে তুলো—ভুলো না। ফাল্গুন মাসে ত্রিশটা বই দিন নেই।

আশু। পাঁজির ফাল্গুনের সঙ্গে আমাদের ফাল্গুনের মিলবে না। আমাদের ফাল্গুনের দিন বেড়ে গেছে।

বৌ-পালানো যুদ্ধ

চারদিকেতে বৌ ছুটেছে গুছিয়ে লোটা কম্বল
স্বপাক খেয়ে শহরবাসীর বাড়বে এবার অম্বল।
এই সুযোগে বাপের বাড়ি চলল নতুন বৌরা,
বৃদ্ধা ছোটেন ছেলের বাসায়, ভায়ের বাসায় প্রৌঢ়া।
ভাঁড়ার ঘরের চাবি ফেলে ছোটেন পাকা গিন্নী
মানে প্রাণে ছুটতে কেহ মানেন পীরের সিন্নি।
রইল প'ড়ে ধোপার খাতা, হাঁড়ি, কড়া, খুন্তি,
বাঙালী বৌ "দেশে", উড়ে "দেশ্ব যাউছন্তি"।
স্পেশাল ট্রেনের হয় নি অভাব রয় না তবু জায়গা,
"জান নিকলে ঠেস্‌মে লেকিন দেশমে জরুর যায়গা।"
পাঞ্জা দেখায় পাঞ্জাবিনী, বোর্খা করে হাল্লা,
মাদ্রাজিনী মাদ্রাজেতে ছুটছে দিয়ে পাল্লা,
আস্তে ধীরে অনেক কিছুই গেছে মোদের সত্য—
একসঙ্গে যায় নি এমন সবার পাতিব্রত্য।
তাই তো মোদের চৌধুরীদা বললে হয়ে ক্রুদ্ধ,
"ইতিহাসে নেইকো এমন বৌ-পালানো যুদ্ধ।"

শ্রীসুলতা সেনগুপ্তা

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৮

স্থান—মেয়েদের কলেজ-হষ্টেলের একটি ঘর।

সময়—বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ ভাগ।

তারিখ—১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৮।

রাত্রি প্রায় দশটার কাছাকাছি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুরুগুরু গর্জ্জন শোনা যাইতেছে, কিন্তু এখনও বর্ষণ শুরু হয় নাই। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে যে সান্ধ্য-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সবেমাত্র ভাঙিয়াছে। চার পাঁচটি পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের মেয়ে কলরব করিতে করিতে ঘরটিতে প্রবেশ করিল। একজনের হাতে বিদ্যাসাগরের একখানি বাঁধানো ছবি। মেয়েগুলির সাজসজ্জা দেখিয়া মনে হয় না যে, তাহারা কোন গম্ভীর শোকসভা হইতে আসিতেছে, বরং মনে হয় তাহারা সিনেমা হইতে ফিরিল

প্রথমা। বাবা বাবা বাবা! বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-বার্ষিকী নয় তো, আমাদের মৃত্যু-বার্ষিকী, একটা ফাঁড়া যেন!

দ্বিতীয়া। যা বলেছিস, বক্তৃতা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা! লোক-গুলো বলতে আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না।

তৃতীয়া। আজও আমার ডেন্‌টিস্টের কাছে যাওয়া হ'ল না, পরশুদিনই ফিলিংটা প'ড়ে গেছে, ভেতরে কিছু একটা ঢুকে গেলে আবার—। [সহসা চতুর্থাকে] তুই সেদিন মার্কেট থেকে এই শাড়িটা কিনলি বুঝি?

চতুর্থা। হ্যাঁ।

প্রথমা। রংটা আর একটু 'সোবার' হ'লে ভাল হ'ত।

দ্বিতীয়া। [অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া] ও তো আর তোমার পছন্দ অনুসারে শাড়ি কিনবে না।

চতুর্থা। [ঈষৎ কোপভরে] তোমাদের খালি ওই এক চিন্তা!

পঞ্চমা। তাতে দোষটা কি, ভাবী স্বামীর পছন্দ অনুসারে চলাই তো ভাল।

দ্বিতীয়া। আচ্ছা, কি কেলেঙ্কারি করলে বল দেখি আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট! বলবার ক্ষমতা নেই যখন, বলতে ওঠা কেন, আমতা আমতা ক'রে, ঘেমে, ঢোঁক গিলে—ছি—ছি!

চতুর্থা। সত্যি! আর আমাকেই বা শুধু শুধু এই ছবিটা নিয়ে যেতে বললে কেন বল তো? ওরা বেশ বড় সুন্দর ছবি এনেছিল, আমি শুধু শুধু ব'য়ে মলুম এটা।

তৃতীয়া। বেচারী!

পঞ্চমা। ল কলেজের ছেলেটি বেশ বললে কিন্তু।

প্রথমা। আমি শুনি নি।

পঞ্চমা। কানে আঙুল দিয়ে ছিলি নাকি?

প্রথমা। আমি শুধু দেখছিলাম তাকে।

দ্বিতীয়া। সত্যি, কি মিষ্টি দেখতে ছেলেটি!

তৃতীয়া। [চতুর্থাকে] তোর কিন্তু এমন ভাবে সেজেগুজে যাওয়াটা ঠিক হয় নি।

চতুর্থা। [ফোঁস করিয়া উঠিল] আহা, তবু যদি ওঁকে মাসে দুবার ক'রে না দেখতে আসত!

তৃতীয়া। [গালে হাত দিয়া] আমাকে মাসে দুবার ক'রে দেখতে আসে!

চতুর্থা। না এলে সেজেগুজে সিনেমাতে পার্টিতে যাওয়ার অত ঘটা কেন? আমরা যেন বুঝি না কিছু!

তৃতীয়া। যত সব বাজে কথা।

রোষভরে বাহির হইয়া গেল

প্রথমা। [চতুর্থাকে] তোর 'বেড পিল' আর আছে?

চতুর্থা। আছে।

প্রথমা। আমাকে দে তো ভাই একটা।

চতুর্থা টেবিলের উপর হইতে একটি ছোট লালরঙের কৌটা দিল

চতুর্থা। একটি মাত্রই আছে আর।

প্রথমা। যাই এবার, আমার চুল খুলতে বাকি এখনও। [দ্বিতীয়াকে] আয় না।

দ্বিতীয়া। যা না, আমি আসছি।

প্রথমা। না, আমার বড় ভয় করে ভাই ওই বারান্দাটা দিয়ে একা যেতে, ওখানকার বাল্‌বটাও আবার ফিউজ হয়ে গেছে।

চতুর্থী। বুড়ো ধাড়ি মেয়ে, এ কথা বলতে লজ্জা করে না ?

প্রথমা। নিজে যা সাহসী, তা জানা আছে। সেদিন একটা কালো বেড়াল দেখে আঁতকে উঠেছিলেন।

চতুর্থী। বেড়াল দেখে আঁতকে উঠতে পারি, তোমাদের মত ভূতের ভয় আমার নেই।

প্রথমা। মিথ্যুক কোথাকার! [পঞ্চমাকে] তবে তুই আয়।

পঞ্চমা। চল, একটা কথা ব'লে যাই থাম, একে—

চতুর্থীর কানে কানে কি যেন বলিল, উভয়েই একটু হাসিল

প্রথমা। তোদের ফুসফুস-গুজগুজের আর অন্ত নেই!

পঞ্চমা। চল এইবার।

পঞ্চমা ও প্রথমা বাহির হইয়া গেল

দ্বিতীয়া। আমাকে এইবার নোটটা দে ভাই, যাই। মেঘ করেছে, বৃষ্টি নামবে বোধ হয়, আমার দিকের জানলা আবার খোলা আছে।

চতুর্থী। এই যে দিই, খুঁজতে হবে একটু।

দ্বিতীয়া। ছবিখানা নিয়ে ঘুরছিস কেন, টাঙিয়ে রাখ না। পেরেকের খোঁচ-টোঁচ লেগে অমন সুন্দর শাড়িখানা ছিঁড়ে যাবে আবার। কত পছন্দ ক'রে কিনে দিয়েছেন ভদ্রলোক।

চতুর্থী শেল্‌ফে 'নোট' খুঁজিতেছিল, এই কথায় ঘাড় ফিরাইয়া মুচকি হাসিল

দ্বিতীয়া। বাঁ দিকের ওই কোণের দিকে বসেছিলেন তো ? দেখেছি আমি।

চতুর্থী একটি খাতা আনিয়া দ্বিতীয়াকে দিল। আকাশের গুরুগুরু গর্জ্জন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল

দ্বিতীয়া। [সচকিত] আমি যাই। সত্যি, তোর সাহস আছে বলতে হবে, আমি তো ম'রে গেলেও এই সিংগল-সীটেড রুমে থাকতে পারতাম না।

দ্বিতীয়া চলিয়া গেল। চতুর্থী তখন বিদ্যাসাগরের ছবিটি যথাস্থানে টাঙাইয়া রাখিল। ক্ষণকাল ছবিটির পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কি ভাবিয়া একটি প্রণাম করিল। তাহার পর গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে আয়নার সম্মুখে গিয়া পোশাকী ঝুমকো হার প্রভৃতি গহনাগুলি খুলিয়া রাখিতে লাগিল। নিঃশব্দচরণে বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আয়নায় ছায়া পড়িতেই মেয়েটি ফিরিয়া দেখিল এবং বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল

মেয়েটি। কে আপনি ?

বিদ্যাসাগর নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন

কে আপনি ?

বিদ্যাসাগর। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দিকি, চিনতে পার কি না।

মেয়েটি চিনিবার চেষ্টা করিল

মেয়েটি। কই না, চিনতে পারছি না।

বিদ্যাসাগর। তবে চললুম।

গমনোদ্যত

মেয়েটি। [আদেশের ভঙ্গিতে] দাঁড়ান।

বিদ্যাসাগর ফিরিলেন

বিদ্যাসাগর। কি ?

মেয়েটি। আপনি রাত্রে এখানে এলেন কি ক'রে ?

বিদ্যাসাগর। বিনা নিমন্ত্রণে সাধারণত আমি কোথাও যাই না। তোমরা আজ আমাকে স্মরণ করেছিলে তাই এসেছিলাম, তাড়িয়ে দিচ্ছ, চ'লে যাচ্ছি।

মেয়েটি। আপনাকে স্মরণ করেছিলাম !

বিদ্যাসাগর। অন্তত খবরের কাগজে তাই বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

অস্বস্তিকর সত্যটা সহসা মেয়েটির চেতনায় প্রতিভাত হইল। সে দেওয়ালের ছবিটার দিকে চাহিয়া আবার বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে চাহিল। বিদ্যাসাগর হাসিলেন

মনে হচ্ছে, যেন চিনেছ চিনেছ।

মেয়েটি। [রুদ্ধশ্বাসে] আপনি কি—?

বিদ্যাসাগর। [হাসিয়া] এখনই যে বড় বড়াই করছিলে, ভূতের ভয় নেই তোমার !

মেয়েটি ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

ভয় পেও না, কোন ভয় নেই তোমার, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।

মেয়েটি। [সবিস্ময়ে] আপনি বিদ্যাসাগর !

বিদ্যাসাগর। এতক্ষণে চিনতে পারলে যা হোক তবু।

মেয়েটি। আপনি ভূত হয়ে আছেন !

বিদ্যাসাগর। বর্ত্তমান যে নই, তার প্রমাণ তো তুমিই এখনই দিলে। সামনে এসে দাঁড়ালাম, তবু চিনতে পারলে না। চিনতে যদি বা পারলে, এখনও ভয় খাচ্ছ মনে মনে। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে এসেছিলাম, তা আর হ'ল না দেখছি। [একটু থামিয়া] আমার জন্যে আজ সন্ধ্যে থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছ, শোও এবার, অনেক রাত হয়েছে।

মেয়েটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

যাও, শোও গিয়ে। সকালে উঠে ভেবো, রাত্রে একটা ভূতের স্বপ্ন দেখেছিলে।

হাসিলেন

মেয়েটি। আপনার কথা শুনে আপনাকে কিন্তু আর ভয় করছে না আমার। ঠিক মনে হচ্ছে আপনি যেন বেঁচে আছেন।

বিদ্যাসাগর। বেঁচে আছি বইকি—[হাসিয়া] জীবন-চরিতের পাতায়। আমার কথা থাক, আর ভয় করছে না যখন, তোমার কথাই একটু বল শুনি। কোন্ শ্রেণীতে পড় তুমি ?

মেয়েটি। আমি এম. এ. পড়ি।

বিদ্যাসাগর। এম. এ. পড় ! বাঃ বাঃ, বড় সুখী হলাম। চন্দ্রমুখী যখন এম. এ. পাস করেছিল, তখন ভারী আহ্লাদ হয়েছিল আমার, তাকে একখণ্ড শেক্‌স্পীয়রের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়েছিলাম। তোমার কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নি, নয় ?

মেয়েটি। না।

বিদ্যাসাগর। কেন, এখনও বিবাহ হয় নি কেন ?

মেয়েটি। আপনি এ কথা বলছেন ! আপনিই তো বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন শুনতে পাই।

বিদ্যাসাগর। আমাদের কালে বড্ড কচি কচি শিশুদের বিয়ে হ'ত যে! তাই তার বিরুদ্ধে লেগেছিলাম। তা ব'লে সময়ে বিয়ে করবে না? এত এত লেখাপড়া শিখে লাভ কি, যদি তোমরা দেশকে সু-সন্তান না দিতে পার?

মেয়েটি। [মুচকি হাসিয়া] কেন, চাকরি করব।

বিদ্যাসাগর। চাকরি করবে! কেন?

মেয়েটি। স্বাধীনভাবে থাকতে পারব। সামান্য টাকার জন্য স্বামীর কিংবা আর কারও মুখ চেয়ে থাকা অপমানকর।

বিদ্যাসাগর। ইস্কুলের সেক্রেটারি বা হাসপাতালের ডাক্তারের মন যুগিয়ে চলাটা কম অপমানকর মনে হয় বুঝি তোমাদের কাছে? তা হবে। কিন্তু কই, তোমাদের মুখে প্রসন্নতা তো দেখতে পাচ্ছি না! আজ দেখলাম, দলে দলে মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারও সীমন্তে সিঁদুর নেই, অথচ সকলেই প্রায় যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত আর সকলেরই বিষণ্ণ মুখ। বাইরে হাসিখুশি বটে, কিন্তু বিষাদের ছাপটি ঢাকা পড়ে নি। বিধবাদের এই দুঃখ ছিল ব'লেই তো সর্ব্বস্ব পণ ক'রে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম আমি। কিন্তু এখন দেখছি, বিধবা-বিবাহ তো চললই না, কুমারীদের পর্য্যন্ত বিয়ে হওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। সেই কথাটি জানবার জন্যেই তোমার কাছে এসেছি আজ। এমন সুন্দর চেহারা তোমার, বিয়ে হয় নি কেন বল তো?

মেয়েটি। [অনুযোগভরে] পাত্রই জোটে না, বিয়ে হবে কি ক'রে?

বিদ্যাসাগর। কেন, দেশে পুরুষ নেই?

মেয়েটি। ভাল পাত্র বড় বেশি পণ চায়। আমার বাবা গরিব মানুষ, কোথা পাবেন অত টাকা?

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] গরিবের মেয়ে বুঝি তুমি! ও বাবা, তোমার সাজসজ্জা দেখে ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি বা কোন রাজারাজড়ার মেয়ে!

মেয়েটি একটু অপ্রতিভ হইল

মেয়েটি। এসব বাইরেই এমনই ঝকমকে দেখতে, দাম খুব বেশি নয়। এই দেখুন না, এই জর্জেটখানার দাম মাত্র দশ টাকা।

বিদ্যাসাগর। তাও তো খুব কম নয় মা। আমার বাবার মাসিক বেতন ছিল দশ টাকা, তাই দিয়ে সংসার চালাতে হ'ত তাঁকে। তোমার বাবার মাইনে কত?

মেয়েটি। দেড়শো।

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে তো বেশ মোটা মাইনে। তবু তোমার জন্যে একটি বর যোগাড় করতে পারেন নি তিনি!

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল

বেশ তো, তিনি না পেরেছেন, না পেরেছেন, তুমি তো সাবালিকা হয়েছ, তুমি নিজেই পছন্দ ক'রে বিয়ে কর না কাউকে।

মেয়েটি। [ওষ্ঠভঙ্গি করিয়া] সব অপদার্থের দল, কাকে পছন্দ করব বলুন?

বিদ্যাসাগর। ঠিক বলেছ, তাই দেখছি, সব অপদার্থ। [একটু পরে] কিন্তু দেখ, এর জন্যে তোমরাই দায়ী।

মেয়েটি। [সবিস্ময়ে] আমরা দায়ী?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, তোমরাই। নারীর মনের কামনাই তো পুরুষের চরিত্র গঠন করে। তোমরা তো আজকাল পুরুষের চরিত্রে বীরত্ব মনুষ্যত্ব এসব কামনা করছ না, তোমরা কামনা করছ পুরুষ চাকরি ক'রে হোক, চুরি ক'রে হোক, যেমন ক'রে হোক রাশি রাশি টাকা রোজগার ক'রে আনুক, আর তোমরা তাই দিয়ে দিব্যি গাড়ি বাড়ি গয়না কর। তোমাদের কামনা অনুসারে তাই দেশ জুড়ে চাকর আর চোরের সৃষ্টি হয়েছে। এখন আফসোস করলে কি হবে বল? তোমরা যেদিন দারিদ্র্যকে তুচ্ছ ক'রে মনুষ্যত্বকে বরণ করতে প্রস্তুত হবে, সেদিন আবার এই কাপুরুষদের ভেতরই সত্যিকার মানুষ দেখা দেবে। [সহসা] আচ্ছা, তোমাদের এমন মতিচ্ছন্ন হ'ল কবে থেকে বল দিকি? আগে মেয়েরা কামনা করত, শিবের মতন স্বামী হোক—যে শিব নগ্ন দরিদ্র, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ—

মেয়েটির আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগিল

মেয়েটি। আমাদের দেশে ভাল ছেলে যে নেই তা নয়, এমন ভাল ছেলে আছে যারা মহৎ আদর্শের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে।

বিদ্যাসাগর। [সোল্লাসে] এই তো চাই! ওদের মধ্যেই একজনকে পছন্দ কর না।

মেয়েটি হাসিয়া ফেলিল

বিদ্যাসাগর। ও, পছন্দ ক'রে রেখেছ বুঝি একজনকে?

মেয়েটি। শুধু আমার পছন্দ হ'লেই তো চলবে না।

বিদ্যাসাগর। আবার কার পছন্দ চাই?

মেয়েটি। বাবা-মার, সমাজের।

বিদ্যাসাগর। ভাল ছেলেকে বিয়ে করলে বাধা দেবেন তাঁরা?

মেয়েটি। দেবেন, যদি—

বিদ্যাসাগর। এ দেশ এখনও বদলায় নি দেখছি। বাধা মানবে কেন তুমি, লেখাপড়া শিখছ কেন তবে? আলোর কাছে অন্ধকার টিকতে পারে কখনও? বিধবা-বিবাহেও সমাজ বাধা দিয়েছিল, সে বাধা কি আমি মেনেছিলুম?

মেয়েটি। তা হ'লে আপনি বিদ্রোহ করতে বলছেন?

বিদ্যাসাগর। নিশ্চয়।

মেয়েটির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল

মেয়েটি। [একটু ইতস্তত করিয়া, সহসা] চেহারা দেখবেন তার, আমার কাছে ফোটো আছে, নিয়ে আসি দাঁড়ান।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া ঘরের কোণে রক্ষিত তোরঙ্গের নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং তোরঙ্গ খুলিতে লাগিল। বিদ্যাসাগর নিঃশব্দচরণে বাহির হইয়া গেলেন। মেয়েটি ফোটো বাহির করিয়া আনিল

মেয়েটি। কই, কোথায় গেলেন আপনি—?

বাহিরে মেঘের গুরুগুরু শব্দ শোনা যাইতে লাগিল

যবনিকা

"বনফুল"

সরোজিনী

৪

পরদিন স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিবার সময়ে রাধানাথের সঙ্গে দেখা হইল। আমাকে দেখিয়া একেবারে হাসিয়া 'আটখানা' হইয়া গেল। বিরক্তমুখে কহিলাম, কি ব্যাপার? রাধানাথ আরও কিছুক্ষণ টানিয়া টানিয়া হাসিয়া, শেষে হাস্য সংবরণ করিয়া কহিল, ভায়া একেবারে বর্ণচোরা আম। বাইরে নিরীহ ভাল মানুষটি, ভেতরে একেবারে জিলিপির পাক। কহিলাম, মানে?

মানে, বউঠানকে যা পরামর্শ দিয়েছ, একেবারে মোক্ষম, তার ওধারে আর গা নাই, রাধানাথ গাঙুলী দুমুঠো ক'রে খাবার যোগাড় করছিল, তা একেবারে ভেস্তিয়ে দিয়েছ। বলিয়া ফোলা ব্যাঙের মত চোখ দুইটা মেলিয়া তাকাইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কর্কশ স্বরে কহিল, ভায়া, তোমাদের গাঙুলী বুড়োর মত প্রবোধ গাঙুলীর বউয়ের পেছনে আমি ছুটোছুটি করি নি। আমাকেই পাঁচবার ডেকে পাঠিয়ে হাতে ধ'রে বলতে আমি রাজি হয়েছি। তবে সাদাসিধে মানুষ কিনা, তোমাদের মত বাঁকা-চোরা ভালবাসি না। তাই বলেছিলাম একটা কাগজ ক'রে দিতে, যাতে ভবিষ্যতে কোন গোলমালের সৃষ্টি না হয়। গাঁয়ে তোমরা পাঁচজন বেঁচে থাকতে, কুপরামর্শ দেবার লোকের অভাব হবে না। তখন ঐ বউটিই হয়তো আমাকে বিপদে ফেলতে পারে। তা তোমরা ভাবলে, রাধানাথ বুঝি সব মেরে দেবে। ওহে! এখনও ইংরেজ রাজত্ব চলছে, আর চিরদিন চলবেও, যতই তোমরা হিট্‌লার হিট্‌লার ব'লে হাঁকাহাকি কর না—

সন্ত্রস্তভাবে কহিলাম, ওসব কি বলছ?

কপাল কুঁচকাইয়া, চোখ দুইটা ছোট করিয়া ও মাথাটা উপর দিকে ঝাঁকানি দিয়া রাধানাথ কহিল, কেন? চেঁচাও না তোমরা? আজ

এত হাজার টন ইংরেজের জাহাজ ডুবেছে, আজ এত ইংরেজ মরেছে—ব'লে তুড়িলাফ দাও না তোমরা'?

দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করিলাম, কি যা তা বলছ?

যা তা বলছি না, দারোগাবাবু পর্য্যন্ত জানেন। বেশ, ও কথা যাক, প্রবোধের বউ তো তোমার পরামর্শ শুনে কাগজ ক'রে দিতে রাজি হ'ল না। তুমি ভাবলে, আমি একেবারে জব্দ হয়ে গেলাম, না? ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি নাড়িয়া কহিল, একদম না, বরং ক্ষতি প্রবোধের স্ত্রীর। আমার একটা কর্ম্মচারী প্রবোধ গাঙুলীর সেরেস্তায় ঠেলে দিলাম। মানে প্রবোধের স্ত্রীর কাছে মাইনে নেবে আর কাজ করবে দুজনেরই। আমার ক্ষতি, না লাভ?—বলিয়া ঠোঁট দুইটা চাপিয়া ভ্রূ দুইটা তুলিয়া আমার দিকে আড়-চোখে চাহিয়া রহিল।

কোনমতে রাধানাথের হাত ছাড়াইয়া বাড়ি পৌঁছিলাম। কিন্তু মনের মধ্যে রাধানাথের মন্তব্যটা সারাক্ষণ খচখচ করিতে লাগিল। রাধানাথ কি দারোগাবাবুর কাছে আমাদের বিরুদ্ধে লাগাইতেছে নাকি? তাহা হইলেই তো বিপদ! সারা ভারত জুড়িয়া সরকার বাহাদুর যে ভারত-রক্ষা-আইনের জাল পাতিয়াছেন, তাহাতে একটু বেকায়দায় হাঁচিলে কাসিলে আটকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাহার উপর যদি সত্য সত্যই কোন অপরাধ বাহির হইয়া পড়ে এবং সাক্ষীর মুখে তাহা প্রমাণিত হইয়া যায়, তাহা হইলে বৎসর কয়েক শ্রীঘরবাস অনিবার্য্য।

সন্ধ্যার সময়ে গাঙুলী মশায়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম—পারিবারিক সঙ্কটটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন কি না সংবাদ লইতে ও রাধানাথ-কৃত মন্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে। বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখিলাম, গাঙুলী মশায় উঠানে একটা খাটিয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছেন। যাইতেই আপ্যায়ন করিয়া পাশে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন আছেন? ঠোঁট দুইটা ফাঁক করিয়া দুই পাটি দাঁত দেখাইয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন, ভালই।

কবে পেলেন?

সেদিন রাত্রে। বললাম যে, গিন্নীর কাণ্ড, ঠিক তাই। সারাদিন

খেলাম না, জল পর্য্যন্ত গিললাম না, রাত্রেও তাই, গিন্নী শেষে বার ক'রে দিলে।

মিটমাট হয়ে গেছে তা হ'লে ?

তা হয়েছে, কিন্তু বিপদ যা ঘটবার তা ঘ'টে গেছে কিনা।

বিপদ আর কি ?

সমস্ত ইউনিয়নে রাধানাথ রটিয়ে দিয়েছে যে, আমার প্লেগ হয়েছে। বাঁচবার আশা নেই, তাই শুনে সবাই দেখতে আসছে, মায় দারোগাবাবু পর্য্যন্ত। তবে ভাগ্যি যে, কেউ ঘরে ঢুকছে না, সব বাইরে থেকেই খবর নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সারাদিন এই গুমট গরমে ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে রোগী সেজে থাকতে হচ্ছে তো। প্রথম দুদিন তো গরম কম্ফর্টার জড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, কি বিপদ বল দেখি !

দারোগাবাবু ঘরে ঢুকেছিলেন নাকি ?

পাগল ! প্লেগের রোগীর কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় ! উনি তো বাইরে দাঁড়িয়েই দুচার কথা জিজ্ঞেসা ক'রে চ'লে গেলেন।

বলিলাম, রাধানাথ আমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে বোধ হয়।

উৎসুককণ্ঠে গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, কি করছে ?

আমার বৈঠকখানায় মাস্টাররা মাঝে মাঝে জড়ো হয়ে যুদ্ধের আলোচনা করেন। হৈ-চৈও একটু হয় অবশ্য। আজ রাধানাথ বলছিল, আমরা নাকি ইংরেজের বিপক্ষে কথাবার্ত্তা বলি। দারোগা-বাবুও নাকি এ কথা জানেন। আমার মনে হয়, রাধানাথই আমাদের নামে দারোগাবাবুর কাছে ব'লে এসেছে।

গাঙ্গুলী মশায় সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে কহিলেন, তোমার যত ছেলেমানুষি ! ওসব আড্ডা বসতে দাও কেন ? খবরের কাগজ নিজে নিজে পড়বে, মতামত নিজের মনের মধ্যেই রেখে দেবে। একালে কাউকে বিশ্বাস নেই। তোমার মাস্টারদের মধ্যেই হয়তো কেউ গোয়েন্দাগিরি করছে।

কহিলাম, দারোগাবাবুকে কি রকম লোক মনে হয় ?

মুখে তো বেশ ভদ্র। দেখা করতে গেলে আদর-আপ্যায়নও করে। তবে হিন্দু তো নয়, মুসলমান। হিন্দু হ'লে খাইয়ে-দাইয়ে,

মেয়েছেলেদের মধ্যে আসা-যাওয়া ঘনিষ্ঠতা করিয়ে একেবারে হাত করা যেত। একে তো তা চলবে না, ঘি মাছ খাইয়েই যতটা হয়। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, চপাই চাঁদাই-এর মুসলমানদের সঙ্গে খুব দহরম-মহরম। আসছে ইলেক্‌শানে নাকি চপাইয়ের আজিজ সাহেবকে বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট করবার চেষ্টা করছে।

কহিলাম, তা কি ক'রে হবে? বোর্ডে হিন্দু মেম্বারই তো বেশি।

গাঙ্গুলী মশায় ক্ষোভের সুরে কহিলেন, হিন্দুদের মধ্যে একতা কই হে? রাধানাথই হয়তো ওদের দলে যোগ দেবে, দেখো।

আজিজ সাহেব তো ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সরকার-মনোনীত সভ্য, ও আবার এদিকে কেন?

গাছেরও খাবে, তলেরও কুড়োবে, আর কি! তা ছাড়া বাংলা দেশে এখনও মুসলমানদের রাজত্ব চলছে, কোথাও হিন্দুপ্রাধান্য ওরা সহ্য করবে কেন? কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তবে এখনও অনেক দেরি, এখন থেকে ভাববার দরকার নেই।

কহিলাম, কিন্তু আমার ব্যাপারটা—। গাঙ্গুলী মশায় সাহস দিয়া কহিলেন, ওতে এত ভাবনার কি আছে? হয়তো রাধানাথ মিথ্যে বলেছে, আর যদি সত্যিও হয়, দারোগাবাবুকে একটু ঠাণ্ডা ক'রে দিয়ে এলেই চলবে।—বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী সহযোগে টাকা বাজাইবার ভঙ্গি করিলেন।

প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য কহিলাম, দিদিমাকে দেখছি না? গাঙ্গুলী মশায় মুখের ইঙ্গিত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, অন্ধকার ঘরে ব'সে হরিনাম হচ্ছে। মাগীর ভিটলেমি অনেক আছে তো। এদিকে ধর্ম্ম করছেন, আর ওদিকে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করছেন।

ভালই তো করছেন, মিছমিছি এসব গোলমালে যাবার দরকার কি?

হুঁ।—বলিয়া গাঙ্গুলী মশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, মনে পড়ল, প্রবোধের বউ নাকি তোমার ওখানে এসেছিল?

কে বললে আপনাকে?

হারাণ। কি জন্যে এসেছিল ?

হারাণ, গাঙুলী মশায়ের গুপ্তচর, হিট্‌লারের হিম্‌লার। শয়নকক্ষের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, হারাণ তাহার খবর লইয়া গাঙুলী মশায়কে সরবরাহ্ করে। হারাণের ইহাতে লাভ কিছুই নাই, স্বার্থ কিছু নাই, একেবারে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ।

আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল।

কি কথাবার্ত্তা হ'ল ?

আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, রাধানাথ ওর সম্পত্তি দেখাশোনা করবার জন্যে ওকে একটা ক্ষমতাপত্র রেজিস্টারি ক'রে দিতে বলেছে, ওর দেওয়া কি উচিত হবে ? আমি নিষেধ ক'রে দিলাম।

খুশি হইয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন, বেশ করেছ। তবে, বিছানায় প'ড়ে থেকেও যা ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি, স্বয়ং লাট সায়েবের কাছ থেকে ক্ষমতাপত্র আনলেও কিছু করতে পারবে না।

বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, কেন ?

ডান হাতের তর্জ্জনীটি ঠিক আমার নাকের সামনে প্রসারিত করিয়া, নাড়িতে নাড়িতে গাঙুলী মশায় কহিলেন, কলকাঠি নেড়ে দিয়েছি ভায়া। প্রজা-খাতক কেউ গাঙুলী মশায় সামনে না থাকলে একটি পয়সা দেবে না।

চুপ করিয়া রহিলাম।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, মনু চক্রবর্ত্তী নাকি খুব রাধানাথের কাছে আনাগোনা করছে ? ভাবছে, রাধানাথ মাগীর কাছে টাকা আদায় ক'রে ওর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে। ও মাগীও বড় সোজা ! আর, তেমনই সোজা রাধানাথ ! আমার হাতে ব্যবস্থা থাকলে মনুকে পাইয়ে দিতাম কিছু। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, পৃথিবীতে পরের উপকার করাটাই সবচেয়ে শক্ত কাজ ভায়া।

৫

পরদিন সকালে মণীন্দ্র আসিয়া কহিল, ভায়া, এ কি বুদ্ধি ?

কহিলাম, কার ?

তোমার। লোকে যে বলে, বারো বৎসর মাস্টারি করলে ডান-বাম জ্ঞান থাকে না, সত্যি।

কি হ'ল?

সরুকে ও কি পরামর্শ দিয়েছ? মাসে মাসে পনরো টাকা একজন পরের হাতে তুলে দেবে?

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া কহিলাম, আমি কি করব? যার টাকা সে যদি নিজের ইচ্ছেয় দেয়—

ওর ইচ্ছে তো নয়, তোমার পরামর্শেই দিচ্ছে।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, পাগল নাকি! আমার কি দায় পড়েছে পরামর্শ দিতে?

মণীন্দ্র ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, তোমার পরামর্শ নয়? তবে যে শুনলাম—তা যাক, আমার সঙ্গে একবার এস দেখি।—বলিয়া আমার ডান কাঁধটা চাপিয়া ধরিয়া টান মারিল।

বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, কোথায়?

সরুর ওখানে। তোমার ওপরই নাকি ভারী ভক্তি আজকাল। তা এস দেখি, একটু বুঝিয়ে দিয়ে আসবে।

বাধা দিয়া কহিলাম, ক্ষেপেছ নাকি! স্কুলের সময় হয়ে গেছে আমার, এখন বিরক্ত ক'রো না।

মণীন্দ্র অনুযোগের সুরে কহিল, বারে! ভুলুকটি কেটে দিয়ে এখন বোজাবার সময় যাবার নাম নেই।

মানে?

দিন কত ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে জান? আট গণ্ডা পয়সা, অথচ মিথ্যে। কোন কাজ হচ্ছে না। ঐ পয়সাটা আমার হাতে এলে—

বাধা দিয়া কহিলাম, কাজ হচ্ছে না মানে? আদায়-উসুল হচ্ছে না নাকি?

মণীন্দ্র ঘাড়টি এদিক ওদিক বার কয়েক নাড়িয়া কহিল, একটি পয়সাও না। গাঙ্গুলী বুড়ো বারণ ক'রে দিয়েছে সবাইকে। কাতরকণ্ঠে কহিল, মিথ্যে এতগুলো টাকা মাসে মাসে পরের হাতে যাবে?

কহিলাম, বেশ তো, বোনকে বলগে, লোক রাখবার দরকার নেই।

ক্ষোভের সহিত মণীন্দ্র কহিল, আমার কোন্ কথাটা শোনে !—বলিয়া করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ চোখের ভঙ্গি বদলাইয়া, ভ্রূ দুইটা নাচাইয়া কহিল, মনে পড়েছে। ভিণ্টে ফুণ্টির কথা বলেছিলে সরুকে ?

কৃত্রিম অনুশোচনার সহিত কহিলাম, এই যা ! একদম ভুলে গেছি ভাই। বলা হয় নি।

মণীন্দ্র কহিল, জানি, জানি। তুমি যে বলবে না, আগেই জানতাম। আচ্ছা, এর পর দেখা হ'লে দয়া ক'রে ব'লো দেখি।

নিশ্চয় বলব।

উৎসাহিত হইয়া মণীন্দ্র কহিল, বেশ তো। এখনই চল না।

ত্রস্তকণ্ঠে কহিলাম, না না, এখন না, স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।

বেশ, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও; ঐ রাস্তা দিয়েই স্কুলে যাবে, বেশিক্ষণের তো মামলা নয়; একবার দাঁড়িয়ে দুচার কথা ব'লে দেবে।

কেন ক্ষ্যাপামি করছ মনুদা ? এখন যেতে পারব না।

বেশ, আজ সন্ধ্যেয় ?

চুপ করিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র কহিল, এই কথা রইল। সন্ধ্যের সময় তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব, পালিও না যেন।

স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিতেছি, দেখিলাম, রাস্তার ধারে মণীন্দ্র দাঁড়াইয়া। আমাকে দেখিবামাত্র একগাল হাসিয়া কহিল, ভায়া, আজ এত দেরি ?

গম্ভীর মুখে ভারী গলায় কহিলাম, কাজ ছিল।

অনুযোগের স্বরে কহিল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, এখনই যেতে হবে নাকি ?

মণীন্দ্র কহিল, না না, তার দরকার কি ? সরোজিনী তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

রাগতস্বরে কহিলাম, পালিয়ে যাচ্ছে না জান তো এখন থেকে ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

মণীন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, ভায়া, কি যে আমার মনের অবস্থা, বুঝতে পারছ না তো! ঘরের টাকা পরের হাতে টুপটুপ ক'রে ঝ'রে পড়ছে, ঘণ্টায় এক পয়সার ওপর, অথচ মিথ্যে, কোন কাজ হবে না। আজ রাধানাথ স্বয়ং গিয়েছিল, সব হাঁকিয়ে দিয়েছে।

চলিতে লাগিলাম। মণীন্দ্র ফিসফিস করিয়া কহিল, রাধানাথ রেগে আগুন হয়ে গেছে, বলছে, দারোগাবাবুর কাছে নালিশ করবে।

কহিলাম, এর মধ্যে আবার দারোগা পুলিস ঢোকানো কেন?

দুই করতল চিত করিয়া দিয়া মণীন্দ্র কহিল, কি জানি বল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, এই গোলমালে আমার ভিণ্টে আর ফুণ্টির ব্যবস্থাটা ভেস্তে না যায়।

সন্ধ্যার পর দুইজনে বাহির হইলাম। প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ির সামনে আসিতেই মণীন্দ্র কহিল, তুমি বাইরে একটু দাঁড়াও ভাই, ভেতরে খবর দিই, যাকে তাকে ধাঁ ক'রে বাড়িতে ঢোকানো ঠিক নয়।—বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরেই মণীন্দ্র যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার অবস্থা সাংঘাতিক। চোখের তারা দুইটা বনবন করিয়া ঘুরিতেছে, কপালে কোঁচ পড়িয়াছে, স্বাভাবিক চওড়া নাকটা আরও চওড়া হইয়া উঠিয়াছে; ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে ও সেই নিশ্বাস-বায়ুতে নাসিকা-গহ্বরের চুলগুলি বাত্যাতাড়িত কাশ-ঝোপের মত দুলিতেছে। আমার কাছে আসিয়া, মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত দিয়া বাতাসে ঘুষি মারিয়া কহিল, রাধানাথকে আজ খুন করব।

সভয়ে কহিলাম, কেন?

আমার বোনকে বেইজ্জত করেছে।

ঘাবড়াইয়া গেলাম। সবিস্ময়ে কহিলাম, সে কি?

হ্যাঁ, ফুণ্টি বললে।

অতীব বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, ফুণ্টির চক্ষের সামনে? এই বয়সে? দিনের বেলায়? তোমার বোন কিছু—

মণীন্দ্র ধমকাইয়া কহিল, তুমি একটি আস্ত বেকুব। সে বেইজ্জত নয়, সরোজিনীকে সুদ্ধ দারোগাবাবুর কাছে টেনে নিয়ে গেছে। একটু

শান্ত হইয়া কহিল, কি কাণ্ড বল দেখি! বামুনের মেয়ে, বালবিধবা, মুসলমানের সামনে নিয়ে যাওয়া! একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই! ওদিকে গাঙুলী বুড়ো মুকিয়ে আছে, একটু খুঁত পেলে হয়, একঘরে ক'রে দেবে। তখন আমার ফুন্টির বিয়ের কি হবে বল দেখি?—বলিয়া আমার মুখের দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া রহিল।

চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। হঠাৎ আমার গায়ে হাত দিয়া মণীন্দ্র কহিল, তুমি ভাই, বাড়ি যাও, আমি একবার থানায় যাই, আমি সঙ্গে থাকলেও নিন্দেটা একটু কম হবে।—বলিয়া এক রকম ছুটিয়াই চলিয়া গেল।

বাড়ি ফিরিলাম। রাধানাথ সত্যই ভাল কাজ করে নাই। দারোগাবাবুটি লোক ভাল, হয়তো কোন একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। কিন্তু শুনিয়াছি, স্ত্রীলোকের, বিশেষ করিয়া হিন্দু স্ত্রীলোকদের, সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা আছে। কাজেই সরোজিনীকে স্বচক্ষে দেখিলে কি করিয়া বসিবেন, বলা যায় না।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

ডেস্ক-ক্যালেণ্ডারের প্রতি

আজকে অনেক আশা নিয়ে, বন্ধু, তোমায় খরিদ করিলাম,
বছরশেষে করব হিসেব, বরবাদ—না উসুল হ'ল দাম!
এলোমেলো ঢেউয়ের দোলায় ঝড়ঝাপটে আলোয় অন্ধকারে,
খেয়ায় পাড়ি দিয়ে বন্ধু, পৌঁছে গেলাম চল্লিশেরই পারে;
চোখে ক্রমেই ঝাপসা দেখি, নিথর জলে শান্তি খোঁজে মন,
তোমার সহায়তায় বন্ধু, পথ চলিবার নূতন আয়োজন।

পিতা-পুত্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নুটবিহারীর আশ্রম। কাল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের প্রত্যূষ। আকাশে সূর্য্যোদয় হইতেছে

বাগানের মধ্যে একখানি মেটে বাংলো ধরনের ঘর। বাগানের মধ্যে ছোট ছোট সবজি-ক্ষেত দেখা যায়। দুই পাশে কয়েকটি বড় গাছ। মেটে বাংলোটির সম্মুখে একটি অনাবৃত চত্বর বা রোয়াক। সেই রোয়াকের উপর নুটবিহারী দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টি পূর্ব্বদিগন্তে সূর্য্যোদয়ের দিকে। চারিদিকে পাখির কলরব। নুটবিহারী স্বাস্থ্যবান দীর্ঘাকৃতি যুবা। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। মুখে বহু ক্লেশের চিহ্ন। কিন্তু সে চিহ্ন যুদ্ধজয়ীর ললাট-ক্ষতের মত তাহার রূপকে দৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। পরনে খদ্দর। তাহার সম্মুখেই দুইটি ছোট ছেলেমেয়ে বরুণ ও শ্যামা জোড়হাতে গান গাহিতেছে। যবনিকা অপসারিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাহারা গাহিতেছিল।

(গান)

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জ্জিল ভয় অর্জ্জিল জয় সার্থক হ'ল কাজে।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই,
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন-ঘাতে।
পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনি পাতে।
ছায়া-ভয় চকিত-মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে।
দেশ-দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।—(রবীন্দ্রনাথ)

গান শেষ হইলে নুটু সস্নেহে ছেলে ও মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিল

হুট। যাও, এইবার পড়তে ব'স গিয়ে।

বরুণ। আজ কখন ছুটি দেবেন বাবা? আজ যে জগদ্ধাত্রী পূজো।

শ্যামা। এক্ষুনি ঘট ভরতে যাবে বাবা, খানিক পরেই বলিদান হবে। কাল থেকে থিয়েটার হবে; ম্যারাপ বাঁধছে। একটু পরেই কিন্তু ছুটি দেবেন আমাদের।

হুট। একটু পরেই ছুটি দিতে হবে?

বরুণ। আশ্রমের ছেলেদের তো আজ সমস্ত দিন ছুটি দিয়েছেন। বড়দার বড় ইস্কুলেরও আজ ছুটি। আমাদের—

হুট। আচ্ছা, তোমাদেরও যদি আজ সমস্ত দিন ছুটি দেওয়া হয়?

শ্যামা। তা হ'লে আমরা পূজো দেখতে যাই বাবা? ছুটি দিলেন তো?

হুট। হ্যাঁ, ছুটি দিলাম বইকি। কিন্তু জগদ্ধাত্রী পূজো যে দেখতে যাবে, তা জগদ্ধাত্রী দেবী কে? তাঁর গল্প কি? সেটা না জেনেই যাবে? আগে তার গল্প শুনে নাও, তারপর যাবে। জগদ্ধাত্রী মানে জান তো?

বরুণ। জগতের মা। বড়দা এসব গল্প জানেন বাবা।

শ্যামা। বড়দা বলছিল বাবা—মা দুর্গাও যে, মা কালীও সেই, মা জগদ্ধাত্রীও সেই।

প্রবেশ করিল বিমলা, হুটবিহারীর স্ত্রী। বয়স চব্বিশ পঁচিশ। দুঃখ-ক্লেশে শ্রান্ত অবসন্ন, কিন্তু মুখে বিরক্তি। তাহার মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর

হুট। এস। কি সংবাদ? চাল নেই, না নুন নেই? ওই দুটো না থাকলেই ভাবনা। বাকি সমস্তগুলোকেই বিলাসের পর্য্যায়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়।

বিমলা। (ছেলেমেয়ের প্রতি) যা, পড়তে বসগে যা।

হুট। ওদের আজ ছুটি। জগদ্ধাত্রী পূজো। জগদ্ধাত্রীর গল্প শুনেই ওরা পূজো দেখতে যাবে।

বিমলা। যাবার সময় দুজনে দুটো লাউয়ের খোলা হাতে ক'রে যাস। বুঝলি?

হুট। বরুণ, শ্যামা, তোমরা এখন পূজো দেখে এস। গল্প ও-বেলায় বলব।

বরুণ ও শ্যামার প্রস্থান

বিমলা। ওদের তাড়িয়ে দিলে যে?

স্মুট। ওদের সামনে, যে কথাটা তুমি বলবে, সেটা হওয়া খুব শোভন হবে না বিমলা।

বিমলা। আমি কি বলব, তুমি জানতে পেরেছ?

স্মুট। জানা কথা যে। আদিকাল থেকে গৃহিণীরা, আমাদের মত স্বামীকে ওই একই কথা ব'লে আসছেন—

অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা
নিশিদিন ধ'রে এ কি ছেলে-খেলা
ভারতীরে ছেড়ে ধর এই বেলা—
লক্ষ্মীর উপাসনা।

ভারতী কথাটা পালটে ভারত বলতে পার। স্বদেশ বললে আরও পরিষ্কার হবে।

বিমলা। (তিক্ত হাসি মুখে ফুটিয়া উঠিল) না। লক্ষ্মীর উপাসনা করতে বলতে আসি নি। বলতে এসেছি, লক্ষ্মীর উপাসনা যখন বর্জ্জনই করেছ, তখন লক্ষ্মীর বরপুত্র যারা, তাদের সঙ্গেই বা সম্বন্ধ রাখবে কেন? রাখতে হয় তুমি রাখ, আমি রাখতে পারব না; বাবুদের বাড়ির পূজোয় যজ্ঞের নেমন্তন্নে আমি যাব না, যেতে পারব না।

স্মুট। (গম্ভীরভাবে) কিন্তু আমি যে নিমন্ত্রণ নিয়েছি বিমলা।

বিমলা। তুমি নিয়েছ, তুমি যাও, তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাও, আমি যাব না। আমায় যেতে ব'লো না, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় যেতে ব'লো না।

স্মুট। তোমার যে অভিযোগ, সেটা তোমার মনের ভ্রম হতে পারে। দারিদ্র্যের জন্যে যাদের ক্ষোভ থাকে, ঐশ্বর্য্যের জন্যে গোপন আকাঙ্ক্ষা তাদের অনিবার্য্য; তারাই কথায় কথায় সংসারে অপমান-বোধ করে; এটা তাদের দুর্ব্বল স্বভাবের ধর্ম্ম। দোতলার বারান্দায় অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের বসাবার জন্যে—তোমাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়েছিল—এটা সত্যি নাও হ'তে পারে। হয়তো জায়গার অকুলান হচ্ছিল, তাই তোমাকে ব'লে থাকবেন—

বিমলা। হ্যাঁ, তাই সকলকে বাদ দিয়ে বেছে বেছে আমাকেই ব'লে থাকবেন—তুমি আবার এখানে কেন বাপু? তুমি নীচে গিয়ে ব'স। শুধু জায়গার অকুলান কেন? খাবার সামগ্রীরও অকুলান হয়েছিল, তাই খাওয়ার ব্যবস্থাও দু রকম হয়েছিল। সবই আমার মনের ভ্রম, ঐশ্বর্য্যের জন্যে ক্ষোভ, সম্পদের ওপর লোভ।

নুটু গম্ভীরভাবে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল

ওই খোঁটাই তুমি চিরদিন আমাকে দিলে। দারিদ্র্যের জন্যেই আমার দুঃখের অন্ত নেই, টাকা-পয়সা ছাড়া আমার আর কিছু কামনা নেই, তুমি গরিব ব'লে—

নুট। (হাসিয়া) সে কি মিথ্যে বিমলা? সে কামনা কি তোমার নেই? সেটা কি তুমি অস্বীকার কর?

বিমলা। না, অস্বীকার করি না, স্বীকার করি। টাকা-পয়সা আমি চাই, সম্পদ আমি চাই। কেন চাইব না? আমার ছেলেমেয়েকে আমি সাধ মিটিয়ে খেতে পরতে দিতে চাই, আমার স্বামীকে—

নুট। আমার কথা বাদ দাও বিমলা।

বিমলা। কেন?

নুট। কারণ, এই আমার সবচেয়ে বড় সুখ। সংসারে কারও ঈর্ষার পাত্র নই আমি, কাউকে আমি বঞ্চনা করি নি। থাক, সে কথা তুমি বোঝ নি, বুঝবে না।

বিমলা। আমি মূর্খ, সে কথা আমি জানি। সেইজন্যেই কি তুমি আমায় ঘৃণা কর?

নুট। না, ঘৃণা তোমায় আমি করি না; তবে শিক্ষার গুণ আছে বইকি বিমলা।

বিমলা। আছে বইকি। সেই গুণের আগুনেই তো তুমি পুড়ছ। সে কি আর আমি জানি না? জানি। কিন্তু শিক্ষিতা মেয়ে যে তোমাকে প্রত্যাখান ক'রে ধনীর ছেলের গলায় মালা দিলে, সে অপরাধ কি আমার? যার জন্যে এক বিন্দু ভালবাসা তুমি আমায় দিলে না, দিতে পারলে না।

মুট। (প্রথমে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বিমলার দিকে চাহিয়া থাকিল, তারপর বলিল) এও তোমার মনের ভ্রম বিমলা।

বিমলা। এও আমার ভ্রম? ভ্রম ক'রেই কি বিধাতা সংসারে আমাকে পাঠিয়েছিলেন? ভ্রম ছাড়া কি জীবনে আমার কিছু নেই?

মুট। তুমি উত্তেজিত হয়েছ বিমলা, ওসব কথা এখন থাক।

বিমলা। উত্তেজিত হয়েছি! তেজ থাকলে উত্তেজনা আসে মানুষের। আমার তেজ, অহঙ্কার, ধূলোয় লুটিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। উত্তেজিত আমি হই নি, কেবল দুঃখের কথাই তোমাকে জানিয়ে গেলাম।

প্রস্থানোদ্যত

মুট। শোন।

বিমলা। বল।

মুট। আমার অনুরোধ, তুমি খেতে যাও।

বিমলা স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

তুমি যা বলেছ, সে কথা সত্যি কি না, আমি আবার একবার যাচাই ক'রে নিতে চাই।

বিমলা স্থির দৃষ্টিতেই স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

আমার অনুরোধ বিমলা, আমার—

নেপথ্যে মহাভারত মোড়ল। দাদাঠাকুর!

মুট। কে? মহাভারত?

মহাভারত প্রবেশ করিয়া নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল

মহা। দেখ দাদাঠাকুর, এই দেখ।

মুট। এ কি মহাভারত, তোমার বুকের ওপর জুতোর ছাপ!

মহা। জুতো সুদ্ধু লাথি মারলে বুকের ওপর।

মুট। কে?

মহা। ছোট তরফের ওই মাতাল ছেলেটা। বাবুদের থিয়েটার হবে, তাই বেগার দেবার কথা। কিন্তু উদিকে আমার আলুর জমিতে খুঁড়বার, মাটি দেবার বাত হয়েছে, তাই গিয়ে জোড়হাত ক'রে

বললাম, আজকে আমাকে রেহাই ছান; তা জুতো স্বদ্ধু বসিয়ে দিলে বুকে লাথি।

স্থট। (মহাভারতের মুখের দিকে স্তব্ধভাবে আরও শুনিবার প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল) তারপর ?

মহা। বড়বাবুর কাছে গেলাম, তা বাবু কথাটা উড়িয়েই দিলেন; বললেন, উঃ, তুই বেটার তো মহা ভাগ্যি রে বেটা চাষা; একে ব্রাহ্মণ, তায় জমিদার—রাজা।

বিমলা। তায় শুধু পা নয়, জুতো স্বদ্ধু লাথি।

মহা। আজ্ঞে হ্যাঁ মা। সেই কথাই বললেন, বলে ভগমান ভৃগুমুনির লাথি খেয়েছিলেন, পায়ের দাগ নাকি বুকে আঁকা আছে।

স্থট। তুমি কি এটাকে ভাগ্য ব'লে মানতে পারছ না মহাভারত ?

মহা। না। পারছি না। তাতেই তো তোমার কাছে ছুটে এলাম দাদাঠাকুর।

স্থট। জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করতে পারবে ?

বিমলা। কথাটা ভুল বললে। জলে বাস করলেই কুমীরে খায়; বাদ করলেও খায়, না করলেও খায়।

মহা। ঠিক বলেছ মা, ঠিক বলেছ। চিরকাল বেগার দিয়ে এলাম, ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল, পুকুরের মাছ, দেবতার সঙ্গে বাবুদিগে দিয়ে এলাম। দাদাঠাকুর, মেয়ের বিয়েতে দেড়শো টাকা ধার নিয়েছিলাম—বড়বাবুর কাছে, স্থদ দিয়েছি তুশো পঁচাত্ত টাকা দশ আনা। চক্রবৃদ্ধি স্থদ। খাজনার স্থদ টাকায় সিকি, তার ওপরে মামুলী চাঁদা—এবার আবার হাসপাতালের চাঁদা টাকায় এক আনা।

স্থট। হাসপাতালের চাঁদা ?

মহা। বাবুরা হাসপাতাল দেবে।

স্থট। বল কি ?

মহা। আজ্ঞে হ্যাঁ। মাজিষ্টর সাহেব বলেছে, দিতে হবে।

স্থট। (হাসিল) ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দীর্ঘজীবী হোন, কল্যাণ হোক তাঁর।

মহা। মাজিষ্টর সাহেবের কাছে তুমি একটা দরখাস্ত লিখে দাও।

মুট। দরখাস্ত নয় মহাভারত, বুকের এই দাগ দেখিয়ে তুমি ফৌজদারি একটা নালিশ ক'রে দিয়ে এস। পারবে?

মহা। পারব।

মুট। খরচ আছে?

মহা। খরচ!

বিমলা ভিতরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল

মুট। হ্যাঁ। খরচ লাগবে তো। যেও না বিমলা, দাঁড়াও।

বিমলা। না।

মুট। না নয়, শোন।

বিমলা। না—না—না। আমার সম্বলের মধ্যে দুগাছা শাঁখা-বাঁধা, আর মরা খুকীর দুগাছা বালা। সে আমায় চেও না, আমি পারব না—সে দিতে আমি পারব না।

চলিয়া গেল

মুট। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ও আত্মসম্বরণ করিয়া) আমার এক মোক্তার বন্ধুকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি মহাভারত, তুমি তাঁর কাছে যাও। আমরা দুজনে একসঙ্গে মোক্তারি দিয়েছিলাম। তার পসারও ভাল। আমার বিশ্বাস, সে আমার কথা রাখবে।

ঘর হইতে লিখিবার সরঞ্জাম আনিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল

মহা। তুমি যদি মোক্তারি করতে দাদাঠাকুর, তবে কেমন হ'ত বল দেখি? ছেলেপিলে ঘর-সংসারের এই দুঃখ, মোক্তারি পাস ক'রে এসে তুমি গরিবগুলোর ছেলে নিয়ে কি পাঠশালা কচ্ছ, এতে যে কি হবে তুমিই জান। ওকালতি প'ড়ে পাস দিলে না। মোক্তারি পাস ক'রে পাঠশালা করছ। মা-ঠাকরুণের রাগের দোষ কি বল?

মুট। (চিঠি শেষ করিয়া) এই চিঠি নিয়ে তুমি যাও। মোক্তার হরেন্দ্রনাথ বসু। হরেনবাবু মোক্তারকে সবাই চেনে; বড় মোক্তার তিনি। এখনই চ'লে যাও তুমি। এই তো তিন মাইল রাস্তা—রামপুর। তবে আর একবার ভেবে দেখো।

মহা। ভেবেছি দাদাঠাকুর, অনেক ভেবেছি। দাও, চিঠি দাও।

চিঠি লইয়া প্রস্থান

নুটু। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আপন মনেই আবৃত্তি করিল)
"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান—
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান—
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে—
ঘৃণা করিয়াছ তুমি—"

ঠিক এই মুহূর্তেই বিমলা আসিয়া দুইগাছি শিশুর বালা ও নিজের দুইগাছি শাখা-বাঁধা নুটুর সম্মুখে ফেলিয়া দিল

বিমলা। এই নাও।

নুটু। (আবৃত্তি বন্ধ হইয়া গেল) নিয়ে যাও, আর দরকার নেই। মহাভারত চ'লে গেছে।

বিমলা। না, দরকার আছে। মহাভারতকে ডাক।

নুটু। না। আমি আমার এক মোক্তার বন্ধুকে চিঠি লিখে দিয়েছি, সে বিনা পয়সাতেই কাজ ক'রে দেবে। আদালত-খরচা পরে নেবে। আমার অনুরোধ সে নিশ্চয় রাখবে।

বিমলা। না, ক'রে দেবে না। এ তোমার অন্যায় অনুরোধ। বিনা পয়সায় কেন সে ক'রে দেবে?

নুটু। সংসারে পয়সাটাই সকলের কাছে বড় জিনিস নয় বিমলা।

বিমলা। (কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া) আমার কাছেই পয়সাটা সকলের চেয়ে বড় জিনিস, না?

নুটু কোন উত্তর দিল না

(প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় তেমনই ভাবেই স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, উচ্ছ্বসিত অভিমানে প্রশ্ন করিল) কেন? কেন? কেন তুমি আমাকে এমন ভাবে অপমান কর?

স্থুট। না। তোমায় অপমান আমি করি নি। এও তোমার মনের ভ্রম।

বিমলা। এও আমার ভ্রম! (দৃঢ়স্বরে) না, এ আমার ভ্রম নয়। শুধু আজ ব'লে নয়, সমস্ত জীবনটাই তুমি আমায় অপমান ক'রে এসেছ।

স্থুট। বিমলা, তুমি কি বলছ?

বিমলা। আমি ঠিক বলছি। বিয়ে ক'রে স্বামী যদি স্ত্রীকে ভালবাসতে না পারে, তাকে যদি ঘৃণা করে, আর দয়া ক'রে যদি সেই ঘৃণা মনে চেপে রাখে, তবে সে অপমান নয় তো কি? তার চেয়ে বড় অপমান মেয়ের আর কি আছে? তুমি যদি শিক্ষিতা ধনীর মেয়ে কল্যাণীকেই ভালবাসতে, তবে কেন তাকেই তুমি—

স্থুট। (দৃঢ় কঠিন স্বরে) বিমলা!

বিমলা। না, আমি আজ চুপ করব না। কেন তুমি তাকেই বিয়ে করলে না?

স্থুট। বিমলা!

বিমলা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপিতে চাপিতে চলিয়া যাইতেছিল

যেও না। শুনে যাও, আমার উত্তর শুনে যাও। হ্যাঁ, কল্যাণীকে আমি এককালে ভালবাসতাম। কিন্তু আজ তাকে আমি ঘৃণা করি। অর্থ এবং আভিজাত্যের পায়ে সে প্রেমকে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। তাকে আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা করি।

বিমলা। আমাকে তুমি কেন ঘৃণা করবে? কেন? আমার কি অপরাধ?

স্থুট। টাকার ওপর লোভ, সোনার ওপর লোভ, সম্পদের ওপর লোভ—তোমার অপরাধ। লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা চিরদিনই ঘৃণ্য জীব।

বিমলা আবার চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

আর একটা কথা।

বিমলা দাঁড়াইল

কল্যাণী এখন পরস্ত্রী। তার বাপ ছিলেন পণ্ডিত—দেশ-সেবক। তার নাম নিয়ে এমন আলোচনা আর তুমি ক'রো না। এ শুধু অন্যায় নয়—অপরাধ।

ন্টু বলিয়াই আবেগবশে চলিয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে আবার ফিরিয়া আসিল

আরও একটা কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই। বিয়ের সময় তুমি নিতান্ত ছোট ছিলে না। তোমার মনে থাকার কথা—মনে থাকা উচিত। তোমার বাবা আমার অবস্থা জানতেন। তা ছাড়া, তোমার বাবাকে আমি বলেছিলাম, দেশের সেবা আমার ব্রত, যে দেশের লোকের দৈনিক গড় আয়—দশ পয়সা। দারিদ্র্য আমার চিরসঙ্গী।

বিমলা। (হাসিল) আমি তো দশ পয়সারও খাই না—তুমি, তোমার দুই ছেলে—অরুণ-বরুণ, তোমার মেয়ে শ্যামা—চারজনে চল্লিশ পয়সার খাও। আমি খাই, তার অবশেষ—উচ্ছিষ্ট।

নেপথ্যে সাতু ঠাকরুণ—ন্টুবিহারীর সম্বন্ধীয় ভগ্না ঠিক এই সময়েই উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল

সাতু। বউ! অ বউ! বলি ওলো, অ ন্টুর বউ!

ন্টু। বউ এখানে রয়েছে সাতুদিদি। কি বলছ?

সাতুর প্রবেশ। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। বেশ আঁটসাঁট চেহারা, পরনে থান; মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। মুখের ভিতরের পান গালের উপর আবের মত ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছে

সাতু। বলছি, বাবুদের বাড়ি খেতে যাবে কখন? আমাদের বউরা সব কাপড়-চোপড় প'রে তোর বউয়ের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

ন্টু। এই যাচ্ছে দিদি। যাও বিমলা, সকলে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

সাতু। মুখের সামনেই একটা কথা আমি বলি, তুই বারণ কর তোর বউকে; বড়লোকের মেয়েদের গায়ে গা দিয়ে যেন তাদের সঙ্গে বসতে না যায়। গত বছর পাঁচবার বারণ করলাম—বউ, খানিকটে না হয় দেরিই হবে, ওপরে বসতে যাস নি। যেমন যাওয়া, দিলে

উঠিয়ে। অপমানটা কি যেচে না নিলেই হ'ত না? কই, আয়
বউ, আয়।

অগ্রসর হইল, বিমলাও স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অনুসরণে উদ্যত হইল

মুট। (ডাকিল) যেও না বিমলা, তোমার যাওয়া হবে না।

সাতু। সে কি রে! খেতে যাবে না কি?

মুট। না সাতুদিদি, যাবে না।

সাতু। ভক্ষ্যি-পূজ্যি উঠিয়ে দিবি?

মুট। দোষ নয়, দিলাম।

সাতু। মুটু, আর পাগলামি করিস নি। একেই তো শুনি, পুলিস লেগে আছে তোর পেছনে। তার ওপর বাবুদের সঙ্গে বিবাদ করিস নি। পায়ে মাথায় সমান করতে নেই।

মুট। সেইজন্যেই তো মাথার বাড়িতে পা যাবে না সাতুদি।

সাতু অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

বউদের নিয়ে তুমি যাও সাতুদি, ও যাবে না।

সাতু। যা ভাল বোঝ তাই কর ভাই। কারুর কথা তো তুমি নেবে না।

সাতুর প্রস্থান

মুটু বার কয়েক পদচারণা করিয়া আপন মনেই উদ্দেশ্যে কাহাকে প্রণাম করিল

বিমলা। (হাসিয়া) বাবুদের প্রণাম জানাচ্ছ নাকি?

মুট। না। মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে প্রণাম জানালাম।

বিমলা। তা হ'লে বল, নিজেকেই প্রণাম জানাচ্ছ। লোকে তো তোমাকেই বলে—কলির দুর্ব্বাসা।

মুট। তারা ভুল বলে। আমার সে ক্ষমতা থাকলে লক্ষ্মীর দম্ভ চূর্ণ করবার জন্যে তাকে আবার একবার সাগরতলে নির্ব্বাসনে পাঠাতাম।

নেপথ্যে কে ডাকিল। এইটে কি মুটবিহারীবাবুর বাড়ি? মুটবিহারী মুখুজ্জে?

নুট। হ্যাঁ। নুটবিহারী মুখুজ্জের বাড়ি। কে? কোথা থেকে আসছেন?

নেপথ্যে। আমি কমলাপদ—কমলাপদ ঘোষ।

নুট। কমলাপদ, কমল! আরে, এস এস এস। (অগ্রসর হইয়া গেল, যাইবার সময় বিমলাকে বলিল) বিমলা, কমল আমার কলেজের বন্ধু—এখন মুন্সেফ। যা হয় তার খাবার আয়োজন কর। অরুণের তো স্কুলের ছুটি, সে কোথায়?

বিমলা। সেবক-সমিতির মুঠির চাল তুলতে গেছে।

নুট। ও।

নুটু দ্রুত অগ্রসর হইয়া বাহিরে গেল। বিমলা ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। নুটু পরমুহূর্ত্তেই বন্ধুকে লইয়া প্রবেশ করিল। কমলাপদর বেশভূষা অভিজাত-জনোচিত। ঈষৎ স্থূলকায়, মাথায় টাক পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। নুটুরই সমবয়সী

কমল। এ কি চেহারা হয়েছে তোমার নুটু—রুক্ষ কঠোর?

নুট। (হাসিয়া) Don't forget Aristotle, old boy! Beauty to different ages different. To full men, strength of body fit for the wars, and countenance sweet with a mixture of terror. এস এস, ভেতরে এস।

ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল

দ্বিতীয় দৃশ্য

কঙ্কণাবাবুদের বাড়ি, বড়বাবুর খাসকামরা

স্থূলকায় বড়বাবু শিবনারায়ণবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অর্দ্ধশায়িত, মুখে গড়গড়ার নল। চাকর পায়ে হাত বুলাইতেছে। বয়স পঞ্চাশ বা তদূর্দ্ধ। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মানুষ। পরনে চুনট করিয়া কোঁচানো থান ধুতি। গায়ে বেনিয়ান, একখানা শাল শরীর হইতে খসিয়া কোমরে পড়িয়া আছে। সম্মুখে বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া আছে মামলা-সেরেস্তার কর্ম্মচারী—গোপী ঘোষ। লোকটি বৈষ্ণব। কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠী, গায়ে ছিটের গলা-বন্ধ কোট, পরনে আধময়লা থান ধুতি। কাঁধে জামার উপর একখানি চাদর সযত্নে ফেলা আছে। মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। মধ্যস্থলে একটি টিকি

শিব। (চোখ মুদিয়া নল টানিতে টানিতে নিস্পৃহভাবেই বলিলেন) অ্যাঁ, বল কি? লাথি মারার জন্যে বেটা চাষা নালিশ করতে গেছে?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ছিলাম কোর্টে—কমলপুরের স্বর্গীয় মহেশ্বর গাঙুলীর বন্ধকী তমস্থদের জন্যে তদীয় পুত্র হরিহর গাঙুলী দিগরের নামে যে নালিশ দায়ের হয়েছে, তারই তদ্বিরের জন্যে।

শিব। (চাকরকে) জোরে জোরে। ওরে বেটা, আরও জোরে টেপ। আখমাড়াই কলে যেমন আখ পেষে তেমনই; জোরে টেপ। পায়ের ওপর থাপ্পড় মারবি, ক্রোশখানেক তার শব্দ যাবে, তবে তো! হ্যাঁ, তারপর গোপী? বেটা চাষার নাম কি বললে হে?

গোপী। আজ্ঞে, মহাভারত মণ্ডল।

শিব। হ্যাঁ। বেটার বাবার নাম কি হে? রামায়ণ?

গোপী। আজ্ঞে না। গণেশ মণ্ডল হ'ল ওর বাপের নাম। পিতামহের নাম হরিশ মণ্ডল।

শিব। হরিশ মণ্ডল! হরিশ মণ্ডল! হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার বুঝেছি। হরিশ মণ্ডল। (এইবার চোখ খুলিয়া, তাকিয়াটা টানিয়া লইলেন) বাবার আমলে যে প্রজা-ধর্ম্মঘট হয়, সে ধর্ম্মঘটে হরিশ ছিল একজন মাতব্বর।

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। ১২৮৫ সালের ধর্ম্মঘটে হরিশ মণ্ডল একজন মাতব্বর ছিল। ডাঙাপাড়ার গৌরহরি ঘোষ, ধর্ম্মরাজের দেবাংশী হরিবোলা পাল,—

শিব। হরিশের নাতি মহাভারত। তখনই বাবাকে বলেছিলাম, ও পাপ সমূলে উচ্ছেদ কর। বাবা দয়া করেছিলেন। সমস্ত উচ্ছেদ ক'রেও সামান্য রেখে দিয়েছিলেন। সেই সামান্য আজ অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ছেলের নামে ফৌজদারিতে নালিশ করতে গেছে। চাপরাসী কে রয়েছে বাইরে?

চাপরাসীর প্রবেশ

চাপ। (সেলাম করিয়া) হুজুর!

শিব। মহাভারত মোড়ল, যাকে আজ ছোটখোকাবাবু লাথি মেরেছিল,

তার দোরে গিয়ে হাজির থাক। বাড়িতে আসবামাত্র তাকে গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে আসবি এখানে। এতবড় সাহস!

চাপরাসী সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

গোপী। আজ্ঞে, যা বুঝলাম, সাহসের পেছনে লোক আছে।

শিব। লোক?

গোপী। আজ্ঞে, মুটু মুখুজ্জে।

শিব। (সোজা হইয়া বসিয়া) মুটু মুখুজ্জে! শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নাতি? কুনো কালীর বেটা? স্বদেশী ক'রে জেল খেটেছে, সেই ছোকরা?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। হরেন্দ্র মোক্তারের কাছে তার লেখা চিঠি আমি নিজে দেখেছি। বিনা পয়সায়, খরচা দিয়ে, মামলা দায়ের ক'রে দিতে অনুরোধ করেছিল মুটুবাবু। তা, আমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ টিপে ইশারা ক'রে দিলাম। হরেনবাবুকে আমি মোক্তার-নামা দিয়ে এসেছি।

শিব। বেশ করেছ। তুমি চাপরাসীকে বারণ কর। বল, মহাভারতকে আনবার দরকার নেই এখন।

গোপীর ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান

নেপথ্যে দেবনারায়ণ। বাবা! বাবা রয়েছ?

ব্যস্তভাবে প্রবেশ

শিব। কি ব্যাপার? বড়বাবু এত ব্যস্ত কেন?

দেব। ন্যায়রত্নের বাড়ির মেয়েরা খেতে আসে নি।

শিব। কার বাড়ির?

দেব। শিবু ন্যায়রত্নের, মানে মুটু মুখুজ্জের স্ত্রী খেতে আসে নি।

শিব। খেতে আসে নি?

দেব। না। মুটুর জ্ঞাতি ভগ্নী সাতুঠাকরুণ বললে, গতবারে মুটুর স্ত্রী দোতলায়, মানে আমাদের বাড়িঘর, তা ছাড়া নবীন উকিলের বাড়ি—এইসব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের সঙ্গে সে ব'সে ছিল। তাতে সাধারণের আপত্তি হতে পারে ব'লে, তাকে নীচে বসতে পাঠানো হয়েছিল। সেইজন্যে আসে নি।

শিব। হুঁ।

দেব। কর্ত্তব্যের খাতিরে একজন কর্ম্মচারীকে পাঠিয়ে দিই। তাতে আসে ভাল, না আসে—

শিব। আসবে না।

দেব। না আসে, তার ব্যবস্থা হবে। আর আসবে না কি ক'রে বলছ?

শিব। হুটুকে তোমরা চেন না। সে আরও কি করেছে জান? ছোটখোকা আজ হরিশ মোড়লের নাতিকে একটা লাথি মেরেছে।

দেব। জানি।

শিব। হুটু তাকে উত্তেজিত ক'রে ফৌজদারিতে নালিশ করতে পাঠিয়েছে।

দেব। কি বলছ তুমি বাবা?

শিব। গোপী এখুনি মহকুমা থেকে ফিরে এল, সেই খবর নিয়ে এসেছে। কি, বিশ্বাস করতে পারছ না?

দেব। অবিশ্যি লোকে ওদের বংশটাকেই বলে বিছুটির ঝাড়। তবু ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আমাদের পেছনে লাগবে, ওর এত সাহস হবে? আর হুটু তো লোক খারাপ নয়।

শিব। ওর পিতামহ শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্ন আমাকে সভার মধ্যে কি বলেছিল জান? আমার পিতামহের শ্রাদ্ধে বিচার-সভায় আমি গীতার "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি" শ্লোকটি আউড়েছিলাম। আমায় সেই সভার মাঝেই বলেছিল—জিহ্বার জড়তা দূর হয় নি তোমার; দেবভাষার অপমান করা হয় ওরকম উচ্চারণে। যদার য বর্গীয় জ নয়, অন্তস্থ য। সে উচ্চারণ আজও করতে পারি না। ও বংশের সন্তানের পক্ষে সবই সম্ভব।

দেব। তা হ'লে?

শিব। তা হ'লে আমাদের নিজেদের কাউকে যেতে হবে। সামাজিকতাটা অন্তত লোকধর্ম্মের খাতিরেও রাখতে হবে। যাও, ডেকে আন, দামী আসন পেতে, রূপোর থালায় খেতে দাও হুটুর স্ত্রীকে। অপমান করতে হয় সম্মানের খোলস পরিয়ে কর।

যেখানে চামড়ার জুতো না চলে, সেখানে চাঁদির জুতো চালাতে হয়।

দেব। বেশ, তা হ'লে সেই ব্যবস্থাই করি।

শিব। মোক্তারিতে পসার হ'ল না ব'লে ছোকরা যখন চাষাভুষোর ছেলেদের জন্যে পাঠশালা খুলে বসল, তখন আমি হাজার বার বলেছিলাম, উঠিয়ে দাও, ওটা উঠিয়ে দাও; তখন তুমিই বলেছিলে, একটু আধটু লেখাপড়া শিখবে বই তো নয়! ওরে বাবা, সৎমাকে ঘর ঢুকতে দিলে, নিজের মা কখনও স্থির থাকতে পারে না। কঙ্কণায় মা-লক্ষ্মী বাঁধা আছেন, সেখানে সরস্বতীর আসন? নইলে কি কঙ্কণার বাবুরা একটা ইস্কুল দিতে পারে না? (হা-হা করিয়া হাসিয়া) খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবকেই এবার সে কথা ব'লে দিলাম। হুজুর যখন ধরছেন, তখন হাসপাতাল দোব আমরা, ইস্কুলের কথা বলবেন না।

দেব। দেরি হয়ে যাচ্ছে, তা হ'লে আমি যাই।

শিব। যাও। কিন্তু ভুলে যেও না বাবা, হুটু মুখুজ্জের নটে-গাছটি মুড়োতে হবে, আর মহাভারতের অষ্টাদশপর্ব্বের শেষ পর্ব্বটি পর্য্যন্ত আখের কলে মাড়াই ক'রে ছিবড়ে ক'রে ফেলে দিতে হবে।

দেবনারায়ণের প্রস্থান

(চাকরকে) আঃ! শরীর ম্যাজম্যাজ ক'রে উঠল যে! জোরে জোরে। বেশ গোটা-কতক কিল মার তো পিঠে, দেখি।

নেপথ্যে ঘড়িতে তিনটা বাজিল

(সচকিতভাবে) হরি, হরি, হরি! তাই তো বলি, শরীর এমন করে কেন? তিনটে বেজে গেল, আফিং রে বেটা, আফিং!

তৃতীয় দৃশ্য

হুটবিহারীর আশ্রম। প্রথম দৃশ্যের দৃশ্য

কেবল বারান্দার উপর দুই তিনটি মোড়া। মোড়ার উপর উপবিষ্ট হুটু ও কমলাপদ

হুট। কল্যাণীর নাম আমার কাছে ক'রো না কমল। Her father drove me away.

কমল। Drove you away? বল কি স্থটু? এ যে আশ্চর্য্যের কথা!

স্থট। Truth is stranger than fiction কমল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু বলেছিলেন, তুমি আর এস না আমার বাড়ি; আমি কল্যাণীর বিবাহ অন্যত্র স্থির করেছি; তোমার সঙ্গে তার বিবাহ অসম্ভব।

কমল। অসম্ভব!

স্থট। অসম্ভব বইকি। হাইকোর্টের উকিল—roaring practice; স্থরেন্দ্রনাথের সহকারী দেশসেবক, ধনী হয়ে মত পালটে করলেন সরকারের সহযোগিতা। সরকার রাজসম্মানে সম্মানিত করলেন। সে অবস্থায় আমার মত দরিদ্র, পুলিসের সন্দেহভাজনের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ অসম্ভব বইকি।

কমল। তোমার দারিদ্র্য তিনি জানতেন। জেনেশুনেই he picked you up. আমরা বলতাম, কলেজ-সমুদ্র মন্থন ক'রে তিনি স্থটু-রত্নকে আহরণ করেছেন।

স্থট। তখন মৃত্যুঞ্জয়বাবু ছিলেন অন্য মানুষ। নির্য্যাতিত দেশসেবক, practiceএর তখন প্রারম্ভ। তখন ধনের চেয়ে গুণ ছিল তাঁর কাছে বড়। ম্যাট্রিকে পনরো টাকা scholarship পেয়ে কলেজে গেলাম, প্রফেসার সেনগুপ্ত আমাকে তাঁর ছোট ছেলে স্থশোভনকে পড়াবার জন্যে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে তিনি আকৃষ্ট হলেন। I. A.-তে first হলাম, তিনি কল্যাণীকেও পড়াবার ভার দিলেন।

কমল। আমি তো সব জানি স্থটু। মৃত্যুঞ্জয়বাবু আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। কল্যাণী আমায় 'দাদা' বলত, তুমি তো জান। কল্যাণীর মা কত দিন তোমার সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ের কথা আমায় বলেছেন।

স্থট। তবুও তুমি সব জান না কমল। জানবার কথাও নয়। কল্যাণীকে আমি পড়াতাম, কিন্তু কখনও এ অসম্ভব আশা মনে আমি স্থান দিই নি। B. A.-তে first class first হলাম, তখন মৃত্যুঞ্জয়বাবু আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা ক'রে কল্যাণীকে আমার হাতে সমর্পণের সংকল্প নিজে আমাকে জানালেন, তবে

আমি নিজেকে কল্যাণীর দিকে আকৃষ্ট হতে দিয়েছিলাম। কল্যাণীও আমার সে আকর্ষণকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু ১৯০৮ সালের পর চাকা ঘুরে গেল। আলিপুর বোমার মামলার পর পুলিস বার বার আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। ঠিক সেই সময় বাবাও মারা গেলেন। M. A.-র result অত্যন্ত খারাপ হ'ল, ordinary 2nd class; সুতরাং সরকারী উপাধিধারী ধনী মৃত্যুঞ্জয়বাবু drove me away. তাঁর ব্যবহারে আমি আঘাত পাই নি কমল, আঘাত পেয়েছিলাম কল্যাণীর ব্যবহারে। "So sweet was ne'er so fatal."

কমল। তাই তো নুটু, বড় সমস্যায় ফেললে আমাকে।

নুট। (উঠিয়া পড়িল—পদচারণা করিতে করিতে, তীক্ষ্ণ হাসি হাসিতে হাসিতে) কোন সমস্যা নেই কমল। অত্যন্ত সহজ এবং সরল। Othello মনে আছে কমল? Desdemona-কে হত্যা করবার আগে Othello-র Solyloque ?

It is the cause, it is the cause, my soul—
Let me not name it to you, you chaste stars.

It is the cause—আমিও সেই কথাই বলি, It is the cause, আমার দারিদ্র্য—

কমল। (নুটুর মুখের দিকে চাহিয়া) নুটু, আমার মনে হচ্ছে, তুমি ভুল করেছ, ওথেলোর মতই ভুল করেছ। কল্যাণীকে তুমি ভুল বুঝেছ।

নুট। তোমার অনুমান ভুল।

কমল। না, ভুল নয়। আর এ আমার অনুমানও নয়। আমার প্রত্যক্ষ করা সত্য।

নুট। প্রত্যক্ষ করা সত্য?

কমল। কল্যাণী বিধবা হয়েছে জান?

নুট। বিধবা! কল্যাণী বিধবা হয়েছে?

বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল

কমল। হ্যাঁ। বছরখানেক আগে সে বিধবা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে এখন নিরাশ্রয়, গায়ের কখানা গহনা ছাড়া নিঃসম্বল।

মুট। কি বলছ কমল? কল্যাণীর শ্বশুর তো লক্ষপতি ছিলেন। জমিদারি, ব্যবসা,—

কমল। হ্যাঁ, সে সবই আছে; কিন্তু কল্যাণীর তাতে কোন অধিকার নেই। আমিই বিচারকের আসনে ব'সে সেই রায় দিয়েছি। কল্যাণীর স্বামী লেখাপড়া শিখেছিলেন, কিন্তু অমিতাচার ছাড়তে পারেন নি। লিভার অ্যাব্‌সেস, সঙ্গে সঙ্গে আরও সাতখানা রোগে তিনি মারা গেলেন। তাঁর বাপ তখন বেঁচে। মাস দুই পরে তিনিও মারা গেলেন। আইন অনুসারে কল্যাণী আর তার মেয়ে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হ'ল। আইন অনুসারে বিচার ক'রে আমিই সে বিধান দিয়েছি। কল্যাণী এখন নিরাশ্রয়, প্রায় নিঃসম্বল।

মুট। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) মৃত্যুঞ্জয়বাবু তো মারা গেছেন। কল্যাণী তবে এখন ভাইদের আশ্রয়ে?

কমল। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর ছেলেদের খবর কিছু জান?

মুট। এখনকার খবর কিছু জানি না। বড় ছেলে বিলেত গিয়েছিল, ছোটটি ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলেজে পড়ছিল, সেই পর্য্যন্তই জানি।

কমল। বড় ছেলে বিলেত থেকে মেম বিয়ে ক'রে এসেছেন। তিনি এখন খাজা সায়েব। ছোট ছেলে, তোমার ছাত্রটি, সঙ্গীতবিদ; পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি ক'রে সঙ্গীতের সাধনায় ভারতবর্ষময় ছুটে বেড়াচ্ছেন। শ্বশুরকুল, পিতৃকুল, কোন কুলেই এখন আর কল্যাণীর আশ্রয় নেই। একটি মেয়েকে বুকে নিয়ে সে এখন ভেসে বেড়াচ্ছে—অকূল সমুদ্রে বললে ভুল হবে না। আমি তোমার কাছে এসেছি মুটু, কল্যাণীর আশ্রয়ের জন্যে।

মুট। আমার কাছে?

কমল। হ্যাঁ, তোমার কাছে। মৃত্যুঞ্জয়বাবু ভুল করেছিলেন, তুমি ভুল করেছ, কিন্তু কল্যাণীর ভুল স্বেচ্ছাকৃত নয়। তোমাদের ভুলের বোঝা তার মাথায় তোমরা চাপিয়ে দিয়েছ। নদীর বুকের ভেলা যখন ভার হয়ে ভেলার আরোহীর বুকে চাপে, তখন নিরুপায় হয়ে

তাকে ডুবতেই হয়। অসহায় ষোল সতরো বছরের কিশোরী মেয়ে নিরুপায় হয়ে আত্মবলি দিয়েছে। সে আমায় কি বললে জান ?

নুটু কমলের মুখের দিকে চাহিল

তাদের মকদ্দমা আমার কোর্টেই চলছিল। যতদিন মকদ্দমা চলেছে, ততদিন সে ঘুণাক্ষরে তার অস্তিত্ব আমাকে জানতে দেয় নি। আমি অবশ্য পরিচয় জানতাম। কিন্তু আইনের বিধানের বিপক্ষে আমি নিরুপায়; তাকে পথে দাঁড় করাতে আমাকে রায় দিতে হ'ল। তারপর সে আমার বাড়িতে এল। আমি মাথা নীচু ক'রে রইলাম। সে আমায় বললে, বিচারক হিসেবে কর্ত্তব্য নিখুঁতভাবে পালন করেছেন ব'লেই ভরসা ক'রে আপনার কাছে এসেছি। দাদা হিসেবে এইবার কর্ত্তব্য করুন। আমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিন। আমি বললাম, বোন, চিরদিন তুমি আমার সংসারে দিদি হয়ে থাক। কল্যাণী বললে, না, আমি ব্রাহ্মণের বিধবা, আপনি কায়স্থ। তা ছাড়া আপনি পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। আপনার বাড়িতে আমার মেয়ে গরিব হয়ে মানুষ হতে পারবে না। যেখানে আমার মেয়ে সেই খাঁটি শিক্ষা পাবে, যেখানে আমি সত্যি সত্যি কুলীন বামুনের বিধবা বোন হয়ে থাকতে পারব, সেইখানে আপনি আমায় পৌঁছে দিন। আমি নুটুদাদার কাছে যেতে চাই।

নুট। (দৃঢ়স্বরে) সে হয় না কমল। কল্যাণীকে আমি আশ্রয় দিতে পারব না।

কমল। (নুটুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) আমি যে তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি নুটু।

নুট। সঙ্গে নিয়ে এসেছ ? সে কি ? কোথায় কল্যাণী ?

কমল। স্টেশন থেকে তারা গরুর গাড়িতে আসছে। আমার আরদালী তার সঙ্গে আছে। আমি তাড়াতাড়ি আগেই এসেছি তোমায় খবর দিতে।

নুট। তুমি অন্যায় করেছ কমল। এ হয় না, হতে পারে না।

কমল। তুমি এ কথা বলবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

কল্যাণী বললে, হুটুদাদাকে খবর দেবার দরকার নেই। তার কথা আমিও অন্তরে অন্তরে সমর্থন করেছিলাম।

হুট। কল্যাণী, কল্যাণীর সন্তানের দেহে ধনীর রক্ত, অস্থিমজ্জায় তার সম্পদের আকাঙ্ক্ষা; দারিদ্র্যের শিক্ষা সহ্য করবার শক্তি সে রক্তের নেই। তুমি ফিরে যাও—

হুটুর পিছন দিকে ইতিমধ্যে কল্যাণী তাহার মেয়ের হাত ধরিয়া প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে হুটুর সমস্ত কথাগুলিই শুনিল

কল্যাণী। (ম্লান হাসিমুখে) কিন্তু আমি তো ফিরে যাব ব'লে আসি নি হুটুদা।

হুট। (সচকিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) কে? কল্যাণী!

কল্যাণী। হ্যাঁ, আমি। (মেয়ের প্রতি) মমতা, প্রণাম কর, তোমার মামা।

মমতা প্রণাম করিল; হুটু নীরবে মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল

আমাদের ফিরিয়ে দেবে হুটুদা?

হুট। (আত্মসম্বরণ করিয়া দৃঢ়স্বরে) হ্যাঁ, ফিরেই তোমাদের যেতে হবে কল্যাণী। এ কষ্ট তোমরা সহ্য করতে পারবে না। এ হয় না।

কল্যাণী। মেয়েটাকে নিয়ে আমি ভেসে যাব দাদা?

হুটু নিরুত্তর

কমল। হুটু!

হুটু নিরুত্তর

চল কল্যাণী, ফিরে চল। এস।

ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইল বিমলা

বিমলা। (হুটুর প্রতি) তুমি কি পাষাণ? ছি! ছি! ছি!

ওই কথায় সকলে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বিমলা অগ্রসর হইয়া কল্যাণীর হাত ধরিল

যেও না ঠাকুরঝি, দাঁড়াও।

কল্যাণী। আপনি বউদি?

বিমলা। হ্যাঁ। ছি, পরের মেয়ে ব'লে এত অবহেলাই কি করে ভাই?

দেখা না ক'রেই চ'লে যাচ্ছ? এস, ঘরে এস। কোথায় যাবে? কেন যাবে? সত্যি 'ভাই' ব'লে যদি দাবি কর, তবে এ ঘরেও তোমার অখণ্ড অধিকার। সে অধিকার উচ্ছেদ করবার ক্ষমতা ভাইয়েরও নেই, ভাজেরও নেই। এস। (মমতার হাত ধরিয়া যাইতে যাইতে) খুকী, চিরকাল তোমরা মামীদেরই দুর্নাম ক'রে এসেছ। এবার থেকে মামার দুর্নাম ক'রো, মামী কোন দোষ করে নি। দাঁড়িয়ে থেকো না—

নেপথ্যে দেবনারায়ণ। নুটু বাড়ি রয়েছ? নুটু!

নুট। কে?

দেব। আমি দেবনারায়ণ, বড়বাবুর বড় ছেলে।

নুট। বাড়ির ভেতর যাও তোমরা বিমলা।

বিমলা। (উত্তেজিত হইয়া) আমি কিন্তু খেতে যাব না; তুমি যেন কথা দিও না। যে বাড়িতে গয়না-কাপড়ের আদর, সে বাড়িতে আমি গরিব খেতে যাব না, যেতে পারব না। এস ঠাকুরঝি, বাড়ির ভেতর এস।

কল্যাণী কমলাপদ সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল

কল্যাণী। কি হয়েছে বউদি?

নুট। কিছু হয় নি বোন। তোমরা বাড়ির ভেতরে যাও। কমল, তুমি ব'স গিয়ে, আমি আসছি।

বাহিরের দিকে প্রস্থান। বিমলা, কল্যাণী ও মমতা বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল

কমল। (উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া) ভগবান, দরিদ্রই যদি কর, তবে দারিদ্র্যের দম্ভ থেকে যেন রক্ষা ক'রো।

প্রস্থান

দেবনারায়ণ ও নুটুর কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ

নুট। আমার স্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব, কিন্তু রাখা না-রাখা তাঁর হাত। আমি তাঁকে বাধ্য করতে পারব না।

দেব। গতবার যা হয়ে গেছে, তার জন্যে নিজে আমি মাফ চাইতে এসেছি।

মুট। তাতে আপনাদের মহত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে দেবনারায়ণবাবু। কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল না। বরং সামাজিক খাওয়া-দাওয়ার প্রথার সংস্কার করাই উচিত। কারণ সমাজ এখন মনুর বিধানে চলে না, সমাজ চলে লক্ষ্মীর বিধানে। সে বিধানে আপনারা আমরা পৃথক জাতি, পৃথক বর্ণ।

দেব। তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে বদ্ধপরিকর হয়েছ মুটু?

মুট। আপনি কি মাফ চাইবার ছলে আমাকে সাবধান ক'রে দিতে এসেছেন দেবনারায়ণবাবু?

বাড়ির ভিতর হইতে ঘোমটা টানিয়া কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। বউদিদি খেতে চ'লে গেছেন দাদা।

মুট। (সবিস্ময়ে) চ'লে গেছেন?

কল্যাণী। হ্যাঁ। এইমাত্র গেলেন। আপনার সাতুদিদি এসেছিলেন, তিনি ডেকে নিয়ে গেলেন।

দেব। খেতে গেছেন? বেশ, বেশ।

হাসিয়া চলিয়া গেল

মুট। (হাসিয়া বলিল) সত্যই তোমরা রহস্যময়ী কল্যাণী। স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্য!

কল্যাণী। (হাসিয়া) বুঝতে চায় না ব'লেই জানতে পারে না দাদা। আপনিই বলুন তো, আপনি কি কোন দিন বুঝতে চেয়েছেন? বউদিকে জানতে—

নেপথ্যে মহাভারত। দাদাঠাকুর!

মুট। (ব্যস্তভাবে) মহাভারত? কি হ'ল মহাভারত?

ব্যস্তভাবে চলিয়া যাইতেছিল

কল্যাণী। (হাসিয়াই) এই তো দাদা, আমার কথাটা শেষ পর্য্যন্ত আপনার শোনবারও অবকাশ হ'ল না!

ভিতরে চলিয়া গেল

মুট। (ফিরিয়া) কল্যাণী!

মহাভারতের প্রবেশ

মহা। হ'ল না দাদাঠাকুর। চিঠি ফিরিয়ে দিলে তোমার।

মুট। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) দাঁড়াও মহাভারত, একটু দাঁড়াও। একটু—(ব্যস্তভাবে বাড়ির ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ডাকিল) কল্যাণী! কল্যাণী!

নেপথ্যে কল্যাণী। আমায় ডাকছেন? আসছি দাদা।

চতুর্থ দৃশ্য

বাবুদের বাড়ির অন্দর। সুসজ্জিত কক্ষ

ঘরের মেঝেতে দামী আসন পাতা। সম্মুখে রূপার গেলাসে জল। রূপার থালা-বাটিতে খাবার। একজন ঝি পাখা হাতে দাঁড়াইয়া আছে। গিন্নী বসিয়া আছেন। স্বয়ং বড়বাবু শিবনারায়ণও দাঁড়াইয়া আছেন। এক পাশে অবগুণ্ঠনাবৃতা বিমলা দাঁড়াইয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গ একখানা চাদরে ঢাকা

শিব। দেখ দেখি, তুমি শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নাতবউ—মুটুর স্ত্রী। মুটুই কি আমাদের সোজা লোক! সাধু পুরুষ, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাই তো বললাম মা, বাড়ির মেয়েদের। ওরা বলে, সন্ন্যাসী কিসের? আরে বাপু, দাড়ি রাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো সকল মুসলমানই সন্ন্যাসী। চুল রাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো সকল স্ত্রীলোকই সন্ন্যাসী। ফল খেলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো বনের সকল বাঁদরই—

গিন্নী। তুমি আর ব'কো না বাপু। তুমি বরং যাও এখান থেকে। ওগো মুটুর বউ, তুমি খেতে ব'স বাছা। এই দেখ, যথাসাধ্যি খাতির আমরা করছি। আর যেন ব'লো না, গয়না নেই ব'লে আমরা অপমান করেছি।

শিব। দেখ দেখি। কি বল গিন্নী, তার ঠিক নেই। গয়না মানে অলঙ্কার, পণ্ডিত লোকের কথায় কথায় অলঙ্কারের ঘটা, তার ছটা কি! সোনা রূপোর ছটা সেখানে মণের কাছে ছটাক। (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) ব'স মা, ব'স, খেতে ব'স। আমি যাই।

বিমলা। না, আপনাকে যেতে হবে না। আপনি আমার বাপের চেয়েও বড়। আপনার সামনে আমার লজ্জা নেই।

সে গায়ের চাদরখানি খুলিয়া রাখিল। দেখা গেল, সর্ব্বাঙ্গে তাহার বহুমূল্য অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে। সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। বিমলা আসনে বসিল

বিমলা। ত্যাগী পণ্ডিত লোকে কুশাসনে বসে বাবা, পাতায় খায়, মাটির ভাঁড় তাদের সম্বল। আপনারা এই দামী আসনে, রূপোর বাসনে খেতে দিয়েছেন, আমি কি তার অপমান করতে পারি? তাই দুখানা সোনার গয়না প'রে এসেছি।

ঝির হাত হইতে পাখাখানা খসিয়া পড়িয়া গেল। বিমলাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িল

আচ্ছা বাবা, এইবার আমি উঠলাম। এই আমার যথেষ্ট খাওয়া হয়েছে। আসি বাবা।

সে চলিয়া গেল। কাহারও মুখে কথা সরিল না

গিন্নী। (কয়েক মুহূর্ত্ত পরে) হ'ল তো? হ'ল তো? নাকে ঝামা ঘ'ষে দিয়ে গেল তো?

শিব। (গম্ভীর ক্রুদ্ধস্বরে) দেবনারাণ! দেবনারাণ!

দেবনারায়ণের প্রবেশ

দেব। বাবা!

শিব। পিঁপড়ে নয়, কাঁকড়াবিছে। না, কেউটে সাপ। যদি বাঁচতে চাও তো ধ্বংস কর।

দেব। সাপ!

শিব। হ্যাঁ, মুটু মুখুজ্জে সাপ। বাঁচতে চাও তো ধ্বংস কর ওকে। এস, সঙ্গে এস।

পঞ্চম দৃশ্য

মুটবিহারীর আশ্রম। পূর্ব্ব দৃশ্য

মহাভারত দাঁড়াইয়া আছে, মুটু পায়চারি করিতেছে। বাড়ির ভিতর হইতে কল্যাণী আসিয়া প্রবেশ করিল

মুট। (পায়চারি করিতে করিতে) "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God."

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। আমায় ডাকছিলেন হুটুদা?

হুট। ডাকছিলাম। কয়েকটা কথা বলবার আছে।

কল্যাণী। বলুন।

হুট। তুমি আমার জীবনের ব্রতের কথা জান। এককালে তোমার সঙ্গেই কত কল্পনা করেছি।

কল্যাণী। জানি। সে কথা ভুলি নি হুটুদা।

হুট। আমি দরিদ্র, চিরদিনই দরিদ্র। তা ছাড়া এ ব্রতে দারিদ্র্যই আমার চিরসঙ্গী। ব'সে খাবার সংস্থান আমার নেই। তোমাকেও আমি ব'সে খেতে দিতে পারব না।

কল্যাণী। মেয়েকে নিয়ে সেই দীক্ষা নেবার জন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি দাদা।

হুট। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে আছে?—

"বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।"

কল্যাণী। মনে আছে।—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।"

হুট। (মহাভারতকে দেখাইয়া) এদের মূঢ় ম্লান মুখে সেই চাওয়ার কথা ফোটাবার জন্যে আমি শিক্ষা-ব্রত নিয়ে এদের ছেলেদের জন্যে পাঠশালা করেছিলাম। এরা মাইনে যা দেয়, তা থেকেই আমার সংসার চলে। আমার দীক্ষা নিতে হ'লে, সেই পাঠশালার ভার তোমাকে নিতে হবে।

কল্যাণী। বেশ, পাঠশালায় আমাকে আপনার সহকারী ক'রে নিন।

হুটু। সহকারী নয়। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তোমায় পাঠশালার ভার নিতে হবে। আমায় অন্য কাজ নিতে হবে।

কল্যাণী। (ন্টুর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া) আপনি ভার দিচ্ছেন, আমি মাথায় ক'রে নিলাম দাদা।

ন্টু। আঃ, বোন, বাঁচালে, আমায় বাঁচালে তুমি। আশীর্ব্বাদ করি—

কল্যাণী। আশীর্ব্বাদ করুন দাদা, মরণ যেন এসে আমার সকল ভার লাঘব ক'রে দেয়।

দ্রুত বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল

ন্টু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল

মহা। আমি তা হ'লে বাড়ি যাই দাদাঠাকুর। কি আর করবে বল? তুমি তো সাধ্যিমত কসুর করলে না! শুনলাম, এখন টাকা দিলেও কোন উকিল-মোক্তারে আমার কাজ নেবে না। বাবুরা তামাম উকিল-মোক্তারকে ফী দেবে—

ন্টু। (এই কথায় সচেতন হইয়া) অপেক্ষা কর মহাভারত, আমি আসছি। বুকের দাগটা যেন মুছো না। আসছি, আমি আসছি।

প্রস্থান

সাতু ঠাকরুণের প্রবেশ

সাতু। (প্রবেশ করিতে করিতেই বলিতেছিল) হ'ল তো? বলি, হ'ল তো? পই পই ক'রে বললাম, ওরে ন্টু, মান করিস নি, মানের গোড়ায় ছাই দে, মান বাড়বে। বউকে খেতে পাঠিয়ে দে। এখন হ'ল তো? মেলে তো চাঁদির জুতো? তোর বউকে রূপোর বাসনে খেতে দেওয়ার মাল্তির মানেটা কে না বুঝলে? কই, ন্টু কই? গেল কোথায়? যা, এইবার কিংখাবের পাল্কি নিয়ে গিয়ে বউকে নিয়ে আয়; মুরদ বুঝি! বলি, অ ন্টু! (মহাভারতকে দেখিয়া) আ মরণ, তুই কে রে? অ, বলি, তুই মহাভারত?

মহা। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিদিঠাকরুণ।

সাতু। বলি, হ্যাঁ রে, শুনলাম, তোর নাকি পাখনা গজিয়েছে?

মহা। ওই, দিদিঠাকরুণ কি বলছেন গো?

সাতু। বলি, পিঁপড়ের পাখা গজায় দেখেছিস তো? ফরফর ক'রে

উড়ে এসে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরে? তোর নাকি তেমনই পাখনা গজিয়েছে? বাবুদের ছোট খোকা তোকে লাথি মেরেছে ব'লে তুই নাকি আদালতে নালিশ করতে গিয়েছিলি? পরামর্শদাতা বুঝি মুটু?

মহা। তিনি পরামর্শ দেবে কেনে দিদিঠাকরুণ? আমরা কি মানুষ লই?

সাতু। মানুষ! চাষার খেঁটে আবার মানুষ কবে হ'ল রে? অ্যাঁ! কালে কালে কতই দেখব! তা তোর পরামর্শদাতা কই? মুটু কই? তা তোর পরামর্শদাতাকে বলিস, তার বউকে বাবুরা ধ'রে জুতো দিয়ে মেরেছে—অবিশ্যি রূপোর জুতো।

প্রস্থান

মহা। (অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর!

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। উনি আসছেন। তোমায় বললেন, একটু জল খেয়ে নিতে। এস, বাড়ির ভেতর এস।

মহা। দাদাঠাকুর কই? আমাকে তার কাছে নিয়ে চলেন।

কল্যাণীর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরই এক দিক হইতে মোক্তারের পোশাক পরিয়া মুটুর ও অপর দিক হইতে অলঙ্কার-ভূষিতা বিমলার প্রবেশ। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল

মুট। (কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর বিস্ময়ে ক্রোধে বলিয়া উঠিল) তুমি শেষে ভিক্ষে নিয়ে এলে বিমলা? সাতুঠাকরুণ ব'লে গেল, বাবুরা তোমায় চাঁদির জুতো মেরেছে। সে কথা তবে সত্যি? কিন্তু সে জুতোটা মাথায় ক'রে আনলে না যে বড়?

বিমলা। রূপো কেন, আমাকে হীরে মানিক বসানো সোনার জুতো মারতেও কারও ক্ষমতা নেই, সাহস নেই। তুমিই আমাকে মার কথার জুতো।

মুট। এ গহনা কার? তুমি কোথায় পেলে?

বিমলা। এ গহনা আমার বেটার বউয়ের। বেটার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে গহনা আমি আগাম নিয়েছি।

মুট। কি বলছ তুমি বিমলা?

বিমলা। কল্যাণী-ঠাকুরঝির মেয়ে মমতার সঙ্গে আমার অরুণের বিয়ের সম্বন্ধ করেছি। এ গহনা মমতার—আমার ভাবী পুত্রবধূর। কিন্তু তোমার এ কি পোশাক? কোথায় যাচ্ছ?

মুট। আজ থেকে মোক্তারি আরম্ভ করলাম বিমলা। তোমার কথাই সত্যি হয়েছে, হরেন বোস আমার চিঠি ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি মহাভারতের মামলা দায়ের করতে চলেছি। মহাভারত! মহাভারত!

ক্রমশ

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইভ্যাকুয়েশন

চুপচাপ ব'সে আছি, চুপচাপ বসিয়াই থাকব,
আকাশে মেঘের মত বিমানের কালো ছায়া পড়বে;
আশে পাশে কেহ নাই, নাম ধ'রে কারেই বা ডাকব?
অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট কামান ওদের সাথে লড়বে।
খুকীর জ্বাওটো বড়, কে আর থামাবে তার কান্না?
শহরের বুক জুড়ে আশ্রয় হইতেছে সৃষ্টি;
উপাদেয় লাগিতেছে ভীত চাকরের হাতে রান্না;
এরো চেয়ে মন্দ কি বোমা আর বারুদের বৃষ্টি!
শখের জিনিস সব নাই আজ কারো কিছু মূল্য—
বালির বস্তা দিয়ে ঢাকিতেছে ভিনিসীয় দর্জা,
প্রশস্ত শয্যায় তেরাত্রি থাকা যায় ফুল্ল;
বোমারু-বিমান আয়, যত খুশি জোরে তুই গর্জা।
চুপচাপ ব'সে আছি, যা হবার হোক অবিলম্বে,
পরিখা খুঁড়িছে সবে আপনার প্রস্থে ও লম্বে।

ওরা এবং আমরা

দুইজনেই প্রায় একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিল ; নিমাই বলিল, নড়নচড়ন। ঘুটু বলিল, নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু। নিমাই তাক করিয়া আঁটের গুলি ছাড়িয়া দিল।

গুলিটা ঘুটুর গুলিতে লাগিল না বটে, তবে গুলির সংলগ্ন একটা কুটোকে আঘাত করিয়া যাওয়ায় ঘুটুর গুলিটাও নড়িয়া উঠিল। নিমাই বলিল, টোয়েনটি ; খাটো ঘুটু।

ঘুটু বলিল, আমি নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু বলেছিলাম।

নিমাই বলিল, আমি আগে নড়নচড়ন ব'লে তবে আঁটি ছেড়েছি।

ঘুটু বলিল, কখনও নয়, আমি আগে বলেছি।

আলবৎ নয়, খাটান দিয়ে যাও। তিনবার উপরোউপরি হেরে বেইমানি করতে আরম্ভ করেছিস।

খবরদার, বেইমানির নাম নিবিনে নিমে! তুই কখন আগে বললি রে? মিথ্যেবাদী কোথাকার!

তুই মিথ্যেবাদী কাকে বললি রে?

তুই বেইমান কাকে বললি?

আলবৎ বেইমান, হেরো বেইমান। খাটান না দিয়ে এক পা এগুতে পারবি নি। নিমাই আগাইয়া গিয়া ঘুটুর পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

ঘুটু তাহার পানে তাচ্ছিল্যের সহিত বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, লে লে, ভারি পথ-আটকানেওয়ালা হয়েছিস। এই বাড়ালাম পা, কর কি করবি, দেখি কত মুরদ।

নিমাই তাহার কোমরের কাপড়টা ধরিয়া বলিল, খাটান দিয়ে য। বলছি বাপের সুপুত্তুর হয়ে।

আর বিলম্ব হইল না। তুই বাপ তুললি কাকে রে?—বলিয়া দাঁতে দাঁত ঘষিয়া ঘুটু একটা ঝটকা মারিয়া একেবারে নিমাইয়ের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর ঝাপটাঝাপটি, কিল, চড়, খামচানি, একবার এ ওপরে যায়, একবার ও ওপরে ঠেলিয়া আসে। ঘামে গায়ের ধূলা কাদা হইয়া উঠিতেছে, নিশ্বাস হইয়া উঠিতেছে দ্রুত আর ঘন, ফোঁসফোঁসানির মধ্যে এক আধটা যা চাপা কথা বাহির হইতেছে তাহার সামনে বাপের সুপুত্তুর অতি ভদ্র।

নিমাই ওপরে ছিল, ঘুটুকে বাগাইয়া নীচে ফেলিয়া এইবার তাহাকে থেঁতো করিবে, হঠাৎ নিজেই চীৎকার করিয়া উঠিল। ঘুটু নীচে থাকিয়া তাহার পাঁজরার কাছের মাংসটা কামড়াইয়া ধরিয়া এমন চাপ দিয়াছে যে, তুলাভরা গেঞ্জি গায়ে না থাকিলে মাংসটা তাহার মুখের মধ্যে গিয়া পড়িত। একটা ঝাঁকানি দিয়া ছাড়াইয়া নিমাই চীৎকার করিতে করিতেই তাহার কাঁধে পিঠে গোটাকতক ঘুষি কষাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়িমুখো হইল।

ঘুটু ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উঠিয়াই প্রথমে হাতের টল-গুলি দুইটা প্রাণপণ শক্তিতে নিমাইয়ের পানে ছুঁড়িল। উগ্র রাগের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় একটা থান ইটের আদ্ধা তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় পিছনে খানিকটা দূরে একটা খনখনে মেয়েলী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কান্না কার রে ঘুটু?

ঘুটু একবার ফিরিয়া দেখিয়াই দারুণ আতঙ্কে নিজের মনেই, 'পিসীমা রে!' বলিয়া হাতের ইট ফেলিয়া ছুট দিবে, কড়া হুকুম হইল, দাঁড়া বলছি, এক পা নড়েছিস কি তোরই একদিন কি আমারই একদিন—

ঘুটু নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি বাকি ধূলা ময়লা ঝাড়িয়া লইতেছিল, ততক্ষণে পিসীমা হনহন করিয়া কাছে আসিয়া গিয়াছেন, গলার স্বরটাকে যতটা সম্ভব শান্ত, অবিচলিত রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে শুনি?

ঘুটু মাটির পানে চাহিয়া বলিল, কিছু নয়।

পিসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হয়েছে কিছু, একশো বার হয়েছে। তুই নিমের কপাল ফাটিয়ে দিয়েছিস, নইলে সোনার চাঁদ ছেলে, ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না, অমন পাড়া মাথায় ক'রে কাঁদতে কাঁদতে গেল কেন? বলি, তোমার চোখে জল দেন নি একচোখো ঠাকুর? গতর যে চুর হয়ে গেছে এদিকে! ভাব ক'রে একসঙ্গে খেলা করতে গিয়ে কতরকম বজ্জাতি শিখছ, আর ঐ ঢঙের কান্নাটুকু শিখে নিতে পার নি? এক কান্নাতে যে শত দস্যিবৃত্তি ঢাকা পড়বে, এ বুদ্ধিটুকু একচোখো ভগবান তোমায় দেন নি কেন? হাড় গুঁড়ো ক'রে দিলেও ওর মারে তোমার চোখে জল আসবে না তো, ও যে নিমাই-ভাই! চল হতভাগা, বাড়ি চল। আর এই দেখ কান্না আসে কি না, দেখ তবে—

কান্না না শিখিতে পারার জন্য এই নিদারুণ ধিক্কারের উপর গোটাকতক চড় খাইয়া ঘুটু ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিসীমা তাহাকে হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে বাড়ির দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। মন্তব্যের উগ্রতার সঙ্গে তাঁহার নিজের গলা এদিকে ধাপে ধাপে উঠিতেছে। সমস্ত পাড়াটা যেন একমুহূর্ত্তেই গমগম করিয়া উঠিল।

ঠিক গলি নয়, তবে রাস্তাটা অপরিসর। এই রাস্তার এক দিকে নিমাইদের বাড়ি, অপর দিকে ঘুটুদের। সামনাসামনি নয়, দুইখানা বাড়ির মাঝখানে খানচারেক অন্য বাড়ি আর একটা এঁদো ডোবা। ডোবাটার পিছনে নিমাইদের বাড়ি। রাস্তা হইতে নামিয়া কচু, আসশ্যাওড়ার পাতলা জঙ্গলের মধ্যে দিয়া পৌঁছিতে হয়।

নিমাইয়ের জেঠাইমা উঠানে বড়ি দিতেছিলেন, হাত থামাইয়া বলিলেন, যেন নিমাইয়ের গলা শুনছি না? দেখ তো রে বেরিয়ে।

অন্য কেহ বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি নিজেই বড়ির হাতে বাহির হইয়া আসিলেন। নিমাই রাস্তা ছাড়িয়া নীচে নামিয়াছে; জেঠাইমা দরজায় দাঁড়াইয়া একটু কান খাড়া করিয়া কি যেন শুনিলেন, তাহার পর গলা উঁচাইয়া প্রশ্ন করিলেন, বলি, আবার কি হ'ল? একদণ্ড আমায় তোরা সুস্থির হয়ে থাকতে দিবি কি না ভেঙে বল দিকিন?

নিমাই চীৎকারের সঙ্গে নাকী স্বর মিশাইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিল, লক্ষ্মীছাড়া ঘুটে, বেইমান, খাটান দেবে না; উলটে—

জেঠাইমার গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল, আবার তুই ঘুটুর সঙ্গে খেলতে গিয়েছিলি? যখনই নেত্য ঠাকুরঝির বাজখেঁয়ে গলা শুনেছি, তখনই ভেবেছি একটা কিছু ঘটেছে। তোকে না পইপই ক'রে বারণ করেছিলাম, ওরে নিমাই, ও আদুরে দুলালের কাছে যাস নি। তা শুনবে? আবার কান্না! বেরো, বেরো তুই; আর বাড়ি-মুখো হ'স নি।

নিমাই সেই রকম সুরেই খিঁচাইয়া উঠিল, ও আসে কেন ঘাড়ে

প'ড়ে? সেদো! সেদে ভাব ক'রে এসে খেলায় বেইমানি! বললে উলটে কামড়ে দেবে, খামচে রক্ত বের করে দেবে!

জেঠাইমা দুয়ার ছাড়িয়া হনহন করিয়া রাস্তার ধারে ডোবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেয়েদের কণ্ঠে সপ্তমের পরেও একটা পর্দ্দা আছে, সেই পর্দ্দায় গলা তুলিয়া বলিলেন, ওরে অলপ্পেয়ে, তুই যে জম্মেই মা খেয়ে ব'সে আছিস, তোকে কি একটা মনিষ্যির মধ্যে ধরে? তোকে তো করবেই সবাই পিটনে, তোকে না পিটলে ননীর হাতে সুখ হবে কি ক'রে? তোকে মারলে তো তার নালিশ নেই, তোর জন্মে তো আদালত নেই। চল বাড়ি, আমিও দিই ঘা কতক বসিয়ে। ঘুটু! ঘুটু না হ'লে ওঁর একদণ্ড চলে না। পইপই ক'রে বারণ করি, ওরে নিমে, যাস নি, তোর প্যাঁকাটির মত শরীর, তুই পেরে উঠবি নি ওসব দজ্জাল দাম্পাস্তাদের সঙ্গে, তা গরিবের কথা বাসী না হ'লে তো—

ঘুটুর পিসীমা ক্রন্দমান ভাইপোকে টানিতে টানিতে যখন বাড়ির রকে উঠিয়াছেন, নিমাইয়ের জেঠাইমার আওয়াজ হঠাৎ কানে গেল। থমকিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলেন, হাতের মুঠিটা আলগা হইয়া পড়ায় ঘুটু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পিসীমা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খানিকটা শুনিলেন, তাহার পর পা বাড়াইলেন।

ঘুটুর মা বলিল, ঠাকুরঝি, তুমি আবার এই দুপুর রোদ্দুর মাথায় ক'রে বেরিও না। অনামুখো ছেলে ঐ ক'রে বেড়াবে চোপোর দিন, গালমন্দ খাবে না তো কি করবে?

ঘুটুর পিসীমা চক্ষু কপালে তুলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যাহাতে ডোবার ধার পর্য্যন্ত আওয়াজটা অবলীলাক্রমে পৌঁছায় এইরূপ কণ্ঠে ঝঙ্কার করিয়া উঠিলেন, তুই বের করতে পারলি কথাটা মুখ দিয়ে বউ?

আটকাল না মুখে একটু? (নামিয়া অগ্রসর হইতে হইতে) ছিষ্টিধর ছেলে, সে হ'ল অনামুখো? তাকে পাড়ার শতেকখোয়ারীরা এই ঠিক দুপুরে খুঁড়বে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুনতে হবে আমায়? পরের ছেলের গতর দেখে ডাইনে! নিজের ছেলে হ'ল প্যাঁকাটি! সাতটা বাঘে খেতে পারে না, তা পড়বে নজর সেদিকে?

পিসীমা রাস্তার ধারে পৌঁছিয়া গেছেন। স্রোত সমানে বহিয়া চলিয়াছে, তা হবে প্যাঁকাটি, হবে, হবে, হবে, এই পাতোব্বাক্যে বলছি আমি। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া, বুড়ো মাগী কোমর বেঁধে এল ছেলে খুঁড়তে!

নিমাইয়ের জেঠাইমাও, 'তবে রে? যত মনে করি কিছু বলব না—' বলিতে বলিতে পুকুর-ধার ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া উঠিলেন, এবং এর পর উভয় পক্ষের ভাষা উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া যাহা দাঁড়াইল তাহা লিপিবদ্ধ করা চলে না। ক্রমে ঘুটুর পিসীমার সঙ্গে ঘুটুদের বাড়ির অন্য মেয়েছেলেরা আসিয়া যোগ দিল, নিমাইয়ের জেঠাইমারও দম্‌গলা পুষ্ট করিতে লাগিল নিমাইদের বাড়ির নানা বয়সের মেয়েরা মিলিয়া। উভয় দলই হাত-পা নাড়া ও উৎকট ভাষা প্রয়োগের ঝোঁকে এক রকম অজ্ঞাতসারেই অগ্রসর হইতে হইতে এক সময় খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িল এবং প্রত্যেকেই সাধ্যমত প্রতিপক্ষ দলে নিজের নিজের জোড়া বাছিয়া লইল। নিমাইয়ের পাঁচ বৎসর বয়সের ছোট ভাই এবং ঘুটুর চার বৎসরের ছোট ভাগ্নীর মধ্যে নানা প্রকারের ভেংচি কাটার বিনিময় হইতে লাগিল। ছেলেটি মধ্যে মধ্যে ধূলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, মেয়েটি বলিতে লাগিল, তোল বাবা ম'লে যাক, তোর মা ম'লে যাক।

ঘুটুদের ঝি খুব খরখরে—যেমনই ছড়া কাটায়, তেমনই হাত-পা নথ নাড়ায়। নিমাইদের ঝি কথার দিকে আদৌ গেল না, কোঁচড় পাতিয়া

দাঁড়াইয়া রহিল এবং ঘুটুদের ঝি অনেকক্ষণ বকিয়া গেলে মাঝে মাঝে এক এক বার 'এই নে, এই নে' বলিয়া কোঁচড়টা ঝাড়িয়া দিতে লাগিল; অর্থটা বোধ হয় এই যে, সে সমস্ত বাক্যবাণগুলি নির্ব্বিচারে ফিরাইয়া দিতেছে। এই প্রায়-নীরব প্রক্রিয়ায় ঘুটুদের ঝি যেরূপ দ্বিগুণিতভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে অনুমানটা বিশেষ মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না।

নিমাইয়ের জেঠাইমার পোষা বেড়ালটা কৌতূহলবশে সঙ্গে আসিয়াছিল, ঘুটুদের কুকুরটা তাহাকে তাড়া করিয়া গাছে তুলিয়া দিয়া আগলাইয়া রহিল।

প্রতিবেশিনীদের কয়েকজন আসিয়াও সদ্‌ভাব অসদ্‌ভাব মত যে যাহার দল বাছিয়া লইয়া ব্যাপারটিকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। বেচারামের মা নিমাইয়ের পিসীর পিঠটা চুঁচিয়া দিতে দিতে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া উপদেশ দিতে লাগিল, ওগো দিদি, চুপ কর, মাথা খাও আমার। কখনও কাউকে উঁচু কথা বল নি একটা, তুমি পেরে উঠবে না ও খাণ্ডাতের কাছে। তার ওপর আবার তোমার মাথার ব্যামো, বুকের ধড়ফড়ানি, কি আছে শরীরে তোমার ওদের শাপ-মন্যিতে? আমার মড়া মুখ দেখো, চুপ কর।

বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাইতেছে; দিদির উৎসাহ চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইতেছে।

ব্যাপার যখন চরমে, ঘুটুর বাবা নীরদ শনিবাবের আফিস ফেরত গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, ব্যাপারটা মোটামুটি একটা আন্দাজ করিয়া লইবার চেষ্টা করিল; তাহার পর

আটকাল না মুখে একটু? (নামিয়া অগ্রসর হইতে হইতে) ছিষ্টিধর ছেলে, সে হ'ল অনামুখো? তাকে পাড়ার শতেকখোয়ারীরা এই ঠিক দুপুরে খুঁড়বে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুনতে হবে আমায়? পরের ছেলের গতর দেখে ডাইনে! নিজের ছেলে হ'ল প্যাঁকাটি! সাতটা বাঘে খেতে পারে না, তা পড়বে নজর সেদিকে?

পিসীমা রাস্তার ধারে পৌঁছিয়া গেছেন। স্রোত সমানে বহিয়া চলিয়াছে, তা হবে প্যাঁকাটি, হবে, হবে, হবে, এই পাতোব্বাক্যে বলছি আমি। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া, বুড়ো মাগী কোমর বেঁধে এল ছেলে খুঁড়তে!

নিমাইয়ের জেঠাইমাও, 'তবে রে? যত মনে করি কিছু বলব না—' বলিতে বলিতে পুকুর-ধার ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া উঠিলেন, এবং এর পর উভয় পক্ষের ভাষা উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া যাহা দাঁড়াইল তাহা লিপিবদ্ধ করা চলে না। ক্রমে ঘুটুর পিসীমার সঙ্গে ঘুটুদের বাড়ির অন্য মেয়েছেলেরা আসিয়া যোগ দিল, নিমাইয়ের জেঠাইমারও দম্‌গলা পুষ্ট করিতে লাগিল নিমাইদের বাড়ির নানা বয়সের মেয়েরা মিলিয়া। উভয় দলই হাত-পা নাড়া ও উৎকট ভাষা প্রয়োগের ঝোঁকে এক রকম অজ্ঞাতসারেই অগ্রসর হইতে হইতে এক সময় খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িল এবং প্রত্যেকেই সাধ্যমত প্রতিপক্ষ দলে নিজের নিজের জোড়া বাছিয়া লইল। নিমাইয়ের পাঁচ বৎসর বয়সের ছোট ভাই এবং ঘুটুর চার বৎসরের ছোট ভাগ্নীর মধ্যে নানা প্রকারের ভেংচি কাটার বিনিময় হইতে লাগিল। ছেলেটি মধ্যে মধ্যে ধূলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, মেয়েটি বলিতে লাগিল, তোল বাবা ম'লে যাক, তোর মা ম'লে যাক।

ঘুটুদের ঝি খুব খরখরে—যেমনই ছড়া কাটায়, তেমনই হাত-পা নথ নাড়ায়। নিমাইদের ঝি কথার দিকে আদৌ গেল না, কোঁচড় পাতিয়া

দাঁড়াইয়া রহিল এবং ঘুটুদের ঝি অনেকক্ষণ বকিয়া গেলে মাঝে মাঝে এক এক বার 'এই নে, এই নে' বলিয়া কোঁচড়টা ঝাড়িয়া দিতে লাগিল; অর্থটা বোধ হয় এই যে, সে সমস্ত বাক্যবাণগুলি নির্ব্বিচারে ফিরাইয়া দিতেছে। এই প্রায়-নীরব প্রক্রিয়ায় ঘুটুদের ঝি যেরূপ দ্বিগুণিতভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে অনুমানটা বিশেষ মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না।

নিমাইয়ের জেঠাইমার পোষা বেড়ালটা কৌতূহলবশে সঙ্গে আসিয়াছিল, ঘুটুদের কুকুরটা তাহাকে তাড়া করিয়া গাছে তুলিয়া দিয়া আগলাইয়া রহিল।

প্রতিবেশিনীদের কয়েকজন আসিয়াও সদ্‌ভাব অসদ্‌ভাব মত যে যাহার দল বাছিয়া লইয়া ব্যাপারটিকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। বেচারামের মা নিমাইয়ের পিসীর পিঠটা চুঁচিয়া দিতে দিতে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া উপদেশ দিতে লাগিল, ওগো দিদি, চুপ কর, মাথা খাও আমার। কখনও কাউকে উঁচু কথা বল নি একটা, তুমি পেরে উঠবে না ও খাণ্ডাতের কাছে। তার ওপর আবার তোমার মাথার ব্যামো, বুকের ধড়ফড়ানি, কি আছে শরীরে তোমার ওদের শাপ-মন্যিতে? আমার মড়া মুখ দেখো, চুপ কর।

বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাইতেছে; দিদির উৎসাহ চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইতেছে।

ব্যাপার যখন চরমে, ঘুটুর বাবা নীরদ শনিবাবের আফিস ফেরত গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, ব্যাপারটা মোটামুটি একটা আন্দাজ করিয়া লইবার চেষ্টা করিল; তাহার পর

ভগ্নীর কাছে গিয়া অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে, এত গোল কিসের ?

বেটাছেলের আগমনে কলহটা একটু থামিয়া গেল।

ঘুটুর পিসী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কিছু হয় নি, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে। আমি উঠতে বসতে এ রকম গালমন্দ আর সহ্য করতে পারব না। তাও যত পারে না হয় আমায় দিক, ঐ দুধের ছেলেটার ওপর নজর কেন ? ঠাকুর-দেবতার দোর ধ'রে কোন রকমে টেকে আছে, তা ডাইনীদের বুক করকর করছে, একটা অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বে না। তার আগে দে আমায়—

নীরদ অধৈর্য্যভাবে বলিল, আঃ, কে কি বলেছে, তাই বল না।

নিমাইয়ের জেঠাইমা চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, গলাটা একটু আগাইয়া সুর তুলিলেন, বলেছি আমি। বলব, একশো বার বলব, হাজার বার বলব, আমার ঐ হাজা-মরা একটা গুঁড়ো, আছে কি নেই, সে হ'ল পালোয়ান, তার হাতীর মতন গতর, তাকে সাতটা বাঘে খেতে পারে না—

নীরদ আবার প্রশ্ন করিল, কিন্তু উঠল কি ক'রে এসব কথা ? কি জ্বালা !

নিমাইয়ের জেঠাইমা বলিল, যা ক'রে চিরকাল ওঠে, ঝগড়া করবার জন্যে যদি কেউ কোমর বেঁধে ব'সে থাকে। হয়েছে ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া ; গুলি খেলতে খেলতে নিমেকে দুব্বল পেয়ে তোমার ঐ আদুরে গোপাল—

নীরদ অধৈর্য্যভাবে বলিয়া উঠিল, তা দেন কেন আসতে আপনার ছেলেকে—ছেলে যদি এতই ক্ষীণজীবী ?

নিমাইয়ের জেঠাইমা নীরদের পানে চাহিয়া চীৎকার করিয়া, 'ওরে

আমার—' বলিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া গিয়া হনহন করিয়া নিজেদের বাড়ির দিকে আগাইয়া গেলেন এবং দরজার দিকে হাত দুইটা বাড়াইয়া গলা ছাড়িয়া দিলেন, বলি অ মেনী-মুখো! বাড়িব মেয়েছেলে যে দাঁড়িয়ে অপমান হচ্ছে গুণ্ডোর হাতে, বেরিয়ে দেখতে পার না? শুধু যে মারতে বাকি রাখলে! বাড়ির মধ্যে কনে-বউয়ের মত ঘোমটা দিয়ে ব'সে থাকলে সে ঘোমটা খোলবার মুখ থাকবে না যে চিরজন্মে!

কথাগুলা নিমাইয়ের বাপ রসময়কে উদ্দেশ করিয়া বলা, তাহার চেহারা দেখা না গেলেও। রসময় সেই প্রকৃতির জীব, যাহাদের লেজে মোচড় না দিলে চাড় হয় না; তবে একটু মোচড় পড়িলেই যাহারা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠে। লোকটা দুয়ারের আড়ালে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল ও ঘুটুর পিসীমার সামনে বাহির হওয়া সমীচীন হইবে কি না চিন্তা করিতেছিল, ভাজের ধিক্কারে বাংলা ছাড়িয়া একেবারে হিন্দী মুখে করিয়া বাহির হইয়া আসিল, কিস্‌কা বুকের পাটা হুয়া হ্যায় যে অপমান করেঙ্গা!

ঘুটুর পিসীমা খপ করিয়া ভাইয়ের ডান হাতটা ধরিয়া তাহাকে মেয়েদের দলের মধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, ওরে নীরু, চ'লে আয়, ও গুণ্ডোর সামনে দাঁড়াস নি, যে ভাবে তেড়ে আসছে! আমার অদৃষ্টে যে কি আছে!

হেঁচকা টানে নীরদ মেয়েদের দলের খানিকটা ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছিল, গা-ঝাড়া দিয়া বাহির হইতে হইতে বলিল, ওর মত দশটা গুণ্ডা আসুক, নীরে চাটুজ্জে একলা তাদের মোহড়া নেবে। বোঝা নেই সোঝা নেই, তুই যে মেয়েদের কথায় বিশ্বাস ক'রে—

রসময় আগাইয়া আসিয়া শীর্ণ বুকটা ফুলাইয়া বলিল, আগে একটার

মোহড়া সামলা নীরে, মেয়েদের দলে ঢুকে সেখান থেকে আস্ফালন করা পুরুষের কাজ নয়।

দুই একটা এই ধরনের আলাপের পরই জমিয়া গেল। এক দিকে বোন আর এক দিকে ভাজ গোড়া থেকেই এমন দক্ষতার সহিত চালাইয়া গেল যে, মূলে যে ওরূপ উৎকট কলহের কিছুই নাই সেটা না রসময় না নীরদ কাহাকেই ভাল করিয়া বুঝিবার অবসর দিল না। দুইটা পরিবারই একটু কলহপ্রিয় ও কলহে দক্ষ, অল্প সময়েই নূতন পুরানো বহু কুৎসাকাহিনী একত্র হইয়া তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল।

প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়িয়া হাতাহাতিটা বন্ধ করিল, কয়েকজন নীরদকে এবং কয়েকজন রসময়কে নানা রকম নীতিবাক্যে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে এক রকম ঠেলিতে ঠেলিতেই বাড়ির দিকে লইয়া গেল। যতক্ষণ দেখিতে পাইল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরস্পরকে শাসাইতে শাসাইতে তাহারা নিজের নিজের বাড়িতে গিয়া উঠিল।

জের কিন্তু মিটিল না। দুই বাড়িরই গর্জ্জানি, আফসানি তখনও পুরা মাত্রায় চলিয়াছে। ঘুটুর পিসীমা কোট ধরিয়াছেন, হয় এ অপমানের বিহিত করা হোক, নয় তাঁহাকে কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হোক। নিমাইয়ের জেঠাইমা অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন। নীরদ বলিতেছে, জান কবুল, এর শোধ লইবে তবে তাহার নাম নীরদ। রসময় বলিতেছে, আজ কোন রকমে ফাঁড়াটা কাটিয়া গেল বলিয়া নীরে যেন নিশ্চিন্ত না হয়।

যাহারা নীতিবাক্য প্রয়োগে ব্যাপারটা থামাইয়াছিল, তাহারা রাত্রে আবার উপস্থিত হইল। দুই বাড়িতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া স্থির হইল, ইহার একমাত্র উপায় আদালত।

নীরদের শুভার্থীরা ফৌজদারির ব্যবস্থা দিল। রসময়ের শুভার্থীরা দিল মানহানির পরামর্শ। সাক্ষী-সাবুদ সব ঠিক হইয়া গেল।

৪

পরদিন দুপুর-বেলার কথা। নিমাই একটা মোটা খাতা কোলে করিয়া কি লিখিতেছে, একটা চাপা আওয়াজ হইল, নিমে!

ঘরের পিছনেই আগাছার ঘন জঙ্গল। নিমাই ঘুরিয়া দেখিল, জঙ্গলের মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিয়া জানালার কাছে ঘুটু। এমন কিছু অনভ্যস্ত দৃশ্য নয়, খুব বিস্মিত হইল না। ফিসফিস করিয়া প্রশ্ন করিল, এলি কি ক'রে?

পূর্ব্ববৎ উত্তর হইল, বাবা বেরিয়ে গেছে গুপী মোক্তারের কাছে মোকদ্দমার সলা করতে। পিসীমা ক্ষারী গয়লানীর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ক্ষীরী কাল তোদের দলে ছিল কিনা। লুকিয়ে পালিয়ে এলাম। খেলবি?

না।—বলিয়া নিমাই গোঁজ হইয়া খাতায় মন দিল।

ঘুটু প্রশ্ন করিল, রাগ করেছিস?

না, করবে না রাগ! হেরে গিয়ে খাটান দেবে না, তার ওপর পেটে কামড়ে দাগ পড়িয়ে দেবে! যা বলছি, নইলে জেঠাইমাকে ডাকব এক্ষুনি। ও জেঠাইমা! এই দেখ—

ঘুটু সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঝোপের মধ্যে নামাইয়া লইল। একটু পরেই পাতার মসমসানিতে বোঝা গেল, সে ফিরিয়া যাইতেছে। নিমাইয়ের মুখে একটু হাসি ফুটিল। খাতা ছাড়িয়া জানালার কাছে উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, ঘুটু!

ঘুটু ফিরিয়া তাকাইতে হাসিয়া বলিল, শোন, ভয় পেয়ে গেলি? জেঠাইমা কোথায়? সে বাবাকে নিয়ে দাসু উকিলের কাছে গেছে। বাবা বড্ড চটেছে কিনা তোদের ওপর, খিক-খিক-খিক—

ঘুটু বলিল, খেলবি তা হ'লে? না হয় কালকের খাটান দিয়েই আরম্ভ করব।

নিমাই একবার খাতার দিকে চাহিয়া নিরুৎসাহভাবে কহিল, না ভাই, হবে না। ফিচলেমি বুদ্ধি বাবার, কুড়িটা অঙ্ক দিয়ে বসিয়ে গেছে, এসেই দেখবে। মানে, কোথাও যাতে না বেরুই আর কি। একে অঙ্ক আসেই না আমার—

অঙ্কের জন্য আটকাইল না। ঘুটু অঙ্কে হুঁশিয়ার, জানালার মধ্য দিয়া খাতাটা লইয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে টকটক করিয়া অঙ্কগুলা কষিয়া দিল। নিমাই নকল করিয়া লইল।

এ পাড়ায় সম্ভব নয়, ও পাড়ায় গিয়া রাধারমণের মন্দিরটার পিছনে গিয়া খেলা ঠিক হইল।

যাইতে যাইতে ঘুটু পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়া বাহির করিল। নিমাইয়ের নাকের কাছে ধরিয়া প্রশ্ন করিল, কি বল তো?

নিমাই নাকটা কুঞ্চিত করিয়া দুই তিন বার ঘ্রাণ লইল, তাহার পর হাসিয়া, চোখ বড় করিয়া প্রশ্ন করিল, কোথায় পেলি রে?

ঘুটু মোড়াটা খুলিয়া আমের গোটা পাঁচেক টক-মিঠে আচারের বড় বড় ফালি মেলিয়া ধরিল, গুড়ে মসলায় দিব্য নধরকান্তি। বলিল, খা, পিসী ছাদে শুকোতে দিয়ে ক্ষীরীমাসীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেল। ভাবলাম, নিমের জন্যে এই তালে গোটাকতক সরাই। তুই ভালবাসিস কিনা—

এক কামড়ে অর্দ্ধেকটা মুখে পুরিয়া নিমাই অম্লরসে মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, তোর পিসীর আচারের হাত খুব মিষ্টি।

ঘুটু একটা নিজের মুখে পুরিতে যাইতেছিল, হঠাৎ নিমাইয়ের দিকে একটু ঝুঁকিয়া কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে বলিয়া উঠিল, কিন্তু গলা?

কথাটায় কি ছিল, দুইজনেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আসিয়া পড়িয়াছে। আচার কয়টা কাগজে জড়াইয়া মন্দিরের রকে রাখিয়া উভয়ে ট্যাঁক হইতে গুলি বাহির করিল।

ওপাড়ায় যে ঝগড়ার আওয়াজটা শুনা যাইতেছিল, সেটা হঠাৎ খুব উগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আঁটি ছাড়িতে ছাড়িতে ঘুটু আর একবার হঠাৎ তেমনই ভাবে নিমাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু গলা?

দুজনেই আবার ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতেই নিমাই রাগ দেখাইয়া বলিল, খবরদার, হাসিয়ে অন্যমনস্ক করিয়ে দিও না বলছি ঘুটু, ভাল হবে না। এ—ই নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু—আমি ফাষ্ট—এগিয়ে আছি—

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এ. আর. কি.

হায় হায় হায় কাণ্ড একি,　　সারাটা ব্রহ্মাণ্ড মেকি,
ভবানীময় ভাণ্ড দেখি—　　সাবাস্ অষ্টরম্ভা!
ফাঁকির উপর সৃষ্টি চলে,　　ফসল ফলে বৃষ্টিজলে,
মাড়াই হয়ে কৃষ্টি-কলে　　চ্যাপ্টা যে হয় লম্বা।
পারি না আর সং সাজিতে,　　নইলে সেরেফ দমবাজিতে
মেনকা কি রম্ভা জিতে　　আনতে পারি মর্ত্ত্যে;
কিন্তু তাতে ঝক্কি ভারী,　　দেব্‌তা হ'লেও লক্ষ্মীছাড়ী—
দুনিয়াটাই ফক্কিকারী;　　চল সেঁধোই গর্ত্তে।

ইতিহাস

কালো পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে সাদাটে নদী
যেমন নেমে আসে কালো চোখ থেকে সাদা অশ্রু
কেউ জানে না তার নাম, কেউ দেখে নি তার উৎস,
কিন্তু সবাই জানে
এ নদী গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত
সব ঋতুতেই সমান মোটা, অথবা সমান রোগা ;
সমান গভীর, অথবা সমান অগভীর ;
আর জানে মিশে আছে এই নদীর স্রোতের সঙ্গে—
একটি অতি-করুণ ইতিহাস।

কালো পাহাড়ের তলায় ছোট্ট একটি পাড়াগাঁ
(এত ছোট যে 'গাঁ'-কে স্রেফ বাদ দিলেও চলে)।
এই পাড়াগাঁর বাসিন্দারা
এই পাহাড়ের মতই কালো আর মজবুত—
মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সবাই।
এ গাঁয়ের ধারেই গিয়েছিলাম বেড়াতে
উদাস মনটাকে আরও উদাস করবার জন্যে—
কারণ এক একটা সময় আসে
যখন স্পষ্ট পৃথিবীটাকে ঝাপসা দেখতে ভাল লাগে,
হাসির চোখে অশ্রুর চশমা পরাতে ইচ্ছে করে,
রাত-দুপুরের ক্লাইভ স্ট্রীটের আড়ালে ঢাকতে চাই
দিন-দুপুরের ক্লাইভ স্ট্রীটকে।

এখানে রূঢ় বাস্তব নীরবে কাঁদে
কল্পনার কানমলা খেয়ে ;
শুধু পথ চলতে চলতে পাথরে হোঁচট খেয়ে
হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়—
আবার কানমলা খায়, আবার কাঁদে।
এ গাঁয়ের তিনু সর্দ্দার বৃদ্ধতম বাসিন্দা
তার কাছেই নদীর সঙ্গে জড়ানো ইতিহাস
জানতে চাইলাম।
বুড়োর চোখ ছলছল ক'রে উঠল,
অতীতের ঝাপসা আলো তার বর্ত্তমান চোখে
পরশ লাগিয়ে গেল আচমকা,
বুক থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস।
করুণ ইতিহাসটুকুর কারুণ্য যে অতি গভীর হবে
সেটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে
চেয়ে রইলাম বুড়োর ব্যথিত মুখের দিকে।
বুড়ো যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেল ;
তারপর ফের দম নিয়ে বললে :

"আধমরা শুকনো বোঁটায়
গোলাপ ফোটাবার চেষ্টা ক'রে লাভ কি বাবু ?
আপনাদের শহরে একবার গিয়েছিলাম ;
শুনেছিলাম কাচের পিলেটে নাকি
ফোটোগেরাপের ছবি তোলা হয়,
পিলেট থেকে ফের ছবি ওঠে কাগজে।

আমার মনের পিলেটেও বাবু,
ফোটোগেরাপ উঠে রয়েছে আপনিই ;
কিন্তু আপনার কাগজে
আমার পিলেটের ছবি তুলে দেব,
এমন ক্ষ্যামতা আমার নেই বাবু।
ছবি খারাপ ক'রে ফেলে
পাছে আসল ছবির অপমান ক'রে ফেলি
এই ভয় হয়।
আমায় দয়া ক'রে মাপ করবেন,
আপনি বরং ঝগড়ুর কাছে একবার যান।
চেনেন না ঝগড়ুকে ?
চেনার দরকার নেই—
ঐ যে নদীর ওপাশে একখানা আধভাঙা ঘর,
ওরই ভেতরে ঝগড়ু শুয়ে আছে।
নাম ধ'রে ডাকলেই বেরিয়ে আসবে 'খন।
ওর কাছেই সব জানবেন—
ও ছোঁড়া যেমন ক'রে কালোকে কালো
আর সাদাকে সাদা বলতে পারে
তেমন আর কেউ পারে না।
আপনি একবার ঝগড়ুর কাছে যান।"
তিনু সর্দ্দার ময়লা কাপড় দিয়ে
একবার চোখ মুছে বিদায় নিলে।
রোগা নদী পেরিয়ে গেলাম
যেখানটায় ছিল আহাঁটু জল।

ঝগড়ু ব'লে ডাকতেই আধ-ভাঙা ঘর থেকে
পুরো আস্ত ঝগড়ু এমন ক'রে বেরিয়ে এল
যেন না ডাকলেও আসত।
এমন ভীম প্যালোয়ান
যে, এ লোক শুয়ে ছিল বিশ্বাস হয় না,
মনে হয় নিশ্চয় কুস্তি লড়ছিল—
যেন চব্বিশ ঘণ্টা কুস্তি লড়বার জন্যেই এর সৃষ্টি।
এই লোকের কাছ থেকে করুণ ইতিহাস
শুনতে হবে ভেবে
মনটা অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠল—
হিটলারের কাছে শুনব শ্রীচৈতন্য-চরিত ?
ঝগড়ু ঝগড়া করবার ভঙ্গিতে বললে
"কি চাই বাবু ?"
জানিয়ে দিলাম মনোবাঞ্ছা।
বললে, "বুড়ো সর্দার পাঠিয়েছে বুঝি ?"
বললাম, "হ্যাঁ।"
বললে, "আগেই বুঝেছিলাম আমি।
বুড়ো সব্বাইকে আমারই কাছে পাঠিয়ে দেয় ;
অথচ পইপই ক'রে তাকে বারণ ক'রে দিয়েছি,
আর কাউকে যেন আমার কাছে পাঠায় না।
অত ইয়ে থাকে তো নিজে বললেই তো পারে।
ঝগড়ু শালাকে কেন জ্বালাতন করা মিছিমিছি ?"

বললাম, "তোমার মত নাকি কালোকে কালো
আর সাদাকে সাদা—

"ধেৎ তেরি সাদাকে সাদা" ব'লে ঝগড়ু
ছুঁড়ে মারল মস্ত একখণ্ড পাথর
নদীর ওপারে।
তারপর হঠাৎ বিনয়ে তরল হয়ে—
"রাগ করবেন না বাবু। কিন্তু কি জানেন—
ঐ তিমু সর্দ্দার সব কিছু নিজে এড়িয়ে যেতে চায়,
এটা সহ্য হয় না।
তা—আপনি যখন এসেছেন,
তখন একেবারে ফিরিয়ে দেওয়াটা ভাল দেখায় না।
আসুন তা হ'লে বসা যাক ঐ গাছতলায়,
রোদে আপনি বড্ড ঘেমে উঠেছেন।"

কি একটা নাম-না-জানা গাছের তলায়
বসলুম আমি আর ঝগড়ু।

বলতে লাগলো ঝগড়ু :

"ইতিহাস আপনাকে বলতে পারি আমি,
কিন্তু তার আগেও কিছু বলা দরকার।
এক হিসেবে তিমু সর্দ্দার ঠিকই করে,
কি হিসেবে জানেন?

সব কথা সবাইকে বলতে নেই
একথা সর্দ্দার জানে,
কিন্তু বোঝে না কোন্ কথা কাকে বলতে হবে
আর কোন্ কথা কাকে বলা ঠিক নয়।
এ জিনিসটা তার চাইতে আমি ভাল বুঝব
এটা বিশ্বাস করেই সে
আমার কাছে আপনাকে পাঠিয়েছে।
আপনাকে আমি বাজিয়ে নিতে চাই।”

আমার মন থর থর করে কাঁপতে লাগল,
মনের কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ল শরীরে,
কিন্তু ভাবটা এমন দেখাতে লাগলুম
যেন পাহাড়ী হাওয়া
আমার অ-পাহাড়ী শহুরে দেহে সয় না।
ভাবলুম
ইসিহাস শুনতে না এলেই ভাল হত হয় তো।
ঝগড়ু বললে,
“প্রথমে বলুন আপনি কি ?
এই পাহাড়ী নদীর গপ্‌পো শুনতে
আপনার এত ইয়ে কেন ?”

বললাম, “আমি কবি বিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।
আগে লিখতাম পদ্যে।

এখন পদ্য জিনিষটা কবিতায় অচল হয়ে যাচ্ছে বলে
গদ্যে লিখছি।
আমি বাংলার ঠিক ওয়াল্ট হুইটম্যান নই,
টি. এস. এলিয়টও নই,
কিন্তু—অর্থাৎ আমি ঠিক আমিই,
যদিও রোমান্টিক যুগের ইংরেজ
এবং সাম্প্রতিক ইঙ্গ-আমেরিকান্—"

"দাঁড়ান, মুংরীকে ডাকি",
হঠাৎ বলে উঠল ঝগড়ু,
"আমি আপনার সঙ্গে জুৎ পাব না।
ও ছুঁড়ী আপনাকে বুঝলেও বুঝতে পারে।"
বুঝলুম, অতটা আত্মহারা হয়ে ভালো করি নি—
ঝগড়ুর পক্ষে বোঝা-অসম্ভব কথা বলে
ঝগড়ুকে বিগড়ে দিয়েছি।
দেখা যাক মুংরী কি করে।

আনমনা হয়ে হঠাৎ শুধালাম, "মুংরী কে?"
ঝগড়ু বললে, "যার সাথে আমার সাদী হবে।
ঐ ঝোপের ভেতর সে কাঠ কাটছে।
আপনি বরং আসুন আমার সঙ্গে।"

ঝগড়ুর সঙ্গে ঝোপের ভিতর ঢুকলাম।
এতটা এগিয়েছি, আর ফিরবার উপায় নেই—
আমি ইতিহাসকে না জানলেও ইতিহাস আমাকে জানবেই।

* * *

মুংরী বললে, "তুই তাহলে কাঠগুলো নিয়ে যা,
আমি বাবুকে গপ্‌পো শোনাই।"
কাঠ নিয়ে গেল ঝগড়ু,
রইলাম আমি আর মুংরী
অথবা মুংরী আর আমি।
মুংরীর কণ্ঠ ঠিক ঠুংরী গানের মত পাৎলা নয়,
ধ্রুপদ গানের মত ভারী।
ভয় হতে লাগল, আমার কথা যেন
ওর কথার পাশে মেয়েলী শোনাবে।
বললে, "আমার কাছে এলি কেন বাবু?"
বললাম, "এই নদীর গপ্‌পো শুনতে।"
মুংরীর কালো হরিণ চোখ দুটি
সহসা করুণ হয়ে ছল ছল করে উঠল
যেন এখনি অশ্রুর প্লাবন নামবে—
অথচ নামল না।
বললে, "ঝগড়ু বুঝি বলতে চাইল না?
জানি যে চাইবে না—ওর রকমই এই।
সবাইকে ও আমারি কাছে পাঠিয়ে দেয় গপ্‌পো শুনতে।"
মনে মনে শুধালাম, "তুমি পাঠাবে কার কাছে?"
মুংরী বলল, "তোকে কে বলল বাবু,
যে এ নদীর একটা গপ্‌পো আছে?"
বললাম, "কে বলেছে তা ঠিক খেয়াল নেই।"
মুংরী বললে, "তা আমি জানতাম।"
বলে নীরব রইল সেকেণ্ড কয়েক।

এই কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে দেখলাম মুংরীর দিকে।
নিটোল, নিখুঁত, পাথরে খোদাই করা দেহ,
নারীত্ব আর পৌরুষের অপরূপ মিশ্রণ—
দেখে বিস্ময় জাগল, জাগল শ্রদ্ধা।
চোখে তার পৌথিক বিত্থার চকমকি ছিল না,
ছিল প্রকৃতির নিজস্ব আলো
যার ঝলসানিতে ধাঁধিয়ে গেল আমার মন।
বললে, "ভেবেছিলাম তোকে মনুয়ার কাছে পাঠাব।
কিন্তু মনুয়া হয় তো আবার পাঠাবে ভিখুর কাছে,
ভিখু আবার পাঠাবে মঙ্গু না বোচার কাছে কে জানে?
এম্নি করে তোর রাত হয়ে যাবে বাবু,
কিন্তু জানা হবে না কিচ্ছু,
হয়রান হবি খামোকা।
তাই যা বলবার আমিই তোকে বলি—
কিন্তু খবরদার, এ গোপন কথা কাউকে বলিস নি যেন,
এমন কি ঝগড়ুকে না, তিনু সর্দ্দারকেও না।
বল, দিব্বি কর গোপন রাখবি?"
দিব্বি করলাম—ওর কথামত মা কালীর দিব্বি।
হঠাৎ মুংরী শুধাল,
"আমার কথা তোকে ঝগড়ু কিছু বলেছে?"
বললাম, "বলেছে বটে।"
"আমায় সাদী করবে এই কথা তো?"
বললাম, "হ্যাঁ।"
মুংরী বললে, "আগেই জানতাম।

সবাইকে ও একই কথা বলে।
কিন্তু আমি যতবারই ওর কাছে
এই নদীর গপ্‌পো জানতে চেয়েছি
ততবারই ওর চোখ জলে ভরে এসেছে,
অথচ গপপো সে আমায় বলে নি।
তিনু সর্দ্দার, ভিখু, মনুয়া—সবাই ঐ—
চোখ ছলছল করে, অথচ গপপো বলে না।"

ভাবলাম, মুংরীও কি তেম্নি কিছু করবে ?
অথবা মুংরী হয় তো—ইত্যাদি।
মুংরী বললে, "আমার কিন্তু কি মনে হয় জানিস ?
আসলে হয় তো এ নদীর কোন গপ্‌পো নেই—
না হয় তো আছে, কিন্তু এরা কেউ জানে না,
তবু জানে না যে সেটা জানাতে চায় না,
আর ঝুটো গপ্‌পোকে খাঁটি গপ্‌পো বলেও চায় না চালাতে।
এই নদীর ধারে দাঁড়িয়ে গপ্‌পোর কথা ভেবে কাঁদা,
এ যেন একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে,
সবাই তাই করে।
সত্যি, আমিও জানি না এ নদার গপ্‌পো,
তবু এর ধারে দাঁড়িয়ে আমিও চোখ মুছি,
মুছে আরামও পাই।
আকাশে মেঘ ছেয়ে আসছে,
সন্ধ্যে নাম্‌তেও দেরী হবে না বেশী।
তুই এখন চলে যা বাবু,

আমার বিশ্বাস যদি মানিস—
এ নদীর কোনো গপ্‌পো নেই।”

মুংরী বিদায় নিয়ে চলে গেল—
যাবার আগে বার দুয়েক মনে করিয়ে দিয়ে গেল
যে গোপন কথাটি সে বলে গেল
তা যেন আমার মনেই গোপন থাকে।
ফেরার পথে ফের পার হতে হল নদীটা,
যেখানে আহাঁটু জল।
মুংরী যাই বলুক না,
এই অগভীর নদীর সঙ্গে জড়ানো আছে
একটা গভীর ইতিহাস—
মন আমার এ কথাটাই বার বার
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে লাগল।

নাই বা কেউ জানল,
নাই বা আমি জানলাম—
তবু সন্ধ্যাভাসের আবছায়ায়
চোখ দুটি আমার ছলছলিয়ে উঠল
সেই না-জানা ইতিহাসের কথা ভেবে।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

অদৃষ্ট

তুলো আর গ্লিসরিন, বালি আর বস্তার।
বেঁচে যদি পারি যেতে, বেঁচে যাব সস্তায়।

বৈরাগ্য

না:, আর পারা যায় না। সংসারের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। মানুষ তো? কত আর সহ্য করিতে পারা যায় বলুন তো? এই যে একঘেয়ে বিশ্রী রকমের জীবন চলিতেছে, কবে যে ইহার শেষ হইবে, ভগবান জানেন। আহা, যদি একটু শান্তি পাইতাম!

কিন্তু বিধাতা নেহাতই বিরূপ আমার উপর। আমার গৃহিণী, যত তাঁহার বয়স বাড়িতেছে, ততই প্রচণ্ডা হইতেছেন, এবং বর্ত্তমানে একেবারে রণরঙ্গিনী হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি আমার তামাক খাওয়াটা পছন্দ করেন না। ওটা নাকি বদ নেশা এবং বাজে খরচ। অথচ তিনি চব্বিশ ঘণ্টাই দোক্তাসহযোগে তাম্বূল চর্ব্বণ করেন, এবং ইদানীং তাঁহার জিহ্বা এবং দন্তরাজি এরূপ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে যে, মা কালীকেও তাহা হার মানাইয়াছে। কিছু বলিবার উপায় নাই; বলিলে, খড়্গ-হস্তা হইয়া আমার বুকের উপর তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করিয়া দিবেন। কাজেই চুপ করিয়া থাকি, এবং মধ্যে মধ্যে পাশের বাড়ির বৃন্দাবনবাবুর নিকট যাইয়া তামাকপর্ব্বটি সারিয়া আসি।

ইহার উপর আছে ছেলেমেয়ের দল। এ বিষয়ে আমার গৃহিণী মুক্তহস্তা, তাঁহার কৃপায় বাড়িতে অপোগণ্ডের দল এত ভারি যে কান পাতিয়া থাকা দায়। কাল ছোট ছেলেটা বোতামের 'সেট'টি হারাইয়া ফেলিয়াছে। সোনার বোতাম, টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম। অফিস যাইবার সময় আবিষ্কার করিলাম, সেটি অন্তর্হিত হইয়াছে। ছেলেদের ধমক দিয়া জানিলাম আমার কনিষ্ঠ ছেলেটি নাকি বোতাম লইয়া খেলা করিতেছিল, তাহার পর কোথায় রাখিয়াছে,

মনে নাই অথবা জানে না। বুঝিলাম, সময় নষ্ট করা বৃথা, আর জানা যাইবে না। ইচ্ছা হইল, একটি চড় দিয়া উহার খেলা ঘুচাইয়া দিই। কিন্তু উহার ক্রন্দনে গৃহিণী ছুটিয়া আসিবেন, এবং তাহার পর যে কি অধ্যায় শুরু হইবে, তাহা মনে পড়িতেও ভয় হইল। সুতরাং রাগটা সামলাইয়া উন্মুক্ত বক্ষ লইয়াই গৃহিণীর নিকট যাইয়া একটা 'সেফটি পিন' চাহিলাম। তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইল। বোতাম কোথায়, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। ভয়ে ভয়ে ছোট ছেলেটির কীর্ত্তি জানাইলাম। তিনি কিন্তু বিশ্বাস করিলেন না। এটি যে আমার অসাবধানতার জন্যই হারাইয়াছে, এবং আমি যে একটি অপদার্থ তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং আমি যে একটি নিরপরাধ শিশুর স্কন্ধে এই দোষ চাপাইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হই নাই, এজন্য বারবার ধিক্কার দিলেন। প্রতিবাদ করিলাম না; অফিসের বেলা হইতেছে। চুপ করিয়া চলিয়া আসিলাম।

কিন্তু আজ অসহ্য হইয়াছে। কে কাহার, এই সংসারে? কেহই অন্যকে সঠিক বুঝিতে পারে না। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর! আমি নিরীহ বেচারি, আমার উপরই এত হম্বিতম্বি! দেখুন দিকি, গৃহিণীর দোক্তার কৌটা লইয়া আমি কি করিব? দামী জিনিসও এমন কিছু নহে যে বিক্রী করিয়া 'রেস্' খেলিয়াছি। অতি সাধারণ পয়সা আষ্টেকের একটা জার্ম্মান সিলভারের কৌটা। হয়তো ছেলেমেয়েদের কেহ হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু গৃহিণী বলেন—আমার দোষেই নাকি হারাইয়াছে, কারণ আমিই ছেলেমেয়েগুলিকে আশ্‌কারা দিয়া এত বাড়াইয়াছি। মজাটা দেখুন একবার,—সামান্য কৌটা হারানোতেই এই কাণ্ড; আর সেদিন যে আমার বোতাম হারাইয়া গেল, তাহার জন্য আমিই উল্টা বকুনি খাইলাম।

তারপর অফিসে বড়বাবু এবং সাহেবের সম্ভাষণ আর শিষ্টালাপ তো আছেই। কেরানীদের পক্ষে ওটা নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু কাল অফিস ফেরত বাসায় পৌঁছিয়া যখন দেখিলাম, আমার পুত্র-কন্যারা মহোৎসাহে কালীপূজার অভিনয় করিতেছে, গৃহিণী গর্জ্জন করিতেছেন, এবং কনিষ্ঠ পুত্রটি তাঁহারই হাতের প্রহার পাইয়া তার-স্বরে চীৎকার করিতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই আমার অফিস-ক্লান্ত মনটা নিতান্তই বিগড়াইয়া গেল। দুত্তোর সংসার! কিসের জন্য এসব, যদি জীবনে একবিন্দু শান্তিই না পাইলাম? ইহার চেয়ে সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যাওয়া ঢের ভাল। যেদিকে দুচোখ যায় চলিয়া যাইব।

আজ রবিবার, বসিয়া বসিয়া এতক্ষণ চিন্তা করিতেছিলাম। নিরুদ্দেশ হইয়া যাইব। সংসারে কেউ কারো নয়। 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ'? ছাড়িয়া যাই এ সংসার, অনেক দূরে চলিয়া যাই, উটকামণ্ড কিংবা কাটামুণ্ডু; নিকারাগুয়া অথবা কামস্কাটকা। গৃহিণী দেখুন, বুঝুন,—আমিও মানুষ; সাধারণ মানুষের মত আমারও সুখ-শান্তির প্রয়োজন। কিন্তু গৃহিণীকে এ কথা বুঝাইব কি করিয়া? মুখে বলিয়া যাইব, না, চিঠি লিখিয়া রাখিব? চিঠিই ভাল। মুখে বলিতে গেলে হয়তো মরাকান্না শুরু করিবেন, অথবা মুখ এমন প্রচণ্ড ভাবে ছুটিতে আরম্ভ করিবে যে বৈরাগ্য পলাইতে পথ খুঁজিয়া পাইবে না। সত্য কথা বলিতে কি, পরোক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলি; কিন্তু তাঁহার সম্মুখে কেমন যেন ম্রিয়মান হইয়া পড়ি, ভাষা খুঁজিয়া পাই না।

কিন্তু এবারে আর বাধা দিতে পারিবে না। অনেক সহ্য করিয়াছি, আর নয়। বারবার ধাক্কা খাইতে খাইতে ইটের গাঁথনিও ধ্বসিয়া পড়ে, আর এ তো সামান্য মানুষের মন!

প্রথম প্রথম গৃহিণী হয়ত খুবই ম্রিয়মানা হইবেন। গৃহিণী আমার মুখরা খুবই সত্য, কিন্তু আমার অদর্শন সহ্য করিতে পারেন না। হয়ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিবেন। তা সেটা কিছুদিনের জন্য। তারপর আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে।

মেজো ছেলেটির আবার অসুখ চলিতেছে, তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। উহার মাতুলের বাসা এই কলিকাতাতেই। তিনি প্রায়ই এখানে আসেন, তাহার অসুখের তত্ত্বাবধান করিতেছেন তিনিই একরকম। কাজেই কোন চিন্তা নাই। কালই আমি হইব মুক্ত,—নীল আকাশের পাখিটির মতই যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইব। কিছুদিন পরেই কনিষ্ঠা শ্যালিকার বিবাহ, কিন্তু তখন আমি দক্ষিণ আমেরিকার নিকারাগুয়ার জঙ্গলে, কিংবা হনলুলুতে। ওঃ কতদূর! পৃথিবীর অপর প্রান্তে বলিলেই হয়। রবি ঠাকুরের কি একটা কবিতা যেন দেখিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে—

'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন—'

কিন্তু নিকারাগুয়াতে ভয়ানক মশা। মশারি একটা লইব নাকি সঙ্গে? লওয়াই ভাল, তাহা না হইলে ম্যালেরিয়া ধরিয়া যাইতে পারে। কলিকাতায় কি ভীষণ মশাই না হইয়াছে! মেজো ছেলেটার কি ম্যালেরিয়াই হইল না কি কে জানে? কানাই ডাক্তারটা কোন কাজেরই নয়; একেবারে ওয়ার্থলেস্। দশ বারো দিন হইয়া গেল, তবু রোগ কি তাহাই ঠিক করিতে পারে না। আসুক একবার 'ভিজিট' লইতে; স্রেফ 'না' বলিয়া বিদায় করিয়া দিব। কি ওষুধ দেয় ভগবানই জানেন। কলের জলও দিতে পারে, বেটা জোচ্চোর! আজই আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের ডাক্তার সুরেন মিত্তিরকে 'কল' দিতে হইবে।

—তা যাউক, উট্কামণ্ডে বোধহয় মশা নাই। স্বাস্থ্যকর স্থান, বায়ু

পরিবর্ত্তনে অনেকে যায় শুনিয়াছি। কাটামুণ্ডুটা বোধহয় সুবিধার জায়গা নয়, বিদঘুটে রকমের নামেই তার পরিচয় দিতেছে। তা ছাড়া জায়গা লইয়া আটকাইবে না, যেখানে খুসি যাইব। হরিদ্বার অথবা কামরূপেও যাওয়া যায়; তীর্থস্থান, পুণ্য ছাড়া পাপ হইবে না, গৃহিণীর তীর্থের শখ খুব, বছর পনের পূর্ব্বে তাহাকে লইয়া একবার ৺কাশীধামে গিয়াছিলাম। তখন আমি থাকিতাম শ্যামবাজারে। আমাদের বাসার অনেকে—মা, দুই বোন, আমি, গৃহিণী এবং তাহার এক বোন। বড় ছেলেটির বয়স তখন দেড় বৎসর। পাশের বাসার এক ভদ্রলোক সপরিবারে আমাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন! ৺কাশীধামে বাঙ্গালীটোলায় একটা বাসা ভাড়া করিয়া সকলে একসঙ্গে থাকিতাম, আজ এখানে, কাল সেখানে, গোধূলিয়া, দশাশ্বমেধ, বেণীমাধবের ধ্বজা, হরিশ্চন্দ্রের ঘাট কিছুই বাদ যায় নাই। বাস্তবিক বেশ হৈচৈ আনন্দের মধ্যেই দিনগুলি কাটিয়াছিল। তখন আমাদের বয়সও কম ছিল, আনন্দরস গ্রহণের ক্ষমতাও ছিল বেশি, এখনও মাঝে মাঝে মনে হয় সগৃহিণী একবার কোনও তীর্থে ঘুরিয়া আসি। কিন্তু মাহিনা পাইবামাত্র পকেট যখন শূন্য হইয়া পড়ে, এবং যখন ভীতিপূর্ণ চক্ষে মা ষষ্ঠীর দানগুলির দিকে তাকাই, তখন সে ইচ্ছা ধামাচাপা পড়িয়া যায়।

—কিংবা বিহারেও যাওয়া যায়, বিহারও জায়গা হিসাবে মন্দ নয়। ভাগলপুর; ভাগলপুরী গাইয়ের কথা কে না জানে? যা দুধ হয় এক একটা গরুর! আর কিছু না হউক, দুধ খাওয়া যাইবে খুব, কলিকাতার জল মিশ্রিত 'খাঁটি দুধ' খাইতে খাইতে রীতিমত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, ছেলেমেয়েগুলিরও স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া গেল। যদি কখনও ফিরি—ফিরিব তো না-ই,—যদি কখনও ফিরিয়া আসি, তবে একটা ভাগলপুরী গাই লইয়া আসিতে হইবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, গরু রাখিব

কোথায়? উঠানটুকু তো যৎসামান্য, রান্নাঘরের পাশে যে ঘরটা, ভাগলপুরী গরুর পক্ষে তাহা ক্ষুদ্র হইবে। ঐ উঠানের এক কোণেই একটা ছাপরা বাঁধিয়া দিতে হইবে আর কি! তাহার পর গরুর তত্ত্বাবধান করার জন্য একটা লোক রাখিতে হইবে। খরচ একটু হইবে; তা হউক, তবে দুধটুকু খাঁটি পাওয়া যাইবে। অথচ দেশের বাটীতে গরুর জন্য যে আলাদা খরচ হয়, তাহা বোঝাই যায় না। তিন চারিটি গরু আছে; সের পাঁচেক দুধ হয় রোজ। ছুটিতে দেশে গেলে চেহারা আমার খুলিয়া যায়।—

কিন্তু কামরূপ তীর্থস্থান হইলে হইবে কি, জায়গাটা বোধ হয় বিশেষ সুবিধার নয়। শুনিয়াছি, সেখানে নাকি যত সব ডাকিনী মায়াবিনীদের আড্ডা; কেহ গেলে তাহাকে ভেড়া বানাইয়া রাখিয়া দেয়। মুশকিলের কথা! বেশ, তালিকা হইতে কামরূপ না হয় বাদই দিলাম। হনলুলুতে যাওয়া যাইতে পারে। অনেক দূর সত্য, কিন্তু গেলে বেশ একটা ভ্রমণ হইয়া যায়। ফিরিয়া আসিলে—ফিরিব না, তা ঠিক, যদি কখনও ফিরি, তবে, গৃহিণীর কাছে বেশ গল্প বলা যাইবে। চাই কি, ভ্রমণ সম্বন্ধে একটা পুস্তকও লিখিয়া ফেলিতে পারি,—'হনলুলু ভ্রমণ,' অথবা 'হনলুলুতে কয়েকদিন', এই রকম একটা নাম দিয়া। বিক্রী হইবে খুব; হনলুলু-পর্য্যটক আমাদের দেশে খুব কমই আছে। তখন আর চাকরি করিব না। বড়বাবুর দাঁতখিচুনি, সাহেবের গালাগালি, এসব আর সহ্য করিতে হইবে না। পয়সার অভাব থাকিবে না, পায়ের ওপর পা রাখিয়া আরামে বসিয়া থাকিব।—

—পরশু বেতনের তারিখ। কামাই, অ্যাডভান্স প্রভৃতির জন্য কিছু বাদ যাইবে। কাটিয়া ছাঁটিয়া গোটা আশি পাওয়া যাইবে। বাসাভাড়া পঁচিশ, লোচন মুদী গোটা পনের, হরি গয়লা গোটা সাতেক টাকা

পাইবে। দুই ছেলের স্কুলের বেতন আট টাকা। ইহাদের বিদ্যার দৌড় কতদূর জানি না, কিন্তু মাহিনা ঠিক ঠিক দিতে হইবে। তাহা ছাড়া বাজার খরচা দৈনিক আট আনা হিসাবে ধরিলেও মাসে পনের টাকা। তাহার পর ছেলের অসুখ আছে, কাপড় জামাও আছে, ইহাতেও তো কিছু খরচ হইবে! নাঃ, কুলাইয়া উঠে না দেখিতেছি। অফিসের রামবাবুর নিকট একবার পাঁচ টাকা ধার করিতে হইয়াছিল। অফিসেই একটা ভাল ঘোড়ার সন্ধান পাইয়াছিলাম। চড়িবার ঘোড়া নহে, রেসের ঘোড়া। পকেটে তখন কিছু ছিল না। রামবাবু পাঁচ টাকা দিয়া তখন আমায় উপকৃত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলাম, মাহিনা পাইলেই শোধ করিব। রামবাবু রোজই একবার করিয়া মনে পড়াইয়া দেন,—কাজেই ভুলিতে পারি না। এবার শোধ করিতেই হইবে। শ্যালিকার বিবাহও ইহার উপর আসিয়া পড়িল। গৃহিণী বায়না ধরিয়াছেন, যাইতে হইবে। আমি বলিয়াছিলাম, কি দরকার। প্রত্যুত্তরে গৃহিণী এমন কতকগুলি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। কাজেই দেখিতেছি, ধার করিতে হয়, নতুবা ব্যাঙ্কে যৎসামান্য যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে ভাঙিতে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় দেশে চলিয়া যাই। কি হইতেছে শহরে থাকিয়া? ধূলা ধোঁয়া, গণ্ডগোল, রোগভোগ; ইহার চেয়ে দেশে সামান্য খাইয়া পরিয়া সহজভাবে থাকা ঢের ভাল। আর এক সুবিধা, দেশে সিনেমা নাই। কলিকাতায় পয়সা অপব্যয়ের পন্থা অনেক। গৃহিণীর বয়স হইলেই হইবে কি, শখ এখনও পুরামাত্রায় রহিয়াছে। গড়ের মাঠে মাঝে মাঝে তার যাওয়াই চাই হাওয়া খাইতে। সিনেমা থিয়েটারেও মধ্যে মধ্যে যাওয়া চাই। 'না' বলিতে পারি না, মানুষ তো! দরকার বই কি একঘেয়ে বদ্ধজীবনে একটু আধটু বৈচিত্র্য!

দরকার আছে স্বীকার করি; কিন্তু তাহাতে ট্যাঁক বেশ শাঁসালো থাকা প্রয়োজন। আমার ট্যাঁকে কিন্তু শাঁস নাই, আকাশের মতই তাহা উদার এবং উন্মুক্ত। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কিয়দংশ ভরাইতে পারি নাই।

যাহা হউক, এবার আর ট্যাঁকের চিন্তা করিতে হইবে না। এবার লম্বা পাড়ি দিব। স্ত্রীপুত্র পরিবার, কাহারও চিন্তা করিতে হইবে না। কেহ বাধা দিতে থাকিবে না, কেহ শান্তি ভঙ্গ করিবে না। লোচন মুদীর তাগাদা, বাড়িওয়ালার হুমকি, ডাক্তারের ফিস, গয়লার পাওনা, গৃহিণীর বায়না কিছুরই চিন্তা করিতে হইবে না। আমি মুক্ত, ঐ ছোট্ট পাখিটির মতই মুক্ত।

তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম, হঠাৎ শুনিলাম, ওগো!

প্রথমে মনে হইল শ্রবণের ভুল, কিন্তু আবার, ওগো শুনছ? বাবারে বাবা! বসে বসে ঘুম। এমন মানুষটি আর কোথাও দেখি নি বাবা!

পিছন ফিরিয়া সভয়ে দেখিলাম মদীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী কুপিত নয়নে দাঁড়াইয়া। নিরীহ ভাবে বলিলাম, আমায় বলছ?

মুখপদ্মখানিকে অধিকতর সুন্দর করিয়া তিনি বলিলেন, তোমাকে নয়ত কি ডাকছি আমার 'ইয়েকে'?

মুখ শুকাইয়া উঠিতেছিল, তবু ঠোঁটের আগায় হাসি টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলাম। কেন বল দিকি? তুমি যে শাড়ির কথা বলছিলে, তাই নাকি? তা বেশ তো, ও বেলায়—

কথাটা শেষ হইল না। মুখ বাঁকাইয়া গৃহিণী কহিলেন, থাক, শাড়ি যে কত হবে, তা জানি। এ জন্মে আর হবে কি না,—তা যাক, ও কথা বলতে আসি নি। বলছিলুম কি, মিনুর বিয়ে তো এসে গেল। তা

আমার জন্যে না হোক, ছেলেমেয়েগুলো যাবে, ওদের জন্যে তো জামা কাপড় কিছু আনতে হবে! মিনুকেও তো একটা কিছু দিতে হবে! আজ রোববার আছে, যাও না একবার নিয়ে এস সব দেখে। তা তো যাবে না, শুধু বসে বসে ঝিমুবে।

আমার যেন কিছুই মনে ছিল না, হঠাৎ সব মনে পড়িয়া গেল। কহিলাম, ওহোঃ, ঠিক তো, মিনুর তো বিয়ে প্রায় এসেই গেল। মনেই ছিল না; দেখছ, বেমালুম ভুলে গিয়েছিলুম। এই, এক্ষুণি বেরোচ্ছি, বলিয়া কণ্ঠস্বরকে বেশ মোলায়েম করিয়া কহিলাম, তা তোমারও তো একখানা ভাল শাড়ির দরকার। তোমাকেও যেতে হবে তো, কবে থেকেই চাইছ। কিন্তু দেখছ তো, যা টানাটানি, তবে এবারে একখানা—

থাক, আমার আর দরকার নেই। এবারও তো টানাটানি। যাওয়া আসা, উপহার, ছেলেমেয়েদের জামা কাপড়। আর আমার তো দিচ্ছ কবে থেকেই। ও আশা ছেড়ে দিয়েছি। এখন দয়া করে বাজারে একবার বেরোও।

বজ্রাহতের মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

হ্যাঁ, আর এক্ষুণি একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাও, কাপড় জামা বিকেলে হবে 'খন। সুনুর জ্বর তো ছাড়ছে না, কি ওষুধ দেয় কে জানে! টাকার বেলায় তো খুব। কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে? বেলা হচ্ছে না বুঝি? বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

আমি বোকার মত কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম।

এবং ছাতা হাতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলাম।

শ্রীপুষ্পরঞ্জন মজুমদার

ছায়া-ছবি

১

কেহ শুনিতে কি চাও গোপন প্রাণের প্রথম প্রেম ?
কৈশোরকালে পদাবলী খুঁজে চণ্ডীদাসে—
কোথায় লিখেছে রজকিনী-প্রীতি নিকষ হেম,
—পড়ি আর গাঁথি সুক্তি-নিচয় মরম-পাশে।

আহা কিশোর-বয়সে প্রথম স্বপন দেখেছ কেহ ?
স্বচ্ছ-নয়নে নীলাকাশ কভু মেলেছে ছবি—
ঘরের বাহিরে একেলা রচেছ বিরল গেহ—
—বিজন জগতে সঙ্গীবিহীন প্রথম কবি।

শত কাম-কণ্টক-যাতনা-বিদ্ধ কেঁদেছে দেহ,
বাসনা-ব্যথায় মরমে মরেছে মরম-খানি,
প্রাণের ছায়ায় করেছি লালন স্বপন-স্নেহ
—কি চেয়েছিলেম স্বরূপ তাহার আজো কি জানি!

মোর মনে পড়ে শুধু বারে বারে আমি চেয়েছি যারে,
শিথিল-মুষ্টি খসেছে কখন গেছে সে চলে!
বেলা-বালুকায় মিছে বেঁধে ঘর খুঁজিনু কারে—
সোনার স্বপন ডুবিল অতল নয়ন-জলে!

২

কেহ শুনিতে কি চাও গোপন প্রাণের প্রথম প্রেম ?
যৌবন-কালে এ পরাণ খুঁজে পাবে না কেহ,—
মিছে লেখে বড়ু রজকিনী-প্রীতি নিকষ হেম,
অনেক আয়াসে শূন্য রেখেছি মানস-গেহ।

আহা যৌবন-বেলা স্বপন-পসরা ভেঙেছে কারো ?
সুরাপাত্রের রঙিন নেশায় রঙানো-আঁখি—
খুঁজে কি দেখেছ ভাঙে নি স্বপন আজিও যারো,
কতখানি তার হিয়ায় লুকানো নিছক ফাঁকি ?

হায় প্রথম প্রণয়ে ঢেকেছে মনের বনের পাতা,
মিছাই আরোপ করেছ ইহার উহার 'পরে,
চির-অমলিন জুঁইফুল চির-অনাঘ্রাতা,—
প্রিয়-পিয়াসায় পিপাসী পরাণ কাঁদিয়া মরে।

তাই মনে পড়ে শুধু বারে বারে আমি ভেঙেছি যারে,
ইঙ্গিত তার এ পরাণ হতে গেছে কি চলে ?
বালুবাঁধা ঘর দেখে অবহেলা করিনু কারে,
কোন্ স্মরণের ছায়া-ছবি ভাসে নয়ন-জলে !

শ্রীউমা দেবী

পূর্ণচ্ছেদ

দাঁড়ি যা টেনেছি ভেবো না কখনো
সে দাঁড়ি আবার রবার দিয়ে
ঘ'ষে তুলে পুন প্রেমের খেলায়
মাতিব হে প্রিয় তোমায় নিয়ে।
অনেকে এসেছে, অনেকে আসিবে—
যতদিন আছে আসার আশা,
ভেবো না কখনো পুরানো ডালেতে
বাঁধিব আবার প্রেমের বাসা।

—বারায়ণী

সংবাদ-সাহিত্য

বোমা সংক্রান্ত আলোচনা ও উত্তেজনার মধ্যে বাস করিতেছি ; রাম আসিয়া জ্যোতিষীমতে ভরসা দিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ভয়ে দুরু দুরু বক্ষপ্রদেশ আরও দশ হাত দমাইয়া দেয়। যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ব্যক্তি যে এতগুলি আমাদেরই আশেপাশে ছিলেন, পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারি নাই। চাকর ঠাকুর পলায়ন করিয়াছে, অনভ্যস্ত হস্তে কুকারের সাহায্যে কোনও গতিকে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতেছে ; ধোপা নাপিত বিরল হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং নানাবিধ আলস্যও প্রশ্রয় পাইতেছে। শাস্ত্রে বলে, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানাবিশেষ, শয়তান আমাদেরও ছাড়িতেছে না।

* * *

এ. আর. পি.-র কর্ত্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে একটি ইস্তাহার জারি করিয়াছেন—প্রত্যেক বাড়ির বাসিন্দাদের সংখ্যা, নাম ও পরিচয় তালিকাভুক্ত করিয়া তালিকার একটি নকল এ. আর. পি. আপিসে, একটি স্থানীয় থানায় এবং তৃতীয়টি গৃহমধ্যেই কোনও প্রকাশ্য স্থানে টাঙাইয়া রাখিতে হইবে ; বুকের কাছটায় তাবিজের মত করিয়া পরিচয়সূচক চাকতি ঝুলাইয়া রাখার প্রস্তাবও হইয়াছে। ইহার পর বলুন তো কোন্ সাধারণ বীরত্বসম্পন্ন বাঙালী স্থির থাকিতে পারে? বস্তুত স্থির থাকা সম্ভব নয়। নিতান্ত বেগতিকে পড়িয়া এই পোড়া শহরে ইহার পরেও বাস করিতে হইতেছে ; পলাইয়া অপঘাতের হাত হইতে বাঁচিব বটে, কিন্তু অনশন ঠেকাইব কেমন করিয়া?

* * *

সুতরাং খুব সহজ অবস্থায় নাই, বুঝিতেই পারিতেছেন। দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত মস্তিষ্কে দুঃস্বপ্নের খেলাও খুব ঘন ঘন হইতেছে। সে সব বিচিত্র স্বপ্ন ; শ্রীযুক্ত ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসুকে আমাদের যাবতীয় স্বপ্নকাহিনী যদি লিখিয়া পাঠাই, তাহা হইলে তাঁহার 'স্বপ্ন' পুস্তকে বোমাতঙ্ক বিষয়ক একটি অধ্যায় সহজেই যোজিত হইতে পারে। একদিন স্বপ্ন দেখিলাম,

পুরীর সমুদ্র বালিগঞ্জের লেকের কাছ বরাবর সরিয়া আসিয়াছে; আমরা সেখানেই আকণ্ঠ বালিতে ডুবিয়া বসিয়া আছি, ওদিকে মেয়ে পুরুষের সম্মিলিত স্নানাদি রহস্যলীলা সমানই চলিতেছে; বি. এন. আর.-ঘাটে সুইমিং ক্যস্টুম পরা সাহেব মেমেদের অর্দ্ধ-অনাবৃত জল-ক্রীড়াও দেখিতে পাইতেছি। ডক্টর সুহৃৎ মিত্রের কৃপায় কিছু কিছু মনঃসমীক্ষণ-বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছি; বুঝিতে পারিলাম, বারবার এ. আর. পি.-র উপদেশ সত্ত্বেও কয়েক বস্তা বালি এখনও সংগ্রহ করা হয় নাই; বালি এবং গৃহিণীর বিরহ সম্মিলিত হইয়া উক্ত স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়াছে।

* * *

আর একদিন দেখিলাম, বোমাবর্ষণ চলিতেছে, যথাসময়ে সামনের মাঠে স্বহস্তে কর্ত্তিত আঁকা-বাঁকা পরিখায় আশ্রয় লইয়াছি, কিন্তু বাম হস্তটি বেকায়দায় পরিখার বাহিরে পড়াতে বোমার আঘাতে উড়িয়া গিয়াছে। "অল ক্লিয়ার" ধ্বনি হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরিখা হইতে উঠিয়া আমাদের পাড়ার এ. আর. পি.-ওয়ার্ডেন শ্রীযুক্ত কিরণ বসু মহাশয়ের সন্ধানে গেলাম। অনেক কষ্টে তাঁহাকে পাইয়া আমার অপহৃত হাতটির কথা বিজ্ঞাপিত করিলাম। তিনি আমাকে সরাসরি লস্ট প্রপার্টিজ বিভাগে সন্ধান লইতে বলিলেন। গেলাম সেখানে; সারি সারি মাথা, ধড়, নাক, হাত, পা, কান প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে—অনেকগুলি পরিচয়সূচক চাকতি-সম্বলিত, খুঁজিয়া পাইতে মালিকদের কোনই অসুবিধা হইতেছে না। যথাসময়ে চাকতি ব্যবহার করি নাই বলিয়া মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলাম। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত অনেক হাঙ্গামার পর হাতটি পাওয়া গেল। বাম হস্তটি দক্ষিণ হস্তে লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছি, দেখিলাম, সেই ঘরের এক অন্ধকার কোণ হইতে সুবর্ণবলয়মণ্ডিত আর একখানি হাত আঙুলের ইশারা করিয়া আমাকে ডাকিতেছে। অন্ধকারেও সুবর্ণ-মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে হইল। কাছে গিয়া দেখিলাম, চেনা হাত। কিন্তু এ তো বোমার কাণ্ড নয়! বোমার কারবার ঘটিবার বহুপূর্ব্বেই হাসপাতালে এ হাত কাটা গিয়াছিল। এ হাত এখানে আসিল কেমন করিয়া তাহাই ভাবিতেছি; দেখি, আমাদের

গোপালদা হন্তদন্ত ভাবে প্রায় আমাকে ধাক্কা দিয়া পাশের ঘরে যাইতেছেন। ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার ঘাড়ে হাত রাখিয়া প্রশ্ন করিলাম, ব্যাপার কি গোপালদা, এখানে, এ ভাবে? গোপালদা কথা না বলিয়া মাথাটা একটু কাত করিলেন; দেখিলাম, দাদার বাম কানটি বেমালুম অন্তর্হিত হইয়াছে। দুঃখের মধ্যেও আমার অত্যন্ত হাসি পাইল, নিজের অট্টহাসিতেই স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া বসিলাম।

* * *

সকালবেলাতেই নলিনীদা আসিয়াছিলেন। আমার বিমর্ষ মুখখানা দেখিয়া বলিলেন, দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নাই। সাধু-মহাত্মাদের কথা বিশ্বাস কর তো? আগে একটু একটু করিতাম, এখন খুব বেশি করি। নলিনীদা বলিলেন, উপেনদার 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা' আছে? বইখানা কাছেই ছিল, দিলাম। নলিনীদা বইটির ২৯-৩০ পৃষ্ঠা খুলিয়া বলিলেন, পড়। পড়িলাম—

সাধু বলিলেন—"দেখ, বাবা, যে কথা আমি বলিতেছি, তাহা জানি বলিয়াই বলিতেছি। তোমরা যে উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু যে উপায়ে ভাবিতেছ, সে উপায়ে নয়। আমার বিশ বৎসরের সাধনার ফলে আমি ইহাই জানিয়াছি। চারিদিকের অবস্থা এক সময় এমনি হইয়া দাঁড়াইবে, যে সমস্ত রাজ্যভার তোমাদের হাতে আপনিই আসিয়া পড়িবে। তোমাদের শুধু শাসন-ব্যবস্থা প্রণালী গড়িয়া লইতে হইবে মাত্র। আমার সঙ্গে তোমরা জন কতক এস; সাধনার প্রত্যক্ষ ফল যদি কিছু না পাও, ফিরিয়া আসিও।"

সে দিন সাধু চলিয়া যাইবার পর আমাদের মধ্যে বিষম তর্কাতর্কি বাধিয়া গেল। বারীন ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—"কিছুতেই নয়। কাজ আমি ছাড়বো না। বিনা রক্তপাতে ভারত উদ্ধার—এটা ওঁর খেয়াল। সাধুর আর সব কথা মানি, শুধু ঐটে ছাড়া।"......

সাধু আর একদিন বারীনকে বুঝাইতে আসিলেন; কিন্তু পরের উপদেশ লইবার কু-অভ্যাস বারীনের একেবারেই নাই। কোন রকমে বারীনকে বাগাইতে না পারিয়া শেষে সাধু বলিলেন—"দেখ, এ রাস্তা যদি না ছাড়, ত তোমাদের ভীষণ বিপদ অনিবার্য্য।"

বারীন দুই হাত নাড়িয়া বলিল—"না হয় ধরে ঝুলিয়ে দেবে—এই বৈ ত নয়। তার জন্য ত প্রস্তুত হয়েই আছি।"

সাধু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"যা ঘট্‌বে, তা মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ।"

পড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম। ইহা প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা, বইটিও ১৩২৮ সালে—প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে বারীনদা সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী তো অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। তিনি যাহা পাইয়াছেন, তাহা মৃত্যু অপেক্ষা ভীষণ তো বটেই। তবে সাধুর অন্য কথাই বা খাটিবে না কেন?

নলিনীদা বলিলেন, সাধু যখন বলিয়াছেন রক্তপাত হইবে না, তখন রক্তপাত কিছুতেই হইবে না, জাপানীরা আসিলে স্বাধীনতা তো নূতন করিয়া গেল! তা ছাড়া, আপনা-আপনিই তো আমাদের হাতে ভারতের শাসনভার আসিয়া পড়িতেছে। শাসন-ব্যবস্থার প্রণালীও প্রায় গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আমাদের আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। জাপানের শুভাগমন ঘটিবে না।

অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছি।

—

এখন চারিদিকে "পালাই পালাই" রব উঠিয়াছে; বলা বাহুল্য, কলিকাতার পুলিস-কমিশনার বাহাদুরের নির্দ্দেশমত যাঁহারা স্থির এবং দৃঢ় আছেন, তাঁহারা এই অকারণ-চাঞ্চল্য উপভোগ করিতেছেন। এই সংখ্যায় অন্যত্র শ্রীসুলতা সেনগুপ্তা ইহাকে "বৌ-পালানো যুদ্ধ" আখ্যা দিয়া তাঁহার বিবৃতিকে ছন্দের আয়ত্তাধীন করিয়াছেন। আমাদের পাড়ার বিষ্ণুশর্ম্মা রসিক লোক, তিনি গত রবিবারের আসরে গদ্যে গল্পাকারে এই প্রসঙ্গে কিছু বলিয়াছিলেন, শুনিয়া সকলেই আমরা উপভোগ করিয়াছিলাম। সেই কাহিনীটিকে ছন্দোবদ্ধ করিয়া আমরা স্থির এবং অস্থির উভয় জাতীয় পাঠককেই উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

পালাই-পালাই উঠল হাওয়া, মাসীর কাছে বললে ভুতো,
বলছি শোন, কলকেতাতে থাকলে খাবে খ্যাঁদার গুঁতো।
বেজার মাসী, অনিচ্ছাতেই সামলে-সুমলে হাওড়া হয়ে
কামারকুণ্ডু রওনা হ'ল এণ্ডাবাচ্ছা সবাই ল'য়ে।
ইষ্টিশানে বললে মাসী, খরচ ক'রে যাচ্ছি যে রে,
বোমা যদি না পড়ে তো ভূত ঝাড়াব খ্যাংরা মেরে।

সেদিন থেকে ভূতো কেবল আকাশ পানে চেয়েই আছে,
সর্ব্বদা ভয় বর্ম্মা হতেই বর্ম্মী ওদের তাড়ায় পাছে !
ছুটকো বোমা পড়লে তবু প্রাণে হয়তো বাঁচতে পারে,
বাঁচাই হবে কঠিন যদি ক্ষ্যান্ত মাসী খ্যাংরা ঝাড়ে।

* * *

এই পলায়নীমনোবৃত্তির আর একটি কৌতুককর সংবাদ দিয়াছেন কলিকাতার ঈডেন হিন্দু হোস্টেলের শ্রীমান অসীমকুমার দত্ত; এই 'পলায়ন'ই সত্যকার পলায়ন—দুঃখের বিষয়, লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "গলায়" আটকাইয়া ইহা একটু ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। 'পলায়ন' পুস্তকের প্রথম গল্পে অর্থাৎ পুস্তকের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই অচিন্ত্যকুমারের ভাষা ও সাহিত্যবোধ প্রায় গলায় গলায় উঠিয়াছে, আর একটু পরেই কণ্ঠরোধের সম্ভাবনা। যথা—

পৃ. ৩। মৃত গলায় অদ্ভুত হেসে…
৪। স্বাদহীন গলায় লোকনাথ বললে
৫। ক্লান্ত গলায় হেসে উঠলো…
লোকনাথ নিরবয়ব গলায় বললে
৬। ধূসর গলায় অস্ফুট…
পাথুরে গলায় বললে…
৮। শুকনো গলায় বললে…
পৃ. ১১। নিষ্প্রাণ গলায় বললে…
নিষ্পেষিত গলায়…
১২। কাতর গলায়…
১৩। বিবর্ণ গলায়…
রেখাহীন নির্লিপ্ত গলায়…
১৯। শুষ্ক শীর্ণ গলায়…

গোপাল-বউদি বাঁচিয়া থাকিলে বলিতেন, "গলায় দড়ি এমন লেখকের"; কিন্তু তিনি গত অর্দ্ধোদয়যোগের সময় হঠাৎ গঙ্গাযাত্রা করিয়াছেন।

ঢাকা যাদুঘর হইতে শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ ভট্টশালী আমাদের নিকট একটি অভিযোগ করিয়া পাঠাইয়াছেন। বড়ই সুখের বিষয়, আজকালকার তরুণেরা নিজেরাই ভালমন্দ মাল যাচাই করিয়া লইতে পারিতেছেন, আগেকার দিনে আমরা চোখ কান বুজিয়া ছাপার অক্ষরে লেখা, বিশেষ করিয়া নামজাদা লেখকদের লেখা, অকাট্য সত্য বলিয়া মানিয়া লইতাম। সেকালের লেখকেরা আজকালকার লেখকদের মত

অবিবেচক ও হৃদয়হীন ছিলেন না সত্য, তথাপি আজ বুঝিতে পারিতেছি, অনেক বিষয়েই ঠকিয়া গিয়াছি, ভুল কম শিখি নাই।

* * *

যাহা হউক, শ্রীমান বীরেন্দ্রের অভিযোগের কথা বলিতেছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—

> সেদিন হঠাৎ শিশু-সাহিত্যের নামজাদা লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের "যুগান্তকারী এড্‌ভেঞ্চারের উপন্যাস" 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' (বি এন্ পাবলিশিং হাউস্, কলিকাতা) পড়িতেছিলাম। এই পুস্তকে বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে বহুসংখ্যক ভুলের মধ্যে এমন কয়েকটি মারাত্মক ভুল দেখিলাম, যাহা স্কুলের মেয়েরাও কোন দিন করে না।

লেখক এই সঙ্গে ভুলের কয়েকটি নমুনা ও তাঁহার মন্তব্য পাঠাইয়াছেন। প্রেমেন্দ্রবাবু আমাদের বন্ধুলোক, আমরা তাঁহার হইয়া ওকালতি করিলে শোভন হইবে না, তবুও কয়েকটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। প্রথমত, তিনি স্কুলের মেয়ে নন, শিল্পী ও কবি অর্থাৎ স্বাধীন সাহিত্যিক। কবিতা লেখেন, গল্প লেখেন, উপন্যাস লেখেন—আজকাল সিনেমার শুধু গল্প-সংলাপাদি লিখিয়াই তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, এই পোড়া দেশে তাঁহাকে যাহাকে বলে "প্রযোজনা" তাহাও করিতে হইতেছে। অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্ব্বাচনেব কাজ যে কিরূপ পরিশ্রম-সাধ্য, তাহা আমরা বুড়োদার মুখেই শুনিয়াছি। ইহার উপর 'নিরুক্ত' ত্রৈমাসিকের সম্পাদনা আছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে দিয়া ছেলে-মেয়েদের উপযোগী তথ্যমূলক বই লিখাইয়া লওয়া প্রকাশকদেরই ভুল। তাঁহারা সদ্বিবেচনা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিলে কিছুতেই এরূপটি ঘটিতে পারিত না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এই সকল ভুলের জন্য নাছোড়বান্দা প্রকাশকেরাই দায়ী; প্রেমেন্দ্রবাবু তাঁহার মধুর ভাষা দিয়াই খালাস, তথ্যের ধার তিনি ধারিবেন কেন? তা ছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার শিক্ষাই বা কতটুকু! "পপুলার সায়ান্স" জাতীয় বইয়ের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যে এতটুকুও করিতে পারিয়াছেন, তাহাই এই দুর্ভাগ্যজাতির ছেলেমেয়েদের লাভ! তথ্য সম্বন্ধে প্রকাশকদের অন্য ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।

যাহা হউক, ভুলের কথা যখন উঠিয়াছে তখন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া ভাল ; যাহাদের প্রয়োজন, তাহারা যথাস্থানে শুদ্ধ করিয়া লইতে পারিবে। একটি কথা আমরা খোলসা করিয়া বলি, তথ্যটথ্য আমরা যাচাই করিয়া দেখি নাই, শ্রীমান বীরেন্দ্রের লেখাই তাঁহার মন্তব্য সহ মুদ্রিত করিলাম। বর্জাইস অক্ষরে বইয়ের ভুল ও লংপ্রাইমার অক্ষরে মন্তব্য ছাপা হইল।

পৃ. ৮৮—পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে হ'ল বুধগ্রহ

বুধ পৃথিবীর প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল কাছাকাছি আসে।

৮৯—বুধ আমাদের অনেক কাছে। ৫ কোটি মাইল পেরিয়ে মঙ্গলের বরফ ঢাকা পিঠে যাওয়ার চেয়ে ২ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল পেরিয়ে…বুধে যাওয়ার অনেক সুবিধে।

পৃথিবীর কাছাকাছি শুক্রগ্রহ এবং মঙ্গল, তারপরে বুধগ্রহ। বুধ পৃথিবী হইতে ২ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল দূরে নহে, প্রায় ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ মাইল দূরে। পৃথিবী হইতে মঙ্গল ৪ কোটি ৮০ লক্ষ মাইল, আর বুধ ৫ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল দূরে ; সুতরাং মঙ্গলের দূরত্ব বুধ অপেক্ষা বেশি তো নয়ই, বরং প্রায় ৯০ লক্ষ মাইল কম।

পৃ. ৮৯—আয়তনে বুধ প্রায় পৃথিবীরই সমান।

আয়তনে পৃথিবী বুধ হইতে বড়—পৃথিবীর mean diameter প্রায় ৮০০০ মাইল, আর বুধের মাত্র ৩০০০ মাইলের কাছাকাছি।

পৃ. ৮৮-৮৯—এই দুই পৃষ্ঠায় প্রেমেন্দ্রবাবু মঙ্গলগ্রহ অপেক্ষা বুধগ্রহ যে মনুষ্যবাসের পক্ষে উপযুক্ত, এই উপন্যাসের নায়ক ডাঃ ক্রল নামক একজন "বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের" মুখ দিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

আমাদের উত্তর মেরুর মত সে গ্রহের সমস্ত জায়গা ঠাণ্ডা। যত ঠাণ্ডা হলে জল জমে বরফ হয়, মঙ্গলগ্রহের তাপ খুব বেশী হ'লেও, তার চেয়ে ১৫ ডিগ্রি নীচে থাকে।…সেখানে নিশ্বাস নেবার মত যথেষ্ট হাওয়া নাই…

অর্থাৎ প্রেমেন্দ্রবাবু বলিতে চাহিয়াছেন যে, মঙ্গলগ্রহের এ সমস্ত অবস্থার দরুন এবং বুধগ্রহে এই সমস্ত অবস্থা না থাকার দরুন, বুধগ্রহই মনুষ্যবাসের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লেখকের এই সামান্য সাধারণ জ্ঞানও নাই যে, বুধ সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ, এবং প্রায় অগ্নিপিণ্ডের মত উত্তপ্ত—সেখানে বায়ু বা জল থাকিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বরং

মঙ্গলগ্রহে অন্যান্য গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঘনীভূত বায়ু থাকিলেও থাকিতে পারে।

১১৭ পৃষ্ঠায় প্রেমেন্দ্রবাবু বুধগ্রহের গাছপালা এবং সমুদ্রের কথা বলিয়াছেন। ইহা একই কারণে অসম্ভব।

পৃ. ৭৩—পৃথিবীর সবুজ গাছপালার দরুণই, তা থেকে যে সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে আসছে তার রঙ একটু সবুজ দেখায়।

ইহা অসম্ভব, কারণ—

(১) পৃথিবীর ১১/১৬ জল + ৩/৩২ মেরুমণ্ডল + ১/৩২ মরুভূমি = ১৩/১৬ গাছপালা বা তৃণহীন ভূমি। ১ − ১৩/১৬ = ৩/১৬ ভাগ সবুজ তৃণাচ্ছাদিত জমি।

(ক) ৩/১৬ জমির উপর প্রতিফলনের ফলে সমস্ত গ্রহটা সবুজ দেখাইতে পারে না।

(খ) গাছপালা অপেক্ষা সমুদ্রের জল ও মেরুমণ্ডলের বরফের উপরই প্রতিফলন অধিকতর জোরালো হইবে। সুতরাং পৃথিবী হইতে যে প্রতিফলিত আলো বাহির হয়—তাহা প্রধানত জলের এবং বরফের উপর প্রতিফলনের আলো।

(গ) সবুজ রঙের প্রতিফলিত আলো (reflected light, not focused light) দূর হইতে কোন সময়েও সবুজ দেখায় না,—কালো দেখায়।

গল্পের নায়ক ক্রল সাহেব, তাহার অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্য ডক্টরেট্ অব সায়েন্স উপাধি পাইয়াছেন—প্রেমেন্দ্রবাবুর এই অপূর্ব্ব বিজ্ঞান এবং সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তাঁহাকে যুগপৎ ডক্টরেট অব সায়েন্স এবং ডক্টরেট অব লিটারেচার উপাধি দেওয়া উচিত।

শেষের মন্তব্যটি আমাদের অনুমোদিত নহে।

'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার দুই নম্বর দরগা 'মডার্ন রিভিউ'য়ে রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্র ও গৃহীত আলোক-চিত্রের মূল্য বিচার করিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন যে, সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত পত্র ও চিত্রই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহার মধ্যে স্বয়ং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত অনেকগুলি পত্র মাসে মাসে 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হইতেছে। এই শেষোক্ত পত্রগুলিরও ফাইনাল নির্ব্বাচন-সংবাদ গত

অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বভাবসুলভ বিনয় ও কৌশল সহকারে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন এবং বাংলা দেশের জনসাধারণের অবগতির জন্য ব্লক করিয়া ছাপিয়াছেন। পৃষ্ঠা ২৩২ ও তৎসম্মুখস্থ প্লেটটি দ্রষ্টব্য।

* * *

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অবশ্য এই মহামূল্য চিঠিখানি হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন নাই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী তর্জ্জমা "আগাগোড়া মাজিয়া ঘষিয়া প্রায় নূতন করিয়া" দিতেন তবে তাহা ছাপা হইত, এবং ইহাও প্রমাণ করিতে চাহেন নাই যে, রবীন্দ্রনাথ কোনও কোনও গ্রন্থে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাধীন ইংরেজী রচনা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন (যেমন ইংরেজী 'চিত্রা'র ভূমিকাটি)। তাঁহার সহজ এবং সরল উদ্দেশ্য ইহাই প্রমাণ করা যে, রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও চিঠিতে তারিখ দিতে ভুলিতেন।

* * *

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লিখিত প্রায় শতাধিক চিঠি 'প্রবাসী'তে এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের কোনটিই ব্লকিত হইবার গৌরব লাভ করে নাই। এই নিরীহ পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী চিঠিটি যে সে গৌরব লাভ করিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ প্রমাণ-প্রীতি ; যাহা বলেন, তাহা চূড়ান্ত করিয়া বলাই তাঁহার অভ্যাস। এই অভ্যাস আমাদের অনুকরণীয়।

মাঘের 'ভারতবর্ষ'টা আসিতেই আমার সপ্তমবর্ষীয়া ভাগিনেয়ী ভূতি ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। ভাবিলাম উহার মাকে পড়িতে দিবে, আপত্তি করিলাম না। খানিক পরে স্নান করিবার জন্য ভিতরে যাইতেছি, দেখি, দক্ষিণের বারান্দায় একটা ছেঁড়া মাদুরে উবু হইয়া বসিয়া ভূতি গভীর মনোযোগের সহিত 'ভারতবর্ষ' লইয়া পড়িয়াছে। ছবি দেখিতেছে মনে করিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতেছিলাম, ভূতি হাঁকিল, সেজোমামা, এ বইটা আমি নেব ? অবাক হইয়া ভূতির মুখের দিকে চাহিলাম। ভূতি বেশ উৎফুল্ল মুখে বলিল, এই তো 'দ্বিতীয় ভাগ'।

ভূতি সবে প্রথম ভাগ শেষ করিয়াছে, সুতরাং 'দ্বিতীয় ভাগে' তাহার দাবি ছিল। প্রশ্ন করিলাম, দ্বিতীয় ভাগ কি রে? ভূতি বই হাতে আগাইয়া আসিয়া বলিল, এই দেখ। দেখিলাম, "দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা"। ভূতি দেখাইয়া চলিল, স্বয়ম্বরা, রূপোন্মাদ, চিদম্বরম্, জঙ্গম, মহামন্ত্র, গান্ধার-শিল্পে বুদ্ধের জীবনী, স্বপ্ন-বিলাস, বন্ধু, অরণ্যানী, জয়লব্ধ……। কৌতুক বোধ করিলেও ধমক দিয়া বলিলাম, থাম। ওটা 'দ্বিতীয় ভাগ' নয়। রেখে দিয়ে আয় আমার টেবিলে। ভূতির উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইল। সে বিষন্ন মুখে বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল।

* * *

কিন্তু এখানেই এ পর্ব্ব শেষ হইল না। আপিস হইতে ফিরিবার সময় মনে করিয়া একটি 'দ্বিতীয় ভাগ' খরিদ করিয়া আনিলাম। ভূতিকে ডাকিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভূতির জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী খুকীও হাজির হইলেন। ভূতির সঙ্গে কারবার চুকিতেই খুকী প্রশ্ন করিল, আচ্ছা সেজোমামা, "ডিজল্‌ভ্‌" মানে কি? পুনরায় অবাক হইলাম। খুকী ইংরেজী পড়া ধরিল না কি! প্রশ্ন করিলাম, কেন বল দেখি? খুকী মায়ের 'ভারতবর্ষ'টাই আনিয়া হাজির করিল। বলিল, এই দেখ। দেখিলাম, বন্ধুবর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কালিদাস"! খুকী বলিল, ডিজল্‌ভ, কাট্‌, ফেড আউট—বারেবারেই লিখেছে, এর মানে কি সেজোমামা? বিপন্ন বোধ করিলাম। মহা মুশকিলেই ফেলিতেছে আমাদের এই সিনেমা-ধর্ম্মী বন্ধুরা, সেদিন শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মহাশয় 'শনিবারের চিঠি'তেই এই কীর্ত্তি করিয়াছেন। কি জবাব দিব? বলিলাম, ডিজল্‌ভ্‌ মানে গোলা, কাট্‌ মানে কাটা আর ফেড আউট মানে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া, উবে যাওয়া।

আপাতত তো বাঁচিলাম, কিন্তু এই প্রশ্নটাই মাথার মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। যথাসময়ে আড্ডাতে গোপালদার নিকট নিবেদন করিলাম, গোপালদা বলিলেন, এও জান না? এই হ'ল আজকালকার গল্প উপন্যাসের মর্ম্মকথা—ডিজল্‌ভ্‌, কাট্‌, ফেড্‌ আউট; অর্থাৎ কি না—গোলা পায়রা, বো-কাটা ঘুড়ি আর ফুড়ুত।

ফুড়ুতই বটে!

স্বর্গত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি আধুনিক নিও-প্রাচ্য যোগের স্বরূপ যথাসময়ে জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে অকারণে চুম্বন-আলিঙ্গন-বিষয়ক সেই হাস্যকর প্রসঙ্গের অবতারণা তাঁহাকে করিতে হইত না। রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্ম্মে"র ঠেলায় নিজের লেখনীর শুচিতা দেখাইবার জন্য তিনি একবার বড়াই করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, চুম্বন তো দূরের কথা, আলিঙ্গন কথাটি পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার লেখায় কোথাও দিতে পারেন নাই। বেচারা শরৎচন্দ্র! ভাবিয়াছিলেন, চুম্বন আলিঙ্গন বুঝি সভ্য সমাজে চলে না। আজ বাঁচিয়া থাকিলে তিনি দেখিতে পাইতেন, সভ্য সমাজ তো ছেলেমানুষ, যোগসিদ্ধ সাধু সমাজেও ও দুই বস্তু চলে এবং রিপীটেড্‌লি চলে। অন্তত চলে বলিয়া আমাদের গোঁদলপাড়ার যোগী শ্রীমতিদাদা চালাইতেছেন। পৌষের 'প্রবর্ত্তকে'র ১৭৯ পৃষ্ঠা দেখুন—তাঁহার "জীবন-সঙ্গিনী"র ব্যাপারে মতিদাদা লিখিতেছেন—

আমি প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই শ্রীঅরবিন্দ প্রসারিত বাহু দুটি দিয়া আমাকে হৃদয়ে টানিয়া লইলেন। তাঁর করুণ নয়ন দুটি প্রসন্নতাময়, তিনি অজস্র চুম্বনে অন্তরব্যথা এক নিমিষে দূর করিয়া দিলেন। বাসায় আসিয়া অরুণকে লিখিলাম "আজ প্রাতে অপূর্ব্ব লীলা, অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব; অপ্রকাশই রইল...কেবল চুম্বন আর চুম্বন! হায় অরো! এ কেবল তুমি আর আমি"—হৃদয়-মল তিরোহিত হইল।

মতিদাদার দাড়ি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন, শুধু অরো নয়, অরোরা বোরিয়ালিস! হৃদয়-মলের বাবার সাধ্য কি যে থাকে! কিন্তু মতিদার "জীবন-সঙ্গিনী"-কাহিনীতে শুধু চুম্বন-আলিঙ্গনই নাই, ফ্রয়েডও আছেন। ক্রমশপ্রকাশ্য।

—

'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্তা সীতা দেবী লিখিত "পুণ্যস্মৃতি" পাঠ করিবার ধৈর্য্য যাঁহারা দেখাইতেছেন, তাঁহারা

লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, পুণ্যকে অতিমাত্রায় কচলাইলে তাহাই ঘৃণ্য হইয়া উঠে। পুণ্যের এখন পাতাল-প্রবেশের অপেক্ষা মাত্র। সন্তানের নামে প্রসূতির আত্মরক্ষার প্রবাদ এ দেশে চলিত আছে, অতঃপর পুণ্যস্মৃতির নামে আত্মকথা চালাইবার চেষ্টাও প্রবাদবাক্যে পরিণত হইবে।

—

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জয়ন্তী-উপলক্ষে শিল্পী দেবীপ্রসাদ "গুরুর শ্রীচরণে" যে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'অলকা'য় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—

> দৈত্য আসিয়াছে দেবতাকে ধ্বংস করিবার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা লইয়া—ঢাকীর দল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে সব কিছুই বেতালের মধ্যে ফেলিবার জন্য। দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নিজেদের অস্তিত্ব প্রচার করিবার জন্য—ঠিক যেভাবে পঙ্গপাল নিজেদের আবির্ভাব প্রচার করিয়া থাকে। মানুষের নিকট উহাদের প্রয়োজন নাই—তথাপি উহারা বাঁচিতে চায়।

চিত্রশিল্প সম্বন্ধে শিল্পী দেবীপ্রসাদের যাহা বক্তব্য, সাহিত্য-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যও তাহাই। আমাদের আশা এই যে, আধুনিক জগতের বৃহত্তর তাণ্ডব ও বেতালের মধ্যে এই সব ছোটখাটো ঢাকীরা বিশেষ জুত করিতে পারিবে না। অর্থাৎ আমরা মহাকালের দোহাই পাড়িতেছি।

—

কাগজ অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। শুধু দুর্ম্মূল্য নয়, দুষ্প্রাপ্যও হইয়াছে। এই অবস্থায় নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় সাময়িক-পত্র এখনও যে কোনও গতিকে প্রাণরক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে, ইহা নিতান্ত আনন্দের বিষয়। বড় বড় চালু কাগজের কথা বলিতেছি না, তাহারা স্বস্ব "ইনার্শিয়া"র জোরেই

চলিতেছে। আমরা বলিতেছি, সমাজের হিতকারী কয়েকটি অপেক্ষা-কৃত অপ্রচলিত এবং সদ্য-প্রকাশিত পত্রিকার কথা। মনে হইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ লোকসান দিয়া কাগজ চালাইতেছেন। বাংলা দেশের সহৃদয় পাঠকেরা এই সকল পত্রিকার কথা এই দুর্দ্দিনে স্মরণ করিলে পরোক্ষে সমাজেরই উপকার করিবেন। পত্রিকাগুলি এই—

১। ঢাকা হইতে প্রকাশিত ডক্টর সর্ব্বাণীসহায় গুহ সরকার সম্পাদিত **'বিজ্ঞান-পরিচয়'**, দ্বৈমাসিক, দ্বিতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

২। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত **'দর্শন'**, ত্রৈমাসিক, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত ব্যবসায়-বাণিজ্য-বিষয়ক **'সম্পদ'**, মাসিক, পৌষে ১ম বর্ষ শেষ হইয়াছে।

৪। বহরমপুর হইতে প্রকাশিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত সাহিত্য-পত্রিকা **'নিরীক্ষা'**, ত্রৈমাসিক, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী (জনশক্তি) ও শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভদ্র সম্পাদিত সাহিত্য-পত্রিকা **'বিবর্ত্তন'**, মাসিক, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান মাসে (পৌষ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ সমাপ্ত হইয়াছে। রচনাবলীর নবম বা বিবিধ খণ্ড সমাপ্ত হওয়াতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিক উপলক্ষে আরব্ধ এই সুবৃহৎ কর্ম্মযজ্ঞ নিষ্পন্ন হইল। মধুসূদন-গ্রন্থাবলী ও বঙ্কিমচন্দ্রের এই সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সমগ্র বাংলাভাষাভাষীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। আমরা আশা করি, সম্ভব হইলে দীনবন্ধু, ভারতচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের গ্রন্থাবলীও পরিষৎ এই ভাবে প্রকাশ করিবেন। সম্প্রতি প্রকাশিত বিবিধ খণ্ডটি নানা দিক দিয়া মূল্যবান। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের বহু বেনামী রচনা, বাল্যরচনা ও অসম্পূর্ণ রচনা স্থান পাইয়াছে। তাঁহার

শেষ জীবনের হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গবেষণা "হিন্দুধর্ম্ম ও দেবতত্ত্ব" এই খণ্ডের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। বাজারে প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে এই সকল রচনার পনেরো আনাই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থাবলী বাড়িতে আছে বলিয়া যাঁহারা পরিষৎ-প্রকাশিত সমগ্র রচনাবলী সংগ্রহ করিতেছেন না, তাঁহাদিগকে এই খণ্ডটি সংগ্রহ করিতেই হইবে।

এই মাসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আর একটি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। বিরাট পুস্তকালয়ের পুস্তক-তালিকার প্রথমার্দ্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত কত পুস্তক (বিভিন্ন বিষয়ে) মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার একটা ধারণা এই তালিকা হইতেই হইতে পারিবে। মূল্য সাধারণের পক্ষে মাত্র পাঁচ টাকা।

—

গত মাসের মধ্যে যে কয়টি মূল্যবান পুস্তক আমাদের হাতে সমালোচনার্থ আসিয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম। এই পুস্তকগুলির প্রত্যেকটিই সংগ্রহ করিয়া রাখিবার মত। সাহিত্যামোদী পাঠকেরা সত্যই কিছু খোরাক পাইবেন।

১। অগ্নতনী, কাব্য, সুশীলকুমার দে, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স — ২৲
২। ক্ষণ-শাশ্বতী, কাব্য, জগদীশ ভট্টাচার্য্য, পরাগ পাবলিশার্স — ১৷৹
৩। আকাশ, কাব্য, মৃণালকান্তি দাশ, বাণীচক্র ভবন, শ্রীহট্ট — ১৲
৪। কৃষ্ণদ্বীপের রাণী, গল্প, পশুপতি ভট্টাচার্য্য, ডি. এম. লাইব্রেরি — ২৲
৫। এদিক-ওদিক, গল্প, কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য, শ্রীহট্ট — ১।০
৬। শিকারের কথা, শিকারবিষয়ক, অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং — ২৷৹
৭। Pakistan Examined, প্রবন্ধ, Rezaul Karim, বুক কোম্পানী লিমিঃ — ১৷৹
৮। রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ, জীবনী, রমাপতি দত্ত, ১৯৯ বি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট — ৩৲
৯। কবি-প্রণাম, রবীন্দ্র-স্মৃতি, বাণীচক্র ভবন, শ্রীহট্ট — ১৷৹

সমালোচকের প্রতি

দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর,
কবি হইবারে দে আমারে অবসর
ময়ুরপুচ্ছে সাজিয়া, নীপের ডালে,
সুমধুর কেকা তুলিব যেমনি তালে—
পেখম মেলিয়া নৃত্য করিব শুরু,
অমনি তোমরা গর্জ্জিবে গুরু গুরু।
নহি কেকাবল, তোমরাও নহ মেঘ—
থাম দয়া করি করহ নিরুদ্বেগ।

জানি তোমাদের অনেক বিদ্যা আছে,
দেশী ও বিদেশী থাকে কোটেশন কাছে।
যদি বা একটু ভাব-ঘরে চুরি করি'
অমনি তোমরা আসিবে—চাপিয়া ধরি
বাহির করিবে বৈষ্ণব পদাবলী—
কেহ উজাড়িবে বিদেশী কাব্য-থলি।
চোর ধ'রে দেবে একেবারে হাতে হাতে,
মিহি মোটা সুরে চেঁচাইবে এক সাথে।

থাক থাক, রাখ বিদ্যার জারিজুরি,
জানি না যাদের, তাদের ভাঁড়ারে চুরি
ধরিয়া দেখাও অতিশয় বাহাদুরি—
আমরা গোবর, তোমরা গোবর-ঝুড়ি!

শ্রীমতী মালবিকা রায়

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

February, 1942.

১৪শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৪৮ [৫ম সংখ্যা

গুরু-বন্দনা

হে গুরু, তোমার ইঙ্গিত অনুসরি
অনেক সহজে দিয়েছি জলাঞ্জলি,
কঠিন হয়েছি কঠিনতন্ত্রে বরি
দেবীমন্দিরে দানিতে আত্মবলি।
তুমি এইবার পরীক্ষা লহ গুরু,
মুক্তিযজ্ঞ আমরা করিব শুরু।

ভুল হয়েছিল, ভুলের দিতেছি দাম ;
দেবতার নামে যাদের আত্মরতি,
থাকিবে না তারা যারা চাহিয়াছে নাম,
সারা দেশ জুড়ে আনিয়াছে দুর্গতি ;
হে গুরু, শুনাও শোধন-মন্ত্রবাণী
বিষম আঘাতে সেই মূঢ়দের হানি।

বাজে রুনুঝুনু পায়ে মনোহর বেড়ি,
তুমি শিখায়েছ সে নহে অলঙ্কার ;
মেঘে ও বজ্রে বাজুক বিজয়-ভেরী,
কঠিন আঘাতে ভেঙে যাক কারাগার।
মৃত্যুর মাঝে বন্দীরে দাও ডাক,
হয় সে মরুক, না হয় মুক্তি পাক।

হে গুরু, ঘুচাও আরামের আশ্রয়,
বজ্রদহনে দাহন মোদেরে কর—
অনেক হীনতা হইয়াছে সঞ্চয়,
বহু জঞ্জাল আমরা করেছি জড়ো।
সব অশুচির শুচি যে বহ্নিকণা
তুমি জ্বেলে দাও, বাতাসে তুলুক ফণা।

উপমা

শবরীর প্রতীক্ষা কি এর চেয়ে ছিল জ্বালাময় ?
এল না শ্রীরামচন্দ্র—মরে বৃদ্ধা তার পথ চেয়ে—
ঐ আসে ঐ আসে পাখা মেলি ঐ আসে ধেয়ে
দিনে দিনে দিন গনি কাটিছে না মোদের সময়।
শবরীর ছিল আশা, আমাদের আশঙ্কা সতত
অনিশ্চিত আশঙ্কায় রাত্রি দিবা হয়ে ওঠে ভারী,
আমি যাব তুমি যাবে ভেঙে গুঁড়া হবে ঘরবাড়ি,
ভয় তত বেড়ে ওঠে একে একে দিন যায় যত।
শবরীর মত নয়, মোরা চাই শবরের পথ,
ঊর্দ্ধ হতে কবে আসি দুর্নিরীক্ষ্য নিক্ষেপিবে বাণ,
সুতীক্ষ্ণ করিয়া চক্ষু, সজাগ করিয়া আছি কান
কবে আসি দেখা দিবে উহাদের শূন্যগামী রথ।
শবরীর সুখমৃত্যু—পরলোকে পেয়েছে ঈপ্সিত,
তক্ষকদংশন-ভয়ে ঘরে ঘরে মোরা পরীক্ষিৎ।

বাংলা গদ্যের আদর্শ

ভূমিকা

পৃথিবীতে যত ভাষা বর্ত্তমানে প্রচলিত, বাংলা ভাষার স্থান তাহাদের মধ্যে মোটেই হীন নয়; বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যা ধরিয়া বিচার করিলে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার মধ্যে বাংলার স্থান সপ্তম। দেড় শত ভাষার মধ্যে সপ্তম স্থান বিশেষ নিন্দার নয়। ভারতবর্ষেরও প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ লোক বাংলাভাষাভাষী—অর্থাৎ আন্দাজ ছয় কোটি মানুষ বাংলা ভাষার সাহায্যে পরস্পর মনের ভাব আদান-প্রদান করিয়া থাকে।

ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের অনুমান অনুযায়ী বাংলা ভাষার সূত্রপাত এইরূপ:—আনুমানিক দুই শত খ্রীষ্টাব্দে এদেশে মাগধী প্রাকৃত চলছিল, আট শত খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাহাই মাগধী অপভ্রংশের রূপ গ্রহণ করে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এই মাগধী অপভ্রংশ প্রাচীন বাংলায় রূপান্তরিত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

নদী যেমন অতি দূর পর্ব্বতের শিখর থেকে ঝরণায় ঝরণায় ঝ'রে ঝ'রে নানা দেশের ভিতর দিয়ে নানা শাখায় বিভক্ত হ'য়ে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছয় তেমনি এই দূর কালের মাগধী ভাষা আর্য জনসাধারণের বাণীধারায় বয়ে এসে সুদূর যুগান্তরে ভারতের সুদূর প্রান্তে বাংলা দেশের হৃদয়কে আজ ধ্বনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্ত-ভূমিকে। আজও শেষ হ'ল না তার প্রকাশলীলা। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে সে বিস্তৃত হয়েছে, মিশ্রিত হয়েছে, গভীর হয়েছে তার প্রবাহ, দেশের সীমা ছাড়িয়ে সর্বদেশের আবেষ্টনের সঙ্গে এসে মিলেছে। সেই দূর কালের সঙ্গে আমাদের এই বর্তমান কালের নবজাগ্রত চিত্তের মিলনের দৌত্য নিয়ে চলেছে এই অতিপুরাতন এবং এই অতি-আধুনিক বাক্যস্রোত এই কথা ভেবে এর রহস্যে বিস্মিত হয়ে আছি।

"এই অতিপুরাতন" এখন প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের বিষয়; "এই অতিআধুনিক" বাক্যস্রোতের আদর্শই আমাদের বিচার্য্য। কিন্তু নূতনকে বুঝিতে হইলে পুরাতন ইতিহাসের কিছু পুনরাবৃত্তি আবশ্যক। তবেই ভাষার রহস্য কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত হইবে; প্রাচীনকে বাদ দিয়া একেবারে আধুনিককে লইয়া পড়িলে আমাদের বিস্ময় জাগ্রত হইবে না।

বস্তুতপক্ষে বাংলা গদ্যের হিসাব ধরিতে হইলে এই সত্যটি আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, ভাষার ইতিহাস যত প্রাচীনই হউক, বাংলা গদ্যের ইতিহাস অতিশয় অর্ব্বাচীন। বাংলা গদ্যের সাহিত্য সেদিনও পর্য্যন্ত শিশুমাত্র ছিল। উপরকার আবরণ ভেদ করিয়া শাবক সবে বাহির হইয়াছে, পক্ষোদ্ভেদও হয়তো হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বের উদার আকাশে অবাধে ডানা মেলিয়া উড়িবার মত শক্তি তখনও সে সংগ্রহ করে নাই।

না করিলেও, আশ্চর্য্যরকম দ্রুত ইহার উন্নতি হইয়াছে। বাংলা গদ্যের ভবিষ্যৎ যে সুপ্রসন্ন, আদর্শ যে মহৎ, তাহা ইহার নবজন্মের এক শতাব্দীর মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মত প্রতিভার উদয়েই সূচিত হইয়াছে।

ইতিহাস অল্পকালের বলিয়াই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আলোচনা করিতে বসিলেই বাংলা গদ্যের সমগ্র রূপটি আমাদের ধ্যান করিতে হইবে; ইহার জন্ম, বিভিন্ন বয়ঃসন্ধি বা মোড়, প্রতিভাবান সাহিত্যশিল্পীদের সাধনায় ইহার ক্রমবিবর্ত্তন—ভবিষ্যতের আদর্শ-নির্দ্ধারণে এই সকল বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা আবশ্যক।

পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ অনুধাবন করিলে দৃষ্ট হয় যে, গদ্যের আবির্ভাব পদ্যের পরে হইয়াছে। অবশ্য সূচনা হইতেই কথোপকথনের ভাষা ছন্দমিলের বন্ধন স্বীকার করিয়া চলে না,

কিন্তু লেখনীমুখে ভাষার প্রথম প্রকাশ ছন্দ ও মিলের আশ্রয়েই আরম্ভ হয়; পরে গদ্যে তাহা পরিণতি লাভ করে। আমাদের বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। প্রাচীনতম চর্য্যাপদ রচনার কাল ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। এগুলি ছন্দোবদ্ধ। ইহার পর উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হইতে প্রায় সহস্র বৎসর সময় লাগিয়াছে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাঙালী রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'কেই আমরা প্রথম মৌলিক বাংলা গদ্যগ্রন্থ বলিয়া থাকি, কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য গদ্য নয়। আর কোনও দেশেই পদ্য হইতে গদ্যের আবির্ভাবে এত দীর্ঘ সময় লাগে নাই। বাঙালী জাতির গীতিপ্রবণতার ইহা অন্যতম প্রমাণ।

অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর আজ এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যের ইতিহাস তাহার শৈশবের ইতিহাস। চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ তাম্রশাসন ও তন্ত্রসাধনের উপদেশ প্রভৃতিতে এই কাল পর্য্যন্ত একধরনের বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু বাঙালীর শিল্পী-মন তখন পর্য্যন্ত মঙ্গল-কাব্য, পাঁচালি, টপ্পা ও কবিগানের রচনা ও প্রয়োগে সার্থকতা লাভের চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ সমুদ্রপারের সওদাগরদের ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক-গণের আগমনে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার ফলেই সত্যকার বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, এবং বাঙালীর আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার পরিণতি। ইহাই হইল সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস।

এই আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হওয়ার ইতিহাসও অতি বিচিত্র। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোক শর্ম্মা, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, তারিণীচরণ মিত্র, রামমোহন রায়, রামকমল সেন প্রভৃতি বঙ্গসন্তানেরা

মিলিয়া একধরনের পাঠ্য-কেতাবী বাংলা গদ্য সৃষ্টি করিলেন; রাম-মোহন, মৃত্যুঞ্জয়, কাশীনাথ প্রভৃতি নৈয়ায়িক তর্ক ও শাস্ত্রালোচনার মধ্য দিয়া সেই গদ্যে চিন্তাশীলতার প্রলেপ দিলেন; ভবানীচরণ, জয়গোপাল, গৌরমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি সংবাদপত্রের মারফৎ তাহাকে করিয়া তুলিলেন দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী; কৃষ্ণমোহন, গোপাললাল, গোবিন্দচন্দ্র তাহাতে পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যের ভাবনা দিলেন; অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সেই গদ্যকে আধুনিক বিজ্ঞানের বাহন করিবার চেষ্টায় ইহার পরিধি বিস্তৃত করিলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহিত্যরসসম্পৃক্ত করিয়া এই ভাষার জড়দেহে করিলেন চৈতন্যসঞ্চার। মাত্র অর্দ্ধশতাব্দীকালের মধ্যে এই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল।

নীলমণি বসাক, তারাশঙ্কর, রাজকৃষ্ণ, রামগতি প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতপ্রধান রীতিকে আশ্রয় করিয়া বাংলা গদ্যে সাহিত্যরস সৃষ্টি করিলেন বটে, কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন একদল ইয়ংবেঙ্গল বাংলা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা বরদাস্ত করিতে রাজি হইলেন না। প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি এই দলের। তাঁহারা বিদ্রোহ করিয়া চলতি ভাষার আদর্শে আলালী ও হুতোমী রীতির প্রবর্ত্তন করিলেন। এই দলাদলির বাহিরে একদল অতি উৎকৃষ্ট গদ্যলেখক সংস্কৃত বা অসংস্কৃত কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিকে অবলম্বন না করিয়া নিজেদের রুচি ও রসবিচার মত চমৎকার গদ্যে সাহিত্য রচনা করিতে লাগিলেন; দুঃখের বিষয়, পরবর্ত্তী কালের দুই-একজন সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের প্রখর দীপ্তিতে তাঁহারা হীনপ্রভ হইয়াছেন, আপন আপন যোগ্য সম্মান পান নাই। কিন্তু আজ দীর্ঘ শতাব্দীকাল পরে আমরা দেখিতেছি, বাংলা গদ্যের বর্ত্তমান উন্নতি-বিকাশে ইহাদের দান নিতান্ত সামান্য নয়। দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, রামকমল ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই দলের অন্তর্ভুক্ত।

ইঁহাদিগকে নিষ্প্রভ করিবার মূলে প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা। বঙ্কিমের প্রতিভার স্বরূপ বুঝিতে হইলে তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাংলা গদ্যের অবস্থা একটু আলোচনা করিতে হইবে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার—বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, অক্ষয়কুমার প্রবর্ত্তিত বিদ্যাসাগরী রীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রধানত মহিলাদের জন্য প্রচারিত হইয়াছিল। 'মাসিক পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটি চ্যালেঞ্জ ছিল—

এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে। যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। ১৬ আগষ্ট, ১৮৫৪।

এই 'মাসিক পত্রিকা'তেই প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা হইতে (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫) প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইতে থাকে। 'আলালের ঘরের দুলাল' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই কারণে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দকে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের একটি যুগসন্ধিক্ষণ বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান" সম্বন্ধে আলোচনায় এই আলালী যুগবিপর্য্যয়ের কথা বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনায় বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। তিনি বলিতেছেন—

এক জনের কথা অপরকে বুঝান ভাষা মাত্রেরই যে উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে তাঁহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল।...যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ

বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়।...গ
যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সা
জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।...

...সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্যা নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে-ছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়-কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালি-লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্তপ্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ্ আর কিছুই নাই।...

এই...গুরুতর বিপদ্ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কারণেই হউক, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রতি অবিচার করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় কালীপ্রসন্নের

কীর্ত্তি প্যারীচাঁদের কীর্ত্তি অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। বরঞ্চ যাঁহার হাতে এক দিকে মহাভারতের অনুবাদের মত সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা এবং অন্য দিকে হুতোমী ভাষা রচনা সম্ভব হইয়াছে, তিনি যে কি পরিমাণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহা ভাবিলে আজ আমরা বিস্ময় বোধ না করিয়া পারি না। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—

হুতোম পেঁচাও এই পরিবর্ত্তন সময়ের একটি মহার্ঘ রত্ন; ইহাতে তৎকালীন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র আছে। হুতোম হুতোমীয় ভাষার প্রবর্ত্তক এবং বহু সংখ্যক হুতোমী পুস্তকের আদিপুরুষ। বোধ হয় মৌলিকতায় তৎকালীন সমস্ত পুস্তকের শিরঃস্থানীয়।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ একটি যুগান্তকারী বৎসর। এই বৎসরে হরগৌরীর মত বিদ্যাসাগরী রীতি ও আলালী রীতির সার্থক সমন্বয় ঘটিয়া বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইলেন। এইখান হইতেই পুরাতনের বিদায় ও নূতন সাহিত্যের আবির্ভাব।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত কলিকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্র-জীবন। ১৮৫৮ আগস্ট হইতে তাঁহার চাকুরি-জীবন আরম্ভ হয়। এই সময়ে তিনি পাকা ইংরেজীনবিস। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ইংরেজীতেই হাত পাকাইয়াছেন এবং ঐ সালে তাঁহার ইংরেজী উপন্যাস *Rajmohan's Wife* ধারাবাহিকভাবে *Indian Field* সাপ্তাহিকে বাহির হইতেছে। কিন্তু ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে খুলনায় অবস্থানকালে অকস্মাৎ তাঁহার মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয়। সম্ভবত নিষ্ঠার সহিত বিমাতার সেবা করিয়া মাতৃভক্ত বঙ্কিমের তৃপ্তি হয় নাই, *Rajmohan's Wife* রচনা করিয়া তাঁহার মনে ধিক্কার আসিয়া থাকিবে। কল্পনা তখনও দিগন্তবিস্তারী নয়,

মূলধনও কম—তথাপি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই নিজের ইংরেজী কাহিনী মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতে বসিলেন। এক অধ্যায়, দুই অধ্যায়, তিন অধ্যায়—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর পক্ষে কোনও বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি, তাহা যে ভাষাতেই হউক, সুখপ্রদ ও সহজসাধ্য নয়। অনুবাদ অগ্রসর হইল না। 'রাজমোহনের স্ত্রী' সূত্রপাতেই পরিত্যক্ত হইল।

এখান হইতেই হইল বাংলা গদ্যের নবজীবনের সূচনা। 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্ত্তী জীবনে লিখিয়াছিলেন—

উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়। এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর 'এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং একের বিষয় ভেদে প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।

এই "বাঙ্গালি লেখক" বঙ্কিমচন্দ্র নিজে। বিষয় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যাসাগরী রীতি ও আলালী রীতির সমন্বয়-সাধন করিয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। প্রাচীন ও নবীনকে কেন্দ্র করিয়া এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই আধুনিক আদর্শ গদ্যের আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই আয়োজন ও উপকরণ সম্পূর্ণ ছিল ;—ইংরেজী সাহিত্যে ও ভাষায় অসামান্য দখল, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার, বিদ্যাসাগরী ও আলালী রীতির আদর্শ। লোকোত্তর প্রতিভার সংস্পর্শে সেদিন যে সৌধের ভিত্তিপত্তন হইল, সমগ্র বাঙালী জাতিকে যে তাহা একদিন আশ্রয় দিবে, সেই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে কেহ কি তাহা কল্পনা করিতে পারিয়াছিল ?

জড়তা ও অনভ্যাসের যে সংশয় ছিল তাহা কাটিয়া গেল, সক্ষম সাধকেরা উপযুক্ত উপকরণ লইয়া জয়যাত্রায় বাহির হইলেন—বাংলা গদ্যের পরবর্ত্তী ইতিহাস এই জয়যাত্রার ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে সেই নবজাগরণের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছেন—

বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি···কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য।···মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিতা হইতে লাগিল।

ভাষা-ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র যে খাত খনন করিয়া দিলেন, বাংলার গদ্য-সাহিত্য আজিও প্রধানত সেই খাতেই প্রবাহিত হইতেছে; রবীন্দ্রনাথ এই খাতেই বিপুল আনন্দ ও রসসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন এবং আমরা আজ যে গদ্য-সাহিত্যের গৌরব করিতেছি, তাহা মূলত বঙ্কিমচন্দ্রে শুরু হইয়া দিনে দিনে পরিপুষ্ট হইয়া চলিয়াছে। এই পথে এই ভাষা ও সাহিত্যের বিরাট সম্ভাবনা আজিও বাধাগ্রস্ত হয় নাই।

চক্রবৎ—

বাঁধাকপি, মটরশুঁটি, গলদাচিংড়ি, ভেটকিমাছ,
গিন্নীরা সব পালিয়ে গেছে, সঙ্গে গেছ তোমরাও?
বোমার ডরে হেঁসেলঘরে কলকাতাতে বাঁদর-নাচ,
চাকররা সব ঠাকুর হ'ল, শুদ্ধ হলেন ডোমরাও!
আমরা সবাই সুখেই আছি, খুলছি খালি শার্সি-কাচ,
বালি বালতি সামনে রাখি, হুকুম দেছেন ওমরাহ্‌।

বোলপুর

শীতের বেলায় তপ্ত রৌদ্রে উড়িছে ধূসর ধূলা—
সীমাহীন মাঠে মরীচিকা-মায়া জাগে ;
শিমুলের ফল পাকে নি এখনো বাতাসের আগে তুলা-
আঁশ উড়ে উড়ে চোখে মুখে নাহি লাগে।
তালীবন-শিরে উত্তুরে হাওয়া করিতেছে সিরসির—
তারি শিহরণে ফাটিছে খুকীর গাল,
এদিকে অজয় ওদিকে কোপাই হতেছে ফল্গুনীর—
বর্ষার নদী শীতে যেন কঙ্কাল।
মাঠে ধান-কাটা হইয়াছে সারা—আটি আটি পাকা ধান
বোঝাই হইয়া গিয়াছে গরুর গাড়ি,
খামারে মরায়ে হইতেছে বাঁধা লক্ষ্মী-মায়ের দান,
মহাসমারোহে সিদ্ধ হতেছে হাঁড়ি,
সকাল সন্ধ্যা অবিরাম তালে ঢেঁকিতে পড়িছে পাড়,
আতপ-গন্ধে বাতাস সুবাসময় ;
মাড়াই হইয়া গাদা গাদা খড় শোভা পায় সারে সার—
ঘর নে রে ছেয়ে, আসিয়াছে সুসময়।

রেল-লাইনের ধারে ধারে দেখি সারি সারি ধান-কল
চোঙার আকারে আকাশে তুলেছে মাথা,
কয়লা খাইয়া মিশকালো ধোঁয়া উদ্গারে অবিরল,
ধূম্র-মলিন সবুজ গাছের পাতা।
পথের দুধারে সেই পাতাদের দেখি গৈরিক শোভা—
কখনো সবুজ ছিল তা হয় না মনে,

ধূলো আর ধোঁয়া ডাঙা ও খোয়াই খ'ড়ো ঘর আর ডোবা—
এ বোলপুরের পরিচয় মোর সনে।
দূর হতে দেখি পথ চলিতেছে গেঁয়ো লোক দলে দলে—
ভিন গাঁ হইতে আসে হেথাকার হাটে,
লাঠির আগায় বোঁচকা বাঁধিয়া যত সাঁওতাল চলে—
যেতে হবে দূর, সূর্য্য নামিছে পাটে।
কৌপীন-পরা পুরুষ এবং মেয়েরা গামছা-পরা
যত চলে পথ তত বেশি কয় কথা ;
কলের কবলে প্রকৃতি মানুষ এখনো পড়ে নি ধরা,
ধূলি ধোঁয়া ঠেলে জাগে প্রাণ-ব্যাকুলতা।

ভারমন্থর গরুর গাড়ির চাকার কান্না শোন—
ধূলা বালি কেটে চলে ঘসঘস করি,
দূর দিগন্তে পথ চলিয়াছে নাই তার শেষ কোনো—
নিশিদিন চলে গো-গাড়ির খেয়াতরী।
কখনো দেখি যে মোটরের ছই কভু টায়ারের চাকা,
পুরাতন আর নূতনেতে মেশামেশি
এই বোলপুর—নূতন ধোঁয়া ও পুরাতন ধূলা ঢাকা ;
নূতনো হতেছে পুরাতন শেষাশেষি।
ডাঙায় ডাঙায় ছাড়াছাড়ি হয়ে তাল-খেজুরের মেলা—
তারি মাঝ দিয়ে চলিয়াছে রাঙা পথ,
তৈলবিহীন চাকার ভাষণে মুখরিত দুই বেলা,
চলে অবিরাম জগন্নাথের রথ।
পাশ দিয়ে গেছে রেলের লাইন, প্রহরে প্রহরে চলে
মাল ও মানুষে বোঝাই বাষ্পগাড়ি,

ঘরের ছন্দ কেটে কেটে যায় বাহিরের কোলাহলে,
অটুট তবুও রয়েছে বনেদী বাড়ি।

জেলেপাড়া ওই, পড়ন্ত রোদে জেলেরা বসেছে সবে
তকলি ধরিয়া বুনিছে খ্যাপলা-জাল,
ডোমপাড়া হোথা, কান ঝালাপালা সমবেত কলরবে—
শূয়োর মুর্গী কুকুর গরুর পাল।
হাড়ীমুচীদের পাড়া কাছাকাছি, ধোঁয়ায় অন্ধকার—
পাতা পুড়ে পুড়ে তৈরি হতেছে টিকে।
গয়লাপাড়ায় সাঁজাল দিয়েছে ওদিকে যেও না আর ;
চড়েছে ভিয়েন, এস এস এই দিকে—
চাটাই বিছিয়ে ময়রা বামুন দেয় বাতাসার বড়ি,
ওদিকে কদমা কাটা হইতেছে তারে।
সন্ধ্যা হতেই বাগ্দীপাড়ার টনক গিয়েছে নড়ি—
চৌকিদারেরা লাঠি তুলে নেয় ঘাড়ে।
বামুন কায়েত পাড়ার হিসাব অঙ্কে মেলে না জানি—
এখানে ওখানে ছড়িয়ে তাহারা আছে।
খুঁজে দেখে নাও কোথায় রয়েছে তাড়ির দোকানখানি,
বন্ধুর ঠিকানা মিলিবে তাহারই কাছে।

উত্তরে যাবে ? উত্তরায়ণ—সেখানে ঠাকুর রবি
অস্তে গেছেন, ভারী ফাঁকা ফাঁকা লাগে,
কারো গুরুদেব কারো কাছে তিনি ছিলেন বিশ্বকবি,
বাবুমশায়ের মুখ শুধু মনে জাগে।

এসেছি গিয়েছি লাল পথ ধরি দেখেছি বারান্দায়
ইন্দ্রের মত বসেছেন সভা করি,
যাই আর আসি অভ্যাসমত চেয়ে চেয়ে দেখি হায়—
প্রাণের ঠাকুরে কে নিয়েছে অপহরি !
রেল থেকে নেমে এই পথে কত বিচিত্র নরনারী—
সাহেব ও মেম, চীনে ও জাপানী কত
সাতই পোষের মেলায় এবার আসে নাই সারি সারি—
ঠাকুরের সাথে গেছে ভক্তেরা যত।
শুধু স্মৃতি নিয়ে রয়েছে পড়িয়া শান্তির নিকেতন,
ধূলি ও ধোঁয়ায় কাঁদিতেছে বোলপুর—
কভু কি আবার আসিবে ফিরিয়া এদের বুকের ধন,
ডাঙায় আবার লাগিবে বনের সুর ?

ব্যোম

অসীম উদার নভোমণ্ডল তোমারে নমস্কার,
প্রণমি তোমায় ইথার-স্বরূপ ব্যোম—
তোমার রাজ্যে বেতার-বার্ত্তা ছুটিতেছে অনিবার
টোকিও মস্কো লণ্ডন ভিচি রোম।
বাধে না লড়াই বেতারে বেতারে শত তরঙ্গ চলে-
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কভু হয় না কো হানাহানি,
তুমি চিরদিন শোভিছ আকাশ, সহস্র শতদলে
শত্রুমিত্র বহিছ সবার বাণী।
বার্লিনে যবে হিটলার ছাড়ে গভীর সিংহনাদ
সে বার্ত্তা তুমি শুনাও জগৎজনে,
অমনি ওদিকে বজ্রকণ্ঠে চার্চ্চিল সাধে বাদ—
তরঙ্গ মেপে যার যা ইচ্ছা শোনে।

হে শূন্য, তব শূন্য কখনো ভরিবে না কোলাহলে—
সকলি শুষিয়া করিছ কণ্ঠ নীল,
তোমার ইথার ভাল তো বাসে না কোনো দেশে কোন দলে-
লক্ষ ধারায় নাহি কোনো গরমিল।
কোটি তরঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ছুটিছে বিমানপথে
থামিবে না কভু, রবে অনন্তকাল,
কাহার কণ্ঠ কেহ চিনিবে না অদূর ভবিষ্যতে,
কালই ভেসে যাবে চিহ্নের জঞ্জাল।
বিভেদ বিরোধ রবে না কিছুই—ঢেউয়ের উপরে ঢেউ;
আজ মোরা ভাবি চরম বার্ত্তা যাহা—
তোমার আকাশে হবে দিশাহারা খুঁজিয়া পাবে না কেউ,
কেবা বাখানিবে কে বলিবে আহা আহা।

আমার ঘড়িতে আটটা বেজেছে শুনিতেছি বার্লিনে
হিন্দী ভাষায় চীৎকার দাপাদাপি,
এক চুল কাঁটা সরাই যদি বা, চ'লে যাব মহাচীনে—
যুবতীকণ্ঠে গান উঠে কাঁপি কাঁপি।
কোথাও রাত্রি হয়েছে গভীর কোথাও প্রখর দিবা,
কেহ গান গায় কেহ ঢালে হলাহল,
লক্ষ কণ্ঠে লক্ষ শ্মশানে ডাকে সারমেয় শিবা—
তোমার শান্তি তবু রয় অবিচল।
মাটির ধরায় তরঙ্গ ছেঁকে আমরা হাঁপায়ে উঠি—
তুমি কি বিরাট বুঝি যে পরিষ্কার,
ঢেউ-ধরা খেলা হতে মন মোর নিমেষে মাগে যে ছুটি
আকাশ, জানাই তোমারে নমস্কার।

ছোটগল্প

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তিটি নিঃশব্দ নিপুণতা সহকারে বাতায়নপথে প্রবেশ করিল। দীর্ঘ দেহ, অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল, ঘনকৃষ্ণ চাপ-দাড়ি। চপলা নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল। লোকটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চপলা, আমি এসেছি।

চপলা চীৎকার করিতে গিয়া থামিয়া গেল। হঠাৎ সে তপনকে চিনিতে পারিল।

তপন! তুমি! এতদিন পরে!

হ্যাঁ, দশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টা আজ সফল হয়েছে, আজই জেল থেকে প্যালিয়েছি। আর দেরি ক'রো না, চল শিগগির।

কোথায়?

প্ল্যান ঠিক ক'রে ফেলেছি। প্রথমে চাটগাঁ, তারপর রেঙ্গুন, তারপর পাহাড় পেরিয়ে—

চপলা চুপ করিয়া রহিল।

তপন হাসিল।

তোমার সিঁদুরটা দেখতে পেয়েছি। জেলে ব'সেই খবর পেয়েছিলাম। তুমি বীরের গলায় মালা দেবে বলেছিলে না? অবশ্য তোমার স্বামীও কম বীর নন; রায়সাহেব হওয়া সোজা কথা নয়।

তুমি অমন ক'রে ঠাট্টা ক'রো না। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকব, সে প্রতিশ্রুতি আমি রাখতে পারি নি। আমায় ক্ষমা কর তুমি।

তপন সস্মিতমুখে চাহিয়া রহিল। ইহারই প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া, ইহারই চক্ষে নিজেকে মহনীয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য দেশের কাজে সে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল। চপলার বয়স সহসা যেন দশ বছর কমিয়া গেল। অতীত-যৌবনের অবলুপ্ত উন্মাদনা আবার অকস্মাৎ যেন তাহার দেহে মনে ফিরিয়া আসিল।

আমি যদি যাই, আমাকে নিয়ে যাবে?

সেইজন্যেই তো এসেছি। কিন্তু রায়সাহেবটি?

ওঁর অবশ্য কষ্ট হবে খুব। আর তা ছাড়া—

সহসা চপলা থামিয়া গেল।

তা ছাড়া কি?

বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল, সব উনি জানেন।

কি ক'রে জানলেন?

আমিই বলেছিলাম।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চপলা বলিল, তুমি জেল থেকে পালিয়েছ, আমিও যদি পালাই, উনি সব বুঝতে পারবেন, আর তা হ'লে হয়তো—

চপলা কথাটা শেষ করিল না।

তপন বলিল, তা হ'লে হয়তো ওঁর চেষ্টায় অবিলম্বে ধরা প'ড়ে যাব আমরা। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে, সে বিষয়ে নিষ্কণ্টক এখনই হতে পারি। পকেট হইতে রিভল্‌ভারটা টানিয়া সে দেখাইল। তোমার স্বামী ক্লাব থেকে কোন্ পথে ফিরবেন তা জানি।

চপলা চুপ করিয়া রহিল।

বল, রাজি আছ?

চপলা নির্নিমেষে তপনের মুখের পানে চাহিয়া ছিল।

মৃদুকণ্ঠে বলিল, আছি।

এতদিন যার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে একত্র বাস করলে, তাকে এত সহজে ছেড়ে যাবে? যেতে পারবে?

চপলা তাহার মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তপন এ কি বলিতেছে? সে কি জানে, তাহার জন্য কত বিনিদ্র রজনী সে যাপন করিয়াছে? সে কি বুঝিতে পারিবে, কিসের তাড়নায়, কিসের জ্বালায় সমাজের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে সে বিবাহ করিয়াছে? নারীর ব্যথা, নারীর দুর্ব্বলতা, নারীর সমস্যা, নারীহৃদয়ের দুর্ব্বোধ্য জটিলতার কতটুকু জানে সে? কতটুকু বোঝে? বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই তপন পর হইয়া যাইবে? তপনই তো তাহার স্বামী, তপনই তো তাহার আরাধ্য দেবতা, সে স্বয়ং আসিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া দিবে?

তপন পুনরায় প্রশ্ন করিল, যেতে পারবে?

পারব।

চপলার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

এক ঘণ্টা পরে দ্বারপথে শব্দ হইল।

তড়িৎস্পৃষ্টবৎ চপলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বার ঠেলিয়া রায়সাহেব প্রবেশ করিলেন, তপন নয়। তপন আর ফিরিল না।

"বনফুল"

তুক

আঙুল দিয়ে কানে, মাটিতে বুক রেখে,
একটু ক'রে থেকো ব্যাদান মুখ,
তবেই জেনো দাদা, বিপদ কেটে যাবে,
বলেছে গুণীজন ইহাই তুক।

নিশিপালন

রাত্রি বারোটা বাজিল ঘড়িতে দাঁড়ান্থ বারান্দায়,
সারি সারি বাড়ি দাঁড়িয়ে স্তব্ধ কি যেন আশঙ্কায়।
আলো নাই পথে, একটার আগে
কাজ সেরে গেছে, কত আর জাগে
গ্যাসের কুলীরা ; শীতের রাত্রি, কেহ নাই পাহারায়।
খড়খড়ি-পথে ক্ষীণ আলোরেখা একটি না বাহিরায়।

আকাশের পানে তুলিয়া চক্ষু একেলা দাঁড়ায়ে থাকি,
শেষ ট্রামটাও ফিরে গেছে ঘরে ঘণ্টার ডাক ডাকি।
বকুলগাছের তলায় কুকুর
থেকে থেকে তোলে কি করুণ সুর !
দূরে চীৎপুরে শাণ্টিং করা কখনো থামিবে না কি,
শেষ হবে না কো মাল-চলাচল, কিছু থাকিবে না বাকি ?

লৌহযানের ধাক্কা-নিনাদ, ধকধকে ইঞ্জিন,
কাছে এলে ভাবি কানের পাশেই, দূরে গেলে বাঁশী ক্ষীণ।
ঘুমের সুযোগ নিয়ে যেন কারা
গোপনে বমাল ছেড়ে যাবে পাড়া ;
আওয়াজের চোটে ঘুমঘোরে দেখে দুঃস্বপ্নের "সীন",
অনিদ্রারোগী খেয়ে ফেলে ভুলে ক্যাফিয়া-অ্যাস্পিরিন।

রসিকতা থাক, মধ্যরাত্রে দেখি শহরের রূপ,
বড় বড় বাড়ি মনে হয় যেন কালো আঁধারের স্তূপ ;
ভয়ে গা কেমন ছমছম করে,
মনে হয় যাই শুই গিয়ে ঘরে,
ওপারে টিনের চালার শিশির ভুঁয়ে পড়ে টুপটুপ—
পেতেছি তাহাই স্পষ্ট শুনিতে চারিধার এত চুপ।

আকাশের পানে চেয়ে আছি তাও ধোঁয়ায় অন্ধকার,
একটি তারকা জ্বলে মিটিমিটি যেন এক চোখ কার,
কান পেতে যেন পাই শুনিবারে
কারা আসিতেছে আকাশ-পাথারে ;
ঘুমন্ত পুরী উঠিবে জাগিয়া লেগে যাবে মহামার,
ঘুমের মাঝারে জড়ো হয়ে ওঠে আর্ত্তের হাহাকার।

দূর গলিপথে বিড়ালের ছানা কাঁদিতেছে অবিরাম,
জানিতে পারিয়া ঘোষণা করে কি শহরের পরিণাম ?
কভু মনে হয় হয়েছে মুখরা
সন্তানশোকবিধুরা এ ধরা,
একটানা কাঁদে একটি একটি লইয়া ছেলের নাম—
আমারো নাম কি ? মধ্যরাত্রে শিহরিয়া উঠিলাম।

ভয়ে হাসি পায়, পায়চারি করি, দেখি যে ঘড়ির কাঁটা—
বারোটা বাজিয়া তেইশ মিনিট, ঘুম ঘুম করে গা-টা ;
পথে লোক চলে একটি কি দুটি—
কেহ দ্রুত তালে কেহ গুটিসুটি,

একে অন্যেরে দেখিয়া ভাবিছে গুণ্ডা কি গাঁটকাটা ;
গান গেয়ে ওঠে আর্ত্তকণ্ঠে বাড়াতে বুকের পাটা।

সৌধপুরীর এই প্রেতরূপ কেহ কি দেখেছে আগে ?
নিশি নিঃঝুম সহিতে না পেরে ভয়ে নিশাচর ভাগে।
ক্লান্ত পুলিস খাড়া বাঁটে বাঁটে
মাথায় পাগড়ি, টুপি নিয়ে পিঠে,
হঠাৎ শুধালে ভুলিবে বলিতে কোন্‌টা কখন লাগে ;
সাইরেন ছুঁয়ে এ. আর. পি.-বাবু পালা ক'রে রাত জাগে।

বিলাতী হোটেল বন্ধ ; বন্ধ ইসলামী কাফিখানা।
মোড়ে মোড়ে নাই পানের দোকান কে দিবে সেথায় হানা ?
মানসনেত্রে দেখিতে যে পাই
কোকেন-বিলাসী তুলিতেছে হাই।
জুয়া-আড্ডায় জমায়েৎ হতে কেহ কি করেছে মানা ?
বোমার ভয়েতে মানিছে সবাই পুলিসের পরোয়ানা ?

মৃত্যুর ভয়ে সুদৃঢ় হয়েছে মাতালের শ্রীচরণ—
শোনা নাহি যায় খানায় পড়িয়া বাতাসের সহ রণ ;
রূপজীবিনীরা দরজায় বসি
নাহি ঝলকায় নয়নের অসি,
বহির্বিলাসী বাবুরা অনেকে করেছে গৃহবরণ—
তিমিরচারীরা বাসিছে না ভাল তমিস্রা-আবরণ।

সহিতে পারি না মানসবিলাস, ঘড়িতে একটা বাজে—
এত বড় বাড়ি, কাছে কেহ নাই, ভয় জাগে মন-মাঝে।
তরাস-বিমূঢ় শহরের শোভা
গাঢ় নিশিযোগে নহে মনোলোভা ;—
ভালবাসি যারে আলোকোজ্জ্বল চটুল চপল সাজে,
গুণ্ঠন তার পারি না সহিতে হোক ভয়ে হোক লাজে।

কত বিচিত্র ভাবনা মনের, কত পুরাতন স্মৃতি—
মনে হ'ল সেই নিশীথ-বাসর হাসিগান কলগীতি ;
অ-সুর আসিয়া জানি দিবে হানা,
দিক, তাহাদের করি না কো মানা—
সহিতে পারি না আসিবে আসিবে এই ভয় নিতি নিতি,
অসহ ঠেকিছে অনিশ্চিত এ নিশীথ-শয়ন-ভীতি।

নিবিড় আঁধারে দক্ষিণ মুখ ফিরায়েছে মহাকাল,
কুঞ্চিত হয়ে উঠিয়াছে দেখি মহারুদ্রের ভাল।
কোথা অরণ্যে প্রান্তরে নভে
হিংস্র মানুষ জাগে কলরবে,
পৃথিবী জুড়িয়া পথে জনপদে হিহি করে কঙ্কাল ;
ধ্বনি বিচিত্র মিলিয়া গগনে বাজিতেছে করতাল।

মধ্যরাত্রে সহসা শুনিনু ভয়াবহ চীৎকার—
কারা কাঁদিতেছে, রাখ রাখ রাখ, কারা হাঁকে, মার মার।
মনে হ'ল যেন আমারি মাথায়
বোমা পড়ে আর বোমা ফেটে যায়—
সহিতে নারিনু, ঘরেতে পশিয়া রুধিয়া দিলাম দ্বার ;
ভিতরে বাহিরে মাটিতে আকাশে সমান অন্ধকার।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ও চণ্ডীদাস-পদাবলী

চণ্ডীদাস-পদাবলীর শ্রবণমনরসায়ন অমিয়া-নির্ঝর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'রই বক্ষোনির্গলিত রসধারা। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' যে অপূর্ব্ব কাব্যের প্রাণবস্তু জাগরণের সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল, পদাবলীতে তাহাই পরিপূর্ণ আত্মবিকাশে সার্থক হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কার প্রেমের, রসের, কাব্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন মাত্র। জন্মখণ্ড হইতে যমুনাখণ্ড পর্য্যন্ত তো একটা একটানা গ্রাম্য কামপ্রাগল্‌ভ্যের ফিরিস্তি। কবিও ইহা বুঝিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, এ ভাবকে কেন্দ্র করিয়া রসসৃষ্টি অসম্ভব। তাই বালখণ্ডে তিনি রাধাকে পঞ্চবাণে হত্যা করাইয়া নূতন করিয়া তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহাকে রসসৃষ্টির অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। এই প্রথম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র চিরপ্রগল্‌ভা, মুখরা, প্রেমবিমুখী রাধা সমস্ত অন্তরখানা নিঙড়াইয়া বেদনাতুর কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন, 'কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে!' বাঁশীর শব্দে রাধার প্রাণ কণ্ঠাগত হইল, তাঁহার মন পুড়িল,—'বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানি। মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥' 'সুসর বাঁশীর নাদে' রাধা রাঁধনের 'জুতী' হারাইলেন, সব ভুল হইয়া গেল,—তিনি পটল মনে করিয়া কাঁচা সুপারিই ভাজিয়া ফেলিলেন, শাকে রন্ধনস্থালীর কানাসই জল ঢালিয়া দিলেন, ছোলঙ্গলেবু টিপিয়া নিমঝোলে দিয়া ফেলিলেন। 'নবকিশলয়' তাঁহার 'দহন সমান' মনে হইল, তিনি 'চাঁদ সুরুজে'র ভেদ ভুলিলেন, তাঁহার দশদিক শূন্য মনে হইল, প্রাণ উৎকণ্ঠায় আতুর হইল, সেই 'গোপনন্দন গোবিন্দ'কে আপন 'কুচযুগের চন্দনে' 'বন্দন' করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'র প্রগল্‌ভা প্রেমবিমুখী রাধা পদাবলীর প্রেমবিহ্বলা প্রবণায়িত-চিত্তা মধুর রাইমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। পদাবলীর রাইয়েরই মত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র বিরহিণী রাধা মুকুতার হার ছিঁড়িয়া, সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া, শঙ্খবলয় চূর্ণ করিয়া, কেশ মুড়াইয়া, যোগিনী সাজিয়া দেশান্তরে যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্পা। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র রাধার এই প্রেমাতুর চিত্তটি পদাবলীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অপরূপ মাধুর্য্যসৌষ্ঠবে লীলায়িত।

কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কারের রসসৃজনে আর এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হইল। রাধাচরিত্র রসানুকূল যদি বা হইল, কৃষ্ণ নূতন করিয়া বাঁকিয়া বসিলেন। কৃষ্ণ 'ব্রহ্মণচিন্তনে' 'কাএ নির্ম্মল' করিয়া 'আহোনিশি যোগ-ধেআনে' মগ্ন হইয়াছেন, তিনি আর রাধাকে দেখিয়া ভুলিবেন না। রাধা অনুনয় করিতেছেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছেন, 'ছিনারী পামরী নাগরী রাধা কিসকে পাতসি মায়া!' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কার এতাবৎ কৃষ্ণকে কামাতুর করিয়াই অঙ্কিত করিয়া আসিয়াছেন। কৃষ্ণের হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার না হইলে রসের দিকটা যে একেবারে অচল হইয়া পড়ে! এখন রাধার কাতর অনুনয়ে বড়ায়ির মধ্যস্থতায় কৃষ্ণ এক-আধ-বার রাধার সহিত মিলিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অনিচ্ছায়, বড়ায়ির অনুরোধে তিনি যেন উপরোধে ঢেঁকি গিলিলেন। ভাবটা এই প্রকার—আচ্ছা, রাধা আসে আসুক, তাহাকে সাজগোজ করিয়া না হয় পাশে আসিয়া বসিতেই বল। 'বুইল মনোহরবেশ করু গোআলিনী। পাশে আসী বৈসু বোলো মধুরসবাণী॥' তারপরই আরম্ভ হইল কামক্রীড়া,—'ভুজযুগ ধরী কাহ্নে। আল কৈল আলিঙ্গনে॥ ...আল কাহ্নি করল সুরতী' ইত্যাদি। ইহাই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের শেষ মিলন। ইহাতে আর যাহা হয় হউক, রসসৃষ্টি হয় না। তারপর রতিশ্রমে নিদ্রিত রাধাকে ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় পলাইলেন। বড়ায়ি খোঁজ করিয়া যখন তাঁহাকে ধরিল, তখন তিনি প্রায় খোলসা জবাব দিয়া বসিলেন, তিনি আর ফিরিবেন না,—'শকতী না কর বড়ায়ি বোলো মো তোহ্মারে। জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম শুনী তারে॥' রসের দিক হইতে ইহা একটা বেদনাপ্রদ অপূর্ণতা। রাধার একতরফা অনুনয় ও আত্মনিবেদন এবং কৃষ্ণের বিরক্তিভরা বিমতি রসের নিষ্ঠুর অঙ্গহানি করিয়াছে। পদাবলীতে এই ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কারই করুন, কিংবা তাঁহার কবিত্বের উত্তরাধিকারী অন্য কোন চণ্ডীদাসই করুন। পদাবলীর কৃষ্ণের বিশ্ব রাধিকাময়, রাইও বঁধুকে পরাণ হইতে শতগুণে অধিক করিয়া মানিতেছেন। প্রেমের পরম পরিণতি উভয়ের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনে। রাই বলিতেছেন, 'বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।' শ্যাম বলিতেছেন,

'রাই, তুমি সে আমার গতি।' উভয়ের এমন পরিপূর্ণ আত্মবিলোপ ভিন্ন কি প্রেম সার্থক হয়!

যাহা হউক, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র উদ্ভেদোন্মুখ রসসম্ভাবনাকে পূর্ণাঙ্গ পরিণতি দান করিবার জন্য পরবর্ত্তী চণ্ডীদাস-পদাবলীর সৃষ্টি, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। আলোচনা-মুখে দেখিব, 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'র সহিত চণ্ডীদাস-পদাবলীকারের নিবিড় পরিচয় ছিল। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'র পদগুলির ভাব, ভাষা, বিশিষ্ট শব্দ ও বাগ্বিধি চণ্ডীদাস-পদাবলীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

মূলত, পদাবলীর ভাষার আধুনিকত্বই ইহার রচয়িতাকে অর্ব্বাচীন যুগের কবি, তথা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কার হইতে পৃথক ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন করিবার সুযোগ দিয়াছে। কিন্তু প্রচলনের ফলে বহু হস্তে বিবিধ ও বিচিত্র অঙ্গসংস্কার লাভ করিয়াই যে পদগুলির ভাষা বর্ত্তমান আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, নিঃসন্দিগ্ধভাবেই এ সিদ্ধান্ত করা যায়। নজিরও কিছু কিছু আছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'দেখিলোঁ প্রথম নিশী' পদটি প্রচলনের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য লাভ করিয়া কি ভাবে 'প্রথম প্রহর নিশি' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা বৈষ্ণবপদজ্ঞ প্রায় সকলেই অবগত আছেন। শুধু তাই নয়, চণ্ডীদাস-পদাবলীর বিভিন্ন সংস্করণে 'দেখিলোঁ প্রথম নিশী' পদটির বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গবাসী সংস্করণ, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, বসুমতী সংস্করণ (দ্বিতীয়) প্রভৃতিতে পদটির পৃথক পৃথক পাঠ দেখি। বাহুল্য-আশঙ্কায় পাঠ-বৈষম্যগুলি উদ্ধৃত করা সম্ভব হইল না। এইরূপ বহুধা পরিবর্জ্জন ও সংযোজন প্রক্রিয়ার ফলেই চণ্ডীদাস বর্ত্তমানে সমস্যায় দাঁড়াইয়াছেন। বেওয়ারিশ মাল,—যাঁহার যা খুশি করিয়াছেন।

বহু সংস্কার সত্ত্বেও চণ্ডীদাস-পদাবলীর পদগুলিতে প্রাচীন ভাষার যে জীর্ণাবশেষ রহিয়া গিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। উত্তম পুরুষের 'করিলাম', 'খাইলাম', 'দেখিলাম', 'গেলাম', প্রভৃতি স্থানে 'করিল', 'খাইল', 'দেখিল', 'গেল' প্রভৃতি প্রযুক্ত হইয়াছে। লিপিকারের অনুগ্রহেই 'করিলোঁ', 'খাইলোঁ' প্রভৃতি যে 'করিল', 'খাইল' ইত্যাদি আকার লাভ করিয়াছে, ইহা না বলিলেও চলে। তাহা ছাড়া, 'হউ'

(হউক), 'যাউ' (যাউক), 'মরু' (মরুক), 'থাকু' (থাকুক), 'হকু' (হউক), 'করিথুঁ' (করিতাম), 'যাইথুঁ' (যাইতাম), 'দেখাসসি' (দেখাস), 'করিয়ে' (করি), 'জানিয়ে' (জানি), 'শুতায়ল' (শোওয়াইল) প্রভৃতি বহু ক্রিয়াপদ, 'আরদ্র', 'সারদ্র' প্রভৃতি অপ্রচলিত শব্দ, 'মর্ম্মত' (মর্ম্মেতে), 'বিশ্বক' (বিশ্বের) প্রভৃতির বিভক্তি, 'আমিহ' (আমিও) প্রভৃতির উচ্চারণ, 'জিসের' (যার), 'তেন' (সেই বা সেইরূপ), 'হেনক' (হেন) প্রভৃতির প্রাচীন ভঙ্গি, নিঃসন্দেহে পুরাতনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। এ প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয় বলিয়া সামান্য উল্লেখ মাত্র করা গেল।

কত সহজে, সামান্য পরিবর্ত্তনে ভাষা প্রাচীনত্ব পরিহার করিয়া আধুনিকত্ব পরিগ্রহ করিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'র একটি চমৎকার পদকে রূপান্তরিত করিতেছি।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পদ

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরুজনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥ ১॥
বড়ায়ি গো
কত দুখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী॥ ধ্রু॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো
আল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতে রাখিতে কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ॥ ২॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতিবোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞির সঙ্গে আছে॥ ৩॥

এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি
মোকে নেহ কাহ্নাঞি'র পাশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পরিবর্ত্তিত রূপ

যে কানু লাগিয়া আমি আন না চাহিনু বড়াই
না মানিনু লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পরিহাসে আমা উপেখিয়া রোষে
আন লয়ে বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥
বড়াই গো, কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বলি ঝাঁপ দিনু সে মোর শুকাইল গো
আমি নারী বড় অভাগিনী ॥
নন্দের নন্দন কানু যশোদার পো ওগো,
তার সনে নেহা বাড়াইনু।
গোপনে রাখিতে প্রেম তাকে কত কহিনু গো
তাহার উচিত ফল পাইনু ॥
স্বামী মোর দুরুবার গোয়াল বিশাল
প্রতিবোল ননদিনী বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিয়া দিল
রাধিকা কানুর সনে আছে ॥
এত সব সহি আমি কানুর পীরিতি লাগি
মোরে লহ কানাইএর পাশে।
বাশুলী চরণ শিরেতে বন্দিয়া
গাইল বড় / দ্বিজ চণ্ডীদাসে।

বস্তুত, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন ভাষার মধ্যে যে ভেদ, তাহা 'আকাশ-পাতাল' নহে। কীটদষ্ট জীর্ণ প্রাচীন পুঁথির বক্ষে দুষ্পাঠ্য হরফে বিচিত্র বানানে লিপিবদ্ধ পদগুলি প্রথম দর্শনেই মনে একটা ভয়াবহ সংস্কার জন্মাইয়া দেয়। এই সংস্কারের কুয়াশা ভেদ করিতে পারিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, উভয় যুগের ভাষার সম্বন্ধ কত সহজ ও স্বাভাবিক। পদাবলীর 'সজনী, ও ধনী কে কহ বাটে। গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী নাহিতে দেখিনু ঘাটে' পদাংশটির মাত্র বানান পরিবর্ত্তন

করিলেই দাঁড়ায়,—'সজনি উ ধনি কে কহো বাটে। গোরোচনা গোরি নবীনা কিসোরি নাহিতে দেখিলোঁ ঘাটে ॥' তাহার উপর যদি 'নবীনা' স্থানে 'নহুলী' এবং অন্তে 'আল' বা 'ল সুবল' যুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই উহা একেবারে পাঁচ শতাব্দী পিছাইয়া গিয়া পড়ে। সুতরাং বিভিন্ন লিপিকারের খোশখেয়াল-মাফিক বানান-সংস্কারে, তথা গায়কদের সুবিধামত শব্দাদি সংযোজন ও পরিবর্জ্জনের ফলেই যে প্রাচীন পদের ভাষা আধুনিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। 'চণ্ডীদাস'-সম্পাদক নীলরতনবাবু স্বীকারই করিয়াছেন যে, তিনি পদগুলির বানানের এক প্রস্থ সংস্কার করিয়া লইয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে আরও কতবার যে এই প্রকার সংস্কারক্রিয়া হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে!

বস্তুত, পদগুলি প্রচারিত হইত গায়কদের মুখে মুখে। তাঁহারা ব্যবসায়ের খাতিরে জনগণের বোধসৌকর্য্য, রসসৃষ্টির আনুকূল্য তথা শ্রোতৃচিত্ত আকর্ষণের নিমিত্ত ভাষার কালক্রমিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পদগুলির ভাষাকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। হয়তো পদের কোন শব্দ বা বাক্যাংশ ভুলই হইয়া গিয়াছে, সে স্থলে তাঁহারা আপন মনোমত শব্দটি সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, লিপিকারের কারচুপি তো আছেই। এই সাত নকলেই যে 'আসল খাস্ত' হইয়াছে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং চণ্ডীদাস-পদাবলীর ভাষা দেখিয়া তাহাকে আধুনিক কালের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সমীচীনও নহে, যুক্তিসহও নহে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পদগুলিও যদি বরাবর প্রচলিত থাকিত, তাহাকে নিঃসন্দেহে আধুনিক ভাষার পোশাক পরিতেই হইত।

এ কথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যাইতে পারে যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পদগুলি রচিত হওয়ার পরে বেশি দিন প্রচলিত ছিল না; থাকিলে সব পদই লোকে ভুলিয়া যাইত না। কতকগুলি অন্তত প্রচলিত থাকিতই। পদগুলি প্রচলিত ও প্রচারিত না হওয়ার পক্ষে একটি স্বাভাবিক কারণও অনুমান করা যাইতে পারে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র শিথিলবন্ধ কামসর্ব্বস্ব তরল পদগুলির রচনার অব্যবহিত পরেই যখন চণ্ডীদাস-পদাবলীর

রসপ্রচুর মধুর পদগুলির আবির্ভাব হইল, তখন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পদগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজন হারাইল,—ফলে সেগুলি পুঁথিগত হইয়া বিলুপ্তির কুক্ষি আশ্রয় করিল। পদগুলি প্রচারের সুযোগ পায় নাই, কাজেই অঙ্গসংস্কারও লাভ করে নাই।

এইবার চণ্ডীদাস-পদাবলীতে সংগৃহীত পদগুলির ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। চণ্ডীদাস-পদাবলীধৃত পদগুলির ভাষার মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যে কয়েকখানি বড়ু-নামাঙ্কিত তাহার অধিকাংশগুলিই পালাগানের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, মাত্র লিপিকার ও সংগ্রাহকের হাত ফিরিয়া কতকটা অঙ্গসংস্কার লাভ করিয়াছে। 'সজনী, কি হেরিনু যমুনার কূলে' প্রভৃতি যে কয়েকটি পদ পালাগানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, সেইগুলিই সমধিক আধুনিক ভাষার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছে। তথাপি পদাবলীতে সংগৃহীত বড়ু-নামাঙ্কিত পদ কয়েকটির মধ্যে এখনও যে প্রাচীনত্বটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, পদগুলি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কারের রচিত। লক্ষ্য করিবার বিষয়, চণ্ডীদাস-পদাবলীর অন্যান্য পদগুলির মধ্যে যেগুলি কিছুকাল প্রচলিত থাকার পর লুপ্ত হইয়াছিল, পরে নীলরতনবাবু যেগুলির উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, সেগুলিতেই প্রাচীনত্বের চিহ্ন বেশি রহিয়াছে। আর যেগুলি বরাবর প্রচলিত আছে, সেগুলির ভাষার অবস্থা যাহা হইয়াছে, তাহা তো সকলেই জানেন। প্রথমে চণ্ডীদাস-পদাবলীর বড়ু-নামাঙ্কিত পদগুলির ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত নীলরতনবাবুর 'চণ্ডীদাস' গ্রন্থে সঙ্কলিত 'সাত পাঁচ সখী সঙ্গে' (১৯৬ সংখ্যক) পদটির 'আমিহ', 'তেঁই', 'থাকু', ও 'থাউ' পুরাতন এবং 'সাত পাঁচ' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কারের প্রিয় বাগ্বিধি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' একাধিক স্থানে এই বাগ্বিধিটি ব্যবহৃত হইয়াছে: দানখণ্ডের 'লুণীর পুতলী' পদে আছে,—'সাত পাঁচ সখী সনে বড়ায়ি গো রাধার বচনে'; যমুনাখণ্ডের শেষ পদ,—'আল বড়ায়ি সাত পাঁচ সখী জন লঞা'।

'শুন লো রাজার ঝি' (চণ্ডীদাস, ২৩৪ সংখ্যক) পদের 'আনত' ও

'করসি', এবং 'পীরিতি আনল ছুঁইলে মরণ' (চণ্ডীদাস, ৩৫১ সংখ্যক) পদের 'আনল', 'মরিয়ে' ও 'তেঁই' প্রাচীনত্বজ্ঞাপক।

'জনম গোঁয়ানু দুখে' (চণ্ডীদাস, ৩৫৭ সংখ্যক) পদের 'তাহার উচিত ফল পাইনু', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র রাধাবিরহখণ্ডের 'যে কাহ্ন লাগিআঁ মো' পদের 'গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ। তাহার উচিত ফল পাইনু' স্মরণ করাইয়া দেয়।

'পীরিতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি' (চণ্ডীদাস, ৩৬৭ সংখ্যক) পদের 'নিছনি', 'বোল', 'সোঙরিয়ে', 'জীয়ে', 'নিছিয়া' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র আমলের ভাষা।

'চণ্ডীদাসে'র ৬৮৭ সংখ্যক পদটি নিঃসন্দেহে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কারের রচনা বলিয়া চেনা যায়। পদটি তুলিয়া দিলাম—

ওপারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখা হইয়া উড়ি যাউ পাখা না দেয় বিধি॥
যমুনাতে ঝাঁপ দিব না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে ছিঁচো না ঘুচে পাথার॥
মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ করে বড়াই গো কানু দেখিবারে॥
আর কি গোকুল চাঁদ না করিব কোলে।
হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে॥
আগুনিতে ঝাঁপ দেউ আগুনি নিভায়।
পাষাণেতে দেউ কোল পাষাণ মিলায়॥
তরুতলে যাই যদি সেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি মঞি সে হইল নিদয়া॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে।
ছটফট করে প্রাণ বন্ধু নাহি ঘরে॥

উদ্ধৃত পদটিতে অঙ্গসংস্কারের পরেও অবশিষ্ট 'যাউ', ছিঁচো', 'দেউ' ও 'মঞি' ক্রিয়াপদগুলি রীতিমত প্রাচীন। 'পাখী হইয়া উড়ি যাউ' বাক্যাংশটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' বহু স্থলে ব্যবহৃত 'পাখী জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ', 'পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাওঁ' প্রভৃতি অংশকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 'মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে। সাধ যায় বড়াই গো কানু দেখিবারে ॥' অংশটি এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র

রাধাবিরহখণ্ডের 'দধি দুধে সজাইআঁ চুকে' পদের 'মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে। স্থূণ বড়ায়ি ল। সাদ লাগে কাহ্নাঞিঁ দেখিবারে॥' যে একই হাতের রচনা, ইহা বলিতে বিন্দুমাত্র সংশয়বোধ করি না।

'নন্দের নন্দন চতুর কান' (চণ্ডীদাস, ৭২৬ সংখ্যক) পদটিও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষার সংস্কৃতাবশেষ।

'চণ্ডীদাসে'র পরিশিষ্টে ধৃত 'নিসেদ (নিষধ?) নীলজ বনমালি' পদটিকেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কারের হাতের রচনা বলিবার কারণ আছে। পদটির 'নিসেদ নীলজ বনমালি' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র বালখণ্ডের 'সব গোপ যার মান ধরে' পদের 'নিষধ নিষধ বনমালি' স্মরণ করায়; 'চন্দ্রাবলী' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'কারের রাধা; 'সাত পাঁচ' বড়ুর প্রিয় বাগ্বিধি; এবং 'মাকড়ের হাতে নারিকল' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র নিজস্ব ভাষা।

সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত নীলরতনবাবুর 'চণ্ডীদাসে' 'শুন রজকিনী রামী' এই রাগাত্মিক পদটি 'বড়ু'-ভনিতায় পাইতেছি। আবার চণ্ডীদাস-পদাবলীর সুবিখ্যাত 'স্বজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে' পদটি নীলরতনবাবুর 'চণ্ডীদাসে' 'দ্বিজ'-ভনিতায়, কিন্তু বসুমতী সংস্করণ (দ্বিতীয়) ও বঙ্গবাসী সংস্করণে পাইতেছি 'বড়ু'-ভনিতায়। সম্ভবত, তখনও চণ্ডীদাস দ্বিধাবিভক্ত হন নাই বলিয়াই 'দ্বিজ' বা 'বড়ু' ভনিতার উপর কেহ গুরুত্ব আরোপ করিত না। অথবা, চণ্ডীদাস 'বড়ু' ও 'দ্বিজ' উভয় ভনিতায়ই পদ রচনা করিতেন, এ বিশ্বাস কালপরম্পরাক্রমে প্রাচীনদের মনে দৃঢ় অঙ্কিত ছিল বলিয়া তাঁহারা খোশখেয়ালমত 'বড়ু' স্থানে 'দ্বিজ' বা 'দ্বিজ' স্থানে 'বড়ু' ব্যবহার করিতেন।

যাহা হউক, চণ্ডীদাস-পদাবলীতে বড়ু-নামাঙ্কিত যে পদগুলি প্রচলিত আছে, তাহার কতকগুলিতে ভাষার প্রাচীনত্ব এবং 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন'কারের রচনাভঙ্গি আজও কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে, আলোচনা-প্রসঙ্গে ইহা দেখিলাম। কয়েকটি পদ অবশ্য একটু বেশিমাত্রায় আধুনিকত্ব পরিগ্রহ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে বলা যায়,—সব পদের গাঁথুনি তো সমান নয়। পরিবর্ত্তনের প্রবাহে পড়িয়া কোনটি সহজে সংস্কৃতাগ হইয়াছে, কোনটির বা আংশিক পরিবর্ত্তন মাত্র সম্ভব হইয়াছে।

ক্রমশ

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ

সরোজিনী

৬

পরদিন সকালে বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। দেখিলাম, আমাদের হারানের বোন পদ্ম হনহন করিয়া আসিতেছে। পদ্ম পাঁচ বছরের ছেলে লইয়া কুড়ি বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। স্বামী রামরতন হালদারের অবস্থা মন্দ ছিল না—জমি-জমা পুকুর-বাগান ছিল, দুই-দশ ঘর প্রজা ছিল, কিছু মহাজনি-তেজারতিও ছিল। কিন্তু পদ্ম দ্বিরাগমনে তাহার সংসারে পা দিবার পরেই এমনই এক মামলা ঘরে ঢুকিল যে, তাহার খোরাক যোগাইবার জন্য রামরতনকে সমস্ত সম্পত্তি খোয়াইতে হইল, এবং বৎসর-খানেক জ্বর ও কাসিতে ভুগিয়া যখন সে ইহলোক ত্যাগ করিল, তখন দেখা গেল, পদ্ম ও তাহার পুত্রের জন্য পৈতৃক ভিটাটুকু ও কিঞ্চিৎ দেনা ছাড়া আর কিছুই সে রাখিয়া যাইতে পারে নাই। কাজেই পদ্ম স্বামীর শ্রাদ্ধ কোনমতে সারিয়া মহাজনের হাতে ভিটাটুকু তুলিয়া দিয়া, স-পুত্র ভাই হারানের বাড়িতে আশ্রয় লইল। এখন পদ্মর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, দেখিতে কালো, বেঁটে ও কাহিল। যৌবনে পদ্মর মুখশ্রী মন্দ ছিল না, দেহে লাবণ্যও কিছু ছিল এবং গ্রামের মেয়ে হওয়ার দরুন তাহার গতিও সর্ব্বত্র অব্যাহত ছিল, তবু তাহার খর-রসনার ভয়ে কেহ কোন দিন তাহার পাশ মাড়াইতে সাহস করে নাই। কাজেই পদ্মর সতীত্ব অদ্যাবধি অক্ষুন্ন এবং এইজন্যই গ্রামের মেয়েদের, বিশেষ করিয়া অল্পবয়সী বিধবাদের, সে স্বয়ংসিদ্ধা প্রহরিণী।

পদ্ম আমার কাছে আসিয়া খনখন করিয়া কহিল, গলায় দড়ি দাওগে তোমরা।

কহিলাম, কিসের জন্যে ?

কেন ! প্রবোধ গাঙুলীর 'বউ রাধানাথ গাঙুলীর সঙ্গে কাল থানার দারোগাবাবুর কাছে বেড়াতে গেছল, কত গল্প, কত হাসি-তামাশা ক'রে এল, শোন নি ?

কে বললে ?

দাদা নিজের চোখে দেখেছে, এসবের একটা ব্যবস্থা কর বাপু ! না হ'লে গাঁয়ে বাস করা যাবে না। তা ছাড়া হিন্দু হ'লেও কথা ছিল, মুসলমান—মুসলমানের সামনে হিন্দু মেয়ের মুখ দেখানো—ছিঃ, ছি !

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার দাদা কি করছে ?

পদ্ম জবাব দিল, দাদা কাল সারারাত্রি ঘুমোয় নি। সোজা ব্যাপার নাকি ! বামুনের ঘরের বিধবা বউ ! ধ্যাড়াং ধ্যাড়াং ক'রে একটা পরপুরুষের হাত ধ'রে থানায় বেড়াতে যাওয়া ! আমরা গাঁয়ের মেয়ে হয়ে কোন দিন ওদিকে পা দিই নি। একটু দম লইয়া পদ্ম কহিল, দাদা সকালে উঠেই দাঁতন চিবোতে চিবোতেই গাঙুলী দাদামশায়ের কাছে গেছে।

মণীন্দ্র ঠিক বলিয়াছিল। সরোজিনীর থানায় যাওয়া লইয়া সামাজিক একটা দলাদলির সৃষ্টি হইবে বোধ হয়। কহিলাম, তুমি কোথায় চললে ?

পদ্ম মুরুব্বিয়ানার সহিত কহিল, যাচ্ছি একবার গাঙুলী-পাড়ায়। ব'লে আসি পাড়ায় গিন্নীদের, পুরুষদের দিয়ে একটা ব্যবস্থা করাক, না হ'লে মেয়ে বউগুলোকে আর ঘরে রাখা যাবে না।

বলিয়া পদ্ম দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বৈঠকখানায় ঢুকিতেই দেখি, পত্নী দাঁড়াইয়া আছেন। সংসারের কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকিলেও

বাহিরে কোথায় কি হইতেছে, কে কাকে কি বলিতেছে, কিছুই তাঁহার চোখ ও কানকে এড়াইতে পারে না। কহিলেন, কি বলছিল পদ্ম?

স্বকর্ণেই তো শুনলে।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া পত্নী কহিলেন, তখন বলেছিলাম না?

কি?

ও মেয়ে একদিন উড়বে। যে মেয়ে বিধবা হয়েও মুখে পাউডার মাখে, গায়ে এসেন্স ঢালে, কুঁচিয়ে কাপড় পরে, সে ঘরে থাকবার নয়।

গৃহিণী এরূপ কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন কি না মনে পড়িল না, তথাপি চুপ করিয়া রহিলাম। গৃহিণী কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, দারোগাবাবুর কুঞ্জে কি জন্যে যাওয়া হয়েছিল শুনি?

কি করবে বেচারা? গাঙুলী মশায় প্রজা-খাতকদের আদায় দিতে মানা ক'রে দিয়েছেন।

চোখ দুইটি ডাগর করিয়া গৃহিণী কহিলেন, তাই নাকি! বুড়ো আবার এসব কখন করলে? বিছানায় প'ড়ে ছিল যে!

লোক পাঠিয়ে—

হঠাৎ উচ্চকণ্ঠের ডাক শোনা গেল, ভায়া! আছ নাকি? মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী আবার জুটিয়াছে! গৃহিণী মাথায় কাপড় দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গিয়া বোধ করি আড়ি পাতিতে লাগিলেন। মণীন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া ডান হাতটি তুলিয়া নাড়িতে নাড়িতে কহিল, কেল্লা মার দিয়া।—বলিয়া একটা চেয়ার টানিয়া আমার কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া কহিল, তোমরা বল, দারোগাবাবু খারাপ লোক। প্রতিবাদ করিলাম, আমরা আবার কখন বলি?

বল না? কে বলছিল যেন, মনে নেই। যাকগে, আমি তো দেখলাম, চমৎকার লোক, মহানুভব ব্যক্তি।

চুপ করিয়া রহিলাম।

কিন্তু ভাগ্যে আমি কাল ছুটে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন করিলাম, কি ব্যবস্থা হ'ল কাল?

চমৎকার ব্যবস্থা! রাধানাথ একেবারে খতম।

বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, মানে?

দারোগাবাবু বললেন, দু পক্ষে টানাটানি ক'রে দরকার নেই। একজন তৃতীয় পক্ষের হাতে ভার দেওয়াই ভাল।

সকৌতুকে কহিলাম, তৃতীয় পক্ষটি কে?

কেন, আজিজ সাহেব! পয়সাওলা লোক, তা ছাড়া ওপরওলাদের সঙ্গে খাতির খুব।

তা হ'লে গাঙ্গুলী মশায় আর রাধানাথের বদলে দারোগাবাবু আর আজিজ সাহেব তোমার বোনের কাছে যাতায়াত করবেন, এই তো?

পাগল নাকি! স্বয়ং শর্ম্মা ছাড়া আর কাউকে যেতে হবে না।

কেন? পরামর্শ করতে?

পরামর্শ সব আমার সঙ্গে।—বলিয়া ডান হাত দিয়া নিজের বুকটা চাপড়াইল।

নির্ব্বোধের মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। সে উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল, বুঝতে পারছ না? আমিই আদায়-উসুল করব, আজিজ সাহেব ব'লে-ক'য়ে দেবেন, আর স্বয়ং ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট থাকবেন আমার পেছনে, বুঝলে?—বলিয়া চেয়ারটায় হেলান দিয়া পা দুইটা টেবিলের উপর চাপাইয়া দিল। কিছুক্ষণ ঐ ভাবে

বসিয়া থাকিয়া আবার পা নামাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, কিন্তু মাইনেটা বড় কম।

কহিলাম, সে কি হে, বোনের কাছে মাইনে!

মণীন্দ্র ধমক দিয়া কহিল, মাইনে নয়, মাইনে নয়, মাসোহারা। আমার কত ক্ষতি হবে, সেটা দেখতে হবে তো। পনরো টাকায় চলবে না আমার।

বললে না কেন দারোগাবাবুকে?

মণীন্দ্র ইতস্তত করিয়া কহিল, বলতে পারলাম না, পাছে আবার কিছু গোলমাল হয়ে যায়। তা ছাড়া দারোগাবাবুকে বলবার কি দরকার? নিজের বোন, একটু বোঝালেই হবে।

তাই কর। এখনই যাও না তার কাছে।—বলিয়া টেবিলের উপর হইতে একটা বই তুলিয়া লইয়া পড়িবার উপক্রম করিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, আরে, সেইজন্যেই তো তোমার কাছে আসা। আজ একবার সন্ধ্যের সময় গিয়ে—

বাধা দিয়া কহিলাম, না ভাই, আমাকে আর ওর মধ্যে টেনো না। তোমাদের ব্যাপার অনেক গোলমেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আহত কণ্ঠে মণীন্দ্র কহিল, গোলমেলে কি হে! এখনই তো বরং সোজা হয়ে গেছে।

প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম, না না, সোজা নয়।

যাবে না তা হ'লে? একবার দেখাও হয়ে যাবে হে, এই সুযোগে।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, দেখা হবার জন্যে ছটফট করছি নাকি?

মুচকি হাসিয়া মণীন্দ্র কহিল, কাল তো ছুটেছিলে!

মণীন্দ্র বিপদ ঘটাইবে দেখিতেছি। গৃহিণী আড়ি পাতিয়া শুনিতেছেন, আর এই সব কথা! তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলাম, রসিকতা রাখ। কাল আমি ছুটেছিলাম, না তুমি টেনে নিয়ে গিছলে?

হাসিয়া মণীন্দ্র কহিল, সেটা লোক-দেখানো। ইচ্ছে না থাকলে কাউকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়?

জবাব না দিয়া পড়িতে শুরু করিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, বেশ, না যাও তো সরোজিনীকেই এনে হাজির করব। তখন তো আর 'দেখা করব না' বলতে পারবে না।—বলিয়া উঠিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। মণীন্দ্রর আজ আনন্দের সীমা নাই। আনন্দ হইবারই কথা। এতবড় একটা সম্পত্তি হাতছাড়া হইতে বসিয়াছিল, আবার পাকে-চক্রে হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলে, হিন্দু বাঙালীর সংসারে নিঃসন্তানা বিত্তবতী বিধবা বোন ও পিসীমা, বিশেষ করিয়া যদি তাহার আর কোন উত্তরাধিকারী না থাকে, ছোটখাটো জমিদারির চেয়ে ঢের ভাল। জমিদারির নানা হাঙ্গামা আছে, খাজনা দেওয়া ও আদায় করা, তদারক করা, মামলা-মকদ্দমা করা ইত্যাদি। কিন্তু বিধবা বোন ও পিসীমার একটু মন যোগাইয়া চলিতে পারিলে, এবং যাহাতে ধর্ম্ম-কর্ম্মে তাহাদের অটল মতি থাকে, তাহার সুলভ ও সুবিধামত ব্যবস্থা করিতে পারিলে, বিনা আয়ে ও বিনা আয়াসে সংসার স্বচ্ছন্দ-গতিতে চলিতে থাকে। কিন্তু রাধানাথ ও গাঙুলী মশায় কি করিবেন? তাঁহাদের তাল-ঠোকাঠুকিই সার হইল? ইহার পর কি পরস্পরের মাথায় হাত বুলাইয়া জোট পাকাইবেন? কিন্তু স্বয়ং দারোগাবাবু নিজহস্তে যে ভার তৃতীয় স্কন্ধে চড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাকে স্কন্ধচ্যুত করিতে তাঁহারা সাহস করিবেন কি?

স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিতেই পত্নী কহিলেন, চণ্ডীমণ্ডপে আজ সব ডাক হয়েছে, গোবিন্দ নাপিত ব'লে গেল।

কহিলাম, কেন ?

তোমার সোহাগী বোন সুভদ্রার আজ বিচার হবে।

কথাবার্ত্তার ধরন দেখিয়া চুপ করিয়া গেলাম। গৃহিণী কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, আর শুনেছ ? মুখ তুলিয়া চাহিলাম।

পত্নী কহিলেন, রাধানাথের বউ জলে ডুবতে গেছল।

তাই নাকি ! তারপর ?

ছেলেপিলেগুলো কান্নাকাটি করাতে পেরে ওঠে নি।

ছেলেমেয়েরা যে কান্নাকাটি করবে, তা তো আগেই জানত।

পত্নী রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, জানলেই বা। তবু ছেলেমেয়ের কান্না দেখলে মরা যায় ? আমি পারি ?

জবাব না দিয়া কহিলাম, রাধানাথ কি করলে ?

বাড়িতে ছিল না, খবর পেয়ে ছুটে এল।

তারপর ?

বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ধরাধরি ক'রে ঘরে নিয়ে এল।

কারণটা কি শুনেছ ?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে পত্নী কহিলেন, কারণ তোমার ঐ সরোজিনী। পদ্ম ঠাকুরঝি সকালে গিয়ে কি সব ব'লে এসেছে—কাল রাতে হাত-ধরাধরি ক'রে রাধানাথ আর সরোজিনী নাকি দুজনে বেড়াচ্ছিল, আরও সব কত কাণ্ড ! লোকে নাকি চোখে দেখেছে।

ঢোক গিলিয়া কহিলেন, বউটা সহজে ফিরতে চায় নি, জনার্দ্দনের ফুল ছুঁয়ে, 'আর কখনও সরোজিনীর পাশ মাড়াব না' ব'লে রাধানাথ প্রতিজ্ঞা করবার পর তবে ফিরেছে।

রাধানাথের বউ নেহাত ভালমানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ঢ্যাঙা, কাহিল, একদা গৌরবর্ণা, বর্ত্তমানে তাম্রবর্ণা। প্রায় কুড়িটি সন্তানের জননী, গোটা-দশেক ছাড়া বাকিগুলি কেহ ভ্রূণ-অবস্থায়, কেহ ভূমিষ্ঠ হইবার পর, মারা গিয়াছে। প্রসব-কার্য্য এখনও বন্ধ হয় নাই, বৎসরে একবার করিয়া চলিতেছে। এক পাল ছেলেমেয়ের টানা-ছেঁড়া সামলাইতে ও ভাবী জননীত্বের অনিবার্য্য দৈহিক ক্লেশ ও গ্লানির ভার বহন করিতে, তাহাকে দিবারাত্র এত ব্যস্ত ও ব্যাপৃত থাকিতে হয় যে, স্বামীর সম্বন্ধে চিন্তা করিবার তাহার অবসর থাকে না। পদ্ম যে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া এই নির্জ্জীব প্রাণীটাকেও এমন উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে যে, না মরুক, অন্তত মরিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার জন্য পদ্মকে বাহবা দিতে হইবে। সরকার বাহাদুর সৈন্য সংগ্রহের জন্য যাহাকে তাহাকে প্রচারক নিযুক্ত না করিয়া যদি পদ্মর মত জনকয়েককে নিযুক্ত করিতেন তো এতদিন সারা ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ মরণ-যজ্ঞে ঝাঁপ দিবার জন্য আরব সমুদ্রের তীরে গিয়া ভিড় করিত।

কিন্তু সরোজিনী মুশকিল করিল দেখিতেছি। যাহার স্কন্ধে চাপিতেছে, তাহারই গৃহে দুর্য্যোগের সৃষ্টি হইতেছে। আমার স্কন্ধে পুরাপুরি চড়িয়া বসিতে পারে নাই, চড়িবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র, তাহাতেই গৃহিণী মধ্যে মধ্যে শর-সন্ধান করিতেছেন।

সন্ধ্যার পর চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া দেখিলাম, প্রায় সকলেই হাজির হইয়াছে। খালি মেঝের উপরেই সকলে বসিয়া, প্রায় প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া লণ্ঠন, এবং প্রত্যেকটি লণ্ঠনের আলো এত কমানো যে, এতগুলি লণ্ঠনের আলোকেও চণ্ডীমণ্ডপটি ভাল করিয়া আলোকিত হইয়া উঠে নাই। দোলু গাঙুলী গ্রামের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, কাস-রোগজীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার দেহ, সকলের ঠিক মধ্যস্থলে খালি গায়ে

উবু হইয়া বসিয়া তামাক টানিতেছে ও কাসিতেছে ; তাহার পাশেই গাঙ্গুলী মশায় (অনেক দিনের পর বাড়ির বাহির হইয়াছেন) ; গাঙ্গুলী মশায়ের সামনে বসিয়া হারান ; চক্রবর্ত্তী-পাড়ারও জনকয়েক আসিয়াছে ; গ্রামের জনকয়েক ছোকরাও আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের এক পাশে জটলা করিতেছে। মন্দিরের দাওয়ায় পাড়ার প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা বিধবারা (অধিকাংশই গ্রামের মেয়ে) আসিয়া বসিয়া আছে, পদ্ম হাত নাড়িয়া নাড়িয়া বোধ হয় সকলকে বিচার্য্য বিষয়টি বুঝাইয়া দিতেছে। আমাকে দেখিয়াই দোলগোবিন্দ কাসিতে কাসিতে কোনমতে কহিল, এস ভায়া, গাঙ্গুলী মশায় ইঙ্গিতে তাঁহার পাশে বসিতে আহ্বান করিলেন। যথাস্থানে বসিয়া কহিলাম, আলোচনা শেষ হয়ে গেল নাকি ? দোলগোবিন্দ গাঙ্গুলী মশায়ের হাতে হুঁকাটি দিয়া কহিল, কই আর হয়েছে ! তুমি আস নি, রাধানাথ আসে নি।

কহিলাম, মনুদাও তো আসে নি দেখছি।

গাঙ্গুলী মশায় পিছন ফিরিয়া তামাক টানিতেছিলেন, মুখ ফিরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কহিলেন, হ্যাঃ, ওর দায় পড়েছে আসতে ! বড়লোক বোন, এখন গরিবদের ও বুঝি তোয়াক্কা করে !

কহিলাম, তা হ'লেও একবার ডাকতে পাঠানো উচিত।

দোলু হাঁকিল, গোবিন্দ !

গোবিন্দ কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, সাড়া দিল, কি বলছেন ?

দোলু কহিল, যা দেখি একবার, রাধানাথ আর মনু চক্রবর্ত্তীকে ডেকে নিয়ে আয়।

গোবিন্দ হাতের কাছে একটা লণ্ঠন তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই, লণ্ঠনের মালিক লণ্ঠনটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া কহিল, আমারটা না। পার্শ্ববর্ত্তী লণ্ঠনটিকে মুখের ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, ঐটে নে।

মুহূর্ত্তমধ্যে দ্বিতীয় লণ্ঠনের মালিক এবং তাহার দেখাদেখি প্রায় সকলেই নিজ নিজ লণ্ঠন কোলের কাছে টানিয়া লইল। গোবিন্দ আমাদের দিকে তাকাইয়া হতাশভাবে কহিল, কেউ যে লণ্ঠন দিচ্ছেন না, অন্ধকারে যাব কি ক'রে ?

দোলগোবিন্দ কহিল, তোর সব বাড়াবাড়ি গোবিন্দ। কোথায় অন্ধকার ?

গোবিন্দ কহিল, অন্ধকার বইকি। কি রকম মেঘ করেছে দেখছেন না ?

দোলু বিরক্ত হইয়া কহিল, হ'লই বা অন্ধকার, এইটুকু রাস্তা আর যেতে পারবি না ?

গোবিন্দ কাহারও বেতনভোগী চাকর নহে। পুরুষানুক্রমে কিছু জমি ভোগ করে এবং পূজা-পার্ব্বণে, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও পৈতার সময়ে কিছু পায়। কাজেই, সে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অন্ধকারে যেতে পারব না, মনু চক্রবর্ত্তীর বাড়ির কাছে যা সাপের আড্ডা।

আমি ডাকিয়া কহিলাম, আমার লণ্ঠনটা নিয়ে যাও গোবিন্দ। বলিতেই গোবিন্দ আমার লণ্ঠনটা লইয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রাধানাথ আসিল। বোধ হয় পুকুরে সদ্য-সদ্য পা ধুইয়া আসিয়াছে, সেইজন্য সিঁড়ির উপরে অনেকক্ষণ ধরিয়া পা ঝাড়িল। শেষে আসিয়া দোলগোবিন্দের অন্য পাশে বসিল। মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী আসিল না, তাহার নাকি ভারী পেটের অসুখ। শুনিয়া সকলে মুচকিয়া হাসিল।

রাধানাথ কহিল, পেটের অসুখ হবে বইকি। কুকুরের পেটে কি ঘি হজম হয় ?

দোলগোবিন্দ বার-কয়েক কাসিয়া কহিল, কি জন্যে যে সকলের

ডাক হয়েছে, তা সবাই জানে। মোট কথা, গ্রামে যে রকম অনাচার আরম্ভ হয়েছে, তাতে আর ভদ্রস্থতা—। বলিয়া কাসিতে শুরু করিল এবং বুকের কফ মুখে টানিয়া আনিয়া অক শব্দ করিয়া ঘাড় উঁচু করিতেই সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল; কারণ দোলগোবিন্দ রাত্রে চোখে কম দেখে, কাহার গায়ে ফেলিয়া দিবে ঠিক নাই। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার লক্ষ্যপথ হইতে সকলে সরিয়া বসিল; দোলগোবিন্দ থূঃ শব্দ করিয়া একদলা কফ চণ্ডীমণ্ডপের মেঝের উপরেই ছুঁড়িয়া ফেলিল। এবং বুকে হাত দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাঙুলী মশায়কে কহিল, তুমিই বল।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, পুরুষানুক্রমে আমাদের এই নিয়ম যে, আমাদের পাড়ার মেয়েরা কেউ কখনও পাড়ার বাইরে পা দেবে না। আজ পর্য্যন্ত কেউ এ নিয়ম লঙ্ঘন করে নি। প্রবোধ গাঙুলীর বিধবাটি শোনা যাচ্ছে—

হারান কহিল, শোনা যাচ্ছে কেন? স্বচক্ষে দেখা।

ঘাড় নাড়িয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন, হ্যাঁ, তাই—স্বচক্ষে দেখা, পায়ে হেঁটে থানায় দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করেছে; এক ঘণ্টা ধ'রে কথাবার্ত্তা কয়েছে।

রাধানাথ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, শুধু কথাবার্ত্তা! আরও কত কি—

গাঙুলী মশায়ের একজন অনুগত লোক প্রশ্ন করিল, একা, না কারও সঙ্গে?

গাঙুলী মশায় গলা ঝাড়িয়া কহিলেন, একা নয়, মানে—মানে—

রাধানাথ গাঙুলী মশায়ের মুখের দিকে তাকাইল।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, মানে মনু চক্রবর্ত্তী ছিল সঙ্গে। হাসিবার

চেষ্টা করিয়া কহিলেন, কেউ কি কিছু জানতে পারত? ভাগ্যে আমাদের রাধানাথ দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

গাঙ্গুলী মশায় আসল অপরাধীর নাম চাপিয়া গেলেন কেন? আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ দুই বিরুদ্ধ পক্ষকে যুক্ত করিয়া দিয়াছে বোধ হয়।

পদ্ম এতক্ষণ অদূরে কোমরের দুই পাশে দুই হাত দিয়া দাঁড়াইয়া গাঙ্গুলী মশায়ের বক্তব্য শুনিতেছিল, এক্ষণে আগাইয়া আসিয়া কহিল, এর তোমরা একটা ভাল ক'রে বিহিত কর দাদামশায়! না হ'লে তোমাদের ঘরের মেয়েদের মানমর্য্যাদা আর থাকবে না, আমি ব'লে দিচ্ছি।—বলিয়া ডান হাতটা নাড়িয়া দিল।

রাধানাথ কড়া গলায় কহিল, বিহিত হচ্ছে, তুই বোসগে দেখি! তোকে আর পুরুষদের মাঝে ফড়ফড়ানি করতে হবে না।

পদ্ম ধারালো কণ্ঠে কহিল, আমি না হয় বসছি, কিন্তু তোমরা কি পুরুষ? মেয়েমানুষের অধম। একটা এক ফোঁটা ছুঁড়ীকে—

হারান হাঁকিয়া কহিল, পদ্ম, চুপ কর, আর চুপ না করবি তো বাড়ি চ'লে যা।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পদ্ম রসনা সংযত করিয়া মেয়েদের মধ্যে গিয়া বসিল।

দোলগোবিন্দ কহিল, তা হ'লে কি ব্যবস্থা করা যাবে, তোমরা ভেবে বল দেখি?

সকলেই ভাবিতে শুরু করিল। ছোকরাদের মধ্যে তিনকড়ি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তিন গুটাইতে লাগিল। তিনকড়ি আমার স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র; একটু উত্তেজিত হইলেই আস্তিন গুটানো তাহার অভ্যাস, জামা না পরিলেও শুধু হাত নাড়িয়া আস্তিন গুটাইবার ভঙ্গি করে।

তিনকড়ি দুই পা আগাইয়া আসিয়া কহিল, প্রবোধ গাঙুলীর স্ত্রীর অপরাধটা কি ?

উত্তর দিল দোলগোবিন্দ, তোমাদের মত চ্যাংড়া ছোঁড়াদের তা বোধগম্যি হবার কথা নয়।

রাধানাথ কহিল, সামাজিক বিষয়ে তোমরা কথা কইতে এসো না, দেশোদ্ধার করছ, তাই করগে।

তিনকড়ি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া পয়সার অভাবে আর পড়িতে পারে নাই, চাকুরিও পায় নাই। কাজেই বিধবা দিদির স্কন্ধে চড়িয়া গ্রামের উন্নতি-সাধনের জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের ছোকরাদের লইয়া দল বাঁধিয়া কখনও রাস্তার ধারের ঝোপ-ঝাপ কাটিতে শুরু করে, কখনও বা পরের পুকুরের পানা পরিষ্কার করিতে গিয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে; সদ্য-প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রহ করিবার জন্য মাঝে মাঝে বাউরী-পাড়ায় হানা দিয়া সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে ক্লান্ত ও হাঁড়িয়া-সেবনে মত্ত লোকগুলাকে টানা-হেঁচড়া করিয়া উত্যক্ত করে; লোকের বিপদে আপদে সাহায্য করিবার জন্য ছুটাছুটি করে; জাতিনির্ব্বিশেষে রোগীর সেবা করে ও রোগী মরিলে তাহার শব কাঁধে করিয়া শ্মশানে লইয়া গিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করে।

তিনকড়ি কহিল, সব বিষয়ই আমাদের দেখতে হবে। আপনারা যা ইচ্ছে তাই করবেন, তা আমরা সহ্য করব না।—বলিয়া বার দুই আস্তিন গুটাইল।

দোলগোবিন্দ গাঙুলী মশায়কে কহিল, শুনছ ভায়া? আমরা যা ইচ্ছে তাই করছি! তিনকড়ির উদ্দেশ্যে কহিল, ভদ্রঘরের বউ হয়ে থানায় যাওয়া তোমাদের মতে হয়তো খুব ভাল কাজ। দু পাতা

ইংরিজী প'ড়ে তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি ওরকম হতে পারে, কিন্তু আমরা কজন যতদিন বেঁচে আছি—। হারানকে ধাক্কা দিয়া কহিল, বল না।—বলিয়া কাসিতে শুরু করিল। হারান চুপ করিয়া রহিল। দোলগোবিন্দের পোঁ ধরিবার মত নগণ্য সে নয়, সে যাহা বলিবে স্বাধীনভাবেই বলিবে।

তিনকড়ি কহিল, তা উনি কি করবেন? আপনারা, যাঁরা সমাজের মাথা, তাঁরা বিরুদ্ধতা করলে তাঁকে বাইরের লোকের সাহায্য নিতেই হবে।

গাঙ্গুলী মশায় ও হারান একযোগে কহিল, মানে?

তিনকড়ি বেপরোয়াভাবে কহিল, মানে আপনারাই জানেন।

হারান উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্লেষের সহিত কহিল, বামুনের বিধবা হয়ে যদি থানায় যাওয়া দোষ না হয় তো তুমিই তোমার বোনকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে এস হে।

তিনকড়ি রাগে আগুন হইয়া কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে কহিল, মুখ সামলে কথা বলবেন বলছি।

হারানও আগাইয়া গিয়া কহিল, ভারী যে তেজ দেখছি! বিধবা বোনের পয়সায় খেয়ে ভারী তেল হয়েছে, না? চীৎকার করিয়া কহিল, হারামজাদা! চ'লে আয় দেখি একবার!—বলিয়া কোমরের কাপড় সাঁটিতে লাগিল। কর কি? কর কি? বলিতে বলিতে গাঙ্গুলী মশায় দুই প্রতিপক্ষের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিলেন। ওদিকে মেয়েদের দল হইতে লাফাইয়া সামনে আগাইয়া আসিয়া পদ্ম চীৎকার করিয়া উঠিল, আ মর! পোড়ামুখোর বাড় দেখ! আমার দাদার গায়ে হাত দিতে যাওয়া! ঐ হাতে যে কুঠ হবে রে হারামজাদা। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি তীক্ষ্ণ রমণীকণ্ঠ

শোনা গেল, মুখ সামলে থাক পদ্মদিদি। ভাল হবে না বলছি। এবং মুহূর্ত্তমধ্যে কণ্ঠের মালিক, আর একটি বিধবা, লাফাইয়া আসিয়া পদ্মর মুখামুখি দাঁড়াইল। বয়স ত্রিশের বেশি, তামাটে রং, মাথার চুল পুরুষ-মানুষের মত করিয়া ছাঁটা, মুখের গঠনও অনেকটা পুরুষমানুষের মত। বিধবাটি তিনকড়ির দিদি, নাম গোবিন্দমোহিনী।

পদ্ম তিড়িং করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, আ মর ছুঁড়ী! কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে এসেছে ঐ ভাইয়ের জন্যে? লজ্জা করে না?

গোবিন্দ কোমরের দুই পাশে দুই হাত রাখিয়া সামনে ঝুঁকিয়া, মুখ নাড়িয়া কহিল, তোর লজ্জা করে না?

বোমার মত ফাটিয়া গিয়া পদ্ম চীৎকার করিয়া কহিল, চুপ ক'রে থাক বলছি। আমাকে 'তোর' বলা! হরু চক্রবর্ত্তীর পয়সায় ভারী বাড় হয়েছে তোর। গোবিন্দ যৌবনে হরু চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করিত। হরু চক্রবর্ত্তী বিপত্নীক ছিল, মেয়ের বয়সী গোবিন্দকে স্নেহের চক্ষেও দেখিত। কাজেই গ্রামের লোক তাহার ও গোবিন্দের মধ্যে কুৎসিত সম্পর্কের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইয়া নানা কথা প্রচার করিত। এখন অবশ্য হরু ইহলোকে নাই, গোবিন্দও আর চাকুরি করে না, তথাপি পদ্ম মেয়েমানুষ হইয়া আর একজন মেয়েমানুষকে অপমান করিবার সুযোগ ছাড়িবে কেন? গোবিন্দও ছাড়িল না; সেও ডান হাত নাড়িয়া পদ্মর পর্দ্দায় গলা উঠাইয়া কহিল, চাকরি ক'রে পয়সা নিয়েছি, তাতে আর লজ্জা কি লো? তোর মত ভাই-ভাজের লাথি-ঝাঁটা তো আর খাই নি।—বলিয়া পদ্মর ঠিক মুখের সামনে হাতটা নাড়িয়া দিল। পদ্ম গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন!—বলিয়া কোমরে আঁচলটা বাঁধিতে লাগিল, গোবিন্দও কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে

বলিতে লাগিল, বেশ তো। আয় না, তোর কটাসের মত চোখ দুটো নখ দিয়ে ছিঁড়ে বার ক'রে দিই।

দোলগোবিন্দ হাঁক দিয়া কহিল, ও সদু! সামলা না ওদের। তোরা সব কাজেই বড় গোলমাল করিস!

উদ্দিষ্টা বিধবাটি উঠিয়া আসিল; বয়স ষাটের কাছাকাছি, ইহারও চুলগুলি পুরুষমানুষের মত করিয়া ছাঁটা। আসিয়া ধমকাইয়া কহিল, কি হচ্ছে তোদের? পদ্ম, চ'লে আয়। গোবিন্দ, বোসগে যা।—বলিয়া বিধবাটি ওস্তাদ বেদেনীর মত ক্রুদ্ধা সর্পিনী দুইটিকে হুড়পি-গত করিল।

এদিকে হারান, তিনকড়ি ও তাহাদের মধ্যবর্ত্তী গাঙুলী মশায় এতক্ষণ পূর্ব্ববৎ পোজে দাঁড়াইয়া ছিল। মহিলা-পক্ষ শান্ত হইতেই তাহারা শুরু করিয়া দিল। হারান হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিল, ছেড়ে দিন, ছোঁড়ার তেলটা একটু নিংড়ে বার ক'রে দিই।

তিনকড়ি ঘুষি বাগাইয়া রোষরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, Beast! Scoundrel!

হারান হাঁক দিয়া কহিল, খবরদার, ইংরিজী বলবি না বলছি, মেরে ছাতু ক'রে দোব।

উঠিয়া কাছে গিয়া কহিলাম, হারান, বোসগে যাও, বুড়ো বয়সে যথেষ্ট কেলেঙ্কারি করেছ।

হারানকে 'বুড়ো' বলিলে বেসামাল হইয়া যায়, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কিনা। সে এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গিয়া কহিল, আমার কি দোষ? এক পুঁটকে ছোঁড়া যা তা বলবে, তাই সহ্য করতে হবে? কহিলাম, ছেলেমানুষ ছেলেমানুষি করবে বইকি। তা ব'লে বুড়োমানুষের খোকাগিরি সাজে না। হারান নেতাইয়া পড়িয়া কহিল, বারে! শুধু আমারই দোষ? আর আমিই বুড়ো? ও বুঝি খোকা?

তোমার তুলনায় তো বটে।—বলিয়া তাহাকে বসাইয়া দিয়া তিনকড়িকে কহিলাম, তোমার ব্যবহারের জন্যে দুঃখিত তিনু ; দেশের উন্নতি করবার আগে তোমার নিজের চরিত্রের উন্নতি করা উচিত। তিনকড়ি লজ্জিত মুখে আস্তিন ঠিক করিতে লাগিল। আমি কহিতে লাগিলাম, তোমরা দেশের পঙ্কোদ্ধার করতে চাও, আর নিজেদের মনের মধ্যে এত পাঁক ! বিনয় নেই, শ্রদ্ধা নেই, ধৈর্য্য নেই, তোমরা করবে দেশের কাজ ! ওসব ছেড়ে দিয়ে যাত্রার দল করগে যাও।

দোলগোবিন্দ বলিয়া উঠিল, বলেছিলাম অনেক দিন, ভাল কথা শুনবে কেন ? আজকালকার ছেলে যে !

তিনু গম্ভীর মুখে কহিল, মা-বোনকে গালাগালি করলে রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। তবু এই ধৈর্য্যচ্যুতির জন্যে আমি সত্যই দুঃখিত। যে দেশের অধিকাংশ লোক কুকুর-বেরালেরও অধম, সেখানে আমাদের (মানে দেশ-সেবকদের) অপমানই তো পাওনা।

হারান হাঁকিয়া উঠিল, কুকুর-বেরাল বলিস না বলছি তিনে। ভাল হবে না।

তিনু ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিল, নমস্কার। আমরা চ'লে যাচ্ছি।—বলিয়া দলবল লইয়া চলিয়া গেল।

সভায় স্থির হইল, সরোজিনী ও মণীন্দ্রকে সমাজচ্যুত করা হইল, তবে তাহারা যদি প্রায়শ্চিত্ত করে এবং দারোগাবাবুর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তবেই তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা হইবে। সভার সিদ্ধান্ত মণীন্দ্রকে জানাইবার ভার হারানের উপর ও সরোজিনীকে জানাইবার ভার পদ্মর উপর পড়িল।

বাড়ি ফিরিতেই পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল গো ? গম্ভীর-ভাবে কহিলাম, সরোজিনীর ফাঁসি, আর মনু চক্রবর্ত্তীর দ্বীপান্তর।

ভ্রূ কুঁচকাইয়া পত্নী কহিলেন, তার মানে ?

মানে, দুজনকেই একঘরে করা হ'ল, ধোপা নাপিত বন্ধ। তবে সরোজিনী যদি ওর জমি-জায়গা গাঙুলী মশায়কে আর নগদ টাকা-কড়ি রাধানাথকে সব দিয়ে দেয় তো ওদের দুজনকেই আবার সমাজে নেওয়া হবে।

পত্নী গালে হাত দিয়া কহিলেন, ওমা! কি কাণ্ড! মুখ ফুটে বললে এই সব ?

মুখ ফুটে ঠিক নয়, তবে—

গৃহিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, রাধানাথের শাস্তি হ'ল না ? ওই তো সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছল বলছিলে।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, গেছল তো। তবে রাধানাথ সে কথা অস্বীকার করেছে। তা ছাড়া গাঙুলী মশায়ের সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গেছে কিনা—

গৃহিণী সবিস্ময়ে কহিলেন, তাই নাকি!

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

হেঁয়ালি

একচক্ষু হরিণেরা চেয়ে থাকে যেদিকে নয়ন,
ব্যাধ আসে অন্য পথে হাতে লয়ে তীক্ষ্ণ মৃত্যুবাণ
আমাদের ফাঁসি-রজ্জু আমরাই করি যে বয়ন—
স্বখাত-সলিলে মরি, বুঝ লোক যে জান সন্ধান।

প্রশ্ন

রূপালী জ্যোৎস্নাধারা নামছে আকাশ হতে ধরা যেন পরীদের রাজ্য,
অতিকায় শহরের কুৎসিত দেহটাও স্বপ্ন-মায়ায় যেন ফুল্ল—
মেঘের আড়ালে যারা ওত পেতে ব'সে আছে তারা কি ভুলেছে নিজ কার্য্য,
অথবা আসছে তারা জেনে জ্যোৎস্নার ধারা করবে তাদের আনুকূল্য ?

পিতা-পুত্র

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নুটবিহারীর শহরের বাসা

নুটবিহারী এখন মোক্তার। আপিস-ঘরে এক-দিকে একটি তক্তাপোশে বসিবার জায়গা। তক্তাপোশের উপর একটি ডেস্ক। আশেপাশে কতকগুলি ফাইল। দোয়াত ও কলমদান। ইহা ছাড়া কয়েকখানি চেয়ার, একখানি বেঞ্চ। দেয়ালে দরজার মাথায় একটি বড় ফ্রেমে একখানি কার্পেটের সূচী-শিল্প; কার্পেটে বুনিয়া লেখা—"It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of god." ইহা ছাড়া একটি পুরানো আলমারিতে বই। Aristotle, Shakespeare ইত্যাদি। বাংলা বই—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। নুটু কাজ করিতেছে। জমিদারের নায়েব গোপীনাথ চেয়ারে বসিয়া কথা বলিতেছে

গোপীনাথ। আপনি হলেন প্রাচীন পণ্ডিত-বংশের সন্তান, বিবেচনা করুন, তার ওপর ব্রাহ্মণ; তাই ধরুন আমার বলা—ও ছেঁড়া কাঁথার আগুনে জল ঢেলে নিবিয়ে ফেলুন নুটুবাবু, একটা মিটমাট ক'রে নিন।

নুটু। (কাজ করিতে করিতেই) ন্যায় আর অন্যায়ের মধ্যে মিটমাট কি আছে বলুন?

গোপী। অ্যাই দেখুন; মিটমাট নেই? বিবেচনা করুন, আপনি আর প্রজাদের পক্ষ নিয়ে বাবুদের সঙ্গে লাগবেন না, আর বাবুরাও তাঁদের যা কিছু কাজকর্ম্ম এখানকার আদালতে আপনাকেই দেবেন। বছরে বাঁধা মাইনে একটা পাবেন, তা ছাড়া মামলা-মকদ্দমা যখন চলবে তখন আদ্ধেক ফীও পাবেন।

হুটু। আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে গোপীনাথবাবু ?

গোপী। এটা হয়েছে। তবে আপনি যা বলবেন তার উত্তর বাকি আছে।

হুটু। আমি কিছু বলব না।

গোপী। তা হ'লে বিবেচনা করুন, বক্তব্য আমার আরও আছে। ধরুন পাঁচ বছর আজ এমনই ক'রে বিরোধ ক'রে লাভ কি করলেন আপনি ? নামডাক হয়েছে, কিন্তু পয়সা কই হ'ল আপনার ?

হুটু। এইবার আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে গোপীনাথবাবু ?

গোপী। সদরের নবকান্তবাবু উকিলের নাম শুনেছেন নিশ্চয়। মস্ত উকিল। বিবেচনা করুন, ফৌজদারিতে অমন বাঘা উকিল আর জন্মাল না। হাকিমকেই শুনিয়ে দিত কড়া কথা। ১৯১৫ সালে ১২ই জুলাই কোর্টেই বহশ করতে করতেই বিবেচনা করুন মারা গেলেন। তিনিও প্রথমে আপনার মত বিনা পয়সায় কেস নিয়ে নাম করেছিলেন। বাস্, যেই নাম হ'ল, অমনই সেই যে আট টাকা ফী ক'রে চেপে বসলেন, বিনা পয়সায় আর ন'ড়ে বসতেন না। ১২ই জুলাই নবকান্তবাবু মারা গেলেন, ১৩ই তারিখে ছেলেরা হিসেব করলে—কোম্পানির কাগজ, তেজারতি, বন্ধকি কারবারে ব্যাঙ্কে মজুত আপনার এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুশো পঁচাত্তর টাকা। জমিদারির আয় আপনার চৌদ্দ হাজার সাতশো টাকা। আবাদী জমি এগারোশো বিঘে। তারপর বিবেচনা করুন, বড় বড় কোম্পানিতে শেয়ার। এইবার আপনি বিবেচনা ক'রে দেখুন। (ঘন ঘন পা দোলাইতে লাগিল) কি বলছেন বলুন তা হ'লে ?

হুটু। আপনি তা হ'লে আসুন গোপীনাথবাবু।

গোপী। আসব ?

মুটু। হ্যাঁ। তা হ'লে আপনি আসুন।

গোপী। আর একটু বক্তব্য আছে মুটুবাবু।

মুটু। বলুন।

গোপী। আপনি তা হ'লে সাবধান। নমস্কার।

মুটু। নমস্কার।

গোপীনাথের প্রস্থান

গোপীনাথের পুনরায় প্রবেশ। মুটু রূঢ় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল

গোপী। বিবেচনা করুন, আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয় নি। এই পাঁচ বছরে তেতাল্লিশটা মামলা আপনি বাবুদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। কটাতে আপনি জিতেছেন হিসেব রাখেন আপনি? আপনার হিসেব না থাকে আমার কাছে শুনুন, সাতটি কেসে কেবল জরিমানা হয়েছে, তাও চাপরাসীর। আর চৌত্রিশটা কেস ডিসমিস। তার পনরোটাতে খরচাসুদ্ধ দিতে হয়েছে আপনার পক্ষকে। মহা-ভারুতকে রক্ষা করতে বাকি খাজনা দিয়েছেন পাঁচশো পনরো টাকা দশ আনা তিন পাই। মকদ্দমা-খরচার হিসেব নেই। ভাল। বিবেচনা করুন, করুন রক্ষে তাকে। কিন্তু আপনি সাবধান।

প্রস্থান

মুটু আপনার মনেই হাসিল। তারপর চোখ মুদিয়া পিছনের বালিশে হেলান দিয়া আবৃত্তি করিল

মুট। "এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়,
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর—"

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। এই যে দাদা! আজ রবিবার, এখনও আপনি জল খান নি? বউদি বললেন—

হুট। এস বোন, এস। কখন এলে কঙ্কণা থেকে? কেমন আছ?

কল্যাণী। এই আসছি। আছিও ভাল। কিন্তু আপনি উঠুন দেখি। আসুন, জল খাবেন।

হুট। মমতা কেমন আছে? তাকে সঙ্গে আনো নি?

কল্যাণী। সেও এসেছে। শ্যামার সঙ্গে সে গল্প করছে। আসুন, উঠে আসুন।

হুট। তোমার পাঠশালার সংবাদ কি?

কল্যাণী। মন্দের ভাল। বাবুরা যে পাঠশালাটা করেছেন, তার মাইনে উঠিয়ে দিয়েছেন। তবুও আমাদের পাঠশালায় পনরোটি ছেলে রয়েছে। আসুন, উঠে আসুন। আপনি খাবেন, আমি খবর বলব।

হুট। আজ আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছি কল্যাণী, কাজ না সেরে উঠব না। কাজ বড় বেশি বাকি প'ড়ে গেছে ভাই।

কল্যাণী। এত বেশি কাজ আপনি নেন কেন?

হুট। বেগারের কাজ কিছু বেশিই হয় বোন।

কল্যাণী। কিন্তু শরীর বাঁচিয়ে তো কাজ করতে হবে?

হুট। শরীর? (হাসিল) I see a man's life is a tedious one; I have tired myself. কল্যাণী, এক এক সময় ইচ্ছে হয়, মৃত্যুই আমার ভাল।

কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল

বিমলা আমায় শান্তি দিলে না কোন দিন। একটা গান শোনাবে বোন, অনেক দিন তোমার গান শুনি নি।

খাবারের থালা হাতে বিমলার প্রবেশ

বিমলা। দিনরাত্রি খাওয়া খাওয়া ক'রে তোমার কাজে অশান্তি ক'রে

দিই, না? (হাসিল) নাও, এই অল্প একটু খেয়ে নাও দেখি। অশান্তি করতেই এসেছি আবার। ওগো বেয়ান-ঠাকরুণ—

কল্যাণী। না বউদি, বেয়ান বলবেন না ভাই।

বিমলা। কেন ভাই? সম্বন্ধটা কেমন একটু টক-মেশানো মিষ্টি-মিষ্টি ক'রে দিয়েছি বল তো? আর মমতার সঙ্গে যখন অরুণের বিয়ে দেব—

কল্যাণী। তবুও আমি আপনার গরিব ঠাকুরঝি হয়েই থাকব বউদি।

বিমলা। কি জানি ভাই! আমরা মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, কিসে কি দোষ হয় বুঝি না। বেশ। তুমি এখন একটা গান গাও দেখি, তোমার দাদা গান শুনতে শুনতে খাবার খেয়ে ফেলুন।

স্টু। খাবারের থালাটা আমায় দাও বিমলা। গান এখন ভাল লাগবে না। আমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে।

বিমলা। (হাসিয়া) সুরের মধ্যে বেসুর এলেই গান আর ভাল লাগে না, নয়? এখুনি তুমি কল্যাণী ঠাকুরঝিকে গান গাইতে বলছিলে, আমি আসবামাত্র সে গানে তোমার অরুচি ধ'রে গেল?

কল্যাণী। আমি এখন যাই দাদা। শ্যামার সঙ্গে এখনও দেখা করি নি, সে রাগ করবে। অরুণ বরুণ কোথায় বউদি?

স্টু। বিমলা, খাবারটা দাও।

বিমলা। কল্যাণী ঠাকুরঝি গান না গাইলে আমি দেব না।

স্টু। বিমলা!

বিমলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া খাবারের থালাটা আগাইয়া দিল, স্টুও হাত বাড়াইল; কিন্তু স্টু ধরিবার আগেই বিমলা থালা ছাড়িয়া দিল। থালাটা পড়িয়া গেল।

কল্যাণী। আহা, প'ড়ে গেল! (তাড়াতাড়ি কুড়াইতে গেল)

বিমলা। কুড়িও না ঠাকুরঝি। ওগুলো ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে হবে।

ন্টুট। না না, কুড়িয়ে নেবে বইকি। গরিব-দুঃখী কাউকে দিয়ে দেবে।

বিমলা। না। ও জিনিস কাউকে দেবার নয়, যা তোমাকে দিয়েছি সে জিনিস—

ন্টুট। আঃ, কি বলছ বিমলা ?

বিমলা। বলছি, সমস্ত জীবনটাই তো এমনই ক'রে আমি বাড়িয়ে ধরলাম তোমার দিকে, এমনই ক'রেই তুমি ধরলে না। সে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। ধুলোয় মিশিয়ে সে মাটিই হয়ে যাবে। সে কি তুলে অন্য কাউকে দেওয়া যায় ?

প্রস্থান

ন্টুট। (একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) কল্যাণী !

কল্যাণী। দাদা !

ন্টুট। তুমি আমায় মাফ কর বোন। বিমলার কথায়—

কল্যাণী। আপনি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন বলুন তো ? আমাদের সংসারে ননদ-ভাজে কত ঝগড়া হয়। আর বউদি তো আমায় কিচ্ছু বলেন নি।

বিমলার পুনরায় খাবার লইয়া প্রবেশ

বিমলা। (খাবারের থালা সযত্নে নামাইয়া দিয়া) নাও, খাও।

কল্যাণী। গান গাইব বউদি ?

বিমলা। না গাইলে বুঝব, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ।

কল্যাণীর গান

নেপথ্যে কমলাপদ। ন্টুটু !

ন্টুট। কমলাপদ ? এস এস। কলকাতা থেকে কখন ফিরলে ?

কমলাপদর প্রবেশ

কমল। এই যে বউদি! আপনার কাছেই এসেছি আমি। শিগগির খাবার নিয়ে আসুন। আপনাদের বরাদ্দমত দশ পয়সার হিসেব আজ চলবে না। আপনার অরুণ আই. এ.তে ফার্স্ট হয়েছে। বরুণও ম্যাট্রিকে ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে।

বিমলা। দাবিটা শুধু আমারই ওপর চালাবেন ঠাকুরপো? অরুণের শাশুড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে রেহাই দিচ্ছেন বুঝি বোন ব'লে?

কল্যাণী। রেহাই দিলেই বা আমি নেব কেন বউদি? কিন্তু অরুণ বরুণ কোথায় বউদি?

বিমলা। তারা মহাপুরুষের ছেলে ভাবী মহাপুরুষ। আজ রবিবার, সেই ভোরবেলায় দুই ভাই সেবক-সমিতির মুঠির চাল আদায় করতে বেরিয়েছে। এস ঠাকুরঝি, ঠাকুরপোর জন্যে খাবার তৈরি করতে হবে। আপনি কিন্তু পালাবেন না ঠাকুরপো।

কল্যাণী ও বিমলার প্রস্থান

মুট। তোমার বিরুদ্ধে দরখাস্তটার কি হ'ল?

কমল। সে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে গেছে। তুমি মোক্তার, আমি মুন্সেফ; আমার কোর্টের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? তবে ট্রান্সফারের সময় হয়েছে, ট্রান্সফার করবেই। ভবঘুরের চাকরি যখন নিয়েছি, তখন আপত্তি করলেই বা চলবে কেন? কিন্তু তুমি কি মানুষ বল তো?

মুট। কেন?

কমল। অরুণের পরীক্ষার খবর শুনে তুমি একটা কথাও বললে না?

মুট। (হাসিয়া) তোমায় অবশ্য ধন্যবাদ জানানো আমার উচিত ছিল।

কমল। No, no, no—ধন্যবাদ নয়—

বিমলার প্রবেশ

বিমলা। ওগো, মহাভারত এসে অঝোর-ঝরে কাঁদছে।

স্টুট। মহাভারত কাঁদছে?

বিমলা। কঙ্কণার বাবুরা তার গরুগুলো ধ'রে খোঁয়াড়ে দিয়েছে। পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে নিয়েছে।

স্টুট দীর্ঘশ্বাস টানিয়া সোজা হইয়া বসিল

স্টুট। তাকে পাঠিয়ে দাও এখানে।

বিমলার প্রস্থান

কমল, তোমার বোধ হয় এখানে আর থাকা উচিত হবে না।

কমল। তোমায় কিন্তু একটা কথা বলব স্টুটু। কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে ব্যাপারটা এইবার মিটিয়ে ফেল।

স্টুট। কি বলছ তুমি?

কমল। ভালই বলছি। আজ পাঁচ বৎসর ধ'রে বিরোধ ক'রে আসছ। এখানকার ফৌজদারী আদালতে তুমি মামলা চালাচ্ছ, ওঁরা জজ-কোর্ট হাইকোর্ট যাচ্ছেন, সেখানে তোমাকে পয়সা খরচ করতে হচ্ছে গরিব মক্কেলের জন্যে। ওঁদের তো পয়সার অভাব নেই। লোকে বলে, কঙ্কণায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

স্টুট। বিরোধ আমার ওই লক্ষ্মীর সঙ্গেই। ওই দেবতাটির অভ্যেস হ'ল, লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। তাঁর পা দুটি আমি ধুলোয় নামিয়ে দেব।

কমল। ছি ছি! তুমি যে কি বল স্টুটু!

স্টুট। বলি আমি ঠিক কথাই। কিন্তু তোমার ভাল লাগছে না। না লাগবারই কথা। লক্ষ্মীর পা যে তোমার মাথার ওপর চেপেছে। পায়ের পথ তো সঙ্কীর্ণ, রথ চলবার মত রাজপথ তৈরি হয়ে গেছে। মাথার টাকটি যে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়ে উঠেছে।

কমল। (সশব্দে হাসিয়া উঠিল) কথাটা ভাল বলেছ! উঃ, বড্ড বলেছ!

মহাভারত আসিয়া নুটুর পা দুইটা চাপিয়া ধরিল

কমল। আচ্ছা, আমি চলছি। বউদিকে ব'লো, ওবেলায় আসব আমি।

প্রস্থান

নুট। ওঠ মহাভারত, ওঠ। আগে কি হয়েছে বল, তারপর কাঁদবে।

মহাভারতের কান্না বাড়িয়া গেল

নুট। মহাভারত!

মহাভারত তবু উঠিল না

নুট। মহাভারত!

মহাভারত তবু উঠিল না

নুট। (রূঢ়স্বরে হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া) মহাভারত!

মহাভারত উঠিল

চোখের জল মোছ, চোখের জল মোছ। খাড়া সোজা হয়ে ব'স। খটখটে শুকনো গলায় বল, কি হয়েছে।

মহা। (করুণস্বরে) আজ্ঞে আমার পুকুরের সমস্ত মাছ—এই হালি পোনা আধপো তিনছটাক—

নুট। ছটাক সের নয়। পুকুরের সমস্ত মাছ কি হ'ল, তাই বল।

মহা। বাবুরা জোর ক'রে ধরিয়ে নিলে।

নুট। আর?

মহা। আমার গরুবাছুর সমস্ত জোর ক'রে ধ'রে খোঁয়াড়ে দিয়েছে।

নুট। হুঁ। আবার নতুন কি হ'ল?

মহা। বাবুদের হুকুম হয়েছে, তোমার জমি কেউ ভাগে চষতে পাবে না। কারও ছেলে তোমার পাঠশালায় পড়াতে পাবে না। আমি বলেছি, সে আমি পারব না, তাই—

সুট। তুমি আমার জমি ছেড়ে দাও মহাভারত। আমার সঙ্গে তোমার অদৃষ্ট জড়িও না।. তুমি পারবে না।

মহা। এতদিন পরে তুমি আমাকে এই কথা বললে দাদাঠাকুর? আজ তিনপুরুষ আমরা তোমাদের জমি ক'রে আসছি, আমাদের সুখ-দুখের ভাগ তোমরা নিয়ে আসছ। আজ তুমি আমাকে এই কথা বললে?

সুট। বললাম। বলবার কারণ ঘটেছে। আজ তুমি কেঁদেছ মহাভারত। দুঃখের চাপে যারা হার মানে, হার মানবার আগে তারা কাঁদে।

মহা। (ভাল করিয়া চোখের জল মুছিয়া) বেশ, এই চোখের জল মুছলাম। আর যদি কোন দিন চোখের জল দেখতে পাও, সেদিন থেকে মুখ দর্শন ক'রো না।

সুট। বিমলা!

বিমলার প্রবেশ

মহাভারতকে জল খেতে দাও। জল খেয়ে একটু সুস্থ হও মহাভারত, আমি স্নান ক'রে দুটো মুখে দিয়ে নিই, তারপর তোমায় এস. ডি. ও.র কাছে নিয়ে যাব।

মহা। আগুনে জল দিতে বলছ দাদাঠাকুর? তুমি চান ক'রে খেয়ে নাও, আমার মুখে এর পিতিকার না ক'রে জল রুচবে না। আমাকে ব'লো না।

সুট। কোন দিন যদি এমনই ভুল হয় মহাভারত, তবে এমনই ক'রেই তুমি মনে ক'রে দিও। এস। আমার ফিরতে একটু দেরি হবে বিমলা।

বিমলা। কমল ঠাকুরপো—

সুট। সে ওবেলায় আসবে।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কঙ্কণার বাবুদের বাড়ি। বড়বাবুর খাস-কামরা

শিবনারায়ণবাবু ও গোপীনাথ

শিবনারায়ণ সেই পূর্ব্ববৎ তাকিয়ায় হেলান দিয়া অর্দ্ধশায়িত—চোখ বুজিয়া মৃদু মৃদু তামাক টানিতেছেন

শিব। (ব্যঙ্গ-শ্লেষপূর্ণ ভঙ্গিতে) বল কি গোপীনাথ ? অ্যাঁ ! ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল ! টুলো শিবু পণ্ডিতের নাতির মুখে চোস্ত ইংরিজী বোল ! ন্নুটু মোক্তার ইংরিজীতে সওয়াল করলে !

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। ফরফর ক'রে ইংরিজীতে সওয়াল ক'রে গেল। একবারে তপ্ত খোলায় যেন খই ফুটিয়ে দিলে !

শিব। খই !

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। বিবেচনা করুন, তপ্ত খোলায় ন্নুটু মুখুজ্জে খই ফুটিয়ে' দিলে।

শিব। ঠাণ্ডা দুধের ব্যবস্থা আছে গোপী, ঠাণ্ডা দুধের ব্যবস্থা আছে। কিছু ভয় নেই। গরম খই তোমার চুপসে গ'লে যাবে। (হা-হা করিয়া হাসিলেন) ডাক, বড়বাবুকে ডাক।

গোপী প্রস্থান করিল

অরে, চা নিয়ে আয়। অ বাপ ভগবান, দয়া কর বাপধন। ভগবান ! অরে ভগবেনে, হারামজাদা শূয়ারকি বাচ্চা !

নেপথ্যে ভগবান। আজ্ঞে যাই হুজুর।

গোপীনাথ ও দেবনারায়ণের প্রবেশ

দেব। আমায় ডাকছ বাবা ?

শিব। জী হুজুর।

দেব। বল।

শিব। আরে জনাবালি, বৈঠিয়ে, পহেলে তসলিম তো রাখিয়ে।

দেবনারায়ণ বসিল

গোপীনাথ!

গোপী। আজ্ঞে?

শিব। একবার পরমপদপ্রাপ্তি ঘটিয়ে দাও তো। ভগবানকে দেখ তো বাবা। চা আনতে বলেছি কখন! চিত্তঘোড়া যে চাঁ-হা চাঁ-হা ক'রে অস্থির হয়ে উঠল হে।

গোপী। ভগবান! ভগবান!

প্রস্থান

শিব। (এইবার উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন) সব কথা সবার সামনে বলা যায় না দেবু। ব্যাটা ভেকধারী সোজা পাত্র নয়। ঘর থেকে যেতে বললে বাইরে থেকে আড়ি পেতে শুনবে। (বার কয়েক নল টানিয়া ফেলিয়া দিয়া) এস. ডি. ও. সায়েব টাউন-হলের চাঁদা ধরেছিলেন, দিয়েছ সেটা?

দেব। হ্যাঁ। পাঠিয়ে দিয়েছি আড়াইশো টাকা।

শিব। আরও আড়াইশো টাকা আজই এখুনি তুমি গিয়ে দিয়ে এস। বলবে, বাবা শুনে রাগ করলেন, বললেন, আড়াইশো টাকা দেওয়া মানে হুজুরের অসম্মান করা। আমাদের চাঁদা পাঁচশো টাকা লেখা হোক।

দেব। কেন আবার আড়াইশো টাকা দেবে বাবা? সায়েব তো খুশি হয়েই—

শিব। কথার প্রতিবাদ ক'রো না দেবু। যা বলি তাই শোন। গোপীর কাছে যা শুনছি, তাতে হরশে চাষার নাতিটা—কি নাম যেন?

দেব। মহাভারত।

শিব। মহাভারত। হ্যাঁ, মহাভারতের মাছ ধরা, গরু খোঁয়াড়ে দেওয়ার মামলার অবস্থা ভাল নয়। সুটু নাকি ভাল তদ্বির করেছে, সওয়ালও

করেছে খুব জোর। জরিমানা হয় তাকে পারা যায়, আমাদের গোমস্তা-চাপরাসীর জেল হ'লে সে বড় লজ্জার কথা, অপমানের কথা।

দেব। বেশ, তাই করছি। এই সঙ্গে কিন্তু আর একটা কথা তোমাকে না জানালে আর চলছে না। ছোট খোকাকে শাসন করা দরকার হয়েছে। তাকে একটু শাসন কর তুমি।

শিব। কেন? আমির-উল-উমরা ছোটে নবাব আমার কি করলেন আবার? (হাসিয়া) পয়সা-কড়ি বেশি চাচ্ছে বুঝি? তা দিও হে, দিও। আমি বরং লিভার বাঁচিয়ে মদ খেতে ব'লে দেব।

দেব। না। স্নুটুর পাঠশালার চারদিকে আজকাল ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেছে, ওখানে যে মেয়েটি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে—

শিব। (সশব্দে উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিলেন) তার ওপর নজর দিয়েছে? বাপকো বেটা সিপাহীকো ঘোড়া, কুছ নেহি হোয় তো হোয় থোড়া থোড়া!

দেব। না বাবা, হাসির কথা নয়। কোন কিছু যদি ঘটে, স্নুটু ছাড়বে না। আর আমাদের বাড়ির ছেলে এরকম মামলায় আসামী হ'লে দেশে আর বাস করা চলবে না।

শিব। তা আমি সাবধান ক'রে দেব ছোটে নবাবকে। তবে দশ-বিশ টাকা চাইলে যেন দিও বাপু। কি রকম, বড় বাবুর মুখ যে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। ওহে, আমি বড় হ'লে বাবা আমার বাগান-বাড়ি যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলেন। (হা-হা করিয়া আবার হাসিয়া উঠিলেন) এক কাজ কর, ছোটে নবাবকে শহরের গদিতে বসিয়ে দাও। সেখানে মামলা-সেরেস্তার কাজ দেখুক, সায়েব-স্থবোর সঙ্গে মেলামেশা করুক। লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার

ক'রে দাও। পার তো ধ'রে পেড়ে অনারারি হাকিম ক'রে দাও।
বুঝলে ?

গোপীনাথ ও ভগবান প্রবেশ করিল। ভগবানের হাতে চা

দেব। তা হ'লে আমি এখুনি চ'লে যাই।

শিব। হ্যাঁ। আর একটা কথা। এবার অজন্মার বছর। চাষীদের ধান টাকা দিতে কার্পণ্য ক'রো না যেন। সকলকেই কিছু কিছু দিও। আদায় হবে কি হবে না—সেই বিবেচনাটাকেই যেন বড় ক'রে দেখো না এবার। বুঝলে ?

দেবনারায়ণের প্রস্থান

গোপী। দেশকাল বড়ই খারাপ পড়েছে হুজুর। অজন্মা লেগেই আছে। এই বিবেচনা করুন ১৩২৩ সালে একবার, ১৩২৬ সালে একবার, ১৩৩০ সালে তো বিবেচনা করুন মাঠে কাস্তে যায় নাই, ফের বিবেচনা করুন ১৩৩৪ সাল, আবার ধরুন এই ১৩৩৬ সাল। আর সে আমলে আপনার ১৩১৩ সালে আকাড়া গিয়েছে, তার আগে বিবেচনা করুন ১৩০০ সালের মধ্যে আর নেই। ১২৯৪ সালে—

শিব। ১২৯৪ সালে। বটে। (চায়ে চুমুক দিয়া) ওরে ভগবান, গোপীনাথকে চা এনে দে।

গোপী। (জোড়হাত করিয়া) আজ্ঞে হুজুর, চা আমি খাই না। বিবেচনা করুন, চা তো আর ভাতও নয় ডালও নয় যে, না হ'লে মানুষ বাঁচে না। জীবনে হুজুর চা খেয়েছি তিনবার। একবার আপনার ১৩০৫ সালে, সেবার ভীষণ বর্ষা, তারিখ আপনার ১২ই আষাঢ়, হুজুরদের সঙ্গে শিবরামপুরের চৌধুরীদের মকদ্দমা, চল্লিশ হাজার টাকার তমসুকের নালিশ—সুদে আসলে এক লক্ষ পাঁচ হাজার দুশো তিন টাকা সাত আনা দাবি। সেই মামলায় গিয়েছি মুর্শিদাবাদ। বর্ষা আপনার ভীষণ, তার ওপর গায়ে ছিল বিলিতী

কম্বল বিবেচনা করুন, একবারে গাড়ল ভেড়ার মত অবস্থা; গলা পর্য্যন্ত ধ'রে গেল। তা সেদিন উকিল হরিমোহনবাবু বললেন, গোপীনাথ, চা খাও এক কাপ, উপকার হবে। খেয়েছিলাম, তা বিবেচনা করুন, উপকার হয়েছিল হুজুর। তা দাও হে ভগবান, এক কাপ চা দাও।

শিব। না না, খাও না যখন, তখন দরকার কি?

গোপী। আজ্ঞে চা যেমন ভাত ডাল নয়, বিবেচনা করুন, তেমনই বিষও নয়। তারপর আপনি মুনিব যখন বললেন, তখন না খেলে আপনি অসন্তুষ্ট একটুকু হবেন। দাও হে ভগবান, চা দাও।

দেবনারায়ণের পুনঃপ্রবেশ। সঙ্গে অন্য একজন কর্ম্মচারী

দেব। মামলার রায় হয়ে গেছে বাবা। আমাদের চাপরাসী দুজনের ছ মাস ক'রে জেল হয়েছে, গোমস্তার এক বছর। আমি পথ থেকেই খবর শুনে ফিরলাম।

গোপী। 'ভগবান, শিগগির চা আন। আপীল করতে যেতে হবে। আপীলে সব উল্টে যাবে হুজুর। রুদ্রপদবাবু পাকা ঘাগী ফৌজদারী উকিল, টেবিলে চাপড় মেরেই সব—

শিব। (রুষ্টস্বরে) গোপীনাথ!

গোপী মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল

দেব। সওয়ালে হুটু মুখুজ্জে আমাদের অপমানের আর বাকি রাখে নি। বলেছে, দেশে ধনী জমিদার অনেক আছেন। তাঁদের অন্যায় নেই এমন নয়। আছে। কিন্তু তবু তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র। দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের ব্যবস্থা তাঁরাই ক'রে এসেছেন, দেশের গুণীদের বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁরাই সসম্মানে প্রতিপালন ক'রে এসেছেন। কিন্তু কঙ্কণার বাবুরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তারা—

শিব। থাক। তুমি এখনই গোপীনাথকে সঙ্গে নিয়ে সদরে যাও।

আপীল মঞ্জুর করিয়ে জামিনে ওদের খালাস ক'রে আন। ফৌজদারী বড় উকিল যে কজন আছে, তাদের ওকালত-নামা দাও। এখনই; দেরি ক'রো না।

দেব। টাউন-হলের চাঁদা আরও আড়াইশো টাকা, আমি বলছিলাম, আর দিয়ে দরকার নেই। কেন মিছে দেব?

শিব। দেবে না? ওইখানেই তো বড়বাবু, তোমাদের সঙ্গে আমাদের মেলে না। বেশ, সায়েবকে না দাও দিও না, কিন্তু টাকাটা আর ঘরে ঢুকিও না। মাঠে একটা বড় সিচের পুকুর ছিল, সেটা বোধ হয় এত দিনে ম'জে এসেছে। ঐ টাকায় পুকুরটার পঙ্কোদ্ধার করিয়ে দাও। চিরঞ্জীব দীঘি।

দেব। চিরঞ্জীব দীঘি?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে বিবেচনা করুন, চেঁচুরে দীঘি। খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত, ২৫০৩ নং প্লট। পরিমাণ একর ২৫ ডেসিমেল। উত্তরে রামহরি ঘোষ—

দেব। আচ্ছা, তাই হবে। এস গোপীনাথ।

গোপী। (যাইতে যাইতে মৃদুস্বরে) ভগবান, এখনও—

প্রস্থান

শিব। কে আছিস, কালি বাগদীকে পাঠিয়ে দে তো।

উঠিয়া পায়চারি আরম্ভ করিলেন

কালির প্রবেশ

কি রে ব্যাটা? বেঁচে আছিস?

কালি প্রণাম করিল

হুকুম করলে কাজ তামিল করতে পারিস এখনও?

কালি সবিনয়ে শুধু হাসিল

নাঃ। আজ নয়, আপীল কেস হয়ে যাক, তারপর। ভগবান, তামাক নিয়ে আয়।

কালি ব্যস্তভবে বাহির হইয়া গিয়া ভগবানকে ডাকিল

নেপথ্যে কালি। ভগবান! ভগবান! দাসজী!

ক্রমশ

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা

হালকা কথার বেসাত করি, চুটকি গানের ভাসাই ভেলা,
বড় কাজের ধার ধারি নে, কাটছে তবু সকল বেলা।
মিশছি এসে অবাধ স্রোতে রাত্রিতকই সকাল হতে,
চুল পেকেছে মোদের তবু ঘোচে নি ভাই ছেলেখেলা।
তোমরা মোদের বুঝবে নাকো ব্যাপারে কান যারাই ঢাকো,
সন্ধ্যে-সকাল হিসেব রাখ খড়ি পেতে লাভ কি ক্ষতি—
আমরা ব'সে জটলা করি, তোমরা দেখ পকেট-ঘড়ি,
রক্ত মাথায় যায় যে চড়ি ভেবে মোদের করুণ গতি;
তোমাদের সব পাকা কথা শুনছি না তাই পাচ্ছ ব্যথা—
ঘুচবে যেদিন চপলতা সেদিন নাকি বুঝব ঠেলা।

অনেক ঠেলা বুঝে দাদা, শিখেছি এই অবহেলা,
হালকা কথার বেসাত করি, চুটকি গানের ভাসাই ভেলা।
রাজা উজির যাই যে মেরে, মহৎজনে ফেলি পেড়ে,
উচ্চ চূড়ায় যাহাই দেখি তাহার পানেই ছুঁড়ছি ঢেলা;
মান্য ক'রে বয়সটারে চলুক তারা যারাই পারে,
আমরা দেখি বাছুর-ষাঁড়ে তফাত কিছুই নেইকো মোটে।
ছোট বড় সবাই মিলে দুর্ভাবনা ফেলছি গিলে,
মনের লাগাম ছেড়ে দিলে সাহস এসে আপনি জোটে;
তোমরা মোদের কাণ্ড দেখে লাজে গেলে অধিক পেকে,
ছাড়লে না হয় আজো ঠেকে বেনাবনে মুক্তো ফেলা।

ছেলেমানুষ আমরা তো নই, ছেলেমানষির এই যে মেলা—
সবাই হেথা সমান দাদা—কেই বা গুরু, কেই বা চেলা !
খামখেয়ালের বইছে হাওয়া, চলছে মোদের আসা-যাওয়া,
রঙ্গমঞ্চে নাচছি সবাই, সবাই আবার দিচ্ছি পেলা।
ব্যক্তিগত ব্যথা বিষাদ মোদের হাসির সাধে না বাদ—
আমরা জানি আকাশে চাঁদ বর্ষাকালেও জ্যোৎস্না ঢালে ;
মোদের কাব্য ছন্দে লিখা, নয় তো কথার মরীচিকা,
দিনযাপনের জয়টীকা পরস্পরের পরাই ভালে।
যমের বাহন মোষে চড়ি কুড়িয়ে বেড়াই পারের কড়ি
হালকা কথার বেসাত করি, চুটকি গানের ভাসাই ভেলা।

মাঘী-পূর্ণিমা

কে আজ বিছায়ে দেছে রূপার চাদরখানি ভয়ভীত শহরেব অঙ্গে,
মনে হয় যেন কোন্ অরণ্য-প্রান্তরে পথ চলি প্রেয়সীর সঙ্গে।
এমন দেখি নি কভু এ লোকালয়ের বুকে কৃত্রিম আলোকের বন্যায়,
আলোর সঙ্গে যেন নিবে গেছে হেথাকার হিংস্র-খলতা ভীরু-অন্যায়।
জ্যোৎস্নায় স্নাত হয়ে পাপ-ধোওয়া নগরীব ধবধবে ছবি ফুটে উঠল—
মাতৃ-অঙ্ক হতে ছিন্ন শিশুর যেন মার-কোল-জোড়া রূপ ফুটল।
সুজলা সুফলা গিরি-নদী-কান্তার-ঘেরা স্নিগ্ধ শ্যামল মাতা বঙ্গের
টুকরা আঁচলখানি কে বিছায়ে দিল হেথা ঘুচাতে কালিমা কালো অঙ্গের !
কখনো ভাবি নি আগে দেখা পাব এই ছাঁদে—শ্মশানের দ্বারে এ কি দৃশ্য !
সধবার চাপা রূপ সহসা খুলিল যেন সদ্যবিধবা-দেহে নিঃস্ব !
থেমে গেছে কোলাহল, অলঙ্কারের দ্যুতি পলায়িত নারীদের গাত্রে—
শোভিছে কোথায় জানি ; আভরণ-ছাড়া রূপ ভাল লাগে পূর্ণিমা-রাত্রে।
দেবতার কৃপা আজ ঝরিতেছে ঝরঝর, মরি মরি অপরূপ সজ্জা,
বস্ত্রহরণে তার বিফল দুঃশাসন, দেবতা নিবারে যার লজ্জা।
শহরের বুক ভরি ডাকে জ্যোৎস্নার বান, ঢেকে দিল সব আলোদৈন্য,
তবু হায় বার বার মানুষের প্রাণ নিতে মানুষই সাজিয়া আসে সৈন্য।

হোলি

১

এই ফাল্গুন মাসেই। সে সময়ে ছিলাম আবিসিনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে। মার্শাল গ্রাজিয়ানি আবিসিনিয়ার ব্যূহ চূর্ণ ক'রে দিতে উদ্যত।

সকাল হয়ে আসছে। ভোরের কুহেলির মাঝে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলাম।

শত শত বৎসর আগে এই দেশটা বিধ্বস্ত হয়েছিল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমে। মাটি লোহার মত,—অত শক্ত না হ'লেও। আমাদের ঘোড়াগুলো ছুটে চলল। তাদের পায়ের নীচে শব্দ হচ্ছে—খুন, খুন, খুন—রক্ত চাই।

ধরণীর বুকচাপা কান্না।

২

যুদ্ধক্ষেত্রের চারদিক থেকেই ভেসে আসছে গোলার শব্দ। নিরস্ত্র হাবসী সৈন্যদের ওপর মেসিনগানের ইতস্তত অগ্নিবর্ষণ। ইতালীয়দের ক্যাপ্রোনি বোমারুগুলো অসহায় অধিবাসীদের ওপর ছোঁ মেরে ছিটিয়ে যাচ্ছে বহ্নিকণা।

মাটি কেঁপে উঠছে প্রচণ্ড তাড়নে। ভয়ার্ত্ত ছোট ছোট মানুষগুলোকে দেখা যাচ্ছে দৌড়তে, বোধ হয় নিরাপদ স্থান খুঁজছে। একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, তার মুখ কাদায় গোঁজা রয়েছে। কয়েক হাত দূরে একটা ছেলে মায়ের কোল থেকে ছিটকে প'ড়ে দুধের জন্যে কাঁদছে।

ক্যাপ্রোনি বম্বারগুলো পাক দিচ্ছে। গুলি ছোঁড়া চলেছে।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট দাঁড়িয়ে রইলেন, ভ্রূ কুঁচকে উঠল, একটু হতভম্ব।

বোমা—ধ্বংসস্তূপ—রক্তের প্রবাহ।

৩

হাবসী সৈন্যবাহিনী পিছু হটছে। অনেক দূর এসে আমরা ক্লান্তি বোধ করছি। দিনের পর দিন আমরা খাই নি—পাই নি ঘুমোতে।

সচকিত ছিলাম সর্ব্বদাই। ইতালীয়রা আমাদের পিছু নিয়েছে। আমাদের পেছনে তারা মাত্র কয়েক মাইল দূরে। তাদের মেশিনগানের ঘর্ঘর শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমাদের ক্ষীয়মান কর্ম্মশক্তির ওপর প্রচণ্ড কশাঘাত।

আমাদের অধিনায়ক লেফ্‌টন্যাণ্ট মিটমিট ক'রে তাকাচ্ছিলেন। আঁধার রয়েছে এখনও, আমরা তাঁকে জাগালাম।

গোল্লায় যাক, ব্যাটাদের জ্বালায় ঘুমিয়েও শান্তি নেই। তিনি গজরাতে লাগলেন, শয়তানগুলো, ওদের আমরা করেছি কি? পাজীগুলো কি আশা করে আমাদের কাছ থেকে, যখন আমরা এত ক্লান্ত?

শয়তানগুলো নয়, আমার দোভাষী বললে, ওদের জন্যে নয়, আপনার নিজের মাথাটা বাঁচাবার জন্যেই উঠতে হবে। ইতালীয়ানরা ঐটাই যে চায়।

নিজের জন্যে ঐ একটা জিনিসই তো আমার আছে। লেফ্‌টন্যাণ্টের গলাটা কেঁপে উঠল—সকালবেলার ঠাণ্ডার জন্যে, কি ভয়ে, বুঝতে পারলাম না।

শয়তানগুলোর এত সাহস হ'ল কি ক'রে? না না, ব্যাটাদের বড় বাড় দেখছি। হারামজাদা।...তিনি বেশ জেগে উঠলেন।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বলছ?

চলতে আরম্ভ করা যাক।

নিশ্চয়ই। এতক্ষণে শুরু করা উচিত ছিল।

অন্ধকারের মধ্যেই আমাদের তাঁবু ওঠানো হ'ত। আমাদের ঘোড়াগুলোও তেমনই অভ্যস্ত হয়েছিল। যাত্রা শুরু করার আগে সকাল হ'লে তারাও চঞ্চল হয়ে পড়ত।

আমরা তাঁবু ছেড়ে উদ্বেল হৃদয় নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। লেফ্‌টেন্যাণ্ট বাহিনী পরিচালনা করছেন, তাঁর মাথাটা খুব ধরেছে, ভাল ক'রে তাকাতেও পারছেন না।

৪

আমরা পৌঁছেছি ওয়াবি নদীর ধারে। নদীর ওপর ধূসর আকাশ জ্বলে উঠেছে। আগুনের ঝলকের মত দেখাচ্ছে। আমাদের দল নদী পার হতে প্রস্তুত। ক্ষণিকের জন্যে চোখ বুজলাম। সব কিছু যেন মিলিয়ে গেছে অসীমের মধ্যে।

বাক্সের ভেতর থেকে ম্যাপ বার করতে গিয়ে দৃষ্টি পড়ল ডায়েরির পাতায় ১লা মার্চ—হোলি। কিন্তু আনন্দ তো নেই কোথাও!

মোটরের আওয়াজ এল। আমাদের দলের সমস্ত কাজকর্ম মুহূর্তে থেমে গেল। রুক্ষ বন্য মুখগুলো আকাশের দিকে উঠে গেল আপনা হতেই। রাইফেলের প্রয়োজন অনুভব করছি।

বদমাসগুলো! লেফ্‌টেন্যাণ্টের চাপা দাঁতের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্কশ আওয়াজ ভেসে এল, ওরা কাদের খুন করতে চায়, শয়তানের বাচ্চা—

আমরা ছড়িয়ে পড়লাম সাবধান হয়ে। শুয়ে প'ড়ে লুকোচ্ছি। লেফ্‌টেন্যাণ্টের মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে। তাঁর ওদিকে রয়েছে তাঁর সঙ্গীরা। ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট ভয়ার্ত্ত মুখগুলো।

৫

আমাদের মাথার ওপর আটটা ক্যাপ্রোনি বম্বার।

ইতালীয় শয়তানগুলো দেখছি চিনতে পেরেছে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট বিড়-বিড় ক'রে উঠলেন। নিজের সৈন্যদের আদেশ দিলেন, এই শূয়োরগুলো, চুপ ক'রে থাক, নইলে—। নিজের রিভল্‌ভারটি তাদের দিকে বাগিয়ে ধরলেন। লোকগুলোর যুক্তি-তর্ক গেল থেমে।

বোমাবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। বজ্র-নির্ঘোষে বোমা ফেটে চলেছে। কালা হয়ে গেলাম বুঝি। মাটি কাঁপছে। আমরাও কাঁপছি। আমাদের রাইফেলগুলো ন'ড়ে যাচ্ছে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট নির্দ্দেশ দিলেন, তারপর আদেশ। ক্যাপ্রোনিগুলোর দিকে তাক ক'রে গুলি চালালাম। আমাদের মধ্যে এল চাঞ্চল্য। গুলির পর গুলি ছুটে চলেছে।

টি—টি—টিট—অশনি-নিনাদের ব্যবধানে শুনতে পাচ্ছি। লেফ্‌টে-ন্যাণ্ট চেঁচিয়ে উঠলেন, ভীরুগুলো—শয়তানের বাচ্চাগুলো আবার আমাদের ওপর মেসিনগান চালাচ্ছে।

তারা যে দিকে খুশি গুলি চালিয়ে চলেছে, কিন্তু তাতেই বা কি যায় আসে! আমাদের ভাগ্য ভাল। আমাদের নিরাপত্তার জন্মে রাইফেলের চেয়ে ভাগ্যের ওপরই বেশি নির্ভর করতে হচ্ছে। ক্যাপ্রোনিগুলো বড় দেরি করছে তাদের ধ্বংসের বোঝা নামিয়ে দিয়ে খালি হতে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি একটা পুরো জীবনের চেয়েও সুদীর্ঘ লাগছে। সময়ের পায়ে গোদ। আমরা মৃত্যুর জন্মে প্রস্তুত।

কুড়ি মিনিট। ক্যাপ্রোনিগুলো যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই চ'লে গেল। আমাদের সংজ্ঞা ফিরে এল। জায়গায় জায়গায় ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। শুকনো ঘাসগুলো পুড়ছে—শ্মশানের দৃশ্য।

মনে হচ্ছে, কিছুই ছিল না। সব কিছুই মিলিয়ে গেছে অসীম রিক্ততার মধ্যে। আমার চারিদিকের মানুষ দেখে মনে হচ্ছিল, বহু দিন আগে দেখা লোকগুলোর প্রেতমূর্ত্তি।

কার যেন গোঙানি! আমি লেফ্‌টেন্যান্টের কাছে গেলাম।

৬

তিনি রুক্ষস্বরে ব'লে উঠলেন, উল্লুকগুলো আমার শরীরটা ফুটো ক'রে দিয়েছে। দাঁড়া। কিন্তু কুকুরের বাচ্চাগুলো, পারিস নি—আমার মাথা নিতে পারিস নি।

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। মনে হ'ল, যেন কেউ ওঁর দেহের ওপর এক কলসী লাল রং ঢেলে দিয়েছে। আমার মনে পড়ল, আজ হোলি।

আমাকে বাহবা দাও। আমি এখন বেঁচে রয়েছি। পারে নি—শয়তানগুলো পারে নি—। তাঁর গলার স্বর নেমে এল। যেন কি খুঁজছেন। একটু অস্থির হয়ে উঠে বললেন, আজকে আমার জন্মদিনের উৎসব কর।

হঠাৎ তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। সেই উষ্ণ রক্তাক্ত কাদার ওপর বন্যের মত নাচ শুরু ক'রে দিলেন। চেঁচিয়ে ব'লে চললেন, শয়তানের বাচ্চাগুলো—ইতালীয়রা—আমার মাথা পাবে না—না না না পেতে পারে না। দেখ না, আমি গাইছি, আমি নাচছি। তিনি নেচে চললেন দুঃখে আর ব্যথায়।

সূর্য্য মাথার ওপর ওঠবার আগেই তিনি আর একবার বিড়বিড় ক'রে উঠলেন, শয়তানগুলো আমার মাথা নিয়েছে—শয়তানের বাচ্চা—

আর তাঁর কোন সাড়া নেই।

আমি এখন ভাবি, কি ক'রে এটা সম্ভব হ'ল। লেফ্‌টেন্যান্ট তাঁর জীবনকে যে এত ভালবাসতেন, কে নিলে তা ছিনিয়ে তাঁর কাছ থেকে?

কেন?

শ্রীসত্যনারায়ণ

রাতের বাজার

শীতকাল। রাত একটা বাজিয়া গিয়াছে। কনকনে ঠাণ্ডায় হাড়ের মজ্জা পর্য্যন্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ছিন্ন কোটের উপর তালি দেওয়া গুনচট, চটের দুইটি প্রান্ত বক্ষের উপর একত্রিত করিয়া সেটাকে র‍্যাপারের মত ব্যবহার করিবার চেষ্টায় ছিলাম। গুনচটটা লম্বায় ছোট। দুপুরবেলা ডাস্টবিন হইতে কুড়াইয়া

লইয়াছিলাম, তখন সমস্ত দেহ আবৃত হয় কি না মাপিয়া দেখা হয় নাই। এখন বহু চেষ্টার পরেও দুইটি প্রান্তের মিলন ঘটাইতে পারিলাম না। গুনচট, রবারও নয় পশমও নয় যে, ইচ্ছা করিলেই টানিয়া লম্বা করিয়া লওয়া যাইবে। হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলাম, দুই হাতে দুইটি কোণ পাঁজরার যথাসম্ভব নিকটে আনিয়া চিৎপুর রোডের দিকে চলিতে লাগিলাম।

গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে; কিন্তু ঘন কুয়াশা, অতি নিকটের বস্তু কিছুই স্পষ্ট দেখিবার উপায় নাই। দোকানপাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল পানওয়ালাকে দেখা যায়, জাগিয়া আছে। ব্যবসা তাহার শুধু পান বেচা নয়, জলসাঘর সম্বন্ধে সদুপদেশ দিতে সে অদ্বিতীয়। উপযুক্ত দক্ষিণা পাইলেই সে বলিয়া দেয়, কোন্ বাড়িতে কোন্ জাতীয় নূতন জীব আসিয়াছে, এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বৃত্তান্ত তাহার নখদর্পণে।

মারোয়াড়ীরা পুণ্যসঞ্চয় করিয়াই জীবন কাটায়। পরকালের সুব্যবস্থার জন্য স্বর্গদ্বারীদের যে ঘুষ দেয়, তাহার অন্ত নাই। সন্ধ্যার প্রারম্ভে এইরূপ একটি ঘুষের ব্যবস্থা হইয়াছিল—পুত্রের বিবাহোপলক্ষ্যে কাঙ্গালী-ভোজন। আমি ঘুষবহনকারীদের মধ্যে একজন হইয়া গেলাম। রাস্তার ধারে পাতা পাড়িয়া বসিয়া পড়িলাম। খাইয়াছিলামও পরম পরিতোষের সহিত। পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়াটা আমার মত প্রাণীর পক্ষে বিলাসের ব্যাপার। আহারের পরেই আলস্য আমাকে কাবু করিয়া ফেলিল। সত্য কথা বলিতে হইলে আমার দলের মধ্যে আমি একটু আয়েশ-বিলাসী, একটু শিক্ষিত এবং একটু মার্জ্জিত। আমার দলের মানুষরা অন্তত আমাকে উক্ত গুণসম্পন্ন বলিয়াই ভাবিয়া ক। আভিজাত্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিলাম না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া

একটি দেড় হাত প্রস্থ রোয়াক খুঁজিয়া বাহির করিলাম। তাহার উপর আমার নবাবিষ্কৃত মূল্যবান র‍্যাপারটি বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

বেশ খানিকটা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, প্রিয়া আমাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছে। স্বপ্নের স্পর্শ বাস্তবে অনুভব করিতে লাগিলাম। ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিতে দেখিলাম, সত্যই একটি জীবন্ত প্রাণী আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছে। হাতটা অকস্মাৎ তাহার গালে লাগিয়া গেল, কি সর্ব্বনাশ, গণ্ডে তো মসৃণ মাংসের স্পর্শসুখ পাইতেছি না! গাল যে কর্কশ! চোখটা সম্পূর্ণ খুলিয়া ফেলিতে দেখিলাম, যিনি আমাকে প্রেম নিবেদন করিতেছিলেন, তিনি নারী নহেন, একটি গোঁফদাড়িযুক্ত পুরুষমানুষ। ধস্তাধস্তি করিয়া তাহার বাহুবন্ধন হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইতেই মনে হইল, উন্মুক্ত বাম হস্তটা সিক্ত, রীতিমত ঠাণ্ডা। পরীক্ষা করিতে দেখিলাম, লোকটা মনের সাধে হাতের উপর বমন করিয়াছে। তাড়ি ও অজীর্ণ অন্নের উৎকট গন্ধে অস্থির হইয়া উঠিলাম। মনে মনে বলিলাম, মানুষটা ছোটলোক। ছোটলোকের সহিত বচসা করিয়া লাভ নাই, তাই তাহাকে ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। উঠিয়া পড়া সোজা, কিন্তু এত রাত্রিতে হাত ধুই কোথায়? কলেও জল নাই। আমার অবস্থার মানুষের উপস্থিতবুদ্ধি ছাড়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচা চলে না। চলিলাম শাল-ধোলাইওয়ালার দোকানের দিকে। রং পাকা করিবার জন্য উহারা রাত্রিতেও শিশিরের মধ্যে রঙিন কাপড়, শাল, দোশালা টাঙাইয়া রাখে।

এই অঞ্চলের আটঘাট সবই আমার জানা। দোকানের সম্মুখে পৌঁছিয়া চতুর্দ্দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলাম, বিপদের আশঙ্কা তেমন নাই। রাস্তার উপর রঙিন কাপড় শাল ইত্যাদি ঝুলিতেছে,

যেটিকে সামনে পাইলাম, সেইটির দ্বারাই হাত মুছিয়া ফেলিলাম, তাহার পর আবার বড় রাস্তার দিকে ফিরিলাম। বমন শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে, হাতও চটচটে হইয়া উঠিয়াছে। চটচটে হইয়া উঠুক তাহাতে ততটা অসুবিধা ছিল না, দুর্গন্ধটা মারিতে পারিলেই বাঁচিতাম। যে মানুষটি প্রিয়ার স্থান অধিকার করিয়া দুষ্কীর্ত্তিটি করিয়া গেল, তাহার কি হইল জানিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না, কারণ এইরূপ ঘটনা নিত্যই দেখিয়া থাকি। হয়তো সে এতক্ষণে কোন গভীর পাঁকযুক্ত নর্দ্দমায় পড়িয়াছে।

তাহার কথা ভাবিয়া লাভ নাই। আমি আবার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিলাম, কারণ চলাই আমার ধর্ম্ম, আমার পেশা, এবং আমার জীবিকা-উপার্জ্জনের অবলম্বন।

চলিতে চলিতে বিডন স্কোয়ার পার হইয়া একেবারে খাস জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, যাহাকে বলে—রাতের বাজার। এখানে বিড়ি মুখে না থাকিলে মানায় না, কালীঘাটে যেমন কপালে একটি সিন্দুরের টিপ না থাকিলে মানুষ অধার্ম্মিক ভাবিয়া থাকে। বিড়িওয়ালার দোকান হইতে যে একটি সরাইয়া ফেলিব তাহারও উপায় নাই, কন্‌স্টেব্‌লগুলি এখানে সর্ব্বদাই জাগ্রত। পরের ধন না বলিয়া লই বা না লই, আমার মত জীব দেখলেই তাড়া করিয়া থাকে। কেন বলিতে পারি না কন্‌স্টেব্‌লগুলি আমার চক্ষুশূল, কখনও উহাদের পছন্দ করিতে পারিলাম না। এখানে সকলেই যে যাহার নিজের ফন্দিতে ঘুরিতেছে—পকেটমার, গাঁটকাটা, ধড়িবাজ, দালাল, পানওয়ালা দি ব্যাঙ্ক, সকলেই নিজের ব্যবসা পাহারাওয়ালার চোখে ধূলি দিয়া গুছাইয়া লইতেছে। আর আমি একটি বিড়ি সরাইলেই তাড়া করিয়া আসিবে কেন? এ কেনর উত্তরই বা দিবে কে? অর্থনীতির কত রকম ভাষ্য বিদেশীদের

অনুকরণে স্বদেশীয়েরা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা কি আমার মত জীবের কথা ভাবিয়াছে? তাহারা মাথা ঘামাইতেছে চাষার জন্য। তাহাদের ভালভাবে ব্যবস্থা করিতে গিয়া জমিদারকে জখম করিবার জন্য দৃঢ়পরিকর হইয়াছে। আরে বাবা, জলসাঘর বাঁচিয়া আছে কেবল বনিয়াদী জমিদারদের জন্য, আমরা বাঁচিয়া আছি জলসাঘরের ভোগের প্রাচুর্য্যের জন্য। লোহাওয়ালা টাকা করিয়া 'সার্' খেতাব পাইলেও সে ভগ্নাংশের হিসাব করিয়া নিমন্ত্রিতদের খানার হিসাব দেয়, প্রাচুর্য্যের স্থান সেখানে নাই। উহারা 'সার্' হইলে কি হইবে, জন্মিয়াছে খাতার হিসাব রাখিবার জন্য। জন্মগত দৈন্যের প্রভাব ও আবেষ্টনী-উদ্ভূত প্রকৃতি পাশ কাটাইয়া কত আর উদার হইতে পারে? হিসাবের বাহিরে খরচ হইলেই কলিজা ফাটিয়া যাইবে, মাঝখান হইতে আমরা পরিত্যক্ত প্রাচুর্য্যের অংশ হইতে বঞ্চিত হইব। আমরা বলি, চাষাও বাঁচুক, জমিদারও বাঁচুক, আমরাও একটু খাইতে পাই।

এখানে শুধু পাহারাওয়ালা জাগিয়া থাকে না। সকলেই যে যাহার নিজের ফন্দিতে ঘুরিতেছে। কর্ম্মব্যস্ততার দিক দিয়া বড়বাজার অথবা শেয়ার-মার্কেট এই স্থানটির তুলনায় নগণ্য। রিক্‌শওয়ালা এদিক ওদিক সওয়ারী লইয়া ছুটিয়াছে। সওয়ারীর ভিতর কেহ নিঃসম্বল হইয়া ফিরিতেছে, কেহ সর্ব্বস্ব দিবার জন্য চলিয়াছে। এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, ইহার ভিতর নূতনত্ব কিছুই নাই।

দুই পয়সার বিড়ি কিনিতে যাইতেছিলাম। পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া খরচটা সংযত করিয়া ফেলিলাম। একসঙ্গে দুই পয়সার বিড়ি কিনিলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষটি গাঁট কাটিয়াছি বলিয়া সন্দেহ করিয়া বসিবে। সন্দেহ করিয়া যদি আইন মানিয়া চলে তো বাঁচিয়া যাই, হাজতে বাস তো আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, দুই বেলাই খাইতে

পাইব। হাজতে না লইয়া, ইচ্ছামত ঘা কতক বসাইয়া ছাড়িয়া দিবে। কেন রে বাপু, আমরা কি বেকার? গাঁট কাটাও ঠিকমত শিখিতে হইলে রীতিমত সাধনার প্রয়োজন হয়।

লোকটা আবার আমার দিকেই ফিরিয়াছে। কি আর করি, একটা পয়সা বাহির করিয়া পানওয়ালাকে ফরমাশ করিলাম, এক আধেলেকা বিড়ি আউর আধেলেকা পান।

পান মুখে পুরিয়া বিড়ি ধরাইলাম। অ্যাঃ, বেটা ঠকাইয়াছে। এত বড় দোকান, এক পয়সার বিড়িতেও ঠকাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না! ছোটলোক কি আর গাছে ফলে! আমারও রাগিবার অধিকার আছে। পয়সা দিয়া জিনিস কিনিয়াছি, ঠকাইলেই মানিব কিনা! পাহারাওয়ালা ও পানওয়ালার তখন রসিকতা চলিতেছিল। যে উৎসাহ লইয়া রাগটা প্রকাশ করিয়া ফেলিব ভাবিয়াছিলাম, তাহা হইল না। অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিলাম, ওস্তাদ, বিড়িটা যে একটু কেমনতর, বদলে দেবে না?

অভিযোগ শুনিয়া এক তাড়া পান জলে ডুবাইয়া সে আমার মুখের উপর ছিটাইয়া দিল। ঠাণ্ডা জলের বিন্দুগুলি মুখের উপর সূচের মত বিঁধিয়া গেল। অভিযোগের বিচার চরম হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিতের মর্য্যাদা মূর্খে বুঝিবে কেমন করিয়া? মূর্খের দলকে ছাড়িয়া বিনাবাক্য-ব্যয়ে স্থানটি ত্যাগ করিলাম। আমি জানি, আমার এই আত্মসংযমের দৃষ্টান্তটি কোন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবে না, কিন্তু সদ্‌গুণের সুবিচার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে বলিতাম, আমি ধর্ম্মপ্রচারকদের অপেক্ষা কম কিসে? ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা প্রচারের জন্য আমি কোন্ কষ্ট সহ্য না করিয়াছি? নিজের দলের ব্যবসা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কতবার মার খাইয়া অজ্ঞান পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছি, খালি জেলে যাই

নাই। জেলে যাই নাই বলিয়াই কি আমার গুণের, আমার সৎসাহসের আদর হইবে না?

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর দল শত শত বৎসর ধরিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে। ঘটনাচক্রের ফলে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মভুক্ত মানুষের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। আমার দলে না হয় লোক কম, মাত্র কয়েকজন; কিন্তু কে বলিতে পারে, দূরভবিষ্যতে আমার মত নির্গুণ ভবঘুরের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিবে না? কে বলিতে পারে, ভদ্রবেশী নীতিবাদীদের ভিতর শত-করা দশজন আমারই মত দিবারাত্র গাঁট কাটিবার কথা ভাবিতেছে না? প্রকাশ্যে তাহারা যোগ না দিক, তাহারা আসলে গাঁটকাটা। কতকগুলি আমার মত জীব বাঁচিয়া না থাকিলে সাধুরা মহাপুরুষ বলিয়া প্রমাণিত হইবে কেমন করিয়া? অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোকের বৈশিষ্ট্য বুঝি। সুতরাং সাধুর মতই আমাদেরও জগতে বাস করিবার অধিকার আছে।

উচ্চ যুক্তি ভাবিয়া বেশ আত্মতুষ্টি বোধ করিতেছিলাম। অনেকটা পথ চলিয়াছি, চলিতে চলিতে শরীর উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, গুনচটের র‍্যাপারটা কাঁধের উপর ফেলিলাম।

যেমন ফেলিয়াছি অমনই মুহূর্ত্তে সেটি অপসারিত হইয়া গেল, ভোজবাজির খেলার মত। বুঝিলাম, কোন ঐন্দ্রজালিক পিছু লইয়াছে। এ রাস্তায় নানা স্তরের নানা দলের ঐন্দ্রজালিক ছদ্মবেশে বিচরণ করিয়া থাকে। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম, পয়সাগুলি ঠিক আছে। হাত পকেটেই রাখিয়া পিছন ফিরিলাম। দেখিলাম, একটি গলিতকুষ্ঠ আমার মূল্যবান র‍্যাপারটা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। তাহার নিকট হইতে অপহৃত বস্তুটি যে কাড়িয়া লইবার উপায় নাই, তাহা সে জানিত। যে হাত দিয়া সে র‍্যাপার সরাইয়াছিল, তাহাতে তালু ছাড়া

আর কিছু নাই, আঙুল সব খসিয়া গিয়াছে। বংশদণ্ডের ডগার সাহায্যে কোন বস্তু উত্তোলন করিবার পন্থায় সে গুনচটটি সরাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহাকে কিছুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিলাম, একেবারে বেপরোয়া। মারেরও ভয় নাই, কারণ হাত দিয়া তাহাকে কেহ মারিতে সাহস পায় না।

আমি কিছুই বলিলাম না। বলিবার এবং করিবার আছে কি? আমার শীতের তাড়না হইতে কতকটা বাঁচিয়া গিয়াছি, কিন্তু গুনচটের বর্ত্তমান মালিক যে, সে প্রায় দিগম্বর। শীতে কুঁকড়াইয়া গিয়াছে, ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, মারাত্মক শীত উন্মুক্ত চামড়াকে আরও ফাটাইয়া দিতেছে।

লোকটা আমার সামনে আমার র‍্যাপার দিয়া দেহ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। কঙ্কালসার শরীর, সমস্তটা আবৃত করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। হাসির মধ্য দিয়া হয়তো আমাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল, গুনচটের প্রয়োজন তোমার অপেক্ষা আমার অনেক বেশি। তোমার পক্ষে উহা শৌখিনতা, আমার পক্ষে বাঁচিয়া যাইবার অবলম্বন, আমার চামড়া যে ফাটা।

র‍্যাপার সহ ঐন্দ্রজালিক চলিয়া গেল। ক্লান্তি বোধ করিতেছিলাম, পছন্দসই একটা রোয়াক খুঁজিতে লাগিলাম। আমার শৌখিনতাই আমার জীবন-ধারণের অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে সেখানে শয়ন তো দূরের কথা, বসিয়া বিশ্রাম করিতেও অসুবিধা বোধ করি। মূর্খ ও অভদ্রের সান্নিধ্য আমার নিকট অসহ্য। সুতরাং এমন একটি স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, যেখানে উপরিবর্ণিত জীবদের আবির্ভাবের সম্ভাবনা কম। সারাটা জীবন ধরিয়াই এমন একটি স্থান খুঁজিতেছি, পাইলাম কই?

অতি বিলম্বে একটি মনোমত রোয়াক পাইয়া গেলাম। চমৎকার, ছোট্ট হইলেও চমৎকার! একেবারে নিরিবিলি। পাশের ঘরটিতে বোতল খোলার আওয়াজ শুনিলাম, উপরতলায় সামনের ঘর হইতে

হার্‌মোনিয়ামের প্যাঁ-পোঁ আওয়াজ আসিতেছে। সমঝদারের বিকট বাহবার আওয়াজে সুর আর শোনা যাইতেছে না, ফুটবল-খেলার গোল দিবার সময়ে যে ধরনের আওয়াজ হয়, ঠিক সেই জাতীয় কোলাহলে সুর জমিয়া উঠিয়াছে।

চতুর্দ্দিকে একবার তাকাইয়া লইলাম। আতঙ্কের কারণ কিছু দেখিলাম না। একটা ঘেয়ো কুকুর নিকটে ছিল, সেটাকে একটা লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিলাম। না তাড়াইলে আমাকে ভুগিতে হইবে, আমি ঘুমাইলেই সে শরীর গরম করিবার জন্য আমার পাশে আসিয়া শুইবে। এবার নিশ্চিন্ত মনে রোয়াকে উঠিলাম।

মেঝেটা বরফের মত ঠাণ্ডা। এঃ, বেজায় ভুল করিয়া ফেলিয়াছি! কুকুরটাকে না তাড়াইয়া বরং আদর করিয়া মেঝেটার উপর খানিকক্ষণ শোয়াইয়া রাখিলে মেঝেটা গরম হইয়া উঠিত। গরম করিয়া লইয়া লাথিটা মারিলেই বুদ্ধির কাজ হইত। যাক, ভুল যখন করিয়াছি, তখন অনুশোচনা করিয়া লাভ কি? ভাবিলাম, শুইয়া পড়ি, নিজের দেহের উত্তাপেই মেঝে গরম করিয়া লইব। কিন্তু প্রথমটা যে ছ্যাঁক করিয়া উঠিবে, সেই ভয়েই কিছুক্ষণ বসাইয়া রাখিল। ঘুমে চোখ ঢুলিতেছে, ঠাণ্ডাকে অগ্রাহ্য করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

অল্প সময়ের মধ্যে গভীর নিদ্রা আমাকে ভিন্ন রাজ্যে লইয়া গেল। প্রায় ইন্দ্রপুরী, ঝাড় ও দেওয়ালগিরির আলোতে জলসাঘর জমজম করিতেছে। মেঝেতে বিরাট ফরাশ পড়িয়াছে, মাঝে মাঝে তাকিয়া, শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর কেহ আরাম করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ হামাগুড়ি দিতেছেন, কেহ একেবারে শুইয়া পড়িয়াছেন। বাইজী নৃত্য ও সুরের তালে আবেষ্টনীকে মশগুল করিয়া তুলিয়াছেন। আমি ঠিক নিমন্ত্রিত না হইলেও আসরের একটি কোণে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছি। বাইজীর নৃত্য দেখিতেছি। বাইজীকে দেখিয়া ইহাও মনে আসিয়াছে, কোন দিন যদি টাকা পাই তো বাইজীর মত চেহারা ছুঁইয়া জীবন সার্থক করিব। কি অপরূপ গঠন! প্রৌঢ়ত্ব পার হইয়া গিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত একটিও স্ত্রীলোককে স্পর্শ করি নাই, উহাদের দেহস্পর্শে না জানি মানুষ কত সুখ পায়! স্ত্রীলোককে আমি ভগিনী বা মাতৃরূপে দেখি না। কেন জানি না, নীতিবাদীদের এই সংস্কারকে আমি কখনও বিরাট ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারি নাই। স্ত্রীভোগের লালসা দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কখনও চরিতার্থ হয় নাই। মানসিক যন্ত্রণা দারুণ হইয়া উঠিয়াছে, সহ্য করিতে বাধ্য

হইয়াছি। বহুকাল পূর্ব্বে একটি অন্ধ যুবতীকে পাইয়াছিলাম। আমারই মত ভবঘুরে, তাহার মালিক তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, সমস্ত দেহ নোংরা ঘায়ে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া। শারীরিক ব্যবধান বজায় রাখিয়া দুই চার দিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়াছিলাম, কিন্তু আমার রুচি মার্জ্জিত, তাহাকে না ছাড়িয়া দিয়া পারি নাই। হয়তো সে এত দিন মরিয়াছে।

জলসাঘরে আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমার পরিচ্ছদ দেখিয়া পাশের লোকগুলি খাতির করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। আমি মানুষের পাশে দাঁড়াইলেই তাহারা সরিয়া দাঁড়ায়। জলসাঘরে নিমন্ত্রিতদের আচরণে বিস্মিত হই নাই, কারণ এ সম্মান আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া পাইয়া আসিতেছি, আমাকে নিকটে দেখিয়াও কেহ সরিয়া না দাঁড়াইলেই বরং আমার বিস্ময় লাগে।

মাঝে মাঝে বাইজীর খানসামারা গোলাপদানি হইতে গোলাপজল ছিটাইতেছিল, দুই চার ফোঁটা লক্ষ্যের মানুষ ফসকাইয়া আমার উপরেও পড়িয়াছিল, আরও পড়িলে খুশি হইতাম, কোটের গন্ধটা একটু কেমন-কেমন হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু মার্জ্জিতরুচির তাড়া খাইয়া বলিয়াছিলাম, থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আমার কথা শুনিয়া খানসামা হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। আরও কত কি ঘটনা দেখিয়াছিলাম মনে নাই।

হঠাৎ একটি চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল। উপরতলার একটি ঘর হইতে একই সঙ্গে তিন চারিটি মেয়ে চীৎকার করিতেছে, খুন করেছে, খুন। মুন্সী, পুলিস ডাক, পুলিস। একেবারে খুন—পুলিস—পুলিস—পুলিস। চীৎকারের সহজ অর্থ উপলব্ধি হইতেই আমি রোয়াক ছাড়িয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম। খুনের ব্যাপারও রাতের বাজারে নিত্য ঘটনা বলিলেই চলে। বিস্মিত হই নাই, কেবল সাক্ষী হইবার ভয়ে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছিলাম। রাস্তায় নামিয়াই পিছন দিকে মুখ না ফিরাইয়া সোজা চলিতে লাগিলাম, কারণ চলাই আমার ধর্ম্ম, পেশা এবং জীবিকা-উপার্জ্জনের অবলম্বন।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

'ক্ষণিকা'

আজ সকালে হঠাৎ হ'ল নতুন পরিচয়—
পেলেম দেখা বিশ্বকবি, তোমার 'ক্ষণিকা'র
চৌদিকেতে ঘনিয়ে যখন আসছে মরণভয়—
ফাটছে বোমা বুকের মাঝে শুনছি ধ্বনি তার,
আতঙ্কে মন চমকে ওঠে,
জটলা পাকাই ভয়ের চোটে,
কখন জানি লাগেই আঘাত লৌহ-কণিকার !

কাব্য তোমার ঝলমলিয়ে উঠল কালো মেঘে,
গুমট ঘরে ফুটল মরণ-তুচ্ছ-করা হাসি ;
মনের মধ্যে খ্যাপারা সব উঠল হঠাৎ জেগে—
শুনতে পেলাম উজান-বহা কোন্ যমুনার বাঁশী।
ভয়-ভাবনা গেল ভেসে,
মন ছুটে যায় নিরুদ্দেশে,
যেথায় তাদের নিবাস যাদের আমরা ভালবাসি।

মহাকাব্য লেখ নি তায় হয় নি কোনো ক্ষতি,
মহৎ কাব্য হচ্ছে জড়ো হালকা কথার মাঝে—
সীতায় না হয় হারিয়েছিলেন ত্রেতার রঘুপতি,
তোমার কাব্য বুকে মোদের সমান সুরে বাজে।
তোমার চটুল ছন্দে কবি,
ছলকে ওঠে ব্যথার ছবি,
হাসির ছবি চমক হানে, কান্না মরে লাজে।

প্রতিদিনের মহাকাব্য তোমার কাব্যখানি—
বাইরে প্রকাশ পায় যে কবি, হাসির কাব্য হয়ে ;
পাকছে যখন চুলের গোড়া, হাসির মুখোশ টানি
চিরদিনের সত্য কথা ছন্দে গেছ ক'য়ে।
ক্ষণিক হাসির অন্তরালে
পরাও টীকা মোদের ভালে,
চমকে উঠি ক্ষণে ক্ষণে আপন পরিচয়ে।

প্রতিদিনের কাব্য তোমার তাই তো চিরন্তন—
উপলমুখর ঝরণা সে যে সাগর পানেই ধায় ;
ত্রেতার নহে, রামের নহে, মোদের রামায়ণ
রইল লেখা বিশ্বকবি, তোমার 'ক্ষণিকা'য়—
মোদের পুলক-অশ্রুধারা,
ছন্দে গাঁথা রইল তারা—
ক্ষণিক কাব্য নিত্য মোদের আশা-আশঙ্কায়।

লাগল ভাল আজ সকালে চপল কাব্যপাঠ,
ক্ষণিকের এই খেলাঘরে তোমায় স্মরণ করি,
ভয়টা কিসের ভাঙে ভাঙুক পুরাতনের ঠাট,
দুঃখ কিসের হঠাৎ যদি থামেই বুকের ঘড়ি !
বাজে বাজুক বিদায়-বাঁশী,
তাই ব'লে কি থামবে হাসি !
ঝড়ঝাপটে বাদলা রাতে চলবে খেয়াতরী।

———

পদাঘাত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গোবরবাবুর বাড়ি

দৃশ্যাবরণ অপসারিত হইতেই দেখা গেল—একটি ঘরের বারান্দা, সেখানে অন্তরাল হইতে কেবলই দুড়দাড় করিয়া হাঁড়ি-কলসী বাসন-কোসন ইত্যাদি সবেগে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এবং সেই সঙ্গে এক ক্রুদ্ধা নারীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে—

যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমায় কিনা বাপ তোলা! এত বাড়, এত তেজ, এত অহঙ্কার! (এবার চায়ের পেয়ালা আর পানের ডাবা নিক্ষিপ্ত হইল) থাকব না, স্বামীর ভাত খাব না—আমায় এক্ষুনি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও, জ্ব'লে পুড়ে ছাই হয়ে যাক, দরকার নেই অমন স্বামীর ঘরে। আমায় কিনা বাপ তোলা! (এবার হাতা বেড়ি খুন্তি ইত্যাদি নিক্ষিপ্ত হইল)

যে দিক হইতে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহার অপর দিক হইতে গোবরবাবুর প্রবেশ

যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! তবে রে পোড়ারমুখো মিন্সে!

দুড়ুম করিয়া একটি মাটির কলসী ভাঙিয়া পড়িল

গোবর। আমার ঘাট হয়েছে। ওগো, শুনছ, ও বড়বউ—

অলক্ষ্যে বড়বউ। এত তেজ, এত অহঙ্কার! আমি কি দাসী-বাঁদী, না কি? আমায় কিনা এত হেনস্তা!

সঙ্গে সঙ্গে এক পাটি জুতো আসিয়া পড়িল। ঠিক এমনই সময়ে গণেশের প্রবেশ

গণেশ। (সবিস্ময়ে) দাদা, জুতো!

গোবর। হ্যাঁ ভাই। সবই মঙ্গলময়ীর ইচ্ছা।

গণেশ। বুঝেছি, বউদি। তুমিও যা হোক দাদা, ধমকে দিতে পার না?

গোবর। কি বললি, ধমকে দোব?

গণেশ। নিশ্চয়ই। বেটাছেলে, বীরের জাত, কিসের ভয়, আর তাও কিনা সামান্য একটা মেয়েমানুষকে, ছোঃ!

গোবর। ঠিক বলেছিস গণশা। আমি বেটাছেলে, বীরের জাত। (বড়বউয়ের উদ্দেশে) এই, ভাল হবে না বলছি বড়বউ, খবরদার!

গণেশ। আরও শক্ত হয়ে বল। বল, মারের চোটে হাড় ভেঙে দোব, মুখ সামলে।

গোবর। দূর, তাই কখনও মানুষকে বলা যায়?

গণেশ। মানুষকে না হ'লেও মেয়েমানুষকে খুব বলা যায়।

গোবর। কিন্তু জানিস তো, তোর বউদি আবার কালীঘাটের মেয়ে—

গণেশ। কিন্তু তুমিও তো কম নও দাদা। তুমিও তো শ্রীরামপুরের ছেলে।

গোবর। তা যা বলেছিস। ঠিক। যুক্তিসঙ্গত কথা।

এমন সময় ঝনাৎ করিয়া একটি কাঁসার থালা সবেগে নিক্ষিপ্ত হইল

এই অপ, সাবধান! মারের চোটে হাড় ভেঙে দোব, মুখ সামলে! (গণেশের প্রতি) কেমন বলেছি?

গণেশ। ঠিক হয়েছে।

অলক্ষ্যে বড়বউ। কি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! তবে রে হতভাগা মিন্সে!

গোবর। (সভয়ে) গণশা!

গণেশ। ভয় নেই দাদা।

গোবর। কিন্তু তুই কোথায় যাচ্ছিস?

গণেশ। আমি গিয়ে—এই জল তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খেয়ে আসি।

গোবর। পারিস তো আমার জন্যেও এক গ্লাস নিয়ে আসিস ভাই।

গণেশের প্রস্থান

হাতে কালি মুখে কালি রণরঙ্গিণী মুর্ত্তিতে শ্রীমতী পঙ্কজিনীর প্রবেশ

পঙ্কজিনী। কি বলছিলে, এইবার বল শুনি।

গোবর। (শুনাইয়া শুনাইয়া) না না, এতে কখনও মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে! এত আস্পর্দ্ধা, আমার স্ত্রীর গয়না থেকে সোনা চুরি করে!

পঙ্কজিনী। মারের চোটে হাড় ভেঙে দেবে বলছিলে না? কই দাও দেখি, কত ক্ষমতা!

গোবর। দোব না হাড় ভেঙে! একশোবার দোব। আমি কোথায় শখ ক'রে সোহাগ ক'রে বউয়ের দুটো গয়না গড়িয়ে দোব, সে থেকেও কিনা সোনা চুরি! বেটার এতদূর আস্পর্দ্ধা; বেটা পাজি নচ্ছার!

পঙ্কজিনী। আমি এসেছি, শুনছ? বেশিক্ষণ দাঁড়াবার সময় আমার নেই। আমি একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই, শুনছ?

গোবর। (মুখ ফিরাইয়া) অ্যাঁ, আমাকে বলছ?

পঙ্কজিনী। হ্যাঁ, তুমি আমায় বাপ তুলেছ, তবু আমি কিছু বলি নি।

গোবর। ব'লেও যদি থাকি অজ্ঞানে, সজ্ঞানে বলি নি, মাইরি বলছি।

পঙ্কজিনী। কিন্তু ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে।

গোবর। নিশ্চয়ই আছে।

পঙ্কজিনী। কিন্তু মারের মোটে তুমি আমার হাড় ভেঙে দেবে বলেছ—এ কথা সত্যি কি না?

গোবর। ধেৎ, কি যে বল তার ঠিক নেই। আমার মুখে আগুন. তোমায় কেন অমন কথা বলতে যাব? ঘর-সংসার করতে গেলে অমন হাত ফস্কেও দুচারটে হাঁড়ি-কলসী ভেঙে যায়, এও নয় সেই গেছে, তাতে কি হয়েছে? তুমি কিছু মনে ক'রো না বড়বউ, বাস্তকিবই আমি নির্দ্দোষ।

পঙ্কজিনী। আমার কথার জবাব দাও। কেন তুমি মারের চোটে আমার হাড় ভেঙে দেবে বলেছ, কোন্ অধিকারে?

গোবর। মাইরি, মা কালীর দিব্যি, আমি তোমায় বলি নি বড়বউ।

পঙ্কজিনী। তুমি হয়তো ভাব, আমি তোমার স্ত্রী ব'লে—

গোবর। তুমি আমার স্ত্রী ব'লে! কক্ষনো আমি তা ভাবি না।

পঙ্কজিনী। তবে কি ভাব, তুমি আমার স্বামী ব'লে—

গোবর। না, তাও ভাবি না।

পঙ্কজিনী। তবে কি ভাব আমাকে, শুনি?

গোবর। অনাদি, অনন্ত, পরমব্রহ্মময়ী।

পঙ্কজিনী। (উচ্চৈঃস্বরে মেয়েকে ডাকিলেন) গৌরী, গৌরী!

গৌরীর প্রবেশ

গৌরী। কি বলছ মা?

পঙ্কজিনী। তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর, দুটোর মধ্যে সে কোন্‌টাকে চায়—আমাকে, না এই সংসারকে? যদি সংসারকে চায়, তবে বল, আমায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। আর যদি আমায় চায়, তবে বল—এই সংসার ত্যাগ ক'রে সে যেন অন্য কোথাও চ'লে যায়।

গোবর। গৌরী, তোর মাকে বল—সংসার আমি চাই না, আমি তোর মাকেই চাই।

পঙ্কজিনী। গৌরী, বাবাকে তোর বল—সে যদি আমায় চায়, তবে

আজই যেন সে এই সংসার ছেড়ে চ'লে যায়। এখন তোর কি মত? তুই কাকে চাস, আমাকে, না তোর বাবাকে?

গৌরী। আমি বাপু, যেতে-টেতে কোথাও পারব না। এখান থেকে আমি এক পাও নড়ছি না।

পঙ্কজিনী। বেশ, তোর বাবাকে তা হ'লে জিজ্ঞেস কর—আজকের মধ্যেই সে যাচ্ছে কি না?

গোবর। আর জিজ্ঞেস করতে হবে না। যাব যখন বলেছি, তখন আজই যাব।

পঙ্কজিনী। আয় গৌরী, চ'লে আয়।

কন্যাসহ মায়ের প্রস্থান

গণেশের প্রবেশ। হাতে এক গ্লাস জল

গণেশ। দাদা, জল এনেছি।

গোবর। আর দরকার নেই ভাই, তেষ্টা আমার মিটে গেছে। পারিস তো দাদাকে তোর ভুলে যা।

গণেশ। ওপরে আকাশ, সামনে বাতাস, হাতে জলের গ্লাস—প্রতিজ্ঞা করছি দাদা, ভুলতে হয় বউদিকে ভুলব, কিন্তু তোমায় নয়।

বলিয়া এক নিশ্বাসে জলটুকু নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল

গোবর। কিন্তু আমি নিরুপায়, একেবারে নিরুপায়। তুই জানিস না গণশা, এই বুকখানা চিরে দেখাবার হ'লে দেখাতাম, কি অসহ্য বেদনায় ভেতরটা আমার টগবগ ক'রে ফুটছে! না না, তুই ছেলেমানুষ, তুই বুঝবি না। আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকত, আমি তাঁদের অধম সন্তান। আমার আশা ছেড়ে দে ভাই, আমি একেবারে হোপ্‌লেস।

গণেশ। তা হ'লে আমিও মীনিংলেস।

গোবর। (উদাস উদাত্ত কণ্ঠে) গণেশ!

গণেশ। দাদা!

গোবর। শোন।

গণেশ আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, গোবরবাবু দক্ষিণ হস্তখানি তাহার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন

তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।

গণেশ। কি কথা দাদা? খুব প্রাইভেট?

গোবর। হ্যাঁ। শোন। মাকে তোর মনে পড়ে?

গণেশ। খুব সামান্য।

গোবর। সে কথা ঠিক। তখন তুই আর কতটুকুই বা হবি? খুব ছোট্ট ছিলি, ঠিক এতটুকু। (বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী সহযোগে যাহা দেখাইলেন, তাহা এক ইঞ্চি হইতে কিছু বেশি)

গণেশ। (সবিস্ময়ে) মাত্র অতটুকু!

গোবর। হ্যাঁ। সেই সময় মা তোকে আমার হাতে দিয়ে যায়।

গণেশ। সেইজন্যেই কি তুমি আমায় হাতে ক'রে মানুষ করেছ দাদা?

গোবর। একমাত্র তুই ছাড়া আপন জন বলতে আমার কেউ ছিল না। কিন্তু আজ তোকেও ছেড়ে বুঝি আমায় চিরদিনের মত চ'লে যেতে হবে। পারবি না গণশা, চিরদিনের মত এই গৃহসংসার ছেড়ে চ'লে যেতে? আমি তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। কি বলছিস? বেশ ক'রে ভেবে দেখ।

গণেশ। (ভাবিয়া দেখিল) না দাদা, মরতে আমি পারব না। আত্মহত্যা করতে হয় তুমি কর, দোহাই দাদা, আমায় সঙ্গে নিও না। সে আমি প্রাণ গেলেও পারব না।

গোবর। তবে তুই কচু বুঝেছিস। তুই দেখছি আমার চাইতেও

নিরেট। জগৎ-সংসারে এমন তো আরও কত ভাই আছে; কিন্তু তোর মতন এমন গাধা কাউকে দেখি নি।

গণেশ। আর তুমি? বলব?

গোবর। যাক। বাজে কথা ছেড়ে দে, এখন শোন,—আমি এই সংসার ছেড়ে অন্য কোথাও চ'লে যেতে চাই। তোর বউদির হুকুম। নইলে সে বাপের বাড়ি চ'লে যাবে।

গণেশ। বাপের বাড়ি গিয়ে থাকবে, ওঃ, মুরোদ কত! তুমি চ'লে গেলে এখানে দিনকতক পরে যদি না ঘুঘু চ'রে বেড়ায় তো কি বলেছি।

গোবর। ঘুঘুই চরুক আর হাঁসই চরুক—। তুই কি বলিস, যাবি আমার সঙ্গে?

গণেশ। যাব দাদা। একদিন রামের সঙ্গে লক্ষ্মণও বনে গেছল।

গোবর। হ্যাঁ, সেই সঙ্গে আরও একজন গেছল।

গণেশ। আজও সে যায়, যদি তুমি একটু চেষ্টা কর।

গোবর। অসম্ভব। মূষিকের পর্ব্বত-প্রসবের মতই অসম্ভব।

গণেশ। কেন? বউদি তো তোমার বউ, তুমি তাকে বিয়ে ক'রে এনেছ।

গোবর। মিথ্যে কথা, বিয়ে তাকে আমি করতে পারি নি। ভুল ক'রে বরের টোপরটাই যা মাথায় দিয়েছিলাম; নইলে বিয়ে আসলে তোর বউদিই আমায় করেছে। ক্ষুদ্র মানুষ আমি, আমার কি শক্তি ভাই যে, ওই শক্তিরূপিণী অনন্তময়ীর পাণিপীড়ন করতে পারি! না গণশা, আর আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই সংসার মায়াকানন আমাদের জন্যে সৃষ্টি হয় নি, সৃষ্টি হয়েছে তোর বউদি জাতীয় ওইগুলোর জন্যে।

গণেশ। কি বলব দাদা, বলতে লজ্জা করে, নইলে তুমি যদি আমার

একটা বিয়ে দিতে, তা হ'লে দেখাতাম, আদরে, সোহাগে, স্নেহে আর প্রেমে বউকে কেমন ক'রে বশে রাখতে হয়।

গোবর। আহা, তোর কথাগুলো কি মিষ্টি রে গণশা! বল, বল, আবার বল। আহা, কানে শুনলেও অন্তরে কি তৃপ্তি! কি বললি, আদর, সোহাগ, প্রেম—বাঃ, কি চমৎকার! এমন কথামৃত কোত্থেকে শিখলি রে গণশা?

গণেশ। বই প'ড়ে অনুভব করেছি দাদা।

গোবর। বেছে বেছে এই কথাগুলো বেশি ক'রে লেখা আছে, এমন বই একখানা আমায় এনে দিতে পারিস? জীবনে বিয়ে ক'রে, বউ পেয়েও বুঝলাম না, এগুলো কি, দেখি, যদি বই প'ড়ে কিছুটা বুঝতে পারি।

গণেশ। তুমি শুধু একা নও দাদা। অনেককে দেখেছি, বউ ছেড়ে বই পড়ে। আমার মনে হয়, এগুলো বউয়ের চেয়ে বইয়েতেই বেশি পাওয়া যায়।

গোবর। নাঃ, হ'ল না; বরাত খারাপ। আমায় যে আজই সংসার ছেড়ে চ'লে যেতে হবে।

গণেশ। কিন্তু দাদা, তুমি চ'লে গেলে গোঁসাই-বাড়ির গোমস্তাগিরি কে করবে?

গোবর। মিথ্যে মিথ্যে, সব মায়া। হ্যাঁ, ভাল কথা গণশা। তুই এখন যা। গিয়ে দুজনের মত কিছু গোছগাছ ক'রে নিগে।

গণেশ। তুমি?

গোবর। আমি এখন কিছুক্ষণ ভাবব, গভীরভাবে আমায় এখন অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে। যা তুই, দেরি করিস না।

গণেশের প্রস্থান

গোবর। (চিন্তান্বিত মুখে পদচারণ করিতে লাগিলেন) হ্যাঁ, তাই যদি হয়, কিসের ভয় ? জগতে ভয় আমি কাউকে করি না। বাপকা বেটা, সেপাইকা ঘোড়া। আসুক, আসুক তেড়ে পঙ্কজিনী। চুলের মুঠি ধ'রে বনবন ক'রে সাতপাক ঘুরিয়ে দোব না! আমার কাছে চালাকি! দোষের মধ্যে 'ধন্যি বাপের পুণ্যি মেয়ে' বলেছিলাম, তার জন্যেই এত রাগ! দেখে নোব, দেখে নোব। পাষাণী পঙ্কজিনী, আমিও রামচন্দ্র—পদাঘাতে উদ্ধার ক'রে ছেড়ে দোব।

সম্মার্জ্জনী হস্তে পঙ্কজিনী পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন

কি বলব, নেহাতই মেয়েমানুষ, অবলা জাত, নইলে এক ঘুষিতে ওর দাঁতের পাটি উড়িয়ে দিতাম না! এতদিন কিছু বলি নি, ক্ষমা অনেক করেছি; পুরুষমানুষ হয়ে স্যাকরার ঠুকঠাক অনেক সয়েছি। কিন্তু আর নয়, এইবার কামারের এক ঘায়ে দফা শেষ ক'রে দোব।

হঠাৎ দেখিলেন, পিছনে বিভীষণা মূর্ত্তিতে স্বয়ং দেবী আবির্ভূতা, এবং ক্রমশই তিনি সম্মার্জ্জনী হস্তে আগাইয়া আসিতেছেন

এই, না না, এই, ভাল হবে না মাইরি বড়বউ। সব সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না। এখনও বলছি, ভেবে দেখ আমি তোমার কে ?

পঙ্কজিনী। এই যে দাঁড়াও, ভাবছি। (বলিতে বলিতে হস্তস্থিত সম্মার্জ্জনী আক্রমণোদ্যত হইয়া উঠিল)

গোবর। (আর্ত্তস্বরে চেঁচাইলেন) গৌরী, গৌরী!

পঙ্কজিনী। আবার মেয়েকে ডাকা হচ্ছে! তবে রে হতচ্ছাড়া পোড়ারমুখো মিন্সে!

এইবার বুঝি এক ঘা পড়িল; কিন্তু না—তাহার আগেই গৌরীর প্রবেশ

গৌরী। (প্রভূত বিস্ময়ে) একি বাবা! মা, ছিঃ ছিঃ, তুমি এতদূর নেমে এসেছ! কি বলব, তোমায় মা ব'লে ডাকতেও লজ্জা করে।

পঙ্কজিনী। লজ্জা যদি করে, তবে ডেকো না। বাপ-আদুরে মেয়ে হয়েছ; এবার থেকে নয় বাবাকেই মা ব'লে ডেকো।

গৌরী। ছিঃ ছিঃ, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধিও একেবারে লোপ পেয়েছে দেখছি।

পঙ্কজিনী। ঘটা ক'রে আর 'ছিঃ ছিঃ' করতে হবে না। যা জানিস না, বুঝিস না, তা নিয়ে কথা কইতে আসিস নি, বারণ ক'রে দিচ্ছি।

গৌরী। জানি না মানে? স্বচক্ষে দেখলাম, আর বলছ জানি না?

পঙ্কজিনী। ঘর-দোর নোঙরা হয়েছে, তাই ঝাঁট দিতে এসেছি। এর মধ্যে স্বচক্ষে কোথায় কি দেখলি শুনি?

গৌরী। ওঃ, তাই বাবাকেও সেই সঙ্গে নোঙরা মনে ক'রে—ছিঃ মা!

পঙ্কজিনী। দেখ গৌরী, তোর বড্ড বাড় বেড়েছে দেখছি। ওই তো তোর সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, জিজ্ঞেস ক'রেই দেখ না? আদুরে বাপ কেন ডেকেছিল, জিজ্ঞেস করলেই তো পারিস?

গৌরী। বাবা!

গোবর। কি মা?

গৌরী। তুমি আমায় কি জন্যে ডেকেছিলে?

গোবর। ওই—ওই, ঠিক ওইজন্যেই ডেকেছিলাম মা।

পঙ্কজিনী। খবরদার বলছি, এখনও দিন-রাত্তির হয়, আকাশে চাঁদ-স্যিযি ওঠে—মিথ্যে কথা ব'লো না। মাথার ওপর ভগবান আছেন।

গৌরী। বল না বাবা, কেন ডেকেছিলে?

পঙ্কজিনী। বল না গো। সত্যি কথা বলবে, তার আবার এত ভয় কিসের?

গোবর। বলছি মা। এই গিয়ে—ডেকেছিলুম—তোমার গিয়ে, তুমি বড় হয়েছ মা, সংসারের কাজকর্ম্মগুলো তো এখন থেকে শেখা দরকার। তোমার মা কেমন রাঁধেন, কুটনো কোটেন, আর কি চমৎকার ঝাঁট দেন—এই সব এখন থেকে শিখে না রাখলে কি চলে মা?

গৌরী। ঝাঁটা হাতে নিয়ে মা চমৎকার ঝাঁট দেন, সে দেখবার জন্যে তুমি আমায় ডেকে ভাল কর নি বাবা।

গোবর। কেন মা?

গৌরী। কিছু নয় বাবা, সে তুমি বুঝবে না। সেই ভাল, তুমি কিছু দিন এই সংসার ছেড়ে অন্য কোথাও চ'লে যাও। নইলে আমার ভয় হচ্ছে, আর কিছু দিন এখানে থাকলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।

গণেশের প্রবেশ

গণেশ। দাদা, সব গুছিয়ে ফেলেছি। দুটো বোঁচকা হয়েছে, একটা তোমার, একটা আমার।

গৌরী। কাকা, তুমিও যাবে নাকি?

গণেশ। বাঃ, তা না হ'লে দাদার দেখাশোনা করবে কে?

পঙ্কজিনী। কিন্তু তোমার দেখাশোনা কে করবে শুনি?

গণেশ। কেন? দাদা।

পঙ্কজিনী। ভাল, তোমায় কে সংসার ছেড়ে যেতে বলেছে শুনি?

গণেশ। বেশ করব যাব। প্রয়োজন হ'লে দাদার সঙ্গে সহমরণেও যাব, তোমার কি?

পঙ্কজিনী। দুজনেই বাড়ি ছেড়ে যদি চ'লে যাও, তবে আমাদের কি অবস্থা হবে, ভেবে দেখেছ কি?

গণেশ। ভগবানে বিশ্বাস রাখ বউদি। তিনি করুণাময়, তিনিই রক্ষা করবেন।

পঙ্কজিনী। তা নয় হ'ল; কিন্তু খাব কি ক'রে শুনি?

গণেশ। কেন? হাত রয়েছে, মুখ রয়েছে—হাঁ ক'রে। দাদা, আর সময় নেই, আমি যাচ্ছি, তুমি এস।

গণেশের প্রস্থান

গোবর। চল ভাই, আমিও যাচ্ছি। বড়বউ!

পঙ্কজিনী। কি?

গোবর। তা হ'লে চললাম। যাবার বেলায় অশ্রুজল ফেলে আমাদের বাধা দিও না। হাসিমুখে আমাদের বিদায় দাও।

পঙ্কজিনী। আহা, খুব হয়েছে, আর ঢং দেখাতে হবে না। যাচ্ছ, যাও।

গোবর। সে কি বড়বউ? আজকের দিনেও তোমার মুখের দুটো মিষ্টি কথা শুনতে পাব না?

পঙ্কজিনী। আহা, কি আমায় মিষ্টি খাইয়ে মিষ্টিমুখ করিয়েছে গো! আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না! যত সব ঘেন্না!

পঙ্কজিনীর প্রস্থান

গোবর। গৌরী!

গৌরী। বাবা।

গোবর। তা হ'লে এবার যেতে দে মা, যাই।

গৌরী। দাঁড়াও বাবা।

গোবর। কেন মা?

অতি সকরুণ হাসিমুখে গৌরী শুধু একবার বাবার পানে চাহিল; তারপর আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিল

ক্রমশ

শ্রীগণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

বাংলা দেশের এই যুগের সাহিত্যিক সমাজের পিতামহসদৃশ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আগামী ৪ঠা ফাল্গুন অশীতি বৎসরে পদার্পণ করিবেন। এই বৎসর আমাদের মহাগুরু-নিপাতের বৎসর। গত ২২এ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারাইয়াছি। যিনি বর্ত্তমান রহিলেন, তাঁহাকে লইয়া উৎসব করিয়া আমরা যে গুরু-নিপাতের পাপ কিয়ৎপরিমাণে ক্ষালন করিবার সুযোগ পাইতেছি, ইহাও কম ভাগ্যের কথা নয়।

কেদারনাথ বঙ্গভারতীর একজন একনিষ্ঠ সাধক। যৌবন-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, নিতান্ত তরুণ বয়সে 'সংসারদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদকরূপে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাব। তাহার পর দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরিয়া নানাভাবে, শুধু কাব্যে নাটকে গল্পে উপন্যাসে ভ্রমণ-কাহিনীতেই নয়, প্রাচীন বাংলা "কবি"-সম্প্রদায়ের রচনা ও জীবনী লইয়া গবেষণার কাজেও তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; তাঁহার সাধনা কখনও স্থগিত থাকে নাই। চাকুরি-ব্যপদেশে তাঁহার জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বহু দেশের বিচিত্র নরনারীর পরিচয় তাঁহার সরস ভঙ্গিতে তিনি বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন; এমন ভাবেই করিয়াছেন যে, তাঁহার রচনা হইতেই একটি হাস্যমধুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল নির্ব্বিরোধী অজাতশত্রু মূর্ত্তি আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে সব চাইতে বড় কথা এই যে, এই কল্পনায় এবং বাস্তবে এতটুকু তফাত নাই; সাহিত্যিক কেদারনাথ এতই sincere, এতই হৃদয়বান। বাংলা দেশের খুব বেশি সাহিত্যিক সম্বন্ধে এই প্রশংসা প্রযোজ্য নয়।

কেদারনাথ সম্পর্কে বাংলা দেশের সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য আছে, সে কর্ত্তব্য তাঁহারা অবশ্যই পালন করিবেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি যাহা দান করিয়াছেন, তাহার যথোচিত প্রচার করার ভার তাঁহাদের হাতে। মহাকালের দরবারে কেদারনাথ পাকা দলিল নিজেই পেশ করিতে পারিবেন, সময়-সংক্ষেপের দায়িত্ব আমাদের।

আজ কেদারনাথকে লইয়া আমরা উৎসব করিব, তিনি বাংলা দেশের প্রবীণতম সাহিত্যিক বলিয়াই নয়, তিনি আমাদের পূজ্যপাদ দাদামহাশয় বলিয়া। তাঁহার স্নেহ যাহারা জীবনে লাভ করিয়াছে, তাহারা ভাগ্যবান। পক্ষীমাতার মত তিনি আপনার পক্ষচ্ছায়ায় আমাদের সকলকে সস্নেহে ধরিয়া আছেন—আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া থাকুন, আজ ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা।

—

'শনিবারের চিঠি'তে গত কয়েক মাসের মধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি নামহীন কবিতার লেখকদের সম্বন্ধে প্রশ্ন সম্বলিত কয়েকটি চিঠি আমরা পাইয়াছি। তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, নামহীন সকল রচনাই সম্পাদকীয়।

—

গত সংখ্যার "সংবাদ-সাহিত্যে" যাহা প্রস্তাব বলিয়া উল্লিখিত ছিল, তাহা ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। গোপালদা এইমাত্র মেছুনীদের অনন্ত-প্রদর্শনের স্টাইলে আমাদের নাকের কাছে তাঁহার পরিচয়-চাকৃতিটি বার কয়েক ঘুরাইয়া গেলেন। সে চাকৃতির বাহার কত! ঠিক রিস্ট-ওয়াচের আকারের ছোট্ট একটি ধাতুময় চাকৃতি, তাহার উপর নাম-ধাম খোদাই করা, দুই দিকে ব্যাণ্ড-সম্বলিত। গোপালদা ঠিক ঘড়ির মত করিয়াই কব্জিতে বাঁধিয়াছিলেন। এই ভাবে ধারণ করিলে এ এক নূতন অলঙ্কারের কাজ করিবে। সংবাদপত্রে দেখিলাম, সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষ এক আনা মূল্যে দেড় কোটি চাকৃতি বিক্রয় করিবেন; উহা নিশ্চয়ই দেখিতে তেমন সুদৃশ্য হইবে না। যে সকল শৌখিন ব্যক্তি স্ব স্ব মৃতদেহ চন্দনকাষ্ঠসহ দগ্ধ হইবার কল্পনা করেন, তাঁহারা কাশী মিত্রের ঘাটের মত গাদার চাকৃতি নিশ্চয়ই ব্যবহার করিবেন না। গোপালদার ব্যবস্থাটি সত্যই চমৎকার; বিপজ্জনক এলাকায় অবস্থিত আমাদের পাঠক-পাঠিকাদিগকে এই ব্যবস্থার অনুকরণ করিতে বলি। শুনিলাম মূল্য মাত্র ছয় আনা।

* * *

চাকৃতি ছাড়াও আরও অনেক প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। জাপানীরা সিঙ্গাপুরে পদার্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল;

দুই চারি দিন পূর্ব্ব হইতেই তাহারা দলে দলে সিঙ্গাপুরে পদধূলি দিতেছে সংবাদ পাওয়া গেল। কলিকাতার যে সকল বীরপুরুষ সিঙ্গাপুরে জাপানী কন্‌ট্যাক্ট ঘটিলে যাহা হউক একটা ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ প্রস্তাব মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে হাওড়া শিয়ালদহের পথে ছ্যাকরা গাড়ির মাথায় দেখা যাইতেছে। গতিক যেরূপ দেখিতেছি, এসেন্সিয়াল সার্ভিসের লোকেরা ব্যতীত যাহারা এখানে অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা আমাদের মত দিন-আনি-দিন-খাই-শ্রেণীর লোক—অর্থাৎ যাহাদের কোনও প্রকারে আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই। অবশ্য সিভিক গার্ড ও এ. আর. পি.র লোকেরা থাকিবেন। এই অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের প্রস্তাব—কলিকাতার মেছুনী ও ধাঙড়নীদিগকেও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র সহ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ভুক্ত করা হউক। শান্তিপুর, বিষ্ণুপুর ও বিক্রমপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের নারীদের যথেষ্ট বীরখ্যাতি আছে, তাঁহাদের সার্ভিসও আহ্বান ও প্রার্থনা করা হউক। এই সকল প্রস্তাব অবলম্বিত হইলে আমরা, যাহারা রহিয়া গেলাম, বুকে অনেকটা বল পাইব।

*　　*　　*

আর এক স্থানের বীরদের কথাও মনে হইতেছে। একবার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নবদ্বীপে গিয়া একরাত্রি বাস করিতে হইয়াছিল। পোড়া-মা-তলায় মন্দিরের ঠিক সামনেই ছিলাম। পাশেই একটি চায়ের দোকান। আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িয়াছি, হঠাৎ টেবিল-চেয়ার-গ্লাস-বাটি ছোঁড়ার শব্দ পাইলাম; ধপাধপ লাঠি ও হাত চালানোর আওয়াজও কানে আসিল। বাতায়নপথে যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্ময়বোধ না করিয়া পারিলাম না। প্রায় কুড়ি-বাইশজন জোয়ান জোয়ান লোক রীতিমত মারামারি ধস্তাধস্তি করিতেছে; মাথা-ফাটাফাটি রক্তারক্তি ব্যাপার—অথচ আগাগোড়াই নিঃশব্দে সম্পন্ন হইতেছে। যে সকল বদ্‌জোবান আমরা কলিকাতা শহরের ট্রামে-বাসের বচসায় হামেশাই শুনিয়া থাকি, তাহার একটিও উচ্চারিত হইতেছে না। নির্ম্মলদা ও শান্তি ভায়া সঙ্গে ছিল। নির্ম্মলদা বলিল, বনেদী বৈষ্ণব-অধ্যুষিত স্থানে এরূপ হওয়াই সঙ্গত। এই শ্রেণীর বীরেদের এই সময়

কলিকাতায় আনিতে পারিলে ভাল হয়। সশব্দ বীরত্ব অনেক দেখিয়াছি, তাহার কাজ নয়।

* * *

প্রস্তাবের কথা হইতেছে। মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও মাদাম কাইশেক নিশ্চয়ই কোন প্রস্তাব লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। প্রস্তাব গুরুতর না হইলে চীন-জাপান যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা ঘাঁটি পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই আসিতেন না। তবে প্রস্তাব গান্ধী-জওহরলালের সহিত, না মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের সহিত, তাহা বুঝা যাইতেছে না। স্বয়ং চিয়াং তাঁহার নিজস্ব প্রস্তাব সম্বন্ধে নিঃসংশয় কিনা জানি না, কিন্তু কলিকাতার দুই একটি বাংলা দৈনিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁহার প্রস্তাবের যাবতীয় রহস্য একেবারে ফাঁক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে" "পরোক্ষভাবে চাপ" দিয়া "তাহার আশু সমাধান"ই "তাঁহার উদ্দেশ্য"। সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল, যিনি শুনিতে পাইতেছি চিয়াং কাইশেকের এক আধারের সুহৃৎ, বলিয়াছেন, (উক্ত দৈনিকের ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি) "রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে মার্শাল চিয়াং কাইশেক ভারতীয়দিগকে উপদেশ দিতে যাইবেন ইহা আশা করা [তাঁহার পক্ষে] সঙ্গত নয়।" মার্শাল চিয়াং কাইশেকের প্রস্তাব যাহাই হউক, এরূপ ধাঁধার সৃষ্টি করা সমরবিশারদ সম্পাদকের পক্ষেই সম্ভব।

* * *

যুদ্ধ সম্পর্কে জ্ঞানের প্রাবল্যহেতু বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ইহাদের জ্ঞান প্রায় চরমে পৌঁছিয়াছে। ভাষা দেখিয়া অনুমান হয়, এগুলি টাট্‌কা আন্‌কোরা অনুবাদ। কিন্তু মূল সম্পাদকীয়কে অনুবাদ বলিতে ভরসা হয় না; হইলে উল্লেখ থাকিত। উহাতে লিখিত হইয়াছে—

জাপানীদের পক্ষে জহোর প্রণালী অতিক্রম করিতে পারা অত্যন্ত দুঃসংবাদ।... জহোর প্রণালীর সেতুপথের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত নৌঘাঁটি। কিন্তু এই ঘাঁটি আজ যুদ্ধ জাহাজের দ্বারা পরিত্যক্ত।

যে যুদ্ধের হুজুগে আমরা কলিকাতার অধম অধিবাসীবৃন্দ পত্নী,

ঠাকুর, চাকর, নাপিত, ধোপা, মায় মাছ ডিম তরিতরকারিদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছি, সেই যুদ্ধের হুজুগে মাতা সরস্বতীর দ্বারাও যে তাঁহার সম্পাদক-সন্তানেরা পরিত্যক্ত হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। পত্রিকার কেরামতিদৃষ্টে সম্পাদকীয় "নানা কথা"-বিভাগে রবীন্দ্রনাথের কোটেশনও কি ভাবে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে দেখুন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি'।
এবার মোর মকর-চূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুক-বাণ নাহি আমার হাতে ;
এবার আমি আনিনি ডালি দখিন সমীরণে
সাগর-কূলে তোমার ফুল-বনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা।—মহুয়া, ১ম সং, পৃ. ১৩

চিনিতে পারা অতিশয় শক্ত। "নানা কথা"র স্মৃতিধর লেখক অসাধারণ ধীশক্তিগুণে ইহার যে রূপ দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা পড়িলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ চিনিতে পারিতেন না। সে রূপটি এই—

মিনতি করি, হে সুন্দরি
বারেক চাহ তো মোর পানে
প্রদীপখানি ধরি।
এবার আসিনি আমি
ধনুর্ব্বাণ হাতে
মকর মণি-মাণিক চূড়
নাহিকো মোর মাথে।
এবার আনিনি ডালি
দখিন সমিরণে
তোমার ফুলবনে—
এবার শুধু এনেছি বীণা
দেখতো চেয়ে, আমায় তুমি
চিনিতে পার কি না?

সেকালে আমরা স্মৃতিশক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ' আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতাম। একালের ছেলেরা

আণ্ডার্ওয়্যার পরে, ন্যাঙট কাহাকে বলে জানে না। এতদ্‌সত্ত্বেও মূলে এবং উদ্ধৃতিতে যে এতখানি মিল থাকিতে পারিয়াছে, তাহা সত্যই প্রশংসার কথা। 'যুগান্তর' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা সম্পাদকীয় বিভাগে রবীন্দ্রনাথের এক সেট কাব্যগ্রন্থ রাখিবার ব্যবস্থা করুন; সোনারচাঁদদের মস্তিষ্কের উপর অত্যধিক চাপ না দেওয়াই ভাল। তাহারা যে "মকর-চূড় মুকুটে" স্থলে "গরমাগরম চনকচুর (চানাচুর)" না লিখিয়া "মকর মণি-মাণিক-চূড়" লিখিতে পারিয়াছেন, ইহাও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কম ভাগ্যের কথা নয়।

যাঁহারা পরিবারাদি মফস্বলে প্রেরণ করিয়া অতি কষ্টে কলিকাতায় দিন যাপন করিতেছেন, বহু দিনের অনভ্যাসের ফলে মরচে-পড়া কলম শানাইয়া নিতান্ত বেগতিকে পড়িয়া কেহ বা রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র', কেহ বা বটতলার "যাও পাখী বলো তারে" মার্কা 'প্রেমপত্র' বেমালুম আত্মসাৎ করিতেছেন এবং স্বকীয় ও পরকীয় যাবতীয় ভাষায় এই আসল কথাটা গৃহিণী এবং হবু-গৃহিণীদের বুঝাইতে যাঁহাদের ভুল হইতেছে না যে, তাঁহারা এই "বাধ্যতামূলক" বিরহে মৃতকল্প হইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে ফ্যাসাদে ফেলিবার জন্য কোনও অতি-আধুনিক কবি যে কবিতা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—

ব্ল্যাক-আউট দেখ্‌তে বেরিয়ো
মিসেস সেনকে সঙ্গে নিয়ো।
ভোঁতা সময় হয় তো স্বচ্ছন্দে কাট্‌বে
অনেক দিনের পুরানো মন অতীতকে চাট্‌বে।
তারপর ব্যাগি-ট্রাউজারে
পা ডুবিয়ে, বাহারে
সোফায় মেদের অস্বাস্থ্য
ঢেলো।

কবি যাহা খুশি চাটিতে পারেন, মিসেস সেনের প্রসঙ্গটা তিনি কৌশলে বাদ দিলেই পারিতেন।

* * *

যাঁহারা এই কাব্যাংশ পড়িয়া চঞ্চল হইয়াছেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য যে পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের লেখা দাখিল করিতেছি। বর্ত্তমান নিদারুণ বিরহে তিনি গৃহস্থ মক্ষিরাণীদের অভাব বাহিরে কি ভাবে পূরণ করিতেছেন, এই রচনা হইতে তাহা অনুমান করা কঠিন হইবে না। মানুষ অভাবে পড়িলেই স্বভাবের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে। আমরা যে অভাবে পড়িয়াছি, আমাদের মফস্বলবাসিনীরা এই কবিতার টুকরা হইতেই অনুমান করিতে পারিবেন; সাধারণ লেখকের লেখা অপেক্ষা সম্পাদকের লেখা যে বেশি নির্ভরযোগ্য, ইহা নিঃসন্দেহ। সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন—

> জীবনের কিছুকাল—নারী যে, সে রানিও হবেই।
> এমন কি পথে-পথে ঘোরায় যে ভিখারিণী মেয়ে
> আস্তাকুঁড়ে খাদ্যকণা খেয়ে,
> অতি জীর্ণ জঘন্য মলিন যার বাস
> তারেও ছাড়ে না
> যৌবনের ক্ষমাহীন সেনা।
>
> * * *
>
> বিশ্বভ'রে চেয়ে দেখি সুন্দরের লীলা
> এর মধ্যে ক্লেদাক্ত মাটির ভাঁড়
> বিশ্বের কুৎসিত ক্ষত ঐ ভিখারিণী।
> যার কিছু নেই, তার যৌবনেও নেই অধিকার
> অতি সত্য এই কথা
> তবু প্রতিদিন এর ঘটায় অন্যথা
> নির্মম নিয়তি।
> ভিখারিণী, সেও যে যুবতী

সুতরাং, বুঝিতে পারিতেছেন—কলিকাতার অবস্থা কি সাংঘাতিক!

—

পৌষের 'পরিচয়ে' শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত "সহমরণ" একটি গল্প লিখিয়াছেন। গল্পাংশ হুবহু এই: বিবাহের দুই বৎসর পরে ক্ষিতীশ মারা গেল। তাহার স্ত্রী ভবানী কাঁদিল কাটিল না, একবার কান্নার স্বরে চীৎকার করিয়া "কেন তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে"

বলিয়া সে মনে মনে নিজের গহনা ও স্বামীর লাইফ-ইন্‌সিওরেন্সের হিসাব করিল, তাহার বয়স বাইশ, ওই সামান্য টাকায় তাহার চলিবে না। সে ভাবিতে লাগিল—

এখানেই নিশ্চয় আর ভবানী থাকবে না—এই জঙ্গুলে গ্রামে, শাশুড়ির মড়াকান্নার মধ্যে। গোড়াতে অবিশ্যি তাকে যেতে হবে বগুড়ায় তার বাপের কাছে। সেখান থেকে কালক্রমে কোলকাতায়। হয় কোথাও একটা মাষ্টারি, নয় হাসপাতালের নার্স—নিজেকে সে কখনোই বয়ে যেতে দেবে না। আর, কাকেই বা বলে বয়ে যাওয়া! সুবিধে যদি সে পায় ফিল্‌ম্‌-ষ্টুডিওতে ঢুকতেও তার আপত্তি নেই কি, বরং আগ্রহ আছে। একেকজন অভিনেত্রী কেমন মাটকোঠা থেকে চারতলা বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।...বিজয় থাকলে আজ আর কোন কথা ছিল না।

এই বিজয় ছিল ভবানীর বিবাহের পূর্ব্বের পরিচিত, উভয়ে "কত দিন কত সুখের ভাগ" লইয়াছে। যাহা হউক, বেলা এগারোটায় শব শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। ঠিক সন্ধ্যার সময় শ্মশানযাত্রী শববাহকেরা ক্ষিতীশকে জীবন্ত অবস্থায় শ্মশান হইতে বাড়ি ফিরাইয়া আনিল। ক্ষিতীশের মৃতদেহে আবার প্রাণসঞ্চারিত হইয়াছে। গ্রামসুদ্ধ মেয়েরা ভবানীর সতীত্বের তেজের প্রশংসা করিতে লাগিল, তাহার পায়ের ধূলা ও সিঁথির সিঁদুর লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল; সকলেই বলিতে লাগিল, সাবিত্রী-বেহুলার চাইতেও বড় সে, কারণ তাহাদের একজনকে যমের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাঁহার তোয়াজ করিতে হইয়াছিল, অন্য জন স্বর্গ পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া নাচ দেখাইয়া তবে স্বামীকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। আর ভবানী ঘরে বসিয়া শুধু সতীত্বের তেজে যমের মুখ পুড়াইয়া দিল।

কিন্তু, যে যাই বলুক, খুব বিশ্রী লাগছিল ভবানীর। অত্যন্ত যাচ্ছেতাই। যেন ট্রেন ধরতে না পেরে ইষ্টিশান থেকে বিছানা-বাক্স নিয়ে বোকার মতো বাড়ি ফিরে আসা। কী লজ্জা! কী অপৌরুষ! [মরার পরে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসা অপৌরুষ নিশ্চয়ই।] বাজি ধরে টাকা না দেবার মতো। বিতাড়িত হবার পরেও যেন ফিরে এসে ফের পায়ে পড়া। নিজেরই ভবানীর বার-বার মনে হতে লাগলো, এমন কখনো সে চায় নি, এর জন্যে করেনি সে এত সেবা, এত প্রার্থনা। মুহূর্ত্তে সে আবার বন্ধ হয়ে গেল, তার আকাশ আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। ছাড়া পাখিকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে এসে আবার খাঁচায় পুরলো।

* * *

ভবানীর সাইকলজি আমাদের বিচারের বিষয় নয়, অচিন্ত্যবাবু নিজে যেমনটি ভাবিতে পারিয়াছেন, ভবানীকে দিয়া তেমনটিই

ভাবাইয়াছেন, আমরা তাঁহার গল্পের কথাটাই বলিতেছি। গল্প এখনও শেষ হয় নাই। পাড়াপড়শিরা সকলে একে একে বিদায় হইল। শয়নঘরে ক্ষিতীশ ও ভবানী একা।

ক্ষিতীশ নামতে চেষ্টা করলো খাট থেকে। অভ্যাসবশতই হবে হয় তো, ভবানী তাকে সামান্য বাধা দিতে এলো ; বললে, ও কি, কোথায় যাচ্ছ ?

ক্ষিতীশ বললে, 'আমাকে একটু জল দিতে পারো ?'

'জল ? খাবে ?'

'না, দাড়ি কামাবো।'

'দাড়ি কামাবে ?'

'হাঁ। অনেকদিন ধ'রে দাড়ি রেখেছি বসে-বসে। দাড়ি না কামালে তুমি আমাকে চিনতে পারবে না।' বলে ক্ষিতীশ হাসলো।

ভবানী চিনিতে পারিল। ক্ষিতীশ নয়, বিজয়। বিজয়

ভবানীর দিকে আরো কিছুটা এগিয়ে এসে গাঢ় অন্তরঙ্গতার সুরে বললে, 'আমার বড় সাধ ভবানী, তুবি আমার এই যন্ত্রণাটা বোঝ।...'

শ্মশান হইতে মৃতদেহ প্রাণ পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—এরূপ সংবাদ কখনও কখনও শোনা যায় ; সুবিখ্যাত ভাওয়াল মামলা এরূপ একটি ঘটনা লইয়াই। কিন্তু মৃত বিজয় ক্ষিতীশের রূপ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া ভবানীর একান্ত সান্নিধ্যে বিজয়ের রূপ লইল এবং ভবানীর গলা টিপিয়া মারিয়া আবার ক্ষিতীশের মৃতদেহ হইয়া পড়িয়া রহিল—এরূপ ঘটনা শঙ্করাচার্য্যের আমলে একবার শোনা গিয়াছিল। অচিন্ত্যবাবু জুডিসিয়াল সার্ভিস ছাড়িয়া আবগারী বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন, এরূপ কোনও সংবাদ 'কলিকাতা গেজেটে' দেখি নাই বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছি।

—

আজকালকার তরুণেরা আজকালকার তরুণীদের সম্বন্ধে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম পোষণ করিয়া থাকেন, মাঝে মাঝে অতি-আধুনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় পাই। অনেকদিন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে ইঁহারা গৃহিণী ও দাসী রূপে গণ্য হইয়া বিশেষ বিব্রত ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে শুনিয়াছি হাওয়া বদলাইয়াছে, তাঁহারা সখী এবং ললিতকলাবিধির সহচরীরূপে গণ্য হইতেছেন। সকল নীতির মত ব্যতিক্রমও সম্ভবত ঘটিতেছে। ব্যতিক্রমটা নীতি না হইয়া যায়—এই আশঙ্কায় আমরা

দুই একটি ব্যতিক্রমের সংবাদ মাঝে মাঝে দিয়া থাকি। একটি চোখে পড়িয়াছে। রেণুকা রায় সম্ভবত কলেজের ছাত্রী; তিনি সুইং ডোরের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার কলেজীয় বন্ধুরা একে একে আসিতেছেন—

রেণুকা রায়ের "সুইং ডোর":

বাইরে থেকে বীরেশ সরকার দিল ধাক্কা
অবাধে সে ছেড়ে দিল পথ;
বাধা সে কাউকে দেয় না,
কিন্তু বাধার সৃষ্টি করে চলে;

রেণুকার নিঃশ্বাসে কী সুগন্ধ?
তার চুম্বন কী উন্মত্ত মদির—
চোখের পাতার নীচে কিসের ইংগিত।
রেণুরায় লতার মত জড়িয়ে আছে
রেণুরায় পাতার মতো কাঁপছে,
বীরেশ সরকার পাগল হয়ে গেছে—

"সুইং ডোর" আবার কেঁপে ওঠে;

বাইরে থেকে ধাক্কা পড়েছে,
অবাধ পথে—
ঢোকে সমরেশ সমাদ্দার:
এবার ধাক্কা আসে ভেতর থেকে—
ছিট্‌কে বেরিয়ে যায় বীরেশ সরকার
অবাধ পথ—

মৃদু আলোয় তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘর
"সুইংডোর" স্তব্ধ স্থির—
রেণুরায় জড়িয়ে আছে সাপের মত
জড়িয়ে আছে, যেন,
সমরেশও গেছে পাগল হয়ে:
"সুইংডোর" আবার উঠলো কেঁপে!

এই অনন্ত অভিযান আর যাহাই হউক, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। আজকালকার তরুণ-তরুণীদের স্বাস্থ্যও শুনিতে পাই খারাপ। তাঁহারা স্বাস্থ্য বজায় রাখিয়া যদি সখীত্ব ও ললিতকলাবিধি বজায় রাখিতে পারেন, তবে পূর্ব্বপুরুষদের উপর টেক্কা দিতে পারিবেন, ভগ্নস্বাস্থ্যে সুইং-ডোরই যমদ্বার হইতে পারে।

—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'বসুমতী'র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সময় ভাল যাইতেছে না। তিনি এতকাল স্বয়ং পুরাতন মালের কারবার করিয়া বেশ দুপয়সা কামাইয়া আসিয়াছেন। আজ তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিরাই যে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার কাছেই পুরাতন মাল বেচিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবের হইলেও ব্যবসায়ের দিক দিয়া ভাল নয়। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় পুরাতন ঘাগী লোক, তিনি মাথায় হাত

বুলাইলেও ততটা অসহ হয় না; কিন্তু নূতনেরাও যে তাঁহার মাথার দিকে হাত বাড়াইতেছে, ইহা শুভলক্ষণ নয়।

মাঘের 'মাসিক বসুমতী'তে শ্রীদেবব্রত গুহ "চিত্রলেখা" নামক একটি গল্প লিখিয়াছেন; গল্পটি চমৎকার—নায়কের স্ত্রীর সদ্যরচিত গল্প হইলেও বেশ পুরাতন পুরাতন ঠেকিল। একটু অনুসন্ধান করিতেই দেখিলাম, স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্যে' (১৩২৮, ফাল্গুন) ঠিক কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এই "চিত্রলেখা" গল্পটি বাহির হইয়াছে। সে সময় লেখক ছিলেন—শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী। তিনি বর্ত্তমানে বাংলা দেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। এইরূপ বেমালুম পুকুর-চুরির দ্বারা শ্রীদেবব্রত গুহ শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীকে পরোক্ষে সম্মান করিয়াছেন—ব্যাপারটা এই ভাবে দেখিলে মামলার নিষ্পত্তি হইয়া যায়। শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী সে ভাবে দেখিবেন কি না, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

* * *

আমরা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্য সত্য সত্যই চিন্তিত হইয়াছি। তাঁহার বিরুদ্ধে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। এই গল্প-চুরি ব্যাপারটাকে অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী করিবার জন্য এই গল্পের ঠিক পরের পৃষ্ঠাতেই "গল্পের প্লট" নামক একটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে লেখা হইয়াছে—

লেখার এই শক্তি বা প্রতিভা সকলের থাকে না। সংসার বা বিশ্বচরাচরকে দেখবার শক্তি এবং সে-দেখাকে লেখায় ফুটিয়ে তোলা শক্তি-সাপেক্ষ, স্বীকার করি। তবু এ কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, দেখার শক্তি এবং দেখে তা লেখার শক্তি—সে শক্তিকে অনুশীলনে তৈরী বা বাড়িয়ে সরল করা যায় না। লেখার শক্তি কি করে আয়ত্ত হয়, সে সম্বন্ধে আর একদিন আলোচনা করবো।

শ্রীদেবব্রত গুহ এই আলোচনার ধার ধারেন নাই, কিন্তু বাস্তবে সেই শক্তির যে প্রকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর! অপরের পুরাতন এবং বিস্মৃত গল্পকে আত্মসাৎ করিয়া নূতন গল্প সৃষ্টি করাও যে একটা আর্ট, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শ্রীদেবব্রত গুহ এই আর্টে দক্ষতা দেখাইয়া পাস-মার্কা পাইয়াছেন।

—

গত সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তে হাস্যরসিক এবং পান-বিশারদ শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, শিবরাম-বাবু সেই বিষয়ে কিছু নিবেদন করিয়া তাহা 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া নিম্নে তাঁহার পত্র মুদ্রিত করিলাম।—

গত সংখ্যার শনিবারের চিঠিতে আমার যে-গল্পটির বিষয়ে আপনারা আলোচনা করেছেন সেই লেখাটির গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে বিদেশী ঋণের কথা যথোচিতভাবেই স্বীকার করা হয়েচে. কোনই অন্যথা হয়নি। আমার মুস্কিল এই, আমি হাসির গল্প লিখি (কিম্বা লেখার চেষ্টা করি বল্লেই বোধহয় ঠিক হবে), অ্যাড্‌ভেঞ্চার কিম্বা ডিটেক্‌টিভ গল্প আমার কলমে আদপেই আসে না—আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেও অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কোনো ছিটে-ফোঁটা নেই (এক যদি সাংবাদিকের জীবন থেকে সাহিত্য জগতে অন-ধিকার প্রবেশ-করাটাকে অ্যাড্‌ভেঞ্চার বলতে চান, বলতে পারেন!) অথচ আমার পাঠক-পাঠিকারা, নিতান্তই তারা নাবালক, (অনেক বড়োরাও নাকি অনুগ্রহ করে আমার 'শিশু-সাহিত্য' পড়ে থাকেন বলে' শুনেচি, কিন্তু সে কথা আমার বিশ্বাস হয় না,) হাসতে নারাজ না হলেও, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প পড়তে চায়—পড়তে তারা ভালোবাসে, আর বাধ্য হয়ে আমাকেও, প্রয়োজনের দায় আর অপরের তাগাদায় সময়ে সময়ে ভয়াবহ পরধর্ম্মাচরণ করতে হয় যে, এ কথা অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন দেখি না। আমার চল্লিশখানা বইয়ে ছড়ানো চারশোর ওপর 'হাস্যকর' রচনার ভেতর এই ধরণের রোমাঞ্চ-কর দুর্ঘট গল্পের সংখ্যা ঠিক কটি, এবং তাদের মধ্যে কারাই বা মৌলিক এবং কজনাই বা ভূঁইফোড়... ভূঙ্গজ, তার চুলচেরা বিচার করে' সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ভার আপনাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে, (অবশ্যি যদি আপনাদের স্থানাভাব, অবকাশের অভাব এবং আপত্তি না থাকে), আমার এই জাতীয় কোনো কোনো গল্পের মালমশলা যে বিলিতি লেখা থেকে নেয়া, বহুদিন আগেকার প্রকাশিত আমার 'টম্ সয়্যারের গল্প' নামক বইয়ের ভূমিকাতেই প্রকাশ্যভাবে এই তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, এই সুযোগে সেই কথাটিই এখানে আমি জানাতে চাই। দুর্ঘটনারা স্বভাবতঃই রোমাঞ্চজনক, তা জানি, কিন্তু তার রোমাঞ্চ যে শনিগ্রহ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে এ ধারণা আমার ছিল না; যাই হোক, এই নতুন ভূমিকায় আবার সেই পুরণো ভূমিকার পুনরুক্তি করতে হোলো, এই পুনরবতারণার ত্রুটি নিজগুণে মার্জ্জনা করে, আমার এই বিজ্ঞপ্তিটি যথাসময়ে আপনার কাগজের যথাস্থানে প্রকাশ করতে আশা করি আপনার দ্বিধা হবে না। ইতি—

—

বাংলা সাহিত্য-জগতে বিদেশী সাহিত্য হইতে না বলিয়া গ্রহণের মাত্রা সম্প্রতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'ভারতবর্ষে' এবং 'বসুমতী'তে প্রকাশিত কয়েকটি গল্প সম্বন্ধে আমরা নানা স্থান হইতে অনুযোগ-পত্র

পাইতেছি। শিবরামবাবুর মত যাঁহারা এইরূপ মৌলিক গল্প রচনা করিয়া দুই পয়সা কামাইতেছেন, তাঁহাদিগকে এই বাজারে বিব্রত করিতে চাহি না। 'ভারতবর্ষে'র শ্রীযুক্ত গঙ্গাপদ বসু এবং 'বসুমতী' ও 'ভারতবর্ষে'র শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন করকে গোপনে শুধু এইটুকু অনুরোধ করিব, তাঁহারা যেন মোপাসাঁ ওড্‌হাউসের মত অতি-প্রসিদ্ধ লেখকদের লেখা আত্মসাৎ না করেন। অজ্ঞাত, অপরিচিত বহু বিদেশী লেখকের ভাল রচনা যথেষ্টই আছে!

*　　　　*　　　　*

এই ছোঁয়াচ অপোগণ্ড স্কুল-কলেজের ছাত্রদের গায়েও লাগিয়াছে দেখিতেছি। 'সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ম্যাগাজিনে' "সেণ্টিনারি নাম্বার, জানুয়ারি ১৯৪২" শ্রীমান জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ "রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে" শীর্ষক যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, সেই কবিতাটিই "স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে" শ্রীমতী শিখরবাসিনী দেবী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া 'ফুলহার' নামক কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। আশুতোষকে কাটিয়া যে ছাত্র রবীন্দ্রনাথ করিতে পারিয়াছে, তাহার লিপিকুশলতার প্রশংসা করিতেছি, কিন্তু পদ্ধতিটা ভাল নয়।

শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "কবিকথা" শিরোনামায় 'ভারতবর্ষে'র কয়েক সংখ্যা ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের যে শ্রাদ্ধ করিতেছেন, সে সম্বন্ধে আসল শ্রাদ্ধাধিকারী শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া আমাদের আর কিছু করিবার নাই।

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র উল্লেখ আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। সম্প্রতি এই চরিতমালায় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা দেশের খাঁটি কবি এবং খাঁটি বাংলার কবি ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় লাভ করিতে হইলে, এই পুস্তিকাটি পড়িতেই হইবে। গুপ্ত-কবির রচনার বহু নিদর্শন এই পুস্তকে সংকলিত হওয়াতে পুস্তকটির মূল্য বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

—

বাংলা দেশ যখন আমলা-তন্ত্রের সুকঠিন শাসন-বন্ধনে বদ্ধ ছিল,

করিতে বাধ্য ছিলাম। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই বাঁধাবাঁধি অবস্থার মধ্যেই বাঁধন-ছেঁড়ার শিক্ষাও তাঁহারাই আমাদের দিতেছিলেন; ফলে ভাবের আকাশে আমাদের মনের মুক্তি ধীরে ধীরে হইতেছিল। এই কালে কয়েকজন বাঙালী লেখক ইংরেজী-বাংলা কবিতা-প্রবন্ধ ও জীবন-চরিত রচনা করিয়া আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ভিত্তি দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমলাতন্ত্রের তন্ত্রীরা বহুদিনের ভ্রান্ত সংস্কার বশে ইহার অনেকগুলি রচনাই বাজেয়াপ্ত করিয়া দেশের ও জাতির উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', কবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুক্তিপথে', বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি পুস্তকের প্রচার এইভাবে বন্ধ হয়।

ইহার পর বাংলা দেশের শাসনতন্ত্রেরও ধীরে ধীরে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; ব্রিটিশ সরকার দেশ শাসনের কর্ত্তৃত্ব আমাদের নির্ব্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে ক্রমশ অর্পণ করিতেছেন। এই অবস্থায় স্বাধীনতা-আন্দোলনকে প্রচলিত রাষ্ট্রের বিরোধী না বলিয়া সহায়ক বলা চলে। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া রাখিবার কোনই অর্থ হয় না। কিন্তু শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন হইলেও বর্ত্তমান আমলাদের শ্লথ মনোবৃত্তি বাহিরের আন্দোলন ব্যতিরেকে পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। শরৎ-চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার ভক্তেরা সোরগোল তুলিয়া 'পথের দাবী'কে মুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু প্রভাতমোহন, বিজয়লাল প্রভৃতি অসহায় সাহিত্যিকদের হইয়া বিশেষ আন্দোলন না হওয়াতে তাঁহাদের পুস্তকগুলির প্রচার বন্ধ আছে।

বাংলা দেশের শাসনকর্ত্তাদের নিকট আমাদের অনুরোধ—তাঁহারা এই সকল কল্যাণকর পুস্তককে বন্ধনমুক্ত করুন। বিজয়লালের 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথে'র মত পুস্তকের বহুলপ্রচার বর্ত্তমানে আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহারা 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' পড়িবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা বিজয়লালের 'মুক্তি-পাগল বঙ্কিমচন্দ্র', 'রিয়ালিষ্ট রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্র সাহিত্যে পল্লীচিত্র' প্রভৃতি পুস্তক হইতেই 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথে'র স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে সাধারণের মধ্যে পরিচিত করিবার এই প্রচেষ্টার আমরা প্রশংসা করি।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি

১৪ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৮

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

মায়াবিনী বেশে চিত্রশিল্পী কে সে,
নাইবা তাহারে জানি।
রঙে রঙে লিখা আঁকি গিয়াছিল
মনে মনে ছবিখানি।
দূরের হাওয়ায় [illegible] তরীখানি তার
এই অন্তরঘাটে কবে হোলো পার,
দূর নীলিমার চোখে তাহার
উদ্যত যেন হাসি॥

মুগ্ধ আলসে যদি একা বসে
গণিতেছি [illegible] শত ঢেউ।
যারা চলে যায় ফেরে না তো হায়
সিন্ধুপারের আর কেউ।
মনে জানি কারো নাগাল পাব না,
তবু যদি মোর উদাসী ভাবনা
কোনো ফুল পায় সেই দুরাশায়
সাঁঝে সাহানায় রাগিণী॥

দাদু

[শিল্পী শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্তের স্ত্রী শ্রীমতী ঊষা সেনগুপ্তাকে লিখিত]

নিবেদন

আজকের এই সভা সম্বর্দ্ধনা-সভা হ'লেও আমি একে আমার নমস্য ও প্রীতিভাজনদের প্রেমের সভাই বলব। আমাকে সম্মান-দানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হ'লেও, তাঁদের ভালবাসাকেই আমি বড় ক'রে দেখব—আমার সম্বর্দ্ধনাকে নয়।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর কিছুদিন পরেই "প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনী" আমার জন্য ঐ নামের একটা কিছুর জল্পনাকল্পনা করেছিলেন। আমি তাঁদের করজোড়ে বাধা দিই। লিখেছিলাম—এমন কাজ করবেন না, যাঁর জয়ন্তী করা না হ'লে আমার দেশ বিশ্বের কাছে চিরদিনের জন্য ছোট হয়ে যেত, বাঙালীর দুরপনেয় কলঙ্ক থেকে যেত, সে জয়ন্তীর মূল্য হ্রাস করবেন না।

সেদিন প্রেমকে নিরস্ত করেছিলাম। আজ আমার সে বল নেই। গুরুদেবের কবিতাই চোখের সামনে উপস্থিত হচ্ছে—

আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না তো অপমান।
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তাহারো চেয়ে সে যে মহীয়ান।

প্রেম বিশ্বজয়ী। প্রেমের জয় হোক।

আমার এ সুযোগ সৌভাগ্য আর কবে মিলবে! শরীর এ বৃথা ভার বহন করতে আর চাচ্ছে না। আবার যাঁর সকলের উপর দাবি, তিনি তাঁর ক্ষেতের সুপক্ক ফলটির দিকেই হাত বাড়িয়ে থাকেন (যদিও তাঁর কাঁচাতেও অরুচি নেই)। মধ্যে মধ্যে তিনি টিপেও দেখে যাচ্ছেন।

তাই এই সুযোগেই আমার আপনজনের কাছে দু-একটি কথা যা মনে আসে, তা শেষ ক'রে রাখাই ভাল।

আমার এই তুচ্ছ জীবন, ঘটনাচক্রে একপ্রকার অজ্ঞাতবাসেই অতিবাহিত, বর্ত্তমানে বিরাটের বাটে। যাঁর পরিচয়ের আজ অপেক্ষা নেই, সেই আমার স্বনামধন্য প্রিয় বন্ধু শরৎচন্দ্র আমাকে সাক্ষাতে ও পত্রে অনুযোগ করতেন—"দেশে থাকেন সইতে পারি, কাশীতে আছেন শুনতেও পারি, আপনি পূর্ণিয়ায় কেন?" বলতাম, ভগবান ভুল করেন না, যথাস্থানই ভাল নয় কি?

আমার দূরাগত আগন্তুক বন্ধুরা, আজ শরৎচন্দ্রের কথার অর্থ ও আমার অপরাধ আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, এবং কষ্টস্বীকারের মধ্য দিয়ে তাঁদের আন্তরিকতার প্রভাব প্রমাণ ক'রেও দিলেন;—নাই বা বললাম, লজ্জাও দিলেন। বাঙালীর ঋণই লক্ষ্মী—ঋণী থাকতে আমি ভালবাসি।

স্থানীয় নমস্য ও প্রিয় ভাই-ভগ্নীদের স্বতন্ত্রভাবে বলবার আমার কিছু নেই। কারণ আমি তাঁদেরই একজন। আত্মকথা অশোভন লাগবে। তাঁদের প্রীতিপূর্ণ অমায়িকতা, আমাকে সাহায্যকল্পে আগ্রহাতিশয্য, সকল বিষয়ে সঙ্গ ও সম্মান দান এবং সাহিত্য-প্রসঙ্গাদি আমার বার্দ্ধক্যকে শক্তিদানে সবল ক'রে রাখে। শাস্ত্রে 'বন্ধন' কথাটি অনুকূলার্থে প্রযুক্ত না হ'লেও, আমি স্বেচ্ছায় তাতে বদ্ধ।

আবার অশরীরী মায়ার ধাত্রী আমার মায়ের জাতিরা, তাঁদের স্নেহমায়ায় এই পরপারের যাত্রীকে তাঁদের স্নিগ্ধমধুর আহ্বানে মুগ্ধ ক'রে রাখেন। তখন কবির সেই করুণ "যেতে নাহি দিব" স্মরণে আসে, যা মায়ের জাতির চিরসত্য মর্ম্মকথা—ব্যথা-বিদ্ধ অন্তরের প্রতিধ্বনি। তখন নীরবে নমস্কার জানাই, মনে মনে বলি—কল্যাণীরা, শান্তিতে থাক, আমি তোমাদের দেওয়া পাথেয় পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করলাম।

জয়ন্তী-দিনে দেশবাসীর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য স্বীকার ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"আপনাদের এই আয়োজন সময়োচিত হয়েছে।... জীবন যখন মৃত্যুর প্রান্তে এসে পৌঁছয়, তখন তা অপেক্ষাকৃত সহজে নেওয়া যায়।"

আমার ভাগ্যে কিন্তু জীবনের উপ-প্রান্তে সাহিত্যসেবার ডাক পড়েছিল, সেটা দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ। তখন আমি ৫৬।৫৭ বর্ষে উপস্থিত, বন্ধুবর স্বনামখ্যাত রস-সাহিত্যিক ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের না-ছোড় আগ্রহ-অনুরোধে ও অধুনা 'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীমান সুরেশ (চন্দ্রগুপ্ত) চক্রবর্ত্তীর আবদারে। তখন কর্ম্ম হতে অবসর পেয়ে কাশীবাস করতে এসেছি। কথাটি যেমন লজ্জার, তেমনই পরিহাসের। মন সায় দেয় না, তাঁরাও ছাড়েন না। এড়াতে না পেরে "দেবী-মাহাত্ম্য" ব'লে একটি নাতিদীর্ঘ গল্প লিখতে হয়। মনে কিন্তু সুখ ছিল না, দ্বিধাই ছিল, "এ কি করছি, এই করতে কি কাশী এলুম ?" তাই আমার "হাইকোর্টে" মীমাংসার জন্য জানাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন —"কাশীতে মুক্তির আশা করলেই তো মুক্তি হয় না। অন্তরে প্রিয় কিছু যদি চাপা থাকে, আর মাঝে মাঝে সে—'আমি আছি' ব'লে জানান দেয়, সেই জ্যান্ত জিনিসকে বন্দী রেখে, নিজে মুক্ত হবে কি ক'রে ? তাকে মুক্তি দিয়ে তবে মুক্ত হতে হয়।"

রায় পেয়ে দ্বিধার দায় ঘোচে। কিন্তু অন্তরে সাহিত্যের সাড়া বা উৎপাত থাকলেও বহুকাল যে লিখি নি ! সে উৎপেতে জিনিস তাই "কোষ্ঠীর ফলাফল" ব'লেই আরম্ভ হয়। সেটাও অল্পে বা সহজে হয় নি। যৌবন বাধামুক্ত, কিন্তু প্রবীণ বয়সের লোক সহজে ক্ষমা পায় না, তায় শিরে সংক্রান্তি—কাশীবাস। নানা চিন্তা আসে,—লিখবই বা কি,—লেখকেরও অভাব নেই, লেখারও আকাল আসে নি। পাঠক

মেলাই সমস্যা। ধর্ম্মমঙ্গলের জঙ্গলে নিজেরও ঢুকতে ভয়, পাঠকেরা নাম শুনেই সশঙ্ক। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের গর্ত্তে জ্যান্ত মানুষ মাথা গলায় না। কোনরূপ সুসমাচারের (মথি-লিখিত নয়) কথা ভাবলে—নিজের মনই বলে, খবরদার! ভিটে-মাটি ঘোচাবার গ্রহ যাকে না ধরেছে, ওসব তাকে রোচাবার জো নেই। উপায় কি ?

অন্তরে বদ্ধ বন্দীরা সাড়া দিলে, বললে—"ভাবছেন কেন, যেমন জাত-ব্যবসা থাকে, তেমনই ধাত্-ব্যবসাও তো আছে—২৫ বছর আগে যার মক্স আরম্ভ করেছিলেন। তার আসবাবগুলো—গামলা, চ্যাঙারি, দাঁড়িপাল্লা, ময়রাইয়ের মালের মত 'ডেটেন্যু' হয়ে পেটে তো মজুদ রয়েছি। আমাদের খালাস দিন না। ধাত-ব্যবসায়ে সবার বড় লাভ—নিজের আনন্দ, যা অন্তঃশীলা বয়।"

বললুম—"থাম ইষ্টুপিডরা, বয়সটা দেখছিস না!" বললে—"বয়স বাড়ুক না, বিজ্ঞ হবেন না, তা হ'লেই হ'ল, সেটা সাহিত্যের শত্রু। কেউ নিজে বয়স বাড়ায় না। ওটা আপনি বাড়ে। সাহিত্য তো শিল্পের মধ্যে—শিল্পের বয়স আছে নাকি ; 'চারু' বললেই কচি বয়স বোঝায় না। ধাত সহজে ছাড়ে না, তার অপঘাত নেই। সাহিত্যসেবার প্রথম অধ্যায়েই ধাত তো ধরা দিয়েছিল!"

তাই তো—ডেভিলরা ভাবালে যে! এদের বন্দী ক'রে রাখা কি দুর্ব্বুদ্ধিতা! কিন্তু আমাকে যে বড় মুশকিলে ফেলে দিলে! জোর ক'রে বিশ্বনাথের বিজ্ঞতার বেড়ার মধ্যে যে নাম লিখিয়েছি! ওরা আবার ব'লে দিলে—"মনে রাখবেন, সব জিনিসেরই দুটো দিক থাকে। নিরবচ্ছিন্ন মন্দ কেউ নয়।"

তখন অনেক চিন্তাই আসে, বিরক্ত না হও তো দু-চারটে মনে আছে বলি, ভাবনাগুলো কিছু বেয়াড়া। কি করব—যেমন দেবতা,

তার নৈবেদ্যও অনুরূপ। আর বলবার দিনই বা আমি কবে পাব? ধাত ছাড়ে না, হিংয়েরও আতর হয় না।

তাদের কথা ধ'রেই চিন্তা নম্বর ওয়ান এলেন। যথা—কোন কিছুই একান্তভাবে মন্দ নয়, সেটা অবস্থা ও রুচির ওপর নির্ভর করে। লোকে কূলকিনারা না পেলে হতাশ অবস্থায় ধোঁয়া দেখে। আবার গুড়ুক টানবার সময় ধোঁয়া না দেখতে পেলে সুখই হয় না।

ভালবাসাতেও তাই। এক সময় লিখতে খুবই ভালবাসতাম, বিচ্ছেদ সইত না, এখনও বাসি,—পারি না। এখন আর তার শিখা দেখতে পাই না, মনে হয় ধরল, না, নিবে গেল।

নম্বর টু—লোকে বলে টানাটানিতে বড় প্যাঁচে প'ড়ে গিয়েছি,—মনে সুখ নেই। কিন্তু কত টানাটানিতে আর কত প্যাঁচে—কদমা জন্মায়, তা মোদকই জানে, টান একটু কম পড়লেই মাল মাটি। টানেরও দরকার, প্যাঁচেরও দরকার। আবার এমন রোগও আছে, পেটের ফাঁপ পেলেই ডাক্তার তাড়াতাড়ি ভিজিট নিয়ে মোটর চাপেন। কিন্তু কদমার যত বেশি ফাঁপ, শিল্পীর ততই খ্যাতি।

থ্রি—চাকরকে বিশেষ ক'রে বলি, বেশ নিরেট দেখে নিবি। আবার ছেলেটা পরীক্ষায় ফেল হ'লে বলি, জানি ওর কিচ্ছু হবে না—মাথাটি একদম নিরেট। ও তো ভূমিষ্ঠ হয় নি, সিমেণ্টের মেঝেয় প'ড়ে সিমেণ্ট হয়ে গেছে।

ফোর—বেড়া দিতে হয়, ফাঁক না থাকে, ছাগল না ঢোকে। চোর কিন্তু সিঁদ কাটে ফাঁক পাবার জন্যে।

নম্বর ফাইভ,—আমাদের রাজবন্ধু হাজরা উর্দ্দিপরা সার্ভিসে সত্বর সুনাম বাড়িয়ে ফেলেন, কিন্তু উর্দ্দির ফুর্ত্তি ও রাবড়িটানা পাগড়ির প্রভাবে, পেটটি দ্রুত বেড়ে পেটির মাপ ছাড়িয়ে যায়। পত্নী সভয়ে

বলেন—দুধ খাওয়াটা ছেড়ে দাও। পোড়ারমুখোরা যত বিলিতী গরু জুটিয়ে গোয়াল ভ'রে দিয়েছে—কোনটা ১০ সের, কোনটা ৮ সের দেয়, ৭ সেরের কম একটাও নয়। যত সব অলুক্ষুণে জানোয়ার। পেট বেড়ে হাঁটুতে এল।

মা উদিকে বধূকে বলেন—দেখতেই পটলচেরা চোখ, চোখে কি দেখতে পাও না, ছেলে আমার দিন দিন যে শুকিয়ে যাচ্ছে! এত দুধ কার পেটে যায়—আমার পা ছুঁয়ে বল। উপে যাচ্ছে নাকি? গরু লক্ষ্মী তা জান? বিলিতী গরু—তা জান, খুরে রোজ তেল দিতে হয়, প্রণাম করতে হয়। হাবাতে ঘরের মেয়ে, কিছু শিখে আস নি বাছা। যাক।

জগৎ দুদিক নিয়েই বেশ চলে। ভালমন্দ আর কোন্‌টাকে বলি, সবই তো দরকার। তখন পেঁতে পাড়লুম। আমার কিন্তু কাজের কথা আসে না, তার সঙ্গে চিরদিনই বিরোধ। বাজেটাই ভালবাসি, বাজেকেই সম্মান দিয়ে এসেছি। চিনির কথা অনেকেই কন, নুনের কথা কেউ কয় না বা শুনতে পাই না। বোধ হয় সেটা বাজের কোটায় পড়ে। তাকেই তখন গ্রহণ করি, তার আশ্রয়ই নিই। নুন নিজেও রসে, অন্যকেও রসায়। গরিবের কাছে তার মূল্য আছে। তাই তাকেই আমার লেখার সম্বল করেছিলাম, বেদনাগুলো নুনের সেঁকে ঢেকে, with a bit of salt দেবার প্রয়াস পেয়েছিলাম।

আমার বাংলা দেশ গরিব হ'লেও রসপ্রিয়, বাঙালী স্বভাবতই রহস্যোপভোগী হাস্যপরিহাসপটু। আমার হাসির আবরণে ঢাকা ব্যথার কথা, তাই সহজেই বোধ হয় আমার দেশের বহু ভাই-বোনদের ভালবাসা পেয়ে সার্থক হয়েছে। তাদের নিজের রসপ্রাণ স্বভাব এ সার্থকতার পশ্চাতে কতটা কাজ করেছে বলতে পারি না। কারণ

গরিব-দুঃস্থের বেদনা বুঝতে পারি। যা বোঝা যায়, দরদী প্রাণ তার প্রতিকারের চেষ্টা পান, পেয়ে ধন্য হন। কিন্তু মধ্যবিত্তের বেদনা, যা বোঝা যায় না—আমাকে বিচলিত করেছিল। এ পণ্যের বাছাই চলে না, "অবাঙ্‌মনসোগোচর" যদি কিছু থাকে, বোধ হয় এরাই, বাবু ব'লে পরিহাসটা বহন করে মাত্র। কিছু না থাকলেও এদের সব করতে হয়, হাসি না থাকলেও হাসতে হয়। এরা বাহ্যিকের বাহন, তাই বোঝবার অবকাশ নেই। এরা ঘটি বাঁধা দিয়ে চাঁদা দেয়, ভিক্ষাও দেয়, নিজেরা বাঁধা মার খায়। পেট খালি, কিন্তু জগৎ-সৌন্দর্য্যের এরাই মালী, জগতের যৌবনরক্ষক শিল্পী। এরাই তাকে বৈচিত্র্যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তার গোড়ায় এরাই গতিশক্তি। নিজের দুর্ভাবনার এদের অন্ত নেই, কিন্তু বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ায়। রাজ্যের চিন্তার ভার মাথায় ক'রে আছে। আবার গল্প, উপন্যাস, দর্শন, বিজ্ঞান লেখে এরাই। সংস্কার, কাল্‌চার, সমাজ, সম্ভ্রম এদের মাথায় বুকে পিঠে, বাঁধা কিন্তু ভিটে। ভাগ্য এদের উঠতেও দেয় না, নামতেও দেয় না। Inter Class-এর লোক। ব্রহ্ম ও শক্তি যেমন দুইও নয়, একও নয়, এক-দুয়ের মাঝখানটা।

এদের চেয়ে গরিবও দেখি নি, দুঃখীও দেখি নি, তার গোপন গভীরতা মাপে পাওয়া যায় না। এরা এক অভিশপ্ত শ্রেণী।

একটা পূর্ব্বকথা বলি, তখন দেশে Unemployment কথাটির আমদানি হয় নি, বিবাহক্ষেত্রেও ছিল না। সে employment বাপ-মার দয়ায় মিলত। এখন ষোল বছরে Matricটাই ভাল, তখন সেটা ছিল বিবাহ, যেটা মধ্যবিত্তের ছিল বড় পরিচয়। পরে অধিকাংশই চাকুরিজীবী। কালবৈশাখীর একটা দিনের কথা মনে পড়ে। আপিস ক'রে ফেরবার পথে গঙ্গার পোলের মুখে পা দিতেই প্রলয়-ঝঞ্ঝা। ফিরলে ২।৩ মিনিটেই আশ্রয় মেলে, কিন্তু বাড়িমুখো বাঙালীর ফেরার অপবাদ নেই। বরুণ ও পবনে দারুণ দুর্ব্ব্যবহার আরম্ভ করলে; বাঙালী adamant; একজন রহস্যে বা দুঃখে ব'লে উঠলেন—"কি ঐশ্বর্য্য কি শান্তি যে বাড়িতে অপেক্ষা ক'রে আছে, ভেবে পাই না, বোধ হয় গিয়ে দেখব—এক বেটা পাওনাদার দুর্ম্মুখের মত দাঁড়িয়ে আছে।"

কথাটা কালাচাঁদ খুড়োর কানে গিয়েছিল, কিন্তু অবস্থা ও সময়টা কথা কবার মত ছিল না। তিনি ছিলেন পউনে-প্রবীণ। ট্রেনে বসবার পর খুড়ো বলেছিলেন—"বাবাজী, বাড়ির কথাটা তখন ঠিকই বলেছিলে, কিন্তু তাতে বেইমানি বাঁচে না। দারুণ দৈন্য আর রোগ শোক বুকে চেপে যে একখানি চিন্তাক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ করুণ ম্লান মুখ, প্রসন্নতার প্রলেপে বিষণ্ণতা ঢেকে, দিনের পর দিন নীরব সেবায়, সেই স্যাঁতসেঁতে বাড়ির একটুখানি উঠোন, দুখানি কুটুরি আর দাওয়াটুকুতে অবিশ্রাম কাজ-কর্ম্মে ঘুরে কাটাচ্ছে, শত অশান্তির মধ্যে সেই আমাদের টেনে নিয়ে যায় বাবাজী।" যাক এ কথা কোথায় যেন লিখেছি। তা হোক। এ কথার শেষ পাই নি—শ্যামেরও নাগাল পাই নি।

কল্যাণীরা রাত্রে ম্যালেরিয়ায় ভোগেন, সকালে রেঁধে খাওয়ান। আপিসে বেরুবার সময় অতি সঙ্কোচে—"যদি পার একটা ডি—" পর্য্যন্ত বেরোয়। "হ্যাঁ হ্যাঁ, ডি. গুপ্ত, আমার মনে আছে, ও বলতে হবে না।" মনে যে নেই তাও নয়, কিন্তু আপিসের দারোয়ানের কাছে ধার চাইতে আর সাহস হয় না। তার খাতায় যে মাথা বিকিয়ে রয়েছে। যাক। •

এই মধ্যবিত্ত অশান্তচিত্ত শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের চেয়ে অপার দুঃখে দুঃখী নজরে পড়ে নি। আবার দেশের দুঃখ মেটাবার জন্যে এরাই পাগল হয়। উদর ভুলে উদারতার উদাহরণ এরাই। ভগবানকে পাবার পথ আছে, এদের বোঝবার পথ পাই না। ইতর ভদ্র দুঃস্থ ও পীড়িতদের দুঃখ দূরীকরণের ও প্রতিকারের সভা, সমিতি, movement আরম্ভ হয়েছ, এদের ভাগ্যে চির "ডুব-ment"।

তাই এদের কথাই কিছু কিছু বলতে প্রয়াস পেয়েছিলুম মাত্র। পঁচাত্তরে পৌঁছে একদিন দেখি—ভোর হয়ে গেছে, স্বপ্ন ভেঙে গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেখনী সেই পর্য্যন্ত নিরস্ত; তার দুঃসাহসী স্পর্দ্ধায় পর্দ্দা প'ড়ে গেল। কিন্তু মন থেকে গেল না। এই বিধাতার "পরিহাসদের" কথা, তাই রহস্যের সুরই স্বীকার করেছিল।

আজ আমার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় শক্তিশালী শিক্ষিত যোগ্যতর সুধী বন্ধুদের পেয়ে ব্যথার কথাটা উত্থাপন ক'রে যাচ্ছি। মানুষের আশা

ফুরোয় না, সামর্থ্যই ফুরোয়। ভালমন্দের কথা জানি না, তা এখন দেশের ও দশের। আমি ভারবাহী ছিলাম মাত্র, বোঝা নামিয়ে দিয়ে গেলাম।

পূর্ব্বে যাঁদের কথা বলেছি, সেই মনীষীদের দেওয়া সাহিত্যরসে আমার দেশ আজ সঞ্জীবিত, জাগরিত। সেই রসাভিষিক্ত রসমুগ্ধ বিদগ্ধ সাহিত্যপ্রেমিক বন্ধুরা এই নগণ্যের সামান্য প্রচেষ্টাকেও সম্মান দিতে সমবেত—স্নেহময়ীরাও উপস্থিত। এ ভালবাসা মানুষেই দিতে পারে—দেবতায় কৃপা করেন। এই যে অন্তরের আকর্ষণ, যাতে আপন-জনকে পাই, এর উৎস সেই বিশ্বেশ্বরের একতারায়—যা বেসুরে বাজে না। যে ভালবাসা পেতে লোক লালায়িত, যে নিরাকারকে দেখবার জন্য তাপসের কৃচ্ছ্রসাধনা, সে ভালবাসা আজ শরীরী হয়েছে, আমি ধন্য হলাম। সকলে আমাকে "দাদামশাই" বলে। কতখানি ভালবাসা দিয়ে, দাদামশায়ের গড়ন হয়, তা আমার জানা নেই। তার যতটুকুই আমার ভাই-ভগ্নীদের দিতে পেরে থাকি, বোধ করি তার মধ্যে ফাঁকি ছিল না। যাক, কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ মাত্র মুখের জিনিস—তুচ্ছ কথা।

আমার বহুদিনের ধারণা, সাহিত্যিকেরা, সাহিত্যরসিকেরা, সাহিত্য-প্রেমিকেরা—একটি স্বতন্ত্র জাতি। এঁদের সাহিত্য-'গোত্র'। আমি সেই গোত্রীয়দের অভিন্ন একজন। আজ তাঁদের পেয়ে, তাঁদের মধ্যে নিজকে সমর্পণ ক'রে এক হবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হলাম। সকলে আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন। দূর দেশ হতে যাঁদের পেয়েছি, তাঁদের সর্ব্ববিধ ত্যাগ ও কষ্টস্বীকার আমার অহংকার না বাড়ায়—এই প্রার্থনাই করি।

আবার বলি—অনেক দিলেন, অনেক পেলুম, কিছু অতিরিক্ত হয়েছে, তাও স্বীকার করলুম। সকলে কিন্তু দয়া ক'রে, ওই "দীর্ঘ জীবন" ব'লে শব্দ দুটি মনে মনে বাদ দিয়ে দেবেন। আমাকে আরও অথর্ব্ব ও পঙ্গু দেখবার প্রার্থনাটা রাখবেন না।*

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* গত ৪ ফাল্গুন ১৩৪৮ তারিখে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশীতিতম জন্মদিনে অনুষ্ঠিত সভার সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তাঁহার ভাষণ। পর-পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কবিতাটিও তিনি পাঠ করিয়াছিলেন।

জন্মদিনে

বহু বর্ষ অতিক্রমি আঁকাবাঁকা পথে,
সুখ দুঃখ সহি কত কত দিন হতে
যাত্রা আরম্ভিয়া, আজ এসেছ অশীতি,
এস অনুবাগী বন্ধু স্বাগত অতিথি।
বসন্ত নিদাঘ বর্ষা শীত ফিরে ফিরে
শরৎ গিয়াছে কত তোমা ঘিরে ঘিরে ;
রোগ শোক জন্ম মৃত্যু ঝঞ্ঝা শিরে ধরি
দেশ কাল উপেক্ষিয়া সাগর উত্তরি,
আঘাত লাঞ্ছনা ব্যথা সবি ছিল সাথে—
ধন্য অনুরাগী, বাধা মানো নাই তাতে।

বিশ্ববক্ষে সুন্দরের কত পরিচয়,
জীবে জড়ে কত কথা স্তব্ধ হয়ে রয়,
একে একে মানবের অন্তরের খেলা,
প্রকৃতির পরিচয়, যত গেছে বেলা
জানালে কতই ভাবে, কি বিচিত্র লীলা
জীবনে ভুবনে চলে! ব্যাকুল করিলা
জানিবারে এ রহস্য কার—কে মহান
ইঙ্গিতে নিখিল যাঁর মানে এ বিধান!
কে গোপনচারী সদা নিয়ন্ত্রিত করে
সহজে এ ত্রিভুবন? সেই শক্তিধরে
না জানিলে বিফল এ মানব-জনম।
পরিহাসচ্ছলে মোরে দিলেন সরম

সাহিত্য-সেবক করি। যথাসাধ্য তাই
তাঁরি দেওয়া সুরে আমি গান গেয়ে যাই।
কেহ কহে হাস্য-রস, কেহ অন্য কিছু,
মোর কিন্তু অশ্রুধারা ছিল তার পিছু।
মন্দারমালা সে নহে মর্ম্মের সে জ্বালা,
আকিশোর প্রাণে যার ঢাকা ছিল ডালা।

কে পড়িবে, কেনই বা? তাই ছদ্মসাজে
প্রয়াস পেয়েছি দিতে যদি লাগে কাজে।
আদৌ রহস্য নয়, সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস,
ধাতা দিলে পরিহাস তাহারি বিকাশ।
তোমরা পরম বন্ধু প্রিয়তম সাথী—
বাণীর সেবক সব সাহিত্যিক-জাতি,
প্রীতির ভাজন মোর দেশের গৌরব,
সকলে আনন্দদানে বাড়াও সৌরভ।
অক্ষমে যা দিলে—ঋণী করিলে আমায়,
ঋণ মোর,—মূলধন আমি গণি তায়।
প্রেমে যার জন্ম তার পরিশোধ নাই,
উর্জ্জিত ধরম তার ফিরে পাবে তাই।
তাঁহার আশিস্ আজ মোর মুখে কয়—
"বাণীর প্রিয় সেবক হবে তব জয়।"
আমারে এ দেওয়া নয়, তোমাদেরি পাওয়া,
উজান বহিয়া চলে এক তাঁরি হাওয়া।

৪ ফাল্গুন, ১৩৪৮ শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনর্বসন্ত

আবার যুগল পায়ের চিহ্নে শ্যাম তৃণদল পড়িছে ঢাকা,
নদীতীরবাহী প্রান্তরে পুনঃ নব পথরেখা উঠিছে জেগে,
জাহ্নবীবুকে লঘু মেঘছায়া মায়া-মনোহর সৃজন করে,
সন্ধ্যার বায়ে ভাসিয়া আবার আসিছে শ্রবণে হারানো সুর।

তুমি একদিন ধরেছিলে হাত, স্মরণে কি আছে সন্ধ্যা সেই—
ধূলি ও ধোঁয়ায় কালো শহরের মাথায় আকাশে গোধূলি-রঙ,
ঠিক মনে হ'ল, মুমূর্ষু দিবা বিদায়ের হাসি উঠিল হেসে—
শূন্যে উধাও ছুটেছিল যেন লাইনে বদ্ধ ট্রামের চাকা।
সহজ স্নেহেতে আপনার হাতে নিয়েছিলে মোর হস্তখানি,
জানিতে কি সখি, সে পাণি কখনো হবে না পীড়িত মন্ত্রপাতে?
গঙ্গার জলে একজোড়া মুখ তড়িৎ-আলোকে ফেলিছে ছায়া,
কাঁপা কাঁপা জলে পড়িতে সেদিন পেরেছিলে ছায়া-মুখের ভাষা?
মনের ভাষা তো পড়িতে শিখি নি, মনে আছে শুধু গানের ভাষা।
কে জানে কখন কোন্ ভাবাবেশে সুরে গাঁথে কথা বিশ্বকবি—
তাঁরি জবানিতে প্রশ্ন-আতুর মন পেয়েছিল জবাব বুঝি,
তোমার মনেতে কি ছিল হয়তো জানিতে আজিও পারি নি তাহা।

তারপর এল শ্রাবণ-রাত্রি, অমা-যামিনীর অন্ধকারে
উদ্যতফণা ফণীও করিল সংহত তার দশন-লীলা।
মনের কামনা মনে র'য়ে গেল, দেহের মিলন বাতাসে কাঁপে,
তুমিও বুঝিলে, আমি বুঝিলাম, নিশ্বাস এল রুদ্ধ হয়ে,
ক্ষণ ইতিহাস ভেসে গেল সখি, বিরাট কালের স্রোতের জলে,
মহাসমুদ্রে প্রবাল হইয়া হয়তো কোথাও জাগিয়া আছে।
তুমি কি চেয়েছ, আমি কি চেয়েছি, ফিরে পেতে সেই হারানো ক্ষণে,
বাঁকা ঠোঁটে তব হাসির রেখাটি বেদনা গোপন বহে কি আজো?
অনেক সয়েছি, ভুলে গেছি কথা—কথাহীন সুর মরমে জাগে
ঠোঁটে ঠোঁট আর বুকে বুক মিলে চাপিয়া মারে নি গানের সুর।

হায় সখি হায়, অধরা রহিলে তাইতে যে ধরা রঙিন মম—
বিফল প্রয়াসে শোণিতবিন্দু তুলিতে চাহে নি সিন্ধুভাষা।
আকাশ সাগর মিলিল না আজো তাই ওঙ্কার শূন্যে বাজে,
তাই রবিকরে সাগরের জল মেঘের শোভায় আকাশ ঢাকে।
তুমি ঢাকিয়াছ আমার আকাশে, আমিও ফেলেছি তোমাতে ছায়া,
ধারাবর্ষণে কাঁদিয়াছি কভু, সাগরের ডাক শুনেছি বুকে,
নিশীথশয়নে জাগিয়া চকিতে খুঁজেছি তোমারে পাই নি কাছে—
বহুদূরদেশে মন ছুটে গেছে কমলালেবুর সোনালী বনে,
ডিঙায়ে গিয়াছে মসমাইধারা, উপলবহুল ডাউকি নদী।

আবার যুগল পায়ের চিহ্নে শ্যামতৃণদল পড়িছে ঢাকা,
হারায়েছি যাহা করি নাই দাবি, সে কি আর সখি ফিরিয়া পাব?
জল উবে গিয়ে জলই হয় জেনো, মন কোনদিন হয় না দেহ—
হাতে হাত রাখা প্রেমে কভু সখি স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরে না বুকে।
দুই স্রোত আসি এক হয় যদি, তবেই সাগরে নদীর গতি,
অবিরাম চলে তাই তো সময় অসময় হয়ে ওঠে না কভু—
শ্মশানের চরে পলি প'ড়ে পুনঃ সবুজ ফসল গজিয়ে ওঠে।

বিরহচিতার আগুনে পুড়িয়া নবরূপ ধরি জেগেছি মোরা—
ভয় পেও নাকো, দুয়ার এখন মৃদু করাঘাতে খুলিয়া যাবে।
পাইনের বনে পথ ভুলে পথ চকিতে সেদিন খুঁজিয়া পেলে,
মরু-বালুকায় পথ যে হারায় মরীচিকা তার আশা যে শুধু।
আবার যুগল পায়ের চিহ্নে শ্যামতৃণদল পড়িছে ঢাকা,
কাছে এস সখি, চুলের গন্ধে বিবাগী মনেরে ঢাকিয়া দাও।
দেহ আর মন চলে পাশাপাশি বুঝিতে পারি নি সেদিন ইহা—
দেহের শুচিতা বাঁচাইতে গিয়ে রুদ্ধ করেছি মনের দ্বারও।
কাছে এস সখি, ভুলে ভুলে আজ আসল কথাটি পড়েছে ধরা—
আবার যুগল পায়ের চিহ্নে শ্যামতৃণদল ফেলিব ঢাকি।

জমিদারির অপমৃত্যু

ফ্লাউড কমিশন তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, রিপোর্টে প্রদত্ত উপদেশ কার্যে পরিণত করা হইবে কি না, সে বিষয়ে গবর্মেণ্ট এখনও কোন স্থিরসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নাই। কমিশনের উপদেশের সারমর্ম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের দ্বারা যে সকল জমিদারি সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সমস্ত গবর্মেণ্ট কিনিয়া লইবেন, এবং তাহার ফলে এই সমস্ত সম্পত্তি সমগ্র রাষ্ট্রের সরকারী সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে; জমিদারিগুলির স্বত্ব বর্তমানে যাঁহারা ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা মূল্য ও ক্ষতিপূরণবাবদ একটা নির্দিষ্ট হারে টাকা পাইবেন। মূল্য ও ক্ষতিপূরণের হার ও টাকা দিবার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা লইয়া কমিশনের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে মতানৈক্য আছে, কিন্তু সে অনৈক্য বিশেষ গুরুতর নয়।

এই উপদেশ কার্যে পরিণত করা হইলে ভারতবর্ষ হইতে জমিদারি-প্রথা উঠিয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া বাংলা দেশেই ইহার ফল লক্ষিত হইবে বেশি, কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলা দেশে যতটা প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এমন আর অন্য কোন প্রদেশে করে নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেন, কি অবস্থায় ও কি প্রত্যাশা লইয়া করা হইয়াছিল, সে প্রত্যাশা পূর্ণ হইয়াছে কি না এবং এই ব্যবস্থার সুফল ও কুফল কি কি হইয়াছে, তাহার আলোচনা ইতিহাসের বইয়ে, পাঠ্যপুস্তকে ও সংবাদপত্রে অনেক করা হইয়াছে। আমি তাহার পুনরুক্তি করিব না। গবর্মেণ্ট যে ফল আশা করিয়াছিলেন, তাহা পান নাই, এইজন্যই ইহার উচ্ছেদের কথা উঠিয়াছে। যে অবস্থার চাপে ইহার সৃষ্টি প্রয়োজন মনে করা হইয়াছিল, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থাও আর ঠিক তাহা নাই।

এই বন্দোবস্তের উচ্ছেদ করিলে তাহার ফলাফল কি হইবে, প্রজার ও জমিদারের স্বার্থ তাহাতে কতটুকু ক্ষুণ্ণ বা পুষ্ট হইবে, গবর্মেণ্টেরই বা কোন্ দিকে কতটুকু লাভ-লোকসান দাঁড়াইবে, সে আলোচনাও করিব না। তাহার এক কারণ, সে আলোচনাও ইতিমধ্যেই বহু হইয়া গিয়াছে; দ্বিতীয় কারণ, কোন্ ব্যবস্থার ফল ভবিষ্যতে কি দাঁড়াইবে, না দাঁড়াইবে, তাহার আলোচনা অনেকটাই জল্পনা-কল্পনার ব্যাপার।

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উৎখাত করা হইতেছে, এই সংবাদটাতেই বাংলা দেশে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। এই চাঞ্চল্য মানসিক, ইহার কার্যে প্রকাশও দেখা যাইতেছে। কমিশন বলিয়াছেন, যে কোন লোক জমির মালিক হইয়া রহিয়াছে অথচ নিজে জমি ব্যবহার না করিয়া অন্য লোককে জমি পত্তন বা বিলি করিয়া দিয়াছে ও তাহার উৎপন্ন ফসলের অংশ স্বত্ব বলিয়া ভোগ করিতেছে, তাহাকেই ভূস্বামী বলিয়া গণ্য করা হইবে, এবং জমিতে তাহার সেই স্বত্ব সরকারের খাস করিয়া লওয়া হইবে; জমি যে নিজে ব্যবহার করিতেছিল তাহার হাতেই থাকিবে। অর্থাৎ জমিদার তালুকদার থাকিবে না, প্রজা সরাসরি সরকারের প্রজা হইবে; জমি যে বরগা খাটাইতেছে, তাহার স্বত্ব লোপ পাইবে এবং বরগাদার সেই জমিতে প্রজাস্বত্ব পাইয়া যাইবে। অতএব জমিদাররা ভয় পাইয়া জমি প্রজার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইতে চাহিতেছেন, বরগাদারকে জমি হইতে সরাইয়া দেওয়া হইতেছে, এবং জমি স্বয়ং অর্থাৎ নিজের তত্ত্বাবধানে নিজের মাহিনা করা মজুর দিয়া চাষ ও ব্যবহারের আয়োজন বা ভান চলিতেছে। ইহাদের ভরসা, তাহা হইলে ইহারা নিজেরাই কৃষক-প্রজা বলিয়া গণ্য হইবেন, জমিতে ইহাদের স্বত্বও বজায় থাকিবে।

কমিশনের উপদেশ অনুযায়ী কার্য করিয়া জমিদারশ্রেণীর উচ্ছেদ

সাধন গবর্মেণ্ট সত্যই করিতে যাইবেন কি না, এবং গেলে তখন এই সকল বিকল্প-ব্যবস্থার দ্বারা নিজের স্বার্থ ও স্বত্ব বজায় রাখিতে বর্তমান জমিদাররা কতদূর সমর্থ হইবেন, তাহাও ভবিষ্যতের কথা। আপাতত রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কৃষ্ণমেঘ চারিদিক হইতে যে ভাবে ঘিরিয়া ঘন হইয়া আসিতেছে, তাহাতে এতবড় একটা সমাজ-আলোড়নকারী কাণ্ড আরম্ভ করিবার মত উৎসাহ বা অবসর গবর্মেণ্টের শীঘ্র হইবে এমন আশা করাই কঠিন।

তবুও কথা যখন উঠিয়াছে, ইহা লইয়া আলোচনাও হইবেই। বিশেষ কোন একজন জমিদারের জমিদারি থাকিল বা থাকিল না, সেটা বড় কথা নয়; জমিদারী ব্যবস্থাটার যে সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠা সমাজে ও রাষ্ট্রে ছিল, তাহার অবসান ঘটিতেছে, এইটাই এখানে লক্ষ্য করিবার বস্তু। সে প্রতিষ্ঠা যতদিন ছিল, ততদিন জমিদারির আয়ুও ছিল; জমিদারী ব্যবস্থার জীবনীশক্তি ফুরাইয়াছে বলিয়াই ইহার শবদেহটার অপসারণের কথা উঠা সম্ভব হইয়াছে।

জমিদারী ব্যবস্থার এই মৃত্যুও অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। বাংলা দেশে আমরা ইহার স্বরূপ ও আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না, তাই সে মৃত্যুর আকস্মিক আবির্ভাবের আঘাতটা বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছি, এইমাত্র। জমিদারী ব্যবস্থার জীবনীশক্তির উৎস কোথায়, এবং সমাজ-বিবর্তনের বিশেষ একটা স্তরে আসিয়া কেন ইহার মৃত্যু ও উচ্ছেদ স্বাভাবিক, এমন কি অপরিহার্য হইয়া উঠে, তাহারই আলোচনা আমি এই প্রবন্ধে করিব।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা ইংলণ্ডে প্রচলিত ফিউডালিজ্‌মের একটি অনুকৃতি ভারতে স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছিল—এইরূপ কথা

এদেশে চলিত আছে। কিন্তু ভারতে যে জমিদারী ব্যবস্থা আছে, তাহা পুরাপুরি ফিউডাল প্রথা নয়। .ফিউডাল প্রথার মূল নীতি—সমস্ত জমি রাজার সম্পত্তি, প্রজা জমির সহিত আবদ্ধ ভূমিদাস (serf), জমি সে ভোগ করে এবং মূল্যবাবদ তাহার শ্রমলব্ধ সম্পদের একাংশ রাজাকে বা তাঁহার প্রতিনিধিকে দিতে বাধ্য থাকে। রাজা আবার জমিগুলা কতকগুলি সামন্তের মধ্যে বিলি করিয়া দেন। ইহারা রাজাকে কর ও সামরিক সাহায্য দিতে বাধ্য থাকেন এবং প্রজার উর্ধ্বতন মালিক হিসাবে তাহাদের দেয় কর ভোগ করিতে পান। যুদ্ধের সময়ে প্রজারা সামন্ত-প্রভুর সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য। তাহাদের শাসন-ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভারও সামন্তের হাতেই থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, এই সামন্ত-প্রথার একাধিক অঙ্গ আছে—ইহার খানিকটা ব্যবস্থা অর্থ-নৈতিক, খানিকটা রাজনৈতিক ও সমরনৈতিক। ভারতে যে জমিদারী প্রথা আছে, তাহাতে জমিদার গবর্মেণ্টকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় দিবেন—এই শর্তে প্রজার দেয় খাজনা ভোগ করিতে পান, এবং জমিদারির মালিক বলিয়াও তাঁহাকেই স্বীকার করা হয়। এইখানে ফিউডাল সামন্তের সহিত তাঁহাদের কতকটা মিল আছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সামন্ত-ভূপতির হাতে যে শাসনক্ষমতা থাকে, জমিদারের তাহা নাই, সামরিক ক্ষমতা ও কর্তব্যও নাই। সুতরাং রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিক হইতে জমিদার ও মধ্যযুগের সামন্ত-ভূপতির মধ্যে সাদৃশ্য নাই।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, ইউরোপে মধ্যযুগে যে সামন্ত-প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল, উত্তরকালে তাহারও রূপের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রের শক্তি সংহরণের ফলে সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তব্যগুলি ক্রমশ সামন্ত-ভূপতির হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া রাজা বা রাষ্ট্রের হাতে গিয়া সঞ্চিত হইয়াছে; সামন্ত-ভূপতি রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তব্যভার

হইতে মুক্তি পাইয়াও (বা বঞ্চিত হইয়াও) অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তব্যটা ভোগ ও পালন করিয়া চলিয়াছেন, ফিউডাল সামন্ত ক্রমে পুরাপুরি অবিমিশ্র ভূস্বামীতে পরিণত হইয়াছেন। ইউরোপে, বিশেষত ইংলণ্ডে, যখন ভূস্বামীদের এই অবস্থা, সেই সময়েই ভারতে জমিদারী প্রথার প্রবর্তন করা হইয়াছিল; অতএব ইংলণ্ডের তৎকালীন ব্যবস্থার অনুকরণেই এখানেও জমিদারদের হাতে রাজনৈতিক বা সামরিক কর্তব্য ও ক্ষমতা দিবার চেষ্টা করা হয় নাই, কেবল অর্থনৈতিক কর্তব্য ও ক্ষমতাটাই দেওয়া হইয়াছিল।* সুতরাং জমিদারী প্রথাকেই মোটামুটি, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিক হইতে, ফিউডাল প্রথার অনুকৃতি বা অনুবর্তন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে আমরা এই কথাই মানিয়া লইব—অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে জমিদারী প্রথা ফিউডাল সামন্ত-প্রথারই একটি রূপ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে ফিউডাল সামন্ত-প্রথার যথার্থ স্বরূপ কি, তাহা দেখা যাক।

ধনিকতন্ত্র বা Capitalism বলিতে দুইটা বস্তু বুঝায়। মানুষের সৃষ্ট ও মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার শক্তিসম্পন্ন বস্তুর নাম ধন। ধন যখন প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত না হইয়া সঞ্চিত হয় এবং তাহার সাহায্যে নূতন ধন সৃষ্টি করা হয়, তখন তাহার নাম মূলধন বা Capital। যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। Capital-এর সাহায্যে

* সমস্ত জমি রাজার সম্পত্তি, এমন কথাও ভারতে বলা হয় নাই। হইলে খাজনা অনাদায়ে জমিদারি গবর্মেণ্টের খাস হইয়া যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থাই করা হইত। খাজনা অনাদায়ে গবর্মেণ্ট জমিদারি খাস করিয়া লইতে পারেন না, বিক্রয় করিতে মাত্র পারেন—এই ব্যবস্থায় ইহাই প্রমাণ হয় যে, গবর্মেণ্ট জমির মূল মালিক নন, খাজনা পাইবার মালিক মাত্র। অবশ্য এ সকলই technical তর্ক, এ প্রবন্ধে ইহার বিশদ আলোচনা আমি করিব না।

যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা Capitalist বা ধনিক, এবং এই ব্যবস্থার নাম ধনিকতন্ত্র। আরেকদল পণ্ডিত বলেন, না, ধনের সাহায্যে নূতন ধন উৎপাদন হইলেই ধনিকতন্ত্র হয় না, উৎপাদন-সহায়ক ধনের সাহায্যে যেখানে ধনিক অপরকে অর্থাৎ শ্রমিককে শোষণ করিতেছে, সেইটাকেই প্রকৃত ধনিকতন্ত্র বলা যায়। এই শোষণের স্বরূপটা দেখা যাক।

ধনিকের হাতে কল ও কাঁচামাল আছে। শ্রমিক কলের সাহায্যে কাঁচামালকে পণ্যবস্তুতে পরিণত করিতে পারে। কল ও কাঁচামাল তাহার নিজের নাই, তাই সে ধনিকের কাছে চাকুরি খুঁজিতে যায়। চাকুরি খোঁজার অর্থ নিজের শ্রম-ক্ষমতা ধনিকের কাছে বিক্রয় করা। ধনিক তাহাকে এই শর্তে কাজে নিযুক্ত করে যে, তাহার উৎপন্ন পণ্যের বা তাহার মোট মূল্যের এক অংশ সে নিজের ব্যয় বাবদ পাইবে, আর এক অংশ ধনিক নিজের অংশ বলিয়া কাটিয়া রাখিবে। চাকুরির জন্য শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে এবং ধনিকের সঙ্গে দরাদরি করিয়া জিতিবার শক্তি তাহার নাই। অতএব সে যথাসম্ভব অল্পমূল্যে কাজ করিতে রাজি হয়—এই মূল্যের পরিমাণ তাহার দেহধারণের জন্য যেটুকু একান্ত প্রয়োজন তাহার বেশি নয়। বাদ-বাকি সমস্তটাই ধনিকের। দিনে হয়তো আট ঘণ্টা শ্রমিক খাটে ; তাহার নিজের জীবন ও স্বাস্থ্য টিকাইয়া রাখিতে যে ব্যয় প্রয়োজন, সেটুকু অর্থ উৎপাদন করিতে তাহার দুই ঘণ্টা সময় লাগে, কল ও কাঁচামাল বাবদ যাহা ব্যয় হইল তাহার মূল্য তুলিতে আর তিন ঘণ্টা, বাকি তিন ঘণ্টায় যেটুকু অর্থ সে সৃষ্টি করিল তাহা বাড়তি। এই বাড়তি অংশটুকু তাহার নিজের সৃষ্টি, ন্যায়ত তাহার নিজের প্রাপ্য—এইটুকু ধনিক তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আদায় করিয়া লয়। ইহার নাম Surplus Value এবং এইটুকুই ধনিকের ধনবৃদ্ধির উপায়।

ধন উৎপাদনে শ্রমিকের দেহের যে সামর্থ্য ক্ষয় হয়, তাহার পূরণের জন্য তাহার আহার-বস্ত্র প্রয়োজন। শ্রমিক মরিয়া গেলে তাহার সন্তান সেই স্থান পূরণ করিবে, অতএব শ্রমিক-বংশ টিকাইয়া রাখিবার জন্য তাহার স্ত্রীপুত্রেরও জীবিকা-সংস্থান প্রয়োজন। এই ব্যয়ের অর্থ অর্জন করিয়া, তাহার পরেও সে surplus value সৃষ্টি করিতে পারে। তাহার কারণ, জীবদেহে স্বভাবতই খানিকটা সঞ্চিত শক্তি থাকে, সেই সঞ্চিত শক্তির ফলে একদিনের ক্ষয় পূরণ করিতে যে আহার প্রয়োজন, তাহার পরেও আর কিছু বেশি একদিনে উৎপাদন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। মানুষের এই সঞ্চিত শ্রমশক্তির সন্ধান মানুষ যেদিন পাইয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহার পক্ষে ধনসঞ্চয় করা সম্ভব হইয়াছে; অপরের শ্রমলব্ধ surplus value নিজে আয়ত্ত করিয়া বড় হইবার ব্যবস্থাও সেইদিন হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অতিরিক্ত শ্রমশক্তি মানুষের সভ্যতার স্রষ্টা, ধনিকতন্ত্র ও শোষণতন্ত্রও ইহারই পরোক্ষ সৃষ্টি।

•

মানুষের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া দার্শনিকরা বলিয়াছেন, Man is a rational animal—মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। নিছক দৈহিক সংস্কার ও প্রবৃত্তির পরেও মানুষের একটা বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি আছে; নিজের প্রত্যেক কাজেই সে ইহাকে খাটাইয়া থাকে। এই বুদ্ধি সুবুদ্ধি হইয়া তাহার সুকর্মে ও দুষ্টবুদ্ধি হইয়া তাহার দুষ্কর্মে সহায় হয়। যে দুষ্ট সরস্বতী দুর্বুদ্ধি যোগাইয়া থাকেন, তিনিও সরস্বতীই।

কিন্তু অর্থনীতিবিদ্‌কে যদি মানুষের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে বলা হয়, তিনি বলিবেন, Man is an idle animal। মানুষ মনে প্রাণে অলস, ইহাই তাহার সত্য স্বরূপ, এবং নিজের কাজ সে যতদূর পারে অপরকে দিয়া করাইয়া লইতে চায়, ইহাই সেই অলসতার বহিঃপ্রকাশ।

একত্র বহু মানুষ যেখানে বাস করে, যে বলবান সে সম্ভব হইলে দুর্বলের ঘাড়ে তাহার কাজের বোঝা চাপাইয়া দিয়া আরাম করিতে চায়। পত্নী স্বামীর ও পুত্র পিতার আদেশমত কার্য করিবে, পত্নী ও পুত্রের অর্জিত বিত্তে স্বামী ও পিতার অধিকার, এই সকল আইনের সৃষ্টি সম্ভবত এই ভাবেই হইয়াছিল। প্রভুত্বের এই অপ(?)ব্যবহার পরিবারের মধ্যে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল, ক্রমশ বৃহত্তর সমাজের মধ্যেও ইহা বিস্তৃত হইয়াছে।

জীবনের প্রথম দিন হইতেই মানুষ যুদ্ধ করিতে শিখিয়াছে। আদিম যুগে মানুষে মানুষে যুদ্ধ হইত;—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতেও। যাহারা হারিত, তাহারা প্রায়ই মরিত। যাহারা জিতিল, তাহারা দেখিল, অনেকখানি মাংস অপচয় হইতেছে। খাইলে পেট ভরিবে, না খাইলে পচিয়া গন্ধ হইবে ও ব্যাধি ছড়াইবে, এরূপ ক্ষেত্রে মাংসটা খাইয়া ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্য প্রকার খাদ্যের স্বচ্ছলতাও খুব ছিল এমন নয়। অতএব মানুষ নরমাংস খাইতে শিখিল। সাধারণত শত্রুর মাংসই খাওয়া হইত; অভাবে মৃত বা মুমূর্ষু স্বজনেরও। মানুষটা মরিয়াই যখন গেল, মাংসটা নষ্ট হয় কেন। শত্রুপক্ষের যাহারা বন্দী হইল, তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া মূর্খতা, নাহক খাওয়াইয়া রাখা আরও বেশি মূর্খতা। সুতরাং তাহাদেরও মারিয়া খাইয়া ফেলা হইত। বরং এইরূপ সদ্যহত মাংসেরই আদর বেশি ছিল, মাংসটা টাটকা খাওয়া যাইত, বধের আনন্দটাও পাওয়া যাইত। মানুষের মাংস তখন মাংস মাত্রই, আর কিছু নয়।

তারপর মানুষ নরদেহের সঞ্চিত শ্রমশক্তিটার সন্ধান পাইল। শিখিল, মানুষের মাংসপেশীটা কেবল মাংসই নয়, পেশীও। তাহার কাজ

করিবার ক্ষমতা আছে, এবং সেই ক্ষমতাকে আয়ত্তে রাখিয়া কাজে লাগাইয়া দিতে পারিলে নিজের ভাগের খাটুনিটাও এড়াইবার উপায় হয়—প্রাণে যদি বাঁচিবার ভরসা থাকে, বন্দী খুশি হইয়াই দাসত্ব করিতে রাজি হইবে। খাদ্য অপেক্ষা দাসরূপে বন্দীর মূল্য বেশি, অতএব নরমাংস ভক্ষণ বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপেই দাসত্ব-প্রথার সৃষ্টি হইল—প্রধানত যুদ্ধের বন্দীরাই দাস হইত।

দাসতন্ত্র ধনিকতন্ত্রের প্রথম রূপ। ধনিকতন্ত্রের মূল কথা—অপরকে নিজের অধীনে রাখিয়া সেই প্রভুত্বের জোরে তাহার উৎপন্ন surplus value নিজের আয়ত্ত করা। ধন উৎপাদনের উপকরণ দুইটি—এক দিকে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বস্তুসম্ভার, আর এক দিকে মানুষের শ্রমশক্তি। মানুষের দেহের মালিক হইতে পারিলেই তাহার শ্রমশক্তির মালিক হওয়া যায়, এবং সেই শ্রমশক্তির দ্বারা উৎপন্ন ধনেরও মালিক হওয়া যায়। দেহের মালিক হইয়া মানুষকে আয়ত্তে রাখার যে প্রথা আবিষ্কৃত হইল, তাঁহারই নাম দাসতন্ত্র। এই ব্যবস্থায় ধনিক দাসের দেহ-মনের একচ্ছত্র প্রভু, দাস তাহার সম্পত্তিমাত্র। দাসের দেহ, তাহার উৎপন্ন বস্তু, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা সমস্তই প্রভুর সম্পত্তি। তাহার সমস্ত দিনের শ্রমে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় সমস্তই প্রভু গ্রহণ করেন, তাহাকে অবশ্য খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখেন—নিজের স্বার্থেই। একান্ত তাহার আহার-বস্ত্র যোগাইতে যেটুকু না দিলে নয়, তাহার বাহিরে সমস্তটুকুই প্রভুর।

দাসতন্ত্রে মালিকের লাভ ছিল—অল্প মূলধনে এমন লাভের ব্যবসায় আর হয় না। বিশেষত মানব-সভ্যতার তখন শৈশবাবস্থা; উৎপাদন-ব্যাপারে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার তখন প্রায় নাই, প্রকৃতিদত্ত বস্তুসম্ভারও প্রচুর, তাই তখনকার দিনে উৎপাদনের

ব্যাপারে শ্রমশক্তিই ছিল প্রধান বস্তু। এই শ্রমশক্তি যাহার আয়ত্তে, সেই তখন বড়লোক।

কিন্তু দাসতন্ত্রের বিপদও ছিল। দাসের দেহ ও শ্রমশক্তির মালিক প্রভু, কিন্তু তাহার সে দেহকে টিকাইয়া রাখিবার ঝুঁকিও তাঁহারই। দাসদের বিবেচনা ও কৃতজ্ঞতা কম, তাহারা অসুস্থ হয়, বিকলাঙ্গ অক্ষম হইয়া পড়ে, মরিয়াও যায়। সে ক্ষেত্রে মালিকের ক্ষতি। দাস অসুস্থ হইয়া থাকিলে তাঁহার কার্যহানি, অথচ তখনও তাহাকে খাওয়াইতে হইবে, কারণ সে মরিলে কেনার টাকা সমস্তটাই লোকসান। অসুস্থ অক্ষম দাসকে বেচিয়া ফেলাও যায় না, দর উঠে না। দাসতন্ত্রের লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষতির দিক বিবেচনা করিয়া ধনিকরা ব্যাকুল হইয়া উঠিল; রোমান পণ্ডিত সেনেকা স্পষ্ট বলিলেন, দাসতন্ত্রে লাভ আছে, কিন্তু যে দেশে মৃত্যু বা ব্যাধির প্রকোপ বেশি, সেখানে ইহার ব্যবহার সমীচীন নয়।

অতএব তখন খোঁজ পড়িল, দাসতন্ত্রের ত্রুটিগুলি দূর করিবার কি উপায়, দাসের জীবন-মৃত্যুর দায়িত্ব লইব না, অথচ তাহার শ্রমশক্তিটাকে নিজের দখলেই রাখিয়া ভোগ করিতে থাকিব, এমন কোন ব্যবস্থা হইতে পারে কি না। পৃথিবীতে মানব-সভ্যতা তখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিত্তসম্পদ, বিশেষ করিয়া জমি, উৎপাদন-ব্যাপারে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে, কারণ মানুষের প্রধান উপজীবিকা তখন কৃষি। সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার (?) সাধনে যাঁহারা অগ্রণী হইলেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে ইহা অলক্ষিত রহিল না। তাঁহারা দেখিলেন, এই সুযোগ। দাসের দেহের মালিক হইতে গিয়াই তো তাহার জীবন-মরণের দায়িত্ব লইতে হইয়াছে, কাজ কি ঝঞ্ঝাটে, দাসের দেহের উপরে প্রভুত্ব ছাড়িয়া দাও, পরিবর্তে জমিটাকেই নিজের আয়ত্ত করিয়া লও এবং

মানুষকে সেই জমির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখ। দাসত্ব-প্রথায় আর লাভ নাই, অতএব সেটা তুলিয়া দেওয়া হইল ও প্রজাকে ভূমিদাসে পরিণত করা হইল। ফিউডাল প্রথার ইহাই জন্ম-ইতিহাস; ইহা ধনিকতন্ত্রের দ্বিতীয় রূপ।

ফিউডাল প্রথার মূল কথা—সমস্ত জমি মালিকদের সম্পত্তি। প্রজা জমির সহিত আবদ্ধ ভূমিদাস। মালিকের নির্দিষ্ট জমি ভিন্ন অন্যের জমিতে কাজ করিতে যাইবার স্বাধীনতা তাহার নাই, জমির কাজ উপেক্ষা করিয়া অন্য কোন প্রকার শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি করিবারও স্বাধীনতা নাই। জমিতে কৃষিকার্য করিবার দায়িত্ব এবং উৎপন্ন ফসলের স্বামিত্ব তাহার, কিন্তু মালিকের জমি সে ভোগ করিতেছে, তাহার মূল্য বাবদ নিজের শ্রমশক্তি ও শ্রমলব্ধ ফলের একাংশ সে মালিককে দিতে বাধ্য। এই অংশ মালিককে দিবার বিবিধ পন্থা ছিল—কোনখানে জমির উৎপন্ন ফসলের একটা ভাগ প্রজা মালিককে দিয়া আসিত, কোনখানে বা বৎসরে মাসে বা সপ্তাহে কিছু সময় সে মালিকের খাস জমিতে খাটিয়া দিয়া আসিতে বাধ্য থাকিত, বাকি সময়টা নিজের জমিতে কাজ করিতে পাইত। নিজের জমিতে যে ফসল সে উৎপাদন করিত, তাহা তাহার নিজের প্রাপ্য; মালিকের জমিতে যে ফসল উৎপন্ন করিত, সেটা মালিকের সম্পত্তি। এই দ্বিতীয় ব্যবস্থায় প্রজার প্রাপ্য অর্থ ও মালিকের আয়ত্তীকৃত surplus value দুইটারই পরিমাণ স্পষ্ট লক্ষ্য হয়। আবার এই দুইটি ব্যবস্থার সংমিশ্রণও কোন কোন ক্ষেত্রে করা হইত। এই সকল ব্যবস্থার রেশ এখনও অনেক দেশে পাওয়া যায়।

এই পর্যন্ত গেল ফিউডাল প্রথার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু ইহার

সহিত রাজনৈতিক ও সমরনৈতিক ব্যবস্থাও ছিল, কারণ প্রজার শাসনের দায়িত্ব অনেকাংশে ফিউডাল সামন্ত-ভূপালের উপরে থাকিত। তাহাদের সাধারণ শাসন ও বিচারের ভার তাঁহার, রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁহার। আবার যুদ্ধের সময়ে রাজা তাঁহার সাহায্য প্রত্যাশা করিবেন, সেজন্যও তাঁহার একটা সেনাবল থাকা প্রয়োজন। নিয়ম ছিল, প্রজারা প্রয়োজন-মত তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিতে বাধ্য থাকিবে, নিজের নিজের ঘোড়া ও অস্ত্রও তাহারাই সংগ্রহ করিয়া আনিবে। এইরূপ প্রজা-সেনা ছাড়া বেতনভুক সেনাও কিছু কিছু থাকিত, প্রজারা তাহার ব্যয় বাবদ কর যোগাইত।

সামন্ত-ভূপতিরা নিজের নিজের সেনা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। সেনার বল অধিক হইলে রাজাকে স্থানচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়া বসিবার স্বপ্নও দেখিতেন। ইংলণ্ডে ফিউডালতন্ত্রের প্রবর্তন করেন উইলিয়ম অব নর্ম্যাণ্ডি; তিনি এই বিপদ এড়াইবার জন্য সমস্ত প্রজা-প্রধানকে ডাকিয়া তাহাদের শপথ করাইয়া লইয়াছিলেন, তাহাদের প্রভু ও তাহাদের আনুগত্যের অধিকারী প্রথমে রাজা, তাহার পরে সামন্ত— যেন সামন্তের হইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাহারা না করিতে যায়। এই শপথ Oath of Salisbury নামে প্রসিদ্ধ। সামন্তদের সামরিক শক্তি কমাইয়া দিবার জন্যই উত্তরকালে রাজারা নিয়ম করেন, সামন্তরা সেনা দিয়া সাহায্য করিবার পরিবর্তে টাকা দিয়া রেহাই পাইতে পারিবেন। সামন্তদের রাজি না হইবার কারণ ছিল না, পরের জন্য যুদ্ধে মরিতে কোন বুদ্ধিমানই চায় না। তাঁহারা টাকা দিয়া অব্যাহতি কিনিতে লাগিলেন, রাজা সেই টাকায় পেশাদার বেতনভুক সেনা নিযুক্ত করিলেন। এই সেনারা প্রায়ই বিদেশী, সামন্ত বা প্রজাদের প্রতি তাহাদের প্রীতি ও দুর্বলতা ছিল না। অতএব রাষ্ট্রের সমস্তখানি

সামরিক শক্তি ও শাসনভার রাজার হাতে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইল; ফিউডাল সামন্তদের হাতে বাকি রহিল শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ক্ষমতাটুকু। তখন তাঁহারা আর সামন্ত-ভূপতি নন, ধনিক ভূস্বামী মাত্র। তাঁহারা জমির একচেটিয়া মালিক, জমিতে যাহারা কৃষিকার্য, অন্যপ্রকার ব্যবসায় বা বাস করিতে চায়, তাহারা সেই অনুমতির মূল্য বাবদ নিজের অর্জিত ধনের একাংশ তাঁহাকে দিতে বাধ্য। কৃষি ও ব্যবসায়ের ব্যাপারে ইঁহাদের প্রাপ্য অংশটার অনেকখানিই বস্তুত প্রজার উৎপন্ন surplus value।

কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তচ্যুত হইলেও তাহার আনুষঙ্গিক দায়িত্ব হইতে ভূস্বামীরা পুরাপুরি অব্যাহতি পাইলেন না। ভূস্বামী প্রজার শাসন, রক্ষণ ও পালনকর্তা—এইরূপ একটা ধারণা প্রজার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। শাসনের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবার পরও রক্ষণ ও পালনের দায় তাই তাঁহাদের উপরে কিয়ৎপরিমাণে রহিয়া গেল। প্রজা জমি ভোগ করে, খাজনাও দেয়, কিন্তু অজন্মা হইলে খাজনা হইতে রেহাই চায়, দুর্ভিক্ষ হইলে ভূস্বামীর কাছে খাবার চায়, চোর-ডাকাতের, বাঘ-ভালুকের, মহামারীর উপদ্রব হইলে তাঁহার কাছেই আসিয়া কাঁদিয়া পড়ে। প্রজা মরিলে তাঁহার জমি পড়িয়া থাকিবে, কাজেই ভূস্বামীকেও রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই দায় হইতে মুক্তির উপায় তাঁহারা খুঁজিতে লাগিলেন।

দাসতন্ত্রে দাসের জীবন-মৃত্যুর দায়িত্ব প্রভুর ছিল। ভূস্বামীতন্ত্রে ভূমিদাসের জীবন-মৃত্যুর দায়িত্ব আর ভূস্বামীর নাই। কিন্তু তবুও তাহার স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্যের কল্যাণ-অকল্যাণের সহিত তাঁহার লাভালাভ অনেকখানি জড়িত। জমিতে সে কাজ করিবে বছরে কয়েক মাস, কিন্তু সমস্ত বৎসরই তাহার কল্যাণের ব্যবস্থা তাঁহাকে দেখিতে হইবে।

এখন এই দায়িত্ব হইতেও ধনিকেরা মুক্তি পাইতে চাহিলেন, এমন একটা ব্যবস্থা আবিষ্কার করিতে চাহিলেন, যাহাতে শ্রমিকের শ্রমশক্তি ও উৎপন্ন surplus value-র উপরে দখল তাঁহাদের সমানই থাকিবে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার দায়িত্ব তাঁহাকে লইতে হইবে না —দিনে যে কয় ঘণ্টা ধনিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে সে খাটিতেছে, তাহার বাহিরে তাহার যাহাই কেন ঘটুক, সেজন্য কোন দায়, কোন দায়িত্ব স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন না। এই নূতন ব্যবস্থার সুযোগ আনিয়া দিল শিল্পবিপ্লব ও যন্ত্রবিপ্লব।

শিল্পবিপ্লব ও যন্ত্রবিপ্লবের ফলে মানুষের উৎপাদনশক্তি বহুগুণ বাড়িয়া গেল। বিনা যন্ত্রে বা হস্তচালিত যন্ত্রের দ্বারা একজন মানুষ যাহা উৎপাদন করিতে পারিত, একটা বাষ্প বা তড়িৎচালিত যন্ত্রের সাহায্যে একজন মানুষ তাহার দশগুণ বিশগুণ বা আরও বেশি উৎপাদন করিতে পারে। এই লোকটির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় যদি সাধারণ অবস্থায় পাঁচজনের যাহা মোট উৎপাদনক্ষমতা তাহার সমানও ধরা হয়, তবু এই ব্যবস্থায় ধনিকের অনেক লাভ, কারণ মোট সেইটুকু বাদ দিয়া বাকি যতখানি শ্রমিকটি উৎপাদন করিতেছে, তাহার সমস্তখানিই ধনিকের surplus value, সমস্তখানিই সে একা ভোগ করিতে পাইতেছে। কার্যত অবশ্য এতখানিও শ্রমিককে দেওয়া হয় না, ধনিকের প্রাপ্য অংশটা আরও অনেক বেশি দাঁড়ায়। এইজন্যই শিল্পতন্ত্রে ধনিক অত্যন্ত দ্রুত ধনসঞ্চয় করিতে পারে। এই শিল্পতন্ত্র ও যন্ত্র-তন্ত্রই ধনিকতন্ত্রের তৃতীয় রূপ।

শিল্পতন্ত্রের মূল কথা—শিল্পে যে ধন খাটিতেছে, তাহা ধনিকের সম্পত্তি। শ্রমিক তাহার বেতনভোগী ভৃত্যমাত্র। বেতনের বিনিময়ে

শ্রমিক তাহার শ্রমশক্তি বিক্রয় করে, যে কয় ঘণ্টার বেতন লইল, সেই কয় ঘণ্টা ধনিকের কারখানায় বিনা ওজরে ধনিকের প্রদত্ত যন্ত্রপাতি মাল-মসলা লইয়া ও ধনিকের নির্দিষ্ট পন্থায় কাজ করিতে বাধ্য থাকে। চুক্তিমত বেতন সে পাইবে ; কিন্তু তাহার প্রতি ইহার বেশি কোন দায় বা দায়িত্ব ধনিকের নাই। কারখানার মধ্যে যতক্ষণ সে কাজ করিতেছে, ততক্ষণই সে ধনিকের ভৃত্য, ততক্ষণই মাত্র তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ধনিক দায়ী। কারখানার বাহিরে, দিনের বাকি চৌদ্দ বা ষোল ঘণ্টা সে বাঁচিল কি মরিল, তাহা লইয়া ধনিকের কোন দায়িত্ব, কোন দুশ্চিন্তা নাই। সে যদি মরে বা অক্ষম হইয়া পড়ে, ধনিককে নূতন একজন লোক. তাহার স্থানে বহাল করিয়া লইতে হইবে, ধনিকের অসুবিধা এই পর্যন্তই। শিল্পতন্ত্রের অপরিহার্য নিয়মে একজন শ্রমিক দশ-বিশজনের সমান কাজ করিতে পারে, তাহার ফলে বহু লোক কর্মহীন হইয়া ঘুরিতে থাকে এবং এই বেকার-সমস্যা সর্বদা টিকিয়া থাকে বলিয়াই নূতন লোক পাইতেও ধনিককে প্রায় কখনই বেগ পাইতে হয় না। যে ধন বা শিল্প-যন্ত্র এই বিপুল উৎপাদনশক্তির উৎস, তাহার একচেটিয়া মালিক ধনিকরাই, অতএব শ্রমিকরাও তাহাদের কাছে চাকুরি করিতে বাধ্য হয়।

শিল্প-বিপ্লব ও যন্ত্র-বিপ্লব সম্পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থায়ও বিপ্লব ঘটিল। কৃষি ও গৃহশিল্প ছাড়িয়া, জাতি ও গীল্ডের গণ্ডি ভাঙিয়া, মানুষ কারখানার শ্রমিকে পরিণত হইয়া গেল। উৎপাদনের প্রধান সঙ্গতি জমি, জমির মালিক বলিয়া ভূস্বামীরা সমাজে প্রভুত্ব করিতে-ছিলেন। তাঁহাদের সে একচ্ছত্র প্রভুত্বেরও অবসান হইল।

স্বাভাবিক উৎপাদন-সঙ্গতি জমি, কল কৃত্রিম সঙ্গতি। জমি অপেক্ষা কলের শক্তি বেশি প্রমাণিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ধনিকেরা জমি ছাড়িয়া

কলের প্রভুত্ব হাত করিয়া লইল। উৎপাদন-ক্ষমতার পাল্লায় শিল্পের সঙ্গে কৃষি, কলের সঙ্গে জমি পারিয়া উঠে না, কৃষির তুলনায় শিল্পে উৎপন্ন surplus value ও লাভ অনেক বেশি। যন্ত্রস্বামীদের সঙ্গে পাল্লায় ভূস্বামীরাও আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, ধনসম্পদে ইহাদের শক্তি অনেক বেশি বাড়িয়া গেল। সমাজে ধনবান ও শক্তিমানেরই জয়; সুতরাং সমাজে ও রাষ্ট্রেও যন্ত্রস্বামীদের প্রভাব ক্রমশ বাড়িয়া চলিল।

দাসতন্ত্র সৃষ্টির ফলে নরমাংস ভক্ষণ বন্ধ হইয়াছিল। ভূস্বামীতন্ত্র সৃষ্টির ফলে দাসতন্ত্র লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু শিল্পতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভূস্বামীতন্ত্র বিলুপ্ত হইল না। তাহার কারণ, শিল্পতন্ত্রের যখন জন্ম, তখনও সমাজে রাজনৈতিক শক্তির অনেকখানিই ভূস্বামীদের আয়ত্ত ছিল। ভূস্বামীদের কেবল ভূস্বামী বলিয়াই সমাজে সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠাও ছিল অনেকখানি। তারপর যন্ত্রস্বামীরা সমাজে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ছলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বও ক্রমে হাত করিয়া লইলেন। ইংলণ্ডে এক সময়ে হাউস অব লর্ডসের প্রাধান্য ছিল, তারপর হাউস অব কমন্সের সৃষ্টি হইল, ইহার ক্ষমতা ক্রমশ বাড়িতে লাগিল এবং তাহার চাপে হাউস অব লর্ডসের ক্ষমতা ক্রমেই তিরোহিত হইয়া যাইতে লাগিল, রাষ্ট্রব্যবস্থার এই পরিবর্তন প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র পরিবর্তনেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। হাউস অব লর্ডসের ক্ষমতার অর্থ রাষ্ট্রে ভূস্বামীদের ক্ষমতা; হাউস অব কমন্সে যন্ত্রস্বামীরা প্রভুত্ব করিতেছেন; ইঁহাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়িবার ফলে ক্রমে রাষ্ট্রে ভূস্বামীদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিতেছে—পার্লামেণ্টের বিবর্তনের ইহাই প্রকৃত অর্থ।

তবুও ভূস্বামীরা একেবারে হার মানিলেন না, যন্ত্রস্বামীদের এতবড়

প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও টিকিয়া রহিলেন। ইহার কারণ প্রধানত দুইটি— ভূস্বামী একসময়ে রাজার মত মর্যাদা পাইতেন, আর্থিক ক্ষমতা কমিয়া গেলেও তাঁহাদের সেই সামাজিক সম্ভ্রম ও মর্যাদা অনেক পরিমাণে টিকিয়া রহিল। ভূস্বামী হওয়ার একটা আভিজাত্য আছে, পূর্বপুরুষের অর্জিত জমিদারি ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে অপমানবোধ আছে। দাস-প্রভু হওয়াতে লাভই ছিল, মর্যাদা ছিল না। তাই লাভের বৃহত্তর পন্থা পাইবার পর আর মানুষ দাসস্বামী হইয়া থাকিতে চাহে নাই। ভূস্বামীরা কিন্তু মর্যাদা হারাইতে চাহিলেন না; যন্ত্রস্বামিত্বে লাভ বেশি জানিয়াও, এবং ভূস্বামিত্বের লাভ ফুরাইয়া যাইবার পরেও, জমি ছাড়িতে তাঁহাদের মন উঠিল না। যন্ত্রস্বামীদের শোষণ-প্রথাটা নির্মম, শ্রমিকের সহিত তাঁহাদের প্রত্যক্ষ কোন বন্ধুত্বের বা পালনের সম্পর্ক নাই; সেই প্রাচীন সম্পর্কের দোহাই দিয়া মানুষের মনেও ভূস্বামীরা নিজেদের আসন কতকটা প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিলেন। দ্বিতীয় কারণ, উৎপাদনের উপায় কৃষিই হউক আর কারখানাই হউক, জমি ছাড়া কাজ চলে না, কারখানাকে বসাইতে গেলেই জমি প্রয়োজন। জমির পরিমাণ অল্প এবং প্রতি খণ্ড জমিরই অবস্থান হিসাবে নিজস্ব মূল্য আছে, অতএব ভূস্বামীদের একেবারে লোকসান সহিতেও হইল না। বরং শহর ও কারখানা বাড়িবার ফলে একশ্রেণীর ভূস্বামীর আয় বাড়িয়াই চলিল; জমির তাঁহারা একচেটিয়া মালিক, কারখানার মালিকরা বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে উচ্চহারে খাজনা দিয়া জমি লইতে লাগিলেন। এই খাজনার কতকটা ভূমিকর (rent), কতকটা একচেটিয়া অধিকার হইতে প্রাপ্ত লাভ (monopoly profit)। শ্রমিকের নিকট হইতে যন্ত্রস্বামী যে surplus value পাইতেছে, তাহারই একটি অংশ এই লাভ বাবদ ভূস্বামী আদায় করিয়া লয়।

বর্তমান সমাজে এই দুই শ্রেণীর ধনিক পাশাপাশি বাস করিতেছে, পুরাতন ধনিক ভূস্বামী, ও নূতন ধনিক যন্ত্রস্বামী। স্বার্থের সংঘর্ষও ইহাদের মধ্যে লাগিয়াই রহিয়াছে। যন্ত্রস্বামীর আয় বেশি, রাষ্ট্রে প্রভাব বেশি, এবং ভূস্বামীর হাত হইতে শ্রমিককে সরাইয়া সে নিজের আয়ত্ত করিয়া লইতেছে, অতএব ভূস্বামী তাহাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখে। যন্ত্রস্বামী শ্রমিকের নিকট হইতে যে লাভ আদায় করিল, তাহার একটা বৃহৎ অংশ ভূস্বামী তাহার গলা টিপিয়া কাড়িয়া লয়, এবং ভূস্বামীই জমির একচেটিয়া মালিক বলিয়া তাহাকে এই অংশ না দিয়া তাহার উপায় নাই, অতএব যন্ত্রস্বামীও ভূস্বামীকে দ্বেষের চক্ষে দেখে। ভূস্বামী না থাকিলে প্রাপ্ত লাভের সমস্তটাই যন্ত্রস্বামী একা ভোগ করিতে পাইত, তাই তাহার কাছে ভূস্বামীদের উচ্ছেদই কাম্য। কিন্তু ভূস্বামীর উচ্ছেদ খুব সহজ নয়। নিছক ব্যবসায়গত প্রতিযোগিতার ফলেই সে জমি ছাড়িয়া দিবে এমন আশা করা বৃথা; যুদ্ধ করিয়া ভূমিতে তাহার অধিকারও কাড়িয়া লওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রভুত্ব এখন যন্ত্রস্বামীদের হাতে, আইন ও বিধান তাহারাই ইচ্ছামত করিতে পারে, সুতরাং সেই রাষ্ট্র-ক্ষমতা খাটাইয়াই যন্ত্রস্বামীরা ভূস্বামীদের হাত হইতে জমির স্বত্ব কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। প্রথম অবস্থায় যন্ত্রস্বামীদের প্রভাব যাহাতে না বাড়িতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও ভূস্বামীরা এই রাষ্ট্র-ক্ষমতার বলেই করিতে চাহিয়াছিলেন; রাষ্ট্রের ও সমাজের কর্তৃত্ব যতদিন তাঁহাদের হাতে ছিল, ততদিন সেই কর্তৃত্বের জোরেই যন্ত্রবিপ্লব ও যন্ত্রস্বামীদের ঠাণ্ডা করিয়া রাখিতে তাঁহারা চেষ্টার কসুর করেন নাই।

গণতন্ত্র ও প্রজার স্বার্থের দোহাই এই যন্ত্রস্বামীদের মুখে খুব শুনা যায়। গণতন্ত্রের হিড়িক তুলিয়াই ইহারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হস্তগত

করিয়াছেন, ভূস্বামীদের স্বস্থানচ্যুত করিবার ব্যাপারেও প্রজাস্বার্থের দোহাই দিয়া কার্য উদ্ধার করিতেছেন। যেখানে একটা রেলওয়ে নির্মাণ করা হয়, জমির মূল্য বা খাজনা বাবদ অনেক টাকাই ভূস্বামীদের প্রাপ্য হয়। তখন দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষ বলেন, রেলওয়ে একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সমগ্র প্রজার স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত; এবং এই কারণ দেখাইয়া সরকারী হুকুম জারি করিয়া সে জমি রেল-কোম্পানির করায়ত্ত করিয়া দেন। ইহার সরকারী নাম—Acquiring। রেল-কোম্পানির অর্থ যে যন্ত্রস্বামী ধনিকেরা, শাসন-ব্যাপারে তাঁহাদের হাত আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়।

এই ব্যাপারই আরও ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, Land-Nationalisation-এর যে আন্দোলন ইউরোপে কিছুদিন পূর্বে চলিয়াছিল, তাহাতে। এই আন্দোলনের মূল কথা, জমিদাররা জমি একচেটিয়া করিয়া রাখার ফলে সমস্ত প্রজার স্বার্থ ব্যাহত হইতেছে, অতএব সমস্ত জমি রাষ্ট্রের আয়ত্ত করিয়া লওয়া হউক।

Land-Nationalisation লইয়া একসময়ে খুব মাতামাতি দেখা দিয়াছিল; অনেকেরই ধারণা ছিল, ইহা সমাজতন্ত্র (Socialism) স্থাপনের একটি সোপান মাত্র। আসলে কিন্তু Land-Nationalisation-এর অর্থ Socialism নয়। ইহা যাঁহারা চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা Socialist নন, নূতন যুগের Capitalist। এই ধুয়া তুলিয়া পুরাতন Capitalist-কে ইহারা উৎখাত করিতে চাহেন, যেন ইহাদের লাভের যে অংশ তাহাদিগকে দিতে ইহারা বাধ্য হইতেছেন, সেটা আর দিতে না হয়, যেন রাষ্ট্রে ও অর্থনৈতিক জগতে ইহাদের প্রভুত্বই অপ্রতিহত হইয়া উঠিতে পারে। ভূস্বামীদের উচ্ছেদ হইবে, সমস্ত জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে; রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আমাদের হাতে, অতএব

সে জমির বিলি-ব্যবস্থা তখন আমরাই নিজেদের সুবিধামত করিয়া লইতে পারিব, যে surplus value শ্রমিকের নিকট হইতে আদায় করি‍াম তাহারও সমস্তটাই নির্বিবাদে ভোগ করিতে পারিব, ইহাই ইঁহাদের আসল কথা। নহিলে, জমি ভূস্বামীদের হাতে থাকিবার ফলে কৃষকের যেরূপ শোষণ হয়, কলকারখানা যন্ত্রস্বামীদের হাতে একচেটিয়া হইয়া থাকিবার ফলে শ্রমিকেরও তো ঠিক সেইরূপই শোষণ হইতেছে। অথচ সমস্ত কলকারখানা রাষ্ট্রের সম্পত্তি হইয়া যাউক—এই নীতি কেহ যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, এই তথাকথিত 'সংস্কারক'রা কিছুতেই তাহাতে রাজি হইবেন না।

নূতন ধনিকদের চাপে পুরাতন ধনিকদের হাত হইতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা ইতিপূর্বেই স্খলিত হইয়া গিয়াছে; অর্থনৈতিক ক্ষমতাটুকু কাড়িয়া লইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এই চেষ্টা যেদিন সফল হইবে, সেই দিনই এই পুরাতন ধনিকদের শেষ।

ভূস্বামীতন্ত্রের উচ্ছেদের যে সংকল্প পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে, ইহাই তাহার প্রকৃত তত্ত্ব। যন্ত্রশিল্পের উন্নতি এবং রাষ্ট্রে যন্ত্রস্বামীদের প্রতিপত্তি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভূস্বামীকে অপসারিত করিবার এই চেষ্টাও সকল দেশেই দেখা দিবে, ইহার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ভারতেও ইহার আয়োজন অবশ্যম্ভাবী ছিল। তবে স্বাভাবিক গতিতে আসিলে হয়তো এটা আরও কিছুদিন পরে, যন্ত্রশিল্পের আরও প্রসার ঘটিবার পর, আসিত। জমিদারী ব্যবস্থার ফলে গবর্মেণ্টের সরাসরিই লোকসান হইতেছে; প্রজারও ক্ষতিটা লোকের চোখে পড়িতেছে এবং সে ক্ষতির কথা ঘোষণা করিবার মত শক্তি বা মুখপাত্র তাহারা অর্জন করিয়াছে—

এই সকল কারণে এটা প্রত্যাশিত সময়ের একটু আগেই আসিয়া পড়িয়াছে; আকস্মিক আবির্ভাবে আমরা চমকিত হইয়া ভাবিতেছি, এ কি অস্বাভাবিক কাণ্ড! কিন্তু আসলে অস্বাভাবিক ইহা নয়, অসময়োচিত মাত্র। নহিলে, সমাজ-বিবর্তনের ধারা যদি মানি, আজ হউক, কাল হউক, ইহা আসিতই। ফ্লাউড কমিশন সেই আবির্ভাবকে একটু বেশি নির্দিষ্ট ও তাহার প্রকারটা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, এইমাত্র। বরং এক হিসাবে ব্যাপারটা ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে, স্বাভাবিক গতিতে আসিলে হয়তো এটা একটা আকস্মিক বিপর্যয়ের মতই আসিয়া পড়িত, ভূস্বামীরা তাহার আঘাতে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, আত্মরক্ষা করিবার বা আঘাত সামলাইবার সময় পাইতেন না, একেবারেই তলাইয়া যাইতেন। ফ্লাউড কমিশন যে নীতি স্থির করিয়াছেন, তাহাতে ভূস্বামীদের জমি গায়ের জোরে কাড়িয়া লওয়া হইবে না, মূল্য দিয়া কিনিয়া লওয়া হইবে। অর্থাৎ সাধারণত জমি হইতে যে আয় তাঁহারা পাইতেছিলেন, জমি খাস করিয়া লইবার পরও কয়েক বৎসর যাবৎ সেই পরিমাণ টাকা তাঁহারা সরকারের নিকট হইতে পাইতে থাকিবেন। এবং কাজেই সেই সময়ের মধ্যে এই বিত্তনাশ এবং আয়ের সঙ্গতিনাশের আঘাতটা সামলাইয়া লইবার অবকাশ পাইবেন।

স্বাভাবিক বিবর্তনের আঘাতে জমি ছাড়িতে হইলে এটুকু সুযোগও তাঁহারা পাইতেন না। সে বিপর্যয় তাঁহাদের দয়া করিত না, জমির দাম দিত না, আত্মরক্ষার সময় দিত না। জমিদারি হারাইবার ভয়ে বা শোকে যাঁহারা মুহ্যমান হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাই বৃহৎ সান্ত্বনা।

শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত

পদাঘাত

দ্বিতীয় অঙ্ক

কলিকাতার পথ

কাঁধে বোঁচকা, হাতে হাত-লাঠি গোবরের প্রবেশ

গোবর। কই রে গণশা, কোথায় গেলি? (পিছন ফিরিয়া চাহিলেন) আয়। আমি ভাবি কলকাতায় এসে বুঝি হারিয়ে গেলি।

কাঁধে বোঁচকা গণেশের প্রবেশ

গণেশ। আমি হারিয়ে যাব কলকাতায়? তুমি কি বলছ দাদা?

গোবর। তবে হঠাৎ পেছিয়ে পড়েছিলি যে বড়? চলতে বুঝি কষ্ট হচ্ছে?

গণেশ। দাদা, তুমি কি আমাকে এমনিই ছেলেমানুষ মনে কর? ছেলে মানুষ ক'রে ক'রে তুমিই দেখছি ছেলেমানুষের হদ্দ হয়ে দাঁড়িয়েছ।

গোবর। তবে অত পেছিয়ে পড়েছিলি কেন?

গণেশ। দেশভ্রমণে বেরিয়েছি, তাই একটু হাওয়া খেতে খেতে আসছিলাম।

গোবর। সত্যিই তো, তোরই বা দোষ কি! সেই কাল সন্ধ্যেবেলা কখন দুটো খেয়েছিস, আর এই একটা বাজতে চলল, এখনও তো কিছু পেটে পড়ে নি। ক্ষিদে পাবে বইকি।

গণেশ। তুমিও তো কিছু খাও নি দাদা।

গোবর। আমার কথা ছেড়ে দে ভাই। আমার না খেলেও চলে। তোর ক্ষিদে পেয়েছে কি না তাই বল।

গণেশ। না, পায় নি।

গোবর। মিথ্যে কথা। ক্ষিদে তোর নিশ্চয়ই পেয়েছে, দস্তুরমত পেয়েছে।

গণেশ। কি ক'রে বুঝলে ?

গোবর। (সজোরে নিজের বুকের উপর কিল মারিলেন) কেন, এই বুকখানা দিয়ে ? তোর ব্যথা-বেদন সবই আমি এই হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারি, জানিস ?

গণেশ। হবে।

গোবর। হ্যাঁ, তোর জন্যে যে আমার কতখানি সহানুভূতি, সে তুই বুঝবি না। সে জানেন একমাত্র নারায়ণ।

গণেশ। বুঝেছি দাদা, ক্ষিদে না পেলেও তোমার সহানুভূতি পেয়েছে। উত্তম, তবে দাও পয়সা, দুজনের মত কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসি।

গোবর। আমার জন্যে আবার কেন ? যাক ছোট ভাই, দাদা না খেলে দুঃখ করবি যখন, নিয়ে আয়। হ্যাঁ, আর দেখ, বেশি দেরি করিস নি। সেই কাল কখন খেয়েছিস মনে আছে তো ?

গণেশ। বাঃ রে, সে সহানুভূতি তো তোমারও আছে।

গোবর। আচ্ছা, এই আধুলি নে। (প্রদান) আর দেখ, বেশ ভাল ভাল খাবার নিয়ে আসবি, পেট ভ'রে খাওয়া যাবে।

গণেশ। ইস, মোটে তো একটা আধুলি, তা আবার পেট ভ'রে ! তারপর তুমি আবার সেই বাড়ির খাওয়া খাবে তো ?

গোবর। আর শোন। ওই থেকে এক পয়সার পান আর এক

পয়সার বিড়িও নিয়ে আসিস, বুঝলি? যা, ছুট্টে যাবি আর দৌড়ে আসবি, বেশি দেরি করিস নি।

গণেশ। কিচ্ছু ভেবো না দাদা। এই সোঁ ক'রে যাব আর ফোঁ ক'রে আসব। তুমি যেন কোথাও যেও না।

গণেশের প্রস্থান

গোবর। কে, পঙ্কজিনী? হাসছ? হাস হাস সতী, প্রাণ খুলে হাস। পিতৃ-আজ্ঞায় রামচন্দ্র যদি ছেলেমানুষ হয়ে চোদ্দ বছর বনে বাস করতে পারে, তবে জেনে রাখ সতী, তোমার আজ্ঞায় বুড়ো ছেলে হয়ে আমিও চোদ্দ দুগুনে আটাশ বছর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারি।

জনৈক বৃদ্ধ ভিখারীর প্রবেশ। বাঁ-পাটি খোঁড়া, তাই সে বাঁ-বগলে লাঠির ভর দিয়া চলে

ভিখারী। বাবা, একটা পয়সা পাই বাবা। খোঁড়া গরিবকে দয়া কর বাবা। ভগবান তোমায় অনেক দেবে বাবা।

গোবর। আচ্ছা, একটা পয়সা দিলে ভগবান আমায় অনেক দেবে, তুমি ঠিক জান?

ভিখারী। (কপালে হাত উঠাইয়া) দেবে বাবা, অনেক দেবে। গরিব আতুরকে দান করলে অনেক পুণ্যি হবে।

গোবর। এক পয়সায় তা হ'লে অনেক কিছু পাব বল?

ভিখারী। অনেক পাবে বাবা। খোকা হবে, খুকী হবে, টাকা-পয়সায় ঘর ভ'রে যাবে, হেঁই বাবা, খোঁড়া গরিবকে একটা পয়সা দাও বাবা, আজ চার দিন কিছু খাই নি, বড্ড কষ্ট, এই খোঁড়া গরিবকে রক্ষে কর বাবা। এ বাবা, একটা পয়সা দাও বাবা।

গোবর। কিন্তু খুচরা পয়সা তো আমার কাছে নেই। সিকি আছে, তা ভাঙানি তো নেই, কি করি বল?

ভিখারী। দাও বাবু, ভাঙানি আমি দিতে পারব 'খুনি।

গোবর। আচ্ছা! ভ্যালা রে আমার গরিবের ছ্যালা! সঙ্গে ভাঙানি, অথচ চার দিন কিছু খাও নি বাবা? আহা খোঁড়া মানুষ, চলতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে, না? কিন্তু বাবা, তোমরা যদি গরিব, তবে বড়লোকটি কে শুনি?

ভিখারী। দয়া কর বাবা। আমার ছেলের বড্ড অসুখ। নিজে পেটে না খেয়ে এই কটা পয়সা জমিয়ে রেখেছি, নইলে ছেলেরে আমার বাঁচাতে পারব নি বাবা। ডাক্তারবাবু ওষুধ না দিলে ছেলে আমার ম'রে যাবে। ওই একটা ছেলে ম'রে গেলে আমার কি হবে বাবু? (কাঁদিয়া ফেলিল)

গোবর। কই, তোমার ছেলের অসুখ, সে কথা তো বল নি?

ভিখারী। বলব কি, কেউ বিশ্বেস করে না বাবু।

গোবর। ছেলের অসুখ বিশ্বাস করে না, আশ্চর্য্য!

ভিখারী। হ্যাঁ বাবু, আমি গরিব মানুষ। ছেলেটা ম'রে গেলে আমি বুড়ো মানুষ আমার কি হবে? ম'রে গেলে আমি বাঁচব নি বাবু। (কাঁদিতে লাগিল)

গোবর। থাক থাক, তুমি আর কেঁদো না। এই নাও। ভাঙানি আর দিতে হবে না, পুরো সিকিটাই তোমায় দিলাম। ছেলেকে ওষুধ কিনে দিও। ভয় নেই, ছেলে তোমার বাঁচবেই। ভগবান তোমার এক পা খোঁড়া ক'রে দিয়েছেন সত্যি; কিন্তু বলছি, দেখে নিও, তিনি তোমার ছেলের ভালই করবেন। তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখ, তা হ'লেই হবে।

ভিখারী। তাঁর ওপর আমাদের বিশ্বেস রাখতেই হয় বাবু। না রাখলে চলে না।

গোবর। আহা, চার দিন তুমি কিছু খাও নি বললে না? দেখ, তুমি ব'সো, ভাইকে আমার খাবার আনতে পাঠিয়েছি, কিছু খেয়ে যেও।

ভিখারী। (কপালে হাত উঠাইল) বাবু আপনার খুব দয়া। আপনার মত মানুষ দেখা যায় না বাবু।

বলিয়া গ্যাঁট হইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল

ময়লা ছেঁড়া কাপড় অথচ মুখখানি ঘোমটা ঢাকা জনৈকা মহিলার প্রবেশ

মহিলা। (দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত করিল) ভগবান তোমার ভাল করুন বাবা!

গোবর। অ্যাঁ, তুমি কে?

মহিলা। তোমারই মেয়ে বাবা। সারাদিন কিছু খাই নি, দুটো পয়সা দাও বাবা।

গোবর। আশ্চর্য্য, এত লোক সব না খেয়েদেয়ে আছ? কেন বাছা, তোমার কি কেউ নেই?

মহিলা। একদিন সবই ছিল বাবা, (ঘোমটার ভিতর গলাটা অল্প একটু ভিজিয়া উঠিল) কিন্তু এখন আর আমার কেউ নেই। নেহাতই পেটের দায়ে পথে বেরিয়েছি, ভিক্ষে ক'রে খাই; নইলে বাবা, একদিন আমার কি না ছিল, সব ছিল। হেঁই বাবা, মেয়েকে তোমার দুটো পয়সা দাও বাবা।

গোবর। দুটো পয়সা? কিন্তু খুচরো তো নেই। দাঁড়াও দেখি। হ্যাঁ, একটা দোয়ানি আছে; এটা দিলে কি হবে?

মহিলা। সারাদিন কিছু খাই নি, দয়া কর বাবা, একটা সিকি দাও।

গোবর। সিকি? আচ্ছা, এই নাও।

মহিলা। বেঁচে থাক বাবা। ভগবান তোমার ভাল করুন। দুটো খেতে পাব না বাবা?

ভিখারী। বাহা রে মাগী, পয়সা পেলি আবার খেতে চাইছিস? বলতে লজ্জা করে না?

মহিলা। তাতে তোর কি রে, বুকে-বেঁশো পোড়ারমুখো মিন্সে? তুই আমায় খাওয়াচ্ছিস, না পরাচ্ছিস? বাবুর কাছে আমি চাচ্ছি, তোর কি রে হাড়-হাবাতে মিন্সে?

ভিখারী। হ্যাঁ হ্যাঁ, থাম থাম, খুব হয়েছে। অত ফটফটাই করিস নি।

গোবর। তোমাদের আবার হ'ল কি, ঝগড়া কর কেন? বেশ তো, সকলেই ব'সে থাক, খাবার এলে খেও এখন।

মহিলাটি ভাল করিয়া ঘোমটা টানিয়া বসিল

লুঙ্গি পরিহিত জনৈক মুসলমানের প্রবেশ

মুসলমান। শুনছেন মশাই?

গোবর। কে আপনি?

মুসলমান। আমি মুছলমান। খোদা-বান্দার কিছু আজ্জি আছে।

গোবর। বলুন।

মুসলমান। আমার বাড়ি উল্টোডাঙায়। বানে আমার বাড়ি ঘর-দোর সব ডুবে গেছে। বিবি বাচ্চাও সেই সঙ্গে—

বলিতে বলিতে কথা বন্ধ হইয়া গেল, চোখ মুছিল

গোবর। অ্যাঁ বলেন কি, বন্যার জলে শেষে—আহাহা!

মুসলমান। দুঃখের কথা বলি কি মশাই; নিজের জানটা নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে এসেছি। হালের গরু-নাঙ্গল, হাঁস-মুরগী সব আমার ভেসে গেছে বাবু। ন মাসের একটা বাচ্চা ছিল, তাকে

পর্য্যন্ত বানের জলে কোথায় টেনে নিয়ে গেছে কে জানে! রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াই, আর দুঃখের কথা কই। কিন্তু মশাই, দুঃখের কথা আমার কেউ শোনে না। ওই খোদা সাক্ষী মশাই, আমার যে কি হচ্ছে, সে আমিই জানি।

গোবর। তা আবার হবে না, হবে বইকি। ঘর-দোর, বউ-ছেলে সব বানের জলে ভেসে গেছে—এ যে সাংঘাতিক কথা! আপনি যে কি ক'রে এখনও টিকে আছেন, তাই ভাবি। আমি হ'লে এতদিন পাগল হয়ে যেতাম।

মুসলমান। পেটের দায়ে এখনও পাগল হতে পারছি না মশাই, নইলে আমারও এতদিন পাগল হবারই কথা। খোদা আপনার ভাল করবে মশাই, যদি না কিছু মনে করেন, তবে এই গরিব খোদা-বান্দাকে কিছু পয়সা দিয়ে সাহায্য করবেন।

গোবর। সাহায্য তো আপনাকে করাই দরকার। তবে যা গেছে সে তো আর ফিরে পাবেন না। তবে ওই যা বললেন, পেটের দায়ে এখন নিজের জন্যেই যা কিছু।

মুসলমান। আজ্ঞে হঁ্যা কত্তা, যা বলেছেন। কিন্তু নিজের জন্যে যাই করি মশাই, থেকে থেকে বুকটা মোচড় দিয়ে দিয়ে ওঠে। উঃ খোদা, এই তোমার মনে ছিল! বউ ছেলে ঘর সংসার আপন বলতে আমার সব কেড়ে নিলে, উঃ আল্লা! (নিদারুণ শোকোচ্ছ্বাস)

গোবর। আমার তো এমন সামর্থ্য নেই যে, আপনাকে তেমন সাহায্য করতে পারি; তবে যখন এসেছেন, তখন শুধু হাতে তো আর ফিরিয়ে দিতে পারি না। এই নিন আট গণ্ডা পয়সা, কিছু মনে করবেন না। মানে, আমারও অবস্থা তেমন সুবিধার নয়।

আপনার তবু ছিল এক কালে, এখন নেই। আমার কিন্তু থাকতেও নেই।

মুসলমান। দেখুন, মাত্র আট গণ্ডা—বড্ড কম হ'ল। আর গণ্ডা চারেক হ'লে বড় ভাল হ'ত।

গোবর। আচ্ছা, নিন, যখন বলছেন—কটা পয়সাই তো মাত্র। আর শুনুন, যদি কিছু মনে না করেন, আমার ভাই খাবার আনতে গেছে, এই সঙ্গে দুটো খেয়েও যাবেন।

মুসলমান। যে আজ্ঞা কর্ত্তা। খোদা আপনাকে সুখী রাখবে। (বসিয়া পড়িল)

গোবর। (স্বগত) উঃ, গণশাটা তো আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি! গেছেও তো অনেকক্ষণ, গাড়ি-ফাড়ি চাপা পড়ল নাকি? কে জানে, ছেলেমানুষ, হাত মুচড়ে হয়তো কেউ পয়সা কটাই কেড়ে নিয়েছে। নিয়েছে তো বেশ করেছে, তাই বাপু ফিরে আয়, তা নয়। যত সব ছেলেমানুষ নিয়ে কাজ। পই পই ক'রে বললাম, আমার সঙ্গে আসিস নি, আসিস নি, তা কি ছাই শুনবে! দূর ছাই, আর ভাবতেও পারি না, মরুকগে, চুলোয় যাকগে, ভাল লাগে না।

কিশোরবয়সী জনৈক বোবার প্রবেশ

বোবা। (বাক্‌রুদ্ধস্বরে) আঁ-ই-ই-ই।

গোবর। কি, তোমার আবার কি চাই?

বোবা এক টুকরা চিরকুট আগাইয়া দিয়া অস্ফুটস্বরে কতকগুলি স্বরবর্ণের উচ্চারণ করিল এবং হাতের চোখের ইশারায় বুঝাইতে চাহিল, কাগজে কি লেখা আছে পড়িয়া দেখ

এটা আবার কি?

মুসলমান। মশাই, ও বোবা, কথা কইতে পারে না। ওই কাগজখানায় সব কিছু লেখা আছে, প'ড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

গোবর। ওঃ, তাই নাকি? বোবা?

বোবা আঁ-আঁ শব্দে মুখগহ্বর বিস্তার করিয়া তন্মধ্যে—সমগ্র তর্জ্জনীটি প্রবেশ করাইয়া দিয়া অর্থহীন ভাষায় ও অর্থপূর্ণ শব্দে-বলিতে চাহিল, আলজিব নাই, সুতরাং সে বাক্‌হীন, বোবা

গোবর। কাগজেও দেখছি ওই কথাই লেখা রয়েছে। ছেলেটির আপন বলতে কেউ নেই। জন্মাবধি বোবা। তাই লেখা আছে—সাধ্যমত ছেলেটিকে সাহায্য করতে। আচ্ছা বেশ, এই নাও দু আনা পয়সা। (প্রদান)

পান, বিড়ি হাতে গণেশের প্রবেশ

গণেশ। (সবিস্ময়ে) বাব্বাঃ এসব আবার কি? দাদা, এসব কি তোমারই, মানে তোমারই আশ্রিত?

গোবর। আহা গণশা, এরা বড় গরিব। এদের দুঃখের কাহিনী শুনলে চোখে জল আসে।

গণেশ। তাই তো দেখছি, কেঁদে কেঁদে তুমি একেবারে পথে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছে। ওদের দুঃখের কাহিনী কি শুনব, তার আগে তোমার দুঃখের কাহিনী দেখে তাক লেগে গেছে। বাপ রে বাপ, যাকে বলে কাঙালীভোজন, মানে দস্তরমত দানছত্র খুলে বসেছ বল।

গোবর। কি যা-তা বলছিস? ছিঃ, ওসব বলতে নেই। তুই ছেলে-মানুষ, ও সব বুঝবি না। কই, খাবার এনেছিস?

গণেশ। খাবার! কার খাবার? ক্ষিদে তো পেয়েছিল আমার, আবার আনব কার জন্যে?

গোবর। কেন, দুজনের মত তো আনতে বলেছিলাম তোকে?

গণেশ। বাঃ রে! সে তো তুমি না খেলে পাছে আমি রাগ করি, তাই আনতে বলেছিলে। কিন্তু ভেবে দেখলাম, রাগ আমি করব না।

গোবর। কিন্তু এদের যে সব আশা দিয়ে বসিয়ে রেখেছি, কি হবে তা হ'লে?

গণেশ। কি আবার হবে. চ'লে যাবে। গরিব হ'লেও মানুষ তো বটে, আর তা ছাড়া এরা হয়ও খুব ভদ্র, আর খুব অমায়িক।

গোবর। নগদও অবশ্য সকলকে কিছু কিছু দিয়েছি।

গণেশ। বাঃ, তবে আর কি, প্রশ্রয় যখন পেয়েছে, তখন আর আশ্রয় নেবে না, দেখে নিও।

দেখিতে হইল না, একে একে সকলেই সুড়সুড় করিয়া খসিয়া পড়িল; শুধু যাইবার সময় মুসলমানটি "আচ্ছা কত্তা, তবে আসি, ছালাম।"—বলিয়া প্রস্থান করিল

হ্যাঁ, তুমি আসলে যা খাবে ব'লে আনতে দিয়েছিলে, তা এনেছি।

গোবর। কি দেখি?

গণেশ। এই এক পয়সার পান আর এক পয়সার বিড়ি।

গোবর। দে তবে, যা এনেছিস ওইগুলোই খাই।

বলিয়া বসিলেন, পান খাইলেন এবং পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া বিড়ি ধরাইলেন

আঃ, কি আরাম! খালি পেটে পান বিড়ি কি মধুর রে গণশা! মনে হচ্ছে, অনাদি অনন্তকাল ধ'রে খালি পেটে কেবলই পান আর বিড়ি খেয়ে যাই। (বিড়িতে টান দিলেন) আঃ! যাক, গরিবগুলো তা হ'লে খসেছে, বাঁচা গেল।

গণেশ। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার কত খসল?

গোবর। বিশেষ কিছু নয়, মোটে এক টাকা ছ আনা। তবে তুই ভাবিস নি গণশা, দেখে নিস, এই খালি পেটে পান আর বিড়ি খেয়েই আমি এর শোধ তুলে নোব।

গণেশ। বরাত ভাল তাই, নইলে ভিড় যে রকম দাঁড়িয়েছিল, আমি না এলে আর কিছুক্ষণ পরে তোমাকেও ওদের দলে ভিড়ে যেতে হ'ত।

গোবর। না রে না, বুঝিস না গণশা। ওরা আমাদেরই মত সংসারত্যাগী বৈরাগী। ওরাও যা, আমরাও তাই। একই পথের পথিক।

গণেশ। পথের পথিক আরও অনেক আছে, তারাও সংসারত্যাগী; কি ভাগ্যি তারা এসে জোটে নি, এই যা রক্ষে।

গোবর। তার মানে, তুই কি বলতে চাস?

গণেশ। প্রভুভক্ত চতুষ্পদ সম্প্রদায়, মানে কুকুর।

গোবর। দূর দূর।

গণেশ। দেখতে পেতে, আর কিছুক্ষণ পরে যদি না দুচারটে এসে জুটত তো কি বলেছি।

গোবর। থাম থাম। কুকুর আর কোথায় মানুষ! কি যা-তা বলিস, তার ঠিক নেই।

গণেশ। কেন, ওরাও তো সংসারত্যাগী, পথের পথিক। ওরাও যা, আমরাও তাই।

গোবর। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এত জিনিস থাকতে তুই শেষে কুকুর এনে হাজির করলি? তোর দেখছি কোন বুদ্ধিসুদ্ধি নেই।

গণেশ। তবে দাও গরিবগুলোকে, বেশি পয়সা হয়েছে কিনা। জান, ওদের সব দল আছে, রীতিমত ব্যবসা চালায়। নিজেদের ভেতরে সব সাট আছে। যত দেবে, ততই ওরা প্রশ্রয় পাবে।

গোবর। কেন, ছেলেবেলায় তুই পড়িস নি বুঝি? সেই যে কে লিখেছে—যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

গণেশ। হ্যাঁ, ওসব তারাই লেখে—যারা বলে, লেখাপড়া শিখিবে মরিবে দুঃখে আর মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে। দান করলে বাড়ে, না হাতি। তা হ'লে উপায় না ক'রে সকলেই ব'সে ব'সে মাছ খেত। ভিখরি না ভিখরি, সব চোর। কলকাতা শহরটাই চোরের আড়ত।

গোবর। গণশা, তবে আর নয়, চল। এখান থেকে পালাই। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

গণেশ। সে কি দাদা?

গোবর। আর এখানে নয়, একেবারে বাংলা দেশের বাইরে।

গণেশ। কুছ পরোয়া নেই দাদা। লক্ষ্মণের প্রেরণা নিয়ে আমিও তোমার ঠিক পেছনেই আছি।

বলিয়া কাঁধে বোঁচকা তুলিল

গোবর। তবে আয় লক্ষ্মণ।

গোবর ও গণেশের প্রস্থান

ক্রমশ

শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিলম্বিনী

বহু বিলম্বে আসিয়াছ তুমি, তবু আসিয়াছ এই তো ভালো ;
তৈলবিহীন প্রদীপে দেখ তো জ্বলে কি না জ্বলে নতুন আলো !
স্তিমিত হয়েছে যৌবনশিখা—মনের খবর লয় না কেহ,
আমি শুধু জানি অন্তর-তাপে হয় কি না হয় তাপিত দেহ।
তুমি জ্বলিতেছ আপনার তেজে, ভস্ম ঠেলিয়া আগুন-জ্বালা
পাবে কি দেখিতে—চারিদিকে তব জ্বলিছে আরতি-দীপের মালা !
শঙ্খ ঘণ্টা সঘনে বাজে,
জোনাকির আলো কে পায় দেখিতে সহস্রশিখা মশাল মাঝে !

বহুদিন হ'ল ক্যারাভান সাথে মরু-অভিযানে যাত্রা করি,
শত ওয়েসিস পার হয়ে শেষে মরু-মরীচিকা-চিহ্ন ধরি—
ঝড়ে ও আঁধিতে, বালু-ঝটিকায় পৌঁছিনু যেথা ভগ্ন দেহে—
মরুর প্রান্তে নহে গ্রামখানি, টানিছে না কেহ স্নিগ্ধ স্নেহে ;
জলকণাহীন পাদপবিরল দগ্ধ পথের অভিজ্ঞতা
সম্বল শুধু ; উদার আকাশ, কেহ নাই পাশে কহিতে কথা—
করুণার মত রজনী নামে,
রহি রহি শুধু পেতেছি শুনিতে ডাকে সারমেয় ডাহিনে বামে।

তুমি আসিয়াছ ভালই করেছ, কাছে এসে ব'স, তিমির-রাতি
যাপিতে হইবে হাতে হাত রেখে,—দেহ-দীপাধারে জ্বেলো না বাতি,
আঁখি-তারকায় অগ্নিশিখায় দিও না জ্বলিতে তীব্র তেজে,
ঝিঁঝিঁর ঝাঁঝর তাও থেমে যাবে বিরামবিহীন খানিক বেজে ;

শুধু হাতে হাত, নিবিড় তিমিরে পড়িতে পাব না মুখের ভাষা,
তুমি না জানিবে আশঙ্কা মম, আমি জানিব না তোমার আশা ;
রাত্রি গড়াবে প্রভাত পানে,
তন্দ্রা যদিই নেমে আসে চোখে টুটিবে তন্দ্রা পাখীর গানে।

পিছন ফিরিয়া খুঁজো না কিছুই, হাতে যাহা ঠেকে তাহাই লহ,
আমার অতীত ভবিষ্যতের তুমি হইও না বার্ত্তাবহ।
সন্ধ্যা-উষায় আজো ক্ষরে মধু, নদীতরঙ্গে সূর্য্য হাসে,
শুষ্ক ফুলের মধু-পান-লোভে আজো প্রজাপতি উড়িয়া আসে,—
তুমি আসিয়াছ ভালই করেছ, এ ধরণীতল নবীন আজো,
পথের ধূলায় আমি সাজিয়াছি, ফুল-পরিমলে তুমিও সাজো।
এস কাছে এস বিলম্বিনী,
নূতন বঁধুরে যদি চিনে থাক পুরানো বধূরে আমিও চিনি।

বেলা ব'য়ে যায়, আঙিনায় ছায়া পড়িয়াছে দেখ দীর্ঘ হয়ে,
দিনের আলোয় মনের আঁধার এখনো হয়তো আসিবে ক্ষয়ে ;
তুমি গাবে গান, আমি তব নাম আখর গনিয়া ছন্দে গাঁথি,
চকিতে চাহিয়া দেখিব আকাশে উড়ে চলিয়াছে বকের পাঁতি ;
ভৈরবী তব পূরবী হইয়া বাজিয়া উঠিবে ছন্দে মম,
দিনের সূর্য্য নিবে যায় যদি, রাতের চন্দ্র হরিবে তম।
আশা-আশঙ্কা জ্যোৎস্নারাতে
এক হয়ে ঝরি রজতধারায় নিদ দিবে আনি আঁখির পাতে।

আর বিলম্ব করিও না, যদি আসিয়াছ এস নিকটে আরো,
কাল-নদীজল বহে ক্ষুরধার, তুমি বিলম্ব করিতে পার ;

আমার আকাশে রৌদ্রশীতল মেঘে মেঘে রঙ দিতেছে এঁকে,
দীপ্তি তোমার প্রখর ঠেকিলে গুণ্ঠনে দিব মুখটি ঢেকে,
দিবা-চপলতা রাতের কবিরে যদি বা মুখর করিয়া তোলে—
অসহ হবে না, জানি যৌবন ভুলিবার যাহা সহজে ভোলে।
দিবা-অবসান যখন হবে,
জানি ঘুচে যাবে ব্যবধান-বাধা তিমির-তীর্থ-মহোৎসবে।

গোধূলিলগন এখনো আসে নি, প্রহরখানেক রয়েছে বাকি,
তব সিঁথিমূলে সিন্দুররেখা অস্তসূর্য্য দিবে কি আঁকি!
কণ্ঠে পরিবে সন্ধ্যামালতী অথবা রজনীগন্ধা-মালা।
প্রভাতের ফুল আমার তো নহে, পার যদি এনো ভরিয়া ডালা।
মন-বিনিময় হয় যদি তবে ফুল-বিনিময় হবেই জানি,
দিনের দীপ্তি মোর পূজাঘরে শোভিবে আরতি-দীপের দানি।
স্নিগ্ধ তিমির ভাল না লাগে,
ঘুমায়ে পড়িও—শশীহীন নভে জেনো অতন্দ্র তারকা জাগে।

ভুলের খেয়ালে যদি এসে থাক, ভুল ক'রে এস নিকটে আরো,
কোনো ভয় নাই, পূবের আকাশে সন্ধ্যাতিমির হতেছে গাঢ়,
আলোর পাখীরা ব্যাকুল পাখায় একে একে হের ফিরিছে নীড়ে,
রবি ডুবে যায় সমুদ্রবুকে, নিশি মনোহর জাগিছে ধীরে,
মিলনের বাঁশী বাজিবে গগনে, বাহুপাশ হবে নিবিড়তর,
সন্ধ্যামালতীমালা পর গলে, রজনীগন্ধা খোঁপায় পর।
আরো কাছে এস বিলম্বিনী,
কেটে গেল দিন পরিচয়হীন, নিশীথ-তিমিরে লইব চিনি।

সরোজিনী

১

স্কুল হইতে ফিরিয়া খাইবার সময়ে পত্নী কহিলেন, আজ আবার এক মজা হয়েছে।

সপ্রশ্ন মুখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই কহিলেন, তোমাদের পদ্মদূতী সরোজিনীকে খবর দিতে গিছল।

কহিলাম, বেশ তো। সেই রকমই তো কথা ছিল।

আমার কথায় কান না দিয়া পত্নী কহিলেন, সঙ্গে গিয়েছিল, বীরু আচায্যির মেয়ে মিণ্টা।

বীরু আচায্যির ভাল নাম বীরেন্দ্র আচার্য্য, রাধানাথের ভগ্নীপতি, অবস্থা আগে বেশ ভাল ছিল, মামলা-মকদ্দমার ফলে এখন খুব খারাপ হইয়াছে। মিণ্টা তাহার বড় মেয়ে। বীরু ভাল ঘর-বর দেখিয়া মিণ্টার বিবাহ দিয়াছিল। দ্বিরাগমনে শ্বশুর-বাড়ি যাওয়ার মাস ছয় পরে মিণ্টা বিধবা হইল। বীরু গহনা কাপড় সমেত মেয়েকে আনিয়া আর শ্বশুর-বাড়ি পাঠায় নাই। বীরু আচায্যি প্রবোধ গাঙ্গুলীর প্রতিবেশী।

কহিলাম, পদ্ম আবার মিণ্টাকে নিয়ে গেল কেন?

সরোজিনীর বাড়িতে মিণ্টাদের খুব যাওয়া-আসা যে! সরোজিনীর সঙ্গে মিণ্টার নাকি খুব ভাব, পদ্ম বলছিল। তারপর শোন, মিণ্টাকে নিয়ে তো গেল।

কখন?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে। গিয়ে দেখল, নীচের তলায় সরোজিনীর শাশুড়ী মাদুর পেতে শুয়ে আছে, আর কাছে ব'সে মনু চক্রবর্ত্তীর এক-পাল ছেলেমেয়ে খেলা করছে। তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানলে, ওরা দোতলায়।

ওরা কে কে?

সরোজিনী আর ফুন্টি। ফুন্টি তো ওখানেই থাকে, রান্না-বান্না কাজ-কর্ম্ম করে। তারপর শোন, দোতলায় গিয়ে দেখলে, ঘরের মধ্যে পালঙের ওপর ধবধবে বিছানায় তাকিয়া হেলান দিয়ে সরোজিনী বই পড়ছে, আর মেঝেতে শতরঞ্জির ওপর ব'সে ফুন্টি পড়ছে।

সরোজিনী ফুন্টিকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে বুঝি?

পদ্ম তো তাই বললে। তারপর শোন, সেদিন তো সরোজিনী খুব সভ্যা ভব্যা বিধবাটি সেজে এসেছিল, বাড়িতে কি প'রে থাকে জান? চওড়া কালাপাড় ধোপদস্ত ফরাসডাঙ্গার শাড়ি, শেমিজ, ব্লাউজ। গায়ে এক-গা গয়না, সিঁথিতে সিঁদুরই শুধু নেই।

বলিতে ইচ্ছা হইল, সরোজিনী তো শুধু 'স্বামীলাভে'র জন্য প্রবোধকে বিবাহ করে নাই যে, স্বামী হারাইয়া, সর্ব্ব সজ্জা ও আভরণ বর্জ্জন করিয়া যৌবনে যোগিনী সাজিবে? কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম।

স্ত্রী কহিলেন, মিণ্টাকে দেখে উঠে ব'সে সরোজিনী বললে, এস ভাই। আজ এত দেরি হ'ল যে? মানে মিণ্টা যে রোজ ওর কাছে যায়, পদ্মকে তা জানিয়ে দিলে আর কি। পদ্ম ওদের আসা-যাওয়া বন্ধ করবার জন্যে গাঙুলী-বুড়োকে বলবে বলছে।

বাধা দিয়া কহিলাম, বলুকগে, তারপর কি হ'ল বল?

সরোজিনী পদ্মর দিকে তাকিয়ে বললে, ওটি কে ভাই? মিণ্টা আর আর ফুন্টি একসঙ্গে ব'লে উঠল, আমাদের পদ্মপিসী। সরোজিনী দুই চোখ ডাগর ক'রে বললে, বামুন? ওরা দুজনেই ঘাড় নাড়লে, নেড়ে জানালে, তাই বটে। সরোজিনী গালে হাত দিয়ে বললে, আমি ভেবেছিলাম, ডোম। বামুনের বাড়ির মেয়ের ঐ চেহারা! রাগে পদ্মর কালো মুখ আরও কালো হয়ে উঠল।

বাধা দিয়া কহিলাম, ওটা জানতে পারলে কি ক'রে?

পত্নী হাসিয়া কহিলেন, পদ্ম-ঠাকুরঝি যাবার পরেই মিণ্টা আর ফুন্টি এসেছিল যে। পদ্ম যা বাদ দিয়েছিল, ওরা তা ব'লে গেল। তারপর শোন, আর মুখটা হ'ল যেন ভীমরুলের চাক, রাস্তায় ঘাটে হ'লে ও বোধ হয় সরোজিনীকে আঁচড়ে কামড়ে দিত। নেহাত বাড়ির ভেতর তাই। তবে বলা মুখ তো, চুপ ক'রে থাকতে পারলে না, বললে,

দেখ বউ, রূপ-যৌবন সবাইকার থাকে না, থাকলেও চিরকাল থাকে না, ওর গরব অত ক'রো না। সরোজিনী হেসে উঠে বললে, বাঃ বে! যতদিন থাকবে, ততদিন গরব করব না? শোন ভাই মিণ্টা, ওর কথা। পদ্ম গর্জ্জে উঠে বললে, দেখ প্রবোধ গাঙুলীর বউ, আমি তোমার বাড়িতে পাত পাড়তেও আসি নি, রাঁধুনীগিরি করতেও আসি নি, বড়লোক আছ, বাড়িতেই থাক, মুখ সামলে কথা বলবে বলছি। সরোজিনী ফুন্টিকে বলল, তুই ও ঘরে যা ফুন্টি। গেলে পর মিণ্টাকে বললে, দেখ ভাই, পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের কাণ্ড! কি বললাম আমি—? পদ্ম বাধা দিয়ে বললে, তুমিই বা কি শহরের মেয়ে শুনি? ওসব চাল আর আমাদের কাছে মেরো না, কোন্ বিত্তান্ত আমাদের না-জানা? সরোজিনী গম্ভীর হয়ে বললে, যার-তার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার ঘেন্না করে, কি দরকার আপনার বলুন দেখি? পদ্ম বললে, তোমার আচার-ব্যাভারের জন্যে গাঁয়ের লোক তোমাকে পতিত করেছে। সরোজিনী বললে, বেশ তো, তাতে আমার কি ব'য়ে যাবে? গাঁয়ের সঙ্গে তো আমার ভারী সম্পর্ক!

পদ্ম বললে, ক্রিয়াকম্মে নেমন্তন্ন হবে না।

সরোজিনী বললে, পরের বাড়িতে শাক-চচ্চড়ি আর কলায়ের ডাল খাবার জন্যে তো আপনাদের মত হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছি!

পদ্ম বললে, ধোপা-নাপিত বন্ধ।

সরোজিনী বললে, ধোপা! একটা আলমারি দেখিয়ে বললে, দেখতে পাচ্ছেন, এক আলমারি ঠাসা কাপড়, যতদিন এ গাঁয়ে থাকব, কাপড় ধোয়াবার দরকার হবে না। আর নাপিত! আপনার মত তো গোঁফ-দাড়ি আমার নেই যে, রোজ নাপিত দরকার হবে! পদ্মর মুখে তো কি রকম লোম দেখেছ? কাজেই সে আরও রেগে উঠে বললে, মড়া মরলে কেউ পোড়াতে আসবে না।

সরোজিনী বললে, এই রূপ-যৌবন যতদিন আছে, ততদিন মরবার ইচ্ছে নেই; তবু যদি মরি, তা হ'লে কে পোড়াতে আসবে, কে আসবে না, দেখতে আসব না। আর ভগবানের ইচ্ছেয় যদি শাশুড়ী মরেন

তো দারোগাবাবু ব্যবস্থা করবেন। জানেন তো কত খাতির আমার সঙ্গে?

পদ্ম মুখ কুঁচকে বললে, জানি বইকি। দারোগাবাবু যে তোমার—

সরোজিনী বললে, ভালবাসার লোক। এই তো? বেশ তাই। কিন্তু এইজন্যেই দারোগাবাবু যদি ডাক দেন তো আপনার বাবা, ভাই, এমন কি নাগররা পর্য্যন্ত ছুটে আসবে। পদ্ম চীৎকার ক'রে বললে, কি বললি? আমার নাগর? হারামজাদীর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! সরোজিনী মিণ্টার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, হ্যাঁ ভাই মিণ্টা, আমি অন্যায় বলছি? ঐ বয়েস, অত রূপ, ওঁর নাগর থাকবে না তো থাকবে আমাদের? পদ্মকে বললে, তোমার শুধু এক-আধটি নয়, গাঁসুদ্ধু লোক। পদ্ম কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল। এমন ক'রে কেউ কখনও ওকে মুখের সামনে অপমান করে নি। তারপর হঠাৎ ব'লে উঠল, তুই মর। মোছলমানের হাতে জাত দিয়েছিস, তোব লজ্জা করে না, গলায় দড়ি দিগে যা। মিণ্টাকে ডেকে বললে, মিণ্টা! চ'লে আয়, চ'লে আয় বলছি। সরোজিনী মিণ্টাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, বাঃ রে! ও কেন যাবে? না ভাই মিণ্টা, যেওনা, দেখছ না কি রকম ক্ষেপেছে, কামড়ে দেবে এখনই। পদ্ম ছুটে নীচে নেমে গেল।

সরোজিনী হেঁকে বললে, ফুন্টি, সঙ্গে যা, দেখিস, কিছু নিয়ে না পালায়।

পদ্ম শুনতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে বললে, তুই মর। মরণ নেই তোর? যম তোকে ভুলেছে কেন লো হারামজাদী? তারপর নীচে যেখানে সরোজিনীর শাশুড়ী ঘুমোচ্ছিল, সেখানে গিয়ে পদ্ম চীৎকার ক'রে বললে, চোখ বুজে যে নিশ্চিন্তি প'ড়ে আছ, ওদিকে হতভাগী যে কুলে কালি দিচ্ছে! জাত-জন্ম যে গেল তোমার! সে বেচারী ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল।

সরোজিনী দোতলা থেকে বললে, ওঁকে আবার বিরক্ত করছ কেন? চ'লে যাও।

পদ্ম গালাগালি দিতে দিতে বেরিয়ে এল।

কহিলাম, তারপর?

তারপর আর কি? পদ্ম সারা পাড়া নেচে বেড়াচ্ছে আর সরোজিনীর পিণ্ডি চটকাচ্ছে। মিণ্টাকেও বাদ দেয় নি। মিণ্টার বাবাকেও বিপদে পড়তে হবে, দেখো।

সন্ধ্যার সময় গাঙুলী মশায়ের বাড়ি গিয়া দেখিলাম, হারাণ ও গাঙুলী মশায় বৈঠকখানায় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। আমি যাইতেই গাঙুলী মশায় কহিলেন, এস ভায়া। বসিতেই কহিলেন, সব শুনেছ?

অজ্ঞতার ভান করিয়া কহিলাম, কি?

পদ্মকে প্রবোধ গাঙুলীর পরিবার অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তাই নাকি?

হারাণ বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিল, হ্যাঁ, তাই। আর মনু চক্রবর্ত্তী অপমান করেছে আমাকে, আমরা তো ইচ্ছে ক'রে যাই নি, সমাজের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলাম।

গাঙুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সত্যিই তো। এ অপমান তোমাদের নয়, সমস্ত সমাজের অপমান। রাগত স্বরে কহিলেন, কিন্তু কিছু ভেবো না তোমরা, এই বুড়ো যদি বেঁচে থাকে আর রাধানাথ বদ চাল না দেয় তো দেখো, কি করি আমি, ঐ মনু চক্রবর্ত্তী আর তার বোনকে দিয়ে যদি তোমাদের ভাই-বোনের পায়ে না ধরাই তো আমার নাম মিথ্যে।

হারাণ কহিল, মনু চক্রবর্ত্তী বললে, দারোগাবাবুকে ব'লে আমাদের দেখে নেবে।

গাঙুলী মশায় আমার দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, শুনছ কথা? দারোগাবাবু যেন ওর ইয়ে কিনা।

হারাণ কহিল, বলেছি আমি। মুখের ওপর ব'লে দিয়েছি, দারোগা-বাবু তোর ভগ্নীপতি যে, তোর ভাবনা কি?

গাঙুলী মশায় পুলকিত হইয়া কহিলেন, বেশ করেছ। তা কি বললে?

হারাণ কহিল, একেবারে মুখ্যু কিনা। ভাল কথা বোঝবার সাধ্যি আছে? উল্টে গালাগালি দিতে লাগল।

আমি কহিলাম, দারোগাবাবুকে নিয়ে যে আপনারা টানাটানি করছেন, তাতে কিছু ক্ষতি হবে না তো ?

গাঙুলী মশায় ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন, ক্ষতি কিসের ? দারোগা-বাবুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ? সার্ক্‌ল-অফিসার যদি হাতে থাকে তো দারোগা আমার এইটি করবে।—বলিয়া দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আমার নাকের সম্মুখে বাড়াইয়া দিলেন। তারপর স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়া কহিলেন, তোমাদের কোন ভয় নেই। বুড়ো সাত চাল ভেবে তবে কাজ করে। সার্ক্‌ল-অফিসার লোক ভাল ; দারোগার সঙ্গে বেশ ভাব নেই। তা ছাড়া দারোগাবাবু যে গাঁয়ে সব বিষয়ে মোড়লি করে, এটা পছন্দ করেন না। ওঁকে দিয়েই সব শায়েস্তা করব আমি।

একাই বাড়ি ফিরিলাম। হারাণ থাকিয়া গেল। হারাণের সঙ্গে গাঙুলী মশায়ের কি গোপন পরামর্শ আছে। আমাকেও গাঙুলী মশায় সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিতেছি। রাস্তায় মনু চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা হইল। এই কয়দিনেই মনুর হাল-চাল বদলাইয়া গিয়াছে, গায়ে হাত-কাটা লংক্লথের ফতুয়া, পায়ে বাটা কোম্পানির ক্যাম্বিসের জুতা, হাতে ঝকঝকে নূতন লণ্ঠন। আমাকে দেখিয়া কহিল, কি ভায়া, বুড়োর আড্ডাতে গিয়েছিলে বুঝি ? কি পরামর্শ হ'ল আজ ?

জবাব না দিয়া কহিলাম, মনুদাদা যে পুরোদস্তুর ম্যানেজার ব'নে গেছ দেখছি।

মনু একগাল হাসিয়া কহিল, সত্যি। নিজের ফতুয়া ও জুতার দিকে চাহিয়া কহিল, আনকোরা নতুন, পরশু কিনে নিয়ে এসেছি। বেশ দেখাচ্ছে, না ?

ঘাড় নাড়িয়া তাহাকে সমর্থন করিলাম। মনু কহিল, সরোজ বললে যে, হাকিম-হকিমের কাছে যেতে হবে, ন্যাংটা ফকির সেজে থাকা ভাল নয়। খুব বুদ্ধি !

কহিলাম, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

এক মুহূর্ত্তে গরম হইয়া উঠিয়া মণীন্দ্র কহিল, যাচ্ছি দারোগাবাবুর কাছে, ঐ হেরো হারামজাদার আর ওর শাঁকচুন্নী বোনটার শ্রাদ্ধ বাঁটতে। সাহস দেখ দেখি ! আমাকে অপমান ! কাঁটাবাঁদের

মুসলমানরা, যারা কাউকে তোয়াক্কা করে না, তারা পর্য্যন্ত আজকা'ল আমাকে খাতির করছে। মুসলমান দিয়ে কানে ধরিয়ে ওকে ওঠ-বোস করাব আমি, তুমি দেখে নিও। আর ঐ ডাইনীটাকে সরোজের পা চাটাব।—বলিয়া লণ্ঠনসুদ্ধ হাতটা নাড়িতে লাগিল। তারপর আমাকে কহিল, আর তোমাকেও সাবধান ক'রে দিচ্ছি, যেমন ভালমানুষটি আছ, তেমনিটিই থেকো, কোন দলে যোগ দিও না, তা হ'লে আখেরে বিপদে প'ড়ে যাবে।—বলিয়া গজগজ করিয়া চলিয়া গেল।

৮

দুই পক্ষেই প্যাঁচ-কষাকষি চলিতে লাগিল। গাঙ্গুলী মশায় একদিন গাঁসুদ্ধ সকলকে খাওয়াইলেন এবং সেই উপলক্ষ্যে সরোজিনী ও মণীন্দ্রকে বাদ দিয়া, তাহাদের সমাজ-চ্যুতি ব্যাপারটাকে সকলের কাছে চালু করিয়া দিলেন। সরোজিনীর শাশুড়ীকে হাত করিয়া তাহাকে দিয়া সরোজিনীর নামে খোরপোষের মামলা রুজু করানো চলিতে পারে কি না, সেই সম্বন্ধে শহরের উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য রাধানাথ জেলায় আনাগোনা করিতে লাগিল। প্রবোধ গাঙ্গুলীর ভাগিনেয় বর্দ্ধমান জেলার কোন্ এক গ্রামে অনেকদিন ধরিয়া নানাপ্রকার রোগে ভুগিতেছিল, অদ্যাবধি বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে এবং প্রবোধের মামাকে আনিবার ব্যবস্থা করা হইল। ওদিকে মণীন্দ্র, আজিজ সাহেব ও দারোগাবাবুর সঙ্গে ঘন ঘন জেলায় গিয়া হাকিমদের সঙ্গে দেখা করিয়া কি যেন সব করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

একদিন সকালে তিনকড়ি আসিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছি।

আপ্যায়ন করিয়া বসাইয়া কহিলাম, কি ব্যাপার?

আমরা গাঁয়ে একটা লাইব্রেরি করব ভাবছি।

বেশ কথা। কিন্তু টাকা?

তিনু মৃদুহাস্যসহকারে কহিল, টাকার যোগাড় হয়েছে। শ্রীমতী

সরোজিনী দেবী দুশো টাকা দেবেন আপাতত, পরে দরকার হ'লে আরও দেবেন।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তাই নাকি?

ঘাড় নাড়িয়া তিনু কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ছাড়া ওঁর বাড়িতে দুটো পুরনো আলমারি আছে, সেইগুলো দিয়ে ওঁর বৈঠকখানায় কাজ আরম্ভ হবে, তারপর নতুন আলমারি করিয়ে দেবেন, এমন কি পরে লাইব্রেরির জন্যে একটা ঘরও তৈরি করিয়ে দেবেন।

বুঝিলাম, সরোজিনী গ্রামের যুবকদের হাত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

তিনু কহিল, উনি বললেন, কি কি বই কিনতে হবে সে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে।

কহিলাম, এ সম্বন্ধে আবার পরামর্শ কি করতে হবে? বাংলা দেশের বড় বড় লেখকদের নাম তো তোমরা জান, তাঁদেরই বই আনিও।

তিনু বলিল, তা হবে না, একদিন আপনাকে উনি নিয়ে যেতে বলেছেন। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে উনি কথাবার্ত্তা বলবেন, আর টাকাও আপনার হাতে দেবেন।

সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলাম, আরে না না, আমাকে আবার এ ব্যাপারে টানা কেন? গ্রামের আবহাওয়া জান তো?

তিনু অনুযোগের স্বরে কহিল, এসব দলাদলি-ব্যাপারে আপনার থাকা উচিত নয়। আর ওঁর বিশ্বাস, আপনি এসবের বাইরে।

চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু কেন জানি না, মনে ভারী আনন্দ হইল। এই মেয়েটির সম্বন্ধে নানা রকমের খবর শুনিয়া ইহার বিরুদ্ধে মনের মধ্যে যে বিরক্তি ও বিরোধের ভাব এ কয়দিন ধরিয়া জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তে পরিষ্কার হইয়া গেল। আপনারা বলিবেন, হইবে না কেন? রূপসী যুবতী যে! কেহ যদি বলে, পদ্ম তোমাকে খুব সাধুপুরুষ বলিয়া তারিফ করিয়াছে, মনের মধ্যে শিহরণ জাগিবে কি? যতই সাধুগিরি কর আর মাস্টারি ফলাও, সরোজিনীর প্রতি তোমার মনে দুর্ব্বলতা জন্মিয়াছে। উত্তরে আমি বলিব, চুপ করুন, ওসব কথা বলিবেন না। সরোজিনী আমার বোন। তথাপি কোন

কথা বলিতে হইলে, দয়া করিয়া কানে কানে বলুন। কারণ দেওয়ালেরও কান আছে। তাহা শুনিয়া আপনারা মুখ টিপিয়া হাসিবেন, কেহ কেহ হয়তো রাগিয়া চোখ পাকাইবেন।

তিনু কহিল, আপনাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস ক'রে টাকা উনি দেবেন না। তা ছাড়া সব বন্দোবস্ত আপনাকেই করতে হবে। ওঁর ইচ্ছে, জেলা থেকে এস. ডি. ও. সাহেবকে এনে লাইব্রেরির উদ্বোধন করানো। তারও ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে।

এ আর এক চাল। শুধু তরুণ-শক্তি নয়, রাজ-শক্তিকেও সরোজিনী আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে।

তিনু কহিল, বেশি দেরি ক'রে লাভ নেই। গ্রামের লোক কিছু জানতে পারবার আগেই সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে হবে। আজ রাত্রিতে তা হ'লে আপনাকে আমি নিয়ে যাব।—বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই কহিলাম, তুমি কি ওঁর সঙ্গে নিজে দেখা করেছিলে?

তিনু কহিল, আজ্ঞে না, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, ফুন্টিকে পড়াবার জন্যে।

কহিলাম, তাই নাকি?

আজ কদিনই তো পড়াচ্ছি।

মাসে কিছু—

তিনু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, মাসে কুড়ি টাকা ক'রে দেবেন। তা ছাড়া গ্রামের উন্নতির জন্যে সাহায্য করবেন বলেছেন। ওঁর মত এতবড় মহৎ-হৃদয় নারী আমি দেখি নি। বলিতে বলিতে তিনু ভাবাবিষ্ট হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, যদি গাঁয়ের ক্ষ্যাপা কুকুরগুলোর তাড়ায় অস্থির হয়ে উনি গাঁ থেকে না পালান তো গাঁয়ের চেহারা বদলে যাবে, আমি ব'লে দিচ্ছি। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আমরা পালাতে দোব না ওঁকে। এক মুহূর্ত্তে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে কহিল, এ ক্ষ্যাপা কুকুর-গুলোকেই বরং টিট ক'রে ছেড়ে দোব।

সন্ধ্যার সময়ে তিনুর সঙ্গে যাইতেই হইল। একে তরুণ, তার উপর

সম্প্রতি তাতিয়া উঠিয়াছে; কাজেই ইহাদের চটাইলে শেষে বাড়িতে ইট-পাটকেল পড়িতে শুরু করিবে।

সরোজিনীর বাড়ির দরজায় আসিয়া কহিলাম, কাউকে ডাক দাও।

তিনু কহিল, কি দরকার? আসুন না আমার সঙ্গে।

তিনু ইহার মধ্যেই সরোজিনীর সংসারে স্বচ্ছন্দ-গতি হইয়া উঠিয়াছে। তিনুর বয়স চব্বিশের কাছাকাছি, লম্বা-চওড়া পেশীবহুল দেহ, গায়ের রংটা ফরসা না হউক, আমাদের মত কালো নয়। লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছে, নভেল-নাটকও দুই-চারখানা পড়িয়াছে, কাজেই হৃদয়টাও হৃদয়সঙ্গিনীর জন্য হাহাকার করিতে শুরু করিয়াছে বোধ হয়। অতএব এই অবস্থায় সরোজিনীর মত একজন সুন্দরী, নিঃসম্পর্কীয়া, বেওয়ারিশ তরুণীর সঙ্গচর্চ্চা তাহার পক্ষে ভাল কি? অবশ্য ফুন্টি মাঝে রহিয়াছে। তবু দুইটি হৃদয় বিপরীতধর্ম্মী তড়িতের তাড়নায় যখন পরস্পরের দিকে বিপুলবেগে ছুটিতে থাকিবে, তখন ঐ এককোঁটা মেয়ে তাহার প্রথম-ভাগ-পড়া বিদ্যা ও দীপশিখার মত দ্যুতিহীন রূপ লইয়া তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিবে কি করিয়া? তাহার উপর তাহারও একটি নিজস্ব হৃদয় আছে; ইতিমধ্যে সেখানেও যদি কোন বৈকল্য ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এই পাড়াগাঁয়ের প'ড়ো বাড়িতে একটি রোমাঞ্চকর ত্রৈভুজিক রোমান্স গড়িয়া উঠিবে দেখিতেছি।

উঠানে আসিয়া পৌঁছিতেই তিনু হাঁকিল, ফুন্টি!

ফুন্টি রান্নাঘরে ছিল, ডাক শুনিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

তিনু প্রশ্ন করিল, দিদি কোথায়?

ফুন্টি জবাব দিল, পূজোর ঘরে আছেন।

তিনু আদেশ দিল, ডেকে দাও।

বারান্দায় বোধ করি আমার আগমন উপলক্ষ্যেই একটি টেবিল ও তাহার চারিদিকে চারিখানি চেয়ার পাতা হইয়াছে। তাহারই একটাতে বসিলাম।

তিনু আর একটাতে বসিয়া কহিল, খুব ধর্ম্মশীলা। এই বয়সেই সব দিক দিয়ে এত সাধু-প্রকৃতির মহিলা বড় দেখা যায় না।—বলিয়া তিনু আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া উঠিল।

মনে মনে কহিলাম, সকাল সন্ধ্যা দুই বেলা পূজার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া ঘণ্টাখানেক করিয়া কাটাইলেই, কোন মেয়েকে সরাসরি ধর্ম্মশীলা বলিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না। আমার একজন নিদ্রানিপুণা আত্মীয়া প্রথম প্রথম শ্বশুর-বাড়ি গিয়া সকাল সন্ধ্যা পূজার ঘরে ঢুকিয়া রাত্রির অসম্পূর্ণ নিদ্রা সুদে আসলে পোষাইয়া লইতেন। আমার স্ত্রীর এক প্রৌঢ়া দিদিমা পূজার ঘরে ঢুকিয়া দুই বেলা অঙ্গ-প্রসাধন করেন; আমি একজন বিধবাকে জানি, যিনি বৈধব্যের প্রথম অবস্থায় পূজার ঘরে ঢুকিয়া নিরিবিলিতে চৌর্য্যলব্ধ, বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ আহার্য্যদ্রব্য উদরসাৎ করিতেন। অবশ্য সরোজিনীর পক্ষে এসব উদাহরণ প্রযুজ্য নয়। নিজের সংসারে সে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনা; কাজেই পূজার ঘরকে অন্য কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করার তাহার আবশ্যক না হইতে পারে।

সরোজিনী আসিয়া হাজির হইল। পরিধানে গরদের থান-কাপড়, গায়ে গরদেরই ব্লাউজ; হাতে সেই সেদিনের মত দুগাছি করিয়া প্লেন চুড়ি; ব্লাউজের অবকাশে অংশত-দৃশ্যমান বিছাহার; মাথায় এলো খোঁপার উপর স্বল্প অবগুণ্ঠন; মুখে সদ্যসমাপ্তপূজা পূজারিণীসুলভ শান্ত-সমাহিত ভাব।

সরোজিনী কাছে আসিয়া (আজও সেই এসেন্সের মিষ্ট গন্ধ) মৃদু ও মাদক হাসি হাসিয়া কহিল, দাদা, বোনকে একেবারে ভুলে গেছেন, বোন কিন্তু ভুলতে পারে নি।—বলিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া সত্য সত্যই পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলাম, থাক থাক, কাজের ভিড়ে আসতে পারি নি, খবর সব পাচ্ছি।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্য মুখে কহিল, খুব কুৎসা শুনছেন বুঝি?

আমিও হাসিয়া কহিলাম, কুৎসা প্রশংসা দুই-ই।

আচ্ছা, একটু বসুন, আমি আসছি এখনই। তারপর ব'সে ব'সে একে একে সব শুনব।—বলিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বুঝিলাম, খাবারের আয়োজন হইতেছে। অন্য কেহ হইলে, এই সুযোগে লাফাইয়া উঠিয়া কহিত, আহা, থাক থাক, ওসব আবার কেন? এইমাত্র খেয়ে আসছি।—বলিয়া সরোজিনীকে প্রায় টানিয়া সামনে বসাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু আমি নির্ব্বাক ও নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া

রহিলাম। মাস্টারি করিতে করিতে সামাজিক কায়দা-কানুন আয়ত্ত করিতে পারি নাই ; যাহা করা উচিত যথাকালে তাহা মনে পড়ে না, এবং যখন মনে পড়ে তখন করিবার উপায় থাকে না।

সরোজিনী এবং তাহার পাছু পাছু ফুন্টি আসিয়া হাজির হইল। দুইজনের হাতে দুই থালা খাবার। ফুন্টি নীল রঙের শাড়ি (বোধ করি সরোজিনীর) কোমর বাঁধিয়া পরিয়াছে, গায়ে ঐ রঙের ব্লাউজ, মাথার চুল আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েদের মত আঁট-সাঁট করিয়া বাঁধা, কানে দুইটি সোনার দুল। ফুন্টি বোধ হয় রান্না করিতেছিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছে। ফুন্টি মেয়েটি ভারী ভাল, খুব নম্র ও ধীর (অন্তত আমাদের কাছে) ; ফরসা রঙ নয়, তবু তাহার স্বাস্থ্যময় দেহে একটি উজ্জ্বল শ্যাম-শ্রী টলমল করিতেছে।

খাবারের থালা নামাইয়া সরোজিনী পাশের চেয়ারে বসিয়া ফুন্টিকে হুকুম করিল, জল নিয়ে আয়, তারপর খাওয়া হ'লে চা নিয়ে আসবি। ফুন্টি হুকুম তামিল করিতে ছুটিল।

সরোজিনী কহিল, খান।

তিনকড়ি অবিলম্বে আরম্ভ করিয়া দিল। আমি এইবার কোন-মতে বলিয়া ফেলিলাম, আবার এত সব কেন, মানে—। সরোজিনী যথারীতি কহিল, বাঃ রে ! বোনের বাড়িতে এসেছেন—কহিলাম, হাতটা একটু—। সরোজিনী ডাক দিয়া কহিল, ফুন্টি, জল নিয়ে আয়। ফুন্টি দুই গ্লাস জল আনিয়া হাজির করিল। হাত ধুইয়া খাইতে বসিলাম।

সরোজিনী কহিল, কি কি নিন্দা শুনেছেন বলুন তো ?

গম্ভীর মুখে কহিলাম, আমাদের পদ্মকে অপমান করেছ কেন ?

সরোজিনী দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, ও কি আপনার নিজের লোক নাকি ?

ত্রস্তভাবে কহিলাম, না না, আমার নিজের লোক নয়, তবু গাঁয়ের মেয়ে তো, হারাণের বোন।

সরোজিনী আশ্বস্ত হওয়ার সুরে কহিল, ও, তা ও বাড়ি ব'য়ে ঝগড়া করতে এসেছিল কেন ? তা ছাড়া অপমান তো কিছু করি নি।

গম্ভীর মুখে কহিলাম, অপমান করা আর কাকে বলে? ডোম বলেছ, গোঁফ-দাড়ি আছে বলেছ, চোর বলেছ—আর আর—

তিনু ভরাট মুখে কহিল, ঠিকই তো বলেছেন, সবগুলি গুণই তো ওর আছে।

সরোজিনী লজ্জার ভান করিয়া কহিল, সত্যি, রাগের মাথায় যা-তা ব'লে ফেলেছি, দেখা হয় তো মাপ চেয়ে নোব।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, উঁহু, ও কাজটি ক'রো না।

সরোজিনী উৎসুক কণ্ঠে কহিল, কেন?

তোমার নাক কামড়ে দেবে, যা রেগেছে।

তিনু কহিল, ঠিক বলেছেন। ও কাজ করবেন না, কামড়ে দেয় ও, আমার দিদিকে একদিন কামড়ে দিয়েছিল।

সরোজিনী সভয়ে কহিল, তাই নাকি! তবে থাক ওসব, তা ছাড়া ওসব মেয়েকে একটু-আধটু আঘাত দেওয়া ভাল!

তিনু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

ফুণ্টি আসিয়া হাজির হইল, দুই হাতে দুই কাপ চা; মুখটি মুছিয়াছে; কেশে ও বেশে কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

টেবিলে চা নামাইয়া দিয়া, ফুণ্টি চেয়ারটা টানিয়া সরোজিনীর আড়ালে গিয়া বসিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, মাঝে মাঝে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ফুণ্টি তিনকড়িকে দেখিয়া লইতেছে।

ফুণ্টির এত আড়ালে-আবডালে তিনুকে দেখিবার কি প্রয়োজন? তিনুর কাছেই পড়ে শুনিয়াছি। পড়িবার সময়ে সাধ মিটাইয়া তাহাকে দেখিয়া লইলেই হয়।

কিন্তু বলিতে কি, তিনুর উপর একটু ঈর্ষা হইল। কুমারী তরুণীর কোমল কটাক্ষ-লাভ ইহলোকে আমাদের ভাগ্যে জুটে নাই।

আমাদের যৌবনকালে অনাত্মীয়া তরুণীরা নিঃসঙ্কোচে পথে-ঘাটে বাহির হইত না, পুরুষদের সহিত মিশিত না, স্কুল-কলেজে একসঙ্গে পড়া দূরে থাক, উঁকি পর্য্যন্ত মারিত না। দূর হইতে তাহাদের দর্শন-লাভের জন্য হয় গির্জ্জায় বা সমাজে, থিয়েটারে বা বায়োস্কোপে যাইতে

হইত; অথবা ফুটপাথের উপর বেলা দশটায় বা চারটায় পায়চারি করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে আমাদের তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয় তৃপ্তি মানিত না।

তিনু প্লেটে চা ঢালিয়া, ফুঁ দিয়া দিয়া খাইতে খাইতে, সরোজিনীকে কহিল, ওঁকে তা হ'লে সেই কথাটা—

সরোজিনী নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া কহিল, আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।

জিজ্ঞাসু মুখে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে কহিল, তিনকড়ি-বাবু গ্রামে একটা লাইব্রেরি করবার জন্যে আমাকে ধরেছেন। এখানের ওপর অবশ্য আমার বিন্দুমাত্র মমতা নেই, তবু আমি রাজি হয়েছি। শ দুই টাকা আমি দোব, কিন্তু আপনার হাতে, আপনি যেমন ইচ্ছে লাইব্রেরি গ'ড়ে তুলুন।

কহিলাম, ঘর কোথায়?

আমার বৈঠকখানায় সম্প্রতি হোক; পরে যদি দেখি, গ্রামের লোক লাইব্রেরি ব্যবহার করছে আর তাতে তাদের মনের কিছু উন্নতি হচ্ছে, তা হ'লে ঘর করবার টাকাও আমি দোব।

সরোজিনী বেশ কথাবার্ত্তা বলে তো! ঠিক শিক্ষিতা মেয়েদের মত!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

সরোজিনী উৎসুক কণ্ঠে কহিল, কি?

একটু ইতস্তত করিয়া কহিলাম, তুমি কি লেখাপড়া শিখেছ?

সরোজিনী মৃদু হাসিয়া কহিল, কেন বলুন দেখি?

তোমার কথাবার্ত্তার ধরন দেখে মনে হয়; তা ছাড়া এসব বিষয়ে উৎসাহ আমাদের পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে কোন দিন দেখি নি।

সরোজিনী গম্ভীর হইয়া কহিল, হ্যাঁ।

বিয়ের আগেই?

ঘাড় নাড়িয়া সরোজিনী কহিল, না, বিয়ের পর। ওঁর সঙ্গে ওখানে গিয়ে। উনি সারাদিন বাইরে বাইরে থাকতেন; বাড়িতে হিন্দুস্থানী

চাকর-চাকরানী ছাড়া আর কোন সঙ্গী ছিল না। ভারী একা একা মনে হ'ত। ওঁকে একদিন বললাম, আমাকে একটু লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা ক'রে দাও; দুচারখানা বই, খবরের কাগজ পড়তে পারলেও সময়টা এক রকম ক'রে কাটবে। উনি ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। বাড়ির পাশেই এক ভদ্রলোক থাকতেন, আগে কোন্ এক স্কুলে হেডমাস্টারি করতেন, বয়স হওয়াতে কাজ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন; তিনিই আমার মাস্টার নিযুক্ত হলেন। তাঁর কাছে ইংরেজী বাংলা কিছু কিছু পড়েছিলাম।

সরোজিনীর হইয়া প্রবোধকে ধন্যবাদ দিলাম। ইহার জীবন ও যৌবনকে সে নষ্ট করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ করিতেও কসুর করে নাই। দিয়া গিয়াছে—বিত্ত ও বিদ্যা। হয়তো সরোজিনী প্রতিদিন গভীর রাত্রে নিঃসঙ্গ শয্যায় ছটফট করিতে করিতে, নিজের ব্যর্থ ও বঞ্চিত নারীত্বের জন্য ক্ষোভে ও দুঃখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে; কিন্তু বাংলা দেশের শত-করা নব্বইজন বিধবার মত সাধু ও স্বাধীন ভাবে জীবনযাত্রার পাথেয়ের জন্য তাহাকে কোন দিন ভাবিয়া দিশাহারা হইতে হইবে না।

সরোজিনী স্বাভাবিক কোমল কণ্ঠ কোমলতর করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল, আমার কোন সাধ মেটাতে উনি কোন দিন কসুর করেন নি। তা ছাড়া কত দিয়ে গেছেন। এখানের এই ছোট জমিদারি শুধু নয়, ওখানেও অনেক সম্পত্তি, চারখানা বাড়ি—যেখানে থাকতাম সেখানে দুখানা, কাশীতে একখানা, এলাহাবাদে একখানা। তা ছাড়া, ব্যাঙ্কে আমার নামে অনেক টাকা। যেখানে থাকতাম, সেখানে ওঁর কত বন্ধুবান্ধব, কত গুরুভাই; বিপদের সময়ে কত সাহায্য করেছেন তাঁরা; আমাকে আসতেও দিতে চান নি। তবু কারও কথা না শুনে আমি চ'লে এলাম। ভাবলাম, পাড়াগাঁ হোক, নিজের দেশ, নিজের আত্মীয়-স্বজন সব এখানে রয়েছে; এরা যত স্নেহ-দরদ করবে, তা কি বিদেশের বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কখনও পাব? কিন্তু এসে দেখলাম, কোথায় স্নেহ, কোথায় সহানুভূতি! সবাই অনাথা অবলা দেখে ভুলিয়ে নিতে চায়। সত্যি বলছি দাদা, যদি

আপনারা আমাকে 'আপনার জন' ক'রে নিতেন, তা হ'লে আমার যা কিছু আছে, সব দিয়ে আমি এই গাঁয়ের চেহারা বদলে দিতাম। (তিনুর মুখেও এই কথা শুনিয়াছিলাম।) আপনাদের স্কুলের উন্নতি ক'রে দিতাম, মেয়েদের জন্যে স্কুল করতাম, হাসপাতাল করতাম, রাস্তাঘাট মেরামত করিয়ে দিতাম, এই সব আমি একদিন কল্পনাও করেছিলাম। কিন্তু এমনই সব ক'রে তুলেছে, একদণ্ডও তিষ্ঠুতে ইচ্ছে করছে না।

বক্তৃতায় বাধা দিয়া কহিলাম, এতে তুমি অস্থির হয়ে উঠো না। এটা আমাদের পাড়াগাঁয়ের নিয়ম; কেউ নতুন এলে তাকে প্রথমে সহ্য করতে পারে না; তাকে ঘা মেরে মেরে ঘাতসহ ক'রে নিয়ে তারপর নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। এ বিষয়ে দিশী কুকুরদের সঙ্গে আমাদের অনেকটা মিল আছে।

তিনু আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে কহিল, ঠিক তাই। আপনি কিছু ঘাবড়াবেন না। আমার টর্চ-লাইট-সমিতি (তিনুর দলের নাম) যখন আপনার পেছনে দাঁড়িয়েছে, তখন কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে আসবে না। এলে তাকে দন্তহীন কিংবা নাসিকাহীন হতে হবে। আপনি মনের সাধে আপনার কল্পনাকে কাজে ফুটিয়ে তুলুন আমাদের কর্ম্মশক্তির ভেতর দিয়ে।

সরোজিনী চুপ করিয়া রহিল। আমি কহিলাম, লাইব্রেরির সম্বন্ধে তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দোব।

তিনু কহিল, আর উদ্বোধনটা সম্বন্ধে—

তারও ব্যবস্থা হবে। এস. ডি. ও. সাহেব তো আমাদের স্কুলের প্রেসিডেন্ট, আমার সঙ্গে আলাপ আছে। তাঁকে অনুরোধ করলেই আসতে রাজি হবেন বোধ হয়।

সরোজিনী কহিল, সেদিনও বলেছি, আজও বলছি, আপনি যদি

আমার মুখের দিকে একটু তাকান দাদা, তা হ'লে হয়তো আমি এখানে টিকে থাকতে পারব। ·

কহিলাম, আমি তো তোমার কথা ভাবি দিদি। আমার স্নেহ-সূচক কথা শুনিয়া আজও সরোজিনীর চক্ষে জল আসিল; অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আর ভাবেন! এখান থেকে পা বাড়ালেই ভুলে যাবেন আমার কথা। আমার যে কি ক'রে দিন কাটছে!—বলিয়া সরোজিনী চক্ষে অঞ্চল দিতেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। একবার ইচ্ছা হইল, সরোজিনীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া বলি, বোন! আমি স্কুল-মাস্টার; আমার ব্যাঙ্কে টাকা নাই, দেহে শক্তি নাই, সমাজে প্রতিপত্তি ও পদ-মর্য্যাদা নাই, তবু আমি তোমার সম্মুখে রহিলাম। আঘাতের বদলে আঘাত করিতে পারিব না বটে, তবু আঘাত হইতে তোমাকে যথাসাধ্য আড়াল করিয়া রাখিব।—কিন্তু ইচ্ছা দমন করিলাম। কারণ তিনু এখনই প্যাটপ্যাট করিয়া তাকাইয়া আছে; তাহার উপর এই কাণ্ড করিলে, ইহার কদর্থ করিবে, মারমুখী হইয়াও উঠিতে পারে। তা ছাড়া সরোজিনীও এই স্নেহোচ্ছ্বাসের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া হয়তো হকচকাইয়া যাইবে, কারণ চল্লিশ পার হইলেও একজন নিঃসম্পর্কীয়া চব্বিশ বৎসর বয়সের যুবতীকে পাতানো ভাই-বোন সম্পর্কের জোরে বুকে টানিবার বয়স এখনও আমার হয় নাই।

সরোজিনী মুখ হইতে অঞ্চল সরাইতেই দেখিলাম, দুই চোখের কোল হইতে দুইটি অশ্রুধারা ইহার মধ্যেই বহাইতে পারিয়াছে। এ সম্বন্ধে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ক্ষমতা অনেক বেশি। এক ফোঁটা অশ্রু বাহির করিবার জন্য পুরুষদের মাথা ঠুকিতে হয়, কিন্তু মেয়েরা ইচ্ছা করিলেই অবলীলাক্রমে চোখের কোলে বন্যা বহাইয়া দিতে পারে। রমণী-নয়নের অশ্রু তিনুর পৌরুষকে খোঁচা দিয়া চাগাইয়া তুলিল বোধ

হয়, সে লাফাইয়া উঠিয়া সরোজিনীর চোখের দিকে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, আপনি সত্যি কাঁদছেন! দাদা নাই বা থাকল, ভাই তো আছে। আমি তো বলেছি আপনাকে, আমি আপনার ছোট ভাই, তা ছাড়া—ডান হাতের আঙুল গনিতে গনিতে কহিল, প্যানা, ভোঁদা, গদা, হিকে, ডিকে—

হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফুন্টি কহিল, পিসীমা! দিদিমার খাবার সময় হ'ল।

দিদিমা অর্থাৎ সরোজিনীর শাশুড়ী। সরোজিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, হ্যাঁ মা। যাই চল। তিনু প্রসারিত দক্ষিণ করতলের অঙ্গুলির উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কহিলাম, রাত হয়েছে, চল হে তিনু, বাড়ি যাই।

বাড়ি যাইতে যাইতে তিনু কহিল, এখানে আবার ফিরতে হবে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, কেন?

রাত্রে পাহারা দিচ্ছি যে আমরা পালা ক'রে, গাঁয়ের লোককে তো বিশ্বাস নেই, হয়তো ডাকাতি করিয়ে দেবে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তা ছাড়া একটা কুস্তির আখড়া করেছি আমরা। ঐ যে পেছনের জায়গাটা প'ড়ে আছে, ওটা তো ওঁদের জায়গা, ঐখানটায়। উনি সেদিন বলছিলেন, এ গাঁয়ের ছেলেরা বয়সেই যুবক, শক্তিতে নয়; সব যেন ধুঁকছে; বাইরে থেকে ডাকাতের দল এসে গাঁয়ের কারও বাড়িতে হানা দিলে, তাদের ঠেকাবার ক্ষমতা কারও নেই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এমন চমৎকার আইডিয়া ওঁর, তা ছাড়া দিলও তেমনই। আখড়ার সমস্ত খরচ উনি দেবেন বলেছেন।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

ক্ষণ-শাশ্বতী

তুমি মহারাণী আঘাত করিলে রুদ্ধ ঘরেতে মম
খুলে গেল সব দ্বার—
প্রবেশিল ঘরে তরল উজল জ্যোৎস্না সে নিরুপম
কাটিল অন্ধকার।
তিমির-পিপাসী হৃদয় আমার,
চোখে ধাঁধা আনে আলোক-বিথার—
পীড়িত নয়ন মেলিয়া তোমার
চাহিনু মুখের পানে,
মনে হ'ল যেন দেখেছি কোথায়
কে জানে সে কোন্ খানে!

মোর পানে তুমি বাড়াইলে হাত মুখে অতি মৃদু হাসি
অচেনা হ'ল না মনে,
কোন্ যৌবনে কোন্ বন্যায় গিয়েছিনু দোঁহে ভাসি
শেষে এনু গৃহ-কোণে।
স্রোতের ধারায় নৃত্যের তালে
তুমি ভেসে গেলে সে কোন্ সকালে,
কোন্ ফুলবনে কোন্ আলবালে
সেচন করিলে বারি—
এলে এতদিনে তুমিই কি সেই
সে কথা বুঝিতে নারি।

ভাবি কাজ নাই, মনে জাগে ভয় চরণের শ্লথ গতি,
এ আঁধার ভাল লাগে;
তুমি যদি সেই ক্ষণিকা আমার ত্রস্ত চপলমতি,
ডাকিতেছ অনুরাগে?

আমি কি পারিব এতদিন পরে
দখিন পবনে বরিতে আদরে,
পারিব খেলিতে মরু-বালুচরে
মরীচিকা-ধরা খেলা ?
চির-চেনা তবু হে অপরিচিতা,
এলে যে স্তিমিত বেলা।

তুমি কি আমার মনের শঙ্কা করেছিলে অনুভব
মনের সে দ্বিধা মোর ?
কহিলে না কথা হে চপলা, তুমি করিলে না কলরব ;
মুগ্ধের মোহ-ডোর
দিলে না ছিঁড়িয়া কঠিন আঘাতে—
শান্ত স্নিগ্ধ দুটি আঁখিপাতে
জ্যোৎস্না-ধবল যামিনী-শোভাতে
বন্দীরে দিলে ডাক—
মনে হ'ল সব প্রয়োজনহীন,
পিছেই পড়িয়া থাক।

তুমি ছুটে গেলে আলেয়ার মত আমি ছুটি দিশাহারা
শিখা তব অনুসরি—
পিছন কখন লেপে মুছে গেল গাঢ় কুয়াশার পারা
দূর প্রান্তর 'পরি।
দীপ্তি তোমার সব দিবে ঢাকি,
আমি পতঙ্গ কাছাকাছি থাকি
পাখা পুড়ে যাবে একদিন তা কি
জানি না ভাবিছ মনে ?
জানি তবু হায় ছুটিয়া চলেছি
বিফল অন্বেষণে !

জানি মহারাণী তব মনখানি তুমি দিবে নাকো ধরা
এ চলার নাহি শেষ,

আজ মনে হয় ম্লান ছায়াময় আমার বসুন্ধরা,
আমি তো ছিলাম বেশ !
ইঙ্গিতে ডাকি আনিলে বাহিরে
চাহি না দেখিতে পশ্চাতে ফিরে
সমুখে আমায় নিয়ে চল ধীরে
নূতন আলোর দেশে—
বাঁধিতে দিও না গৃহ-কোণ মোরে
পথে পুন ভালবেসে।

জানি একদিন তোমার ইশারা হারাব পথের মাঝে
থামিবে আমার চলা,
তুমি কি আবার দেখা দিবে মোরে নবতন কোন সাজে
পাতিয়া নূতন ছলা ?
গৃহসুখলোভী ভীরুরে আবার
করিবে বাহির ভাঙি গৃহদ্বার,
এমনি ঘটিবে কত বার বার
কে দিবে বলিয়া মোরে—
আলেয়া-বিলাস ভাল নাহি লাগে
বাঁধহ কঠিন ডোরে।

তুমি একবার দাও ধরা দাও বসহ সিংহাসনে
ক্ষণ হও শাশ্বতী,
এক হয়ে যাক নিকট সুদূর তুমি এসে গৃহ-কোণে
জ্বালাও সন্ধ্যারতি।
ঘরে ও বাহিরে দ্বন্দ্ব ঘুচাও
তপ্ত পথের ক্লান্তি মুছাও
ইশারা ছাড়িয়া একবার চাও
আয়ত নয়ন মেলে—
শাশ্বতীরূপে এস চঞ্চলা,
শান্ত চরণ ফেলে।

পিতা-পুত্র

তৃতীয় দৃশ্য

কঙ্কণায় সুটুর আশ্রম। পূর্ব্ব দৃশ্য। (প্রথম অঙ্কের অনুরূপ)

আট-দশটি ছেলে-মেয়ে সারিবন্দী দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছিল

গান

বল বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান হবে কর্ম্মে মহান হবে
নব দিনমণি উদিবে আবার—

গানের মধ্যেই কমলাপদ প্রবেশ করিল

কল্যাণী। (ছেলে-মেয়েদের প্রতি) তোমরা যাও, আপনার আপনার জায়গায় গিয়ে পড়তে ব'স।

ছেলে-মেয়েদের প্রস্থান

কমল। (চিন্তা করিয়া) তুমি দেখছি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার কিন্তু এ ভাল মনে হচ্ছে না বোন। যাক—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, তোমাকে রক্ষা করুন, এই কামনাই তাঁর কাছে জানাচ্ছি। তবে অনুরোধ রইল, কিছুমাত্র অসুবিধে হ'লে পত্র লিখে আমায় জানাতে দ্বিধা ক'রো না। আমি যেখানেই থাকব, সংবাদ নেব তোমার।

কল্যাণী। কোথায় যাবেন কমলদা? এখান থেকে চ'লে যাবেন আপনি?

কমল। আমার ট্রান্সফারের হুকুম হয়েছে বোন। আমি দুটো কথা বলবার জন্যে এসেছি। একটা সুটুর কথা। একটা আমার নিজের।

কল্যাণী। বলুন।

কমল। হুটুর কথাই আগে বলি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এড বন্ধ করছে : সে এড আর পাওয়া যাবে ব'লে মনে হচ্ছে না।

কল্যাণী। বন্ধ করলে তার ওপর আর জোর কি বলুন ?

কমল। হুটু অবশ্য খুব লড়ছে। খবরের কাগজেও সে লিখেছে। কিন্তু ফল হবে ব'লে আমার মনে হয় না। বাবুরা যখন ফ্রী প্রাইমারি স্কুল করেছেন, তখন এ স্কুলের জন্যে এড ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড দেবে না।

কল্যাণী। না দেয়, সে কষ্ট আমি স্বীকার ক'রে নেব কমলাপদদা।

কমল। কষ্ট-স্বীকারের একটা মাত্রা আছে কল্যাণী। এই আট-দশটি ছেলে, মাইনে বোধ হয় চার আনা হিসেবে দু টাকা আড়াই টাকা। হুটু দেয় পনরো টাকা। কিন্তু পাঠশালার খরচও আছে। বাদ দিয়ে যা থাকে, তাতে তোমার মমতার চলা অসম্ভব।

কল্যাণী। বাগানে তরি-তরকারি হয়, দুটি গরু পুষেছি—দুধও ঘরে হয়, চাষীদের ছেলে-মেয়েদের জামা তৈরি ক'রে দিই—তাতেও কিছু হয়। চ'লে কোন রকমে যাবেই কমলাপদদা।

কমল। চ'লে যাবে। কিন্তু এ ভাবে চলা উচিত নয় কল্যাণী। এ কৃচ্ছ্রসাধনের তোমার প্রয়োজন কি ? হুটু নিজেও এ চায় না। সে যখন বলছে পাঠশালা তুলে দিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে থাকতে, তখন এ কষ্ট কেন ?

কল্যাণী। না, সে হয় না কমলদা।

কমল। হুটুর স্ত্রী অত্যন্ত মুখরা, সন্দিগ্ধচিত্ত। হুটু সে কথা আমায় গোপন করে নি।

কল্যাণী। না। ও কথা বলবেন না। তিনি আমায় সহোদরার মত স্নেহ করেন। কিন্তু আপনি যা বলছেন সে অসম্ভব।

কমল। বেশ। ভিন্ন বাসা ক'রে তুমি থাক। স্থটুর বাসার কাছেই বাড়ি খালি রয়েছে।

কল্যাণী। না, সেও হয় না কমলদা।

কমল। কেন? একটু স্পষ্ট ক'রে বল কল্যাণী।

কল্যাণী। স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে কমলদা?

কমল। বুঝে যে উঠতে পারছি না বোন।

কল্যাণী। এ সংসারে ভগবান আমাকে স্নেহ, মমতা, আশ্রয় সমস্ত কিছুর কাঙাল করেছেন। সে কাঙালপনা আমি স্বীকার ক'রে নিয়েছি। কিন্তু এক জায়গায় তাঁর বিধানকে আমি মানতে পারি নি কমলদা, সে আমি মানতে পারব না। অর্থ-সাহায্য; না কমলদা, সে আমি পারব না। আমার পিতৃকুলের, আমার স্বামী-কুলের সমস্ত মর্য্যাদাই আমার ভেসে গেছে, বহু কষ্টে অবশেষে রেখেছি ওইটুকু, ওটুকুও যদি চ'লে যায়, তবে আমার কি থাকবে কমলদা?

কমল। তোমার সে মর্য্যাদা অটুট থাক বোন, ও কথা তোমায় আর বলব না। কিন্তু তোমার তো গয়না রয়েছে, তাই থেকে—

কল্যাণী। সে গয়না মমতার বিয়ের জন্যে রেখেছি, ওইটুকুই তার পিতৃধন, ওতে কি আমি হাত দিতে পারি কমলদা?

কমল। স্থটু কখনও তার ছেলের বিয়েতে গহনা দাবি করতে পারে না।

কল্যাণী। আমার মেয়েও যে শুধু হাতে স্বামীর ঘরে যেতে পারে না কমলদা।

সুশোভন। জরুর। উস্‌মে চুক না হৈ। অধীন তোমার ছোড়দাই বটেন। বাঃ, সাদা থান-কাপড়ে তোকে বড় ভাল মানিয়েছে রে! চমৎকার! খান্‌দানী বেহাগ!

কল্যাণী কমলাপদ এই মন্তব্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহাভারত অবাক হইয়া গেল

কি ব্যাপার? অন্যায় বললাম নাকি কিছু? না না, I did not mean anything wrong—

কমল। ব'স সুশোভন, ব'স। ও কথা যেতে দাও।

কল্যাণী ঘর হইতে একটা মোড়া আনিয়া দিল, সুশোভন বসিল

কল্যাণী। তোমার এ কি শরীর হয়েছে ছোড়দা? দেহে যে আর কিছু নেই।

সুশোভন। বাত, হাঁপানি, যকৃতানন্দ—মানে লিভারের দোষ, তা ছাড়া অনেক কিছু। সেবা-শুশ্রূষা করতে হ'লে ক্রমেই জানতে পারবি। এখন একটু চা খাওয়া দেখি।

কল্যাণী। মহাভারত, দোকান থেকে একটা ছোট টিন চা এনে দাও তো। এস, পয়সা নিয়ে যাও।

সুশোভন। Lipton yellow brand কিংবা Brooke-Bond green label, বাজে কিছু আনিস না যেন।

কল্যাণী ও মহাভারতের ভিতরে প্রস্থান

সুশোভন। কমলাপদদা, Don't mind, please, একটা information দাও দেখি।

কমল। বল?

সুশো। Vodka shop কোথায় বল তো?

কমল। কি? কি shop?

সুশো। Vodka shop—not Russian of course, Indian Vodka—ধেনো, ধেনো; ধেনো-মদের দোকান কোথায় বল তো? ওটা না হ'লে তো আমি বাঁচব না।

কমল। তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে সুশোভন?

সুশো। পতন চিরকাল অধোলোকেই হয় কমলদা। উর্দ্ধলোকে কেউ কখনও পড়ে না। হ্যাঁ, আছাড় আমি বড্ড বেশি খাই। তবে ভরসার কথা, আছাড় খেয়ে খেয়ে পতন-প্রুফ হয়ে গেছি এখন। লক্ষ্ণৌতে এক বাইজীর বাড়ির দোতলার ছাদ থেকে একতলার বারান্দায় পড়েছিলাম। তাতেও কাবু হই নি। এখন আমার কথার উত্তর দাও দেখি?

কমল। শোন সুশোভন, You must leave the place at once। তুমি এখানে থাকলে কল্যাণীরও এখানে থাকা চলবে না। হুটু কখনও এ সহ্য করবে না। তোমার অর্থ আছে—

সুশো। খট খট লবডঙ্কা। all gone কমলদা, all gone—চিচিং ফাঁক।

কমল। বল কি?

সুশো। নইলে খুঁজে খুঁজে এই অজ-পাড়াগাঁয়ে আসব কেন বল? দাদার ওখানে গিছলাম, দাদা তাড়িয়ে দিলে।

কল্যাণীর মুড়ি চা লইয়া প্রবেশ

কল্যাণী। খাও ছোড়দা।

সুশো। আরে বাপরে! এ যে মুড়ি! মুড়ি তো আমি খেতে পারি না কল্যাণী। ওটা থাক, আমি শুধু চা খাই। (চায়ে চুমুক দিয়া) আঃ, তারপর শোন কল্যাণী, আমি তোর কাছে থাকব ব'লে এসেছি। আমার এই রুগ্ন শরীর, বেশি দিন বাঁচব না।

কল্যাণী। ও কথা ব'লো না ছোড়দা। আমি তোমাকে সেবা ক'রে ভাল ক'রে তুলব।

সুশো। আমার কিন্তু টাকা-কড়ি সব ফুরিয়ে গেছে। তা ছাড়া

আমি মদ খাই। অবিশ্যি খরচ বেশি নয়, আনা দুয়েকের ধেনো। ধেনোতেই চ'লে যাবে আমার।

কল্যাণী। তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই, তোমাকে কি আমি ফেলতে পারি ছোড়দা?

স্থশো। কমলদা বলছে, এটা স্থটুদার বাড়ি। স্থটুদা নাকি আমার জন্যে তোকে সুদ্ধু তাড়িয়ে দেবে?

কল্যাণী। না না। স্থটুদা কি কখনও এমন হৃদয়হীন হতে পারেন? না না।

কমল। স্থটুর আদর্শ সকলের ওপরে কল্যাণী।

কল্যাণী। আমার আদর্শও যে আমার কাছে সকলের ওপরে কমলদা, ছোড়দা আমার রুগ্ন ভাই, আমি বোন।

স্থশো। কিছু ভয় করিস নি কল্যাণী, স্থটুদা এককালে তোকে ভালবাসত—

কল্যাণী সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলিয়া গেল। কমলাপদও অন্য দিকে চলিয়া গেল

যাঃ বাবা! কি হ'ল? দুজনেই চ'লে গেল যে! কল্যাণী, ওরে অ কল্যাণী!

লাঠি ধরিয়া অগ্রসর হইল

চতুর্থ দৃশ্য

স্থটুর শহরের বাসা

স্থটু বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত আইনের বই পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে নোট করিতেছে। কমলাপদও বসিয়া আছে

কমলা। আজই তো অ্যাপীল-কেসের রায় বেরুবে? আর্‌গুমেণ্ট কেমন হ'ল? কি রকম বুঝছ?

হুট। (বই রাখিয়া) আর্গুমেণ্ট কাল শেষ হয় নি, তবে (একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) জান কমলাপদ, সংসারে মানুষকে ছোট ভাবার তুল্য অন্যায় আর হয় না। সুপিরিয়রিটি কম্প্লেক্স তারই সাজে, যে সত্যকার সুপিরিয়র ; উকিলবাবুটি গলাবাজি করতে পারেন ভালই, কিন্তু শূন্যগর্ভ কুম্ভের মত। আমি পরিশ্রম ক'রে পয়েণ্ট্স সংগ্রহ ক'রে চোখের সামনে ধরছি, কিন্তু তিনি তা নেবেন না। কারণ আমি মোক্তার, তিনি উকিল।

কমল। সবই তোমার ভুলের মাসুল বন্ধু। ভুল তো তোমার একটা নয় ; প্রিলিমিনারি ইণ্টার্মিডিয়েট দিয়েও ল ফাইনালটা দিলে না, মোক্তারি পরীক্ষা দিলে। একটা ভুলের জন্যে—

হুট। ও কথা বাদ দাও কমল। (হাসিল)

কমল। একটু সকাল সকাল ফিরতে চেষ্টা ক'রো আজ। সন্ধ্যের ট্রেনেই রওনা হব।

সুশোভনের প্রবেশ, মুখে সিগারেট

হুট। তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু ছিলে, তুমিও চ'লে যাচ্ছ!

সু। From harmony—from heavenly harmony this frame of universe began। গুড মর্নিং হুটুদা। আরে, কমলাপদদা যে! গুড মর্নিং।

হুট। এস, কেমন আছ ?

সু। ভাল, অনেক ভাল। কল্যাণী is worthy of her name ; খাড়া ক'রে তুলেছে আমাকে। (পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া কমলাপদর সামনে ধরিল) আসুন কমলদা।

কমল। নো থ্যাঙ্ক্স। আমি ও ছেড়ে দিয়েছি সুশোভন।

সু। ছেড়ে দিয়েছেন ? বলেন কি ? আরে, আমি যে প্রথম প্রথম আপনার পকেট থেকেই চুরি ক'রে সিগারেট খেতে শিখেছিলাম।

কমল। শিষ্যবিদ্যা চিরকাল গরীয়সী সুশোভন।

সু। আপনি যে ভয়ানক সিগারেট খেতেন! মাসে ২০৷২৫ টাকার কম তো নয়। ফার্স্ট ক্লাস ভার্জিনিয়া স্টাফ, আমার অবশ্য এক পয়সায় দশটা। তা হ'লে আপনি তো অনেক টাকা জমিয়েছেন কমলদা।

কমল। (হাসিয়া) তুমি পাগল সুশোভন।

সু। কেন?

কমল। সিগারেট ছাড়লেই টাকা জমানো যায়?

সু। যায় না? জমাতে পারেন নি আপনি?

কমল। (হাসিয়া) না।

সু। তবে আসুন, ফের শুরু করুন। টাকাই যখন জমল না, তখন ছাড়বেন কেন?

কমল। না। হুটুর কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

হুট। সুশোভন, এইবার তুমিও ওগুলো ছাড়—সিগারেট মদ।

সু। (বিলাতী ধরনে শ্রাগ করিয়া) ওরে বাবা, বাঁচব কি খেয়ে হুটুদা? I hope you are joking।

হুট। না সুশোভন, কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে তোমার মায়া হয় না?

সু। হয় না, তা বলতে পারি না। তবে তুমি মায়া করছ, কমলদা মায়া করছেন, আবার আমি কেন?

কমল। আমি উঠলাম হুটু। ওবেলায় একটু সকালে সকালে ফিরো।

সু। কমলদা, আমি তোমার ওখানে যেতাম। পাঁচটা টাকা আমাকে ধার দাও। অবশ্য payable when able; I mean when I shall be able।

কমল। আজই আমি ট্রান্সফার হয়ে চ'লে যাচ্ছি সুশোভন।

প্রস্থান

সু। মাইরি বলছি, মনি অর্ডার ক'রে আমি পাঠিয়ে দেব—মাইরি বলছি কমলদা।

সুট। টাকা নিয়ে তুমি কি করবে ?

সু। একটা বিউটিফুল ফিল্ম এসেছে। মিউজিক, কেবল মিউজিক—মরিস শিভালিয়ের গান গেয়েছ। (ইংরেজী গানের সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিল)

সুট। সুশোভন !

সু। কমলদা চ'লে যাচ্ছে, I must catch him—কমলদা !

অল্প খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান

সুট। স্কাউণ্ড্রেল। কি বলব, কল্যাণী দুঃখ পাবে।

বিমলার প্রবেশ

এস। (সঙ্গে সঙ্গে হাত-বাক্স খুলিয়া একটা টাকা বাহির করিয়া) এই নাও।

বিমলা। (পিছাইয়া গিয়া) কি ?

সুট। টাকা। খরচের টাকা।

বিমলা। (অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অথচ করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া) উঃ ! খুব চাঁদির জুতোটা তুমি আমায় মারছ যা হোক।

সুট। আমায় মার্জ্জনা কর বিমলা, আজ মহাভারতের অ্যাপীল-কেসের শেষ হিয়ারিং—

বিমলা কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল

শোন, কি বলছ সংক্ষেপে বল।

বিমলা। বলছি—না, থাক।

সুট। বিমলা, কি বলছ ব'লে যাও।

বিমলা। দুটো কথা। একটা জিজ্ঞাসা করব, একটা অনুরোধ করব।

মুট। বল।

বিমলা। আমার অরুণ যদি সুশোভন হ'ত, তবে কি তাকে তুমি সহ্য করতে ?

মুট। এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। তোমার দ্বিতীয় কথা কি—তোমার অনুরোধ ?

বিমলা। সেকালের সেই দুঃখকষ্টভরা জীবন আমায় ফিরিয়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি; তোমার উপার্জ্জন আমি চাই না। ওগো, এর চেয়ে যে সেকালে আমার অনেক শান্তি ছিল।

মুট। বাড়ির ভেতর যাও বিমলা; জীবনে সমাপ্তি আছে—থামা চলে, কিন্তু পেছনে ফিরে যাওয়া যায় না।

বিমলা। যদি না যায় তবে আমায় মুক্তি দাও, এমন ক'রে টেনে হিঁচড়ে আমায় নিয়ে যেও না। আমি আর পারছি না।

প্রস্থান

মুটু নীরবে কয়েক বার পায়চারি করিয়া আবার বই লইয়া বসিল। আবার উঠিয়া আর একখানা বই বাহির করিল। কয়েকটা নোট করিল। সে নোট করিতেছে, এমন সময় মুটুর পিছনের দিকে প্রবেশ করিল কল্যাণী। তাহার হাতে একখানা বই

মুট। আবার যখন এসেছ বিমলা, তখন তোমার সকল জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর শুনে যাও।

কল্যাণী এদিক ওদিক চাহিয়া বিমলাকে খুঁজিল

হ্যাঁ। কল্যাণীকে আমি ভালবাসি, কিন্তু—

কল্যাণীর হাত হইতে বইখানা সশব্দে পড়িয়া গেল। মুটু সেই শব্দে ফিরিয়া চাহিয়া কল্যাণীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বইখানা কুড়াইয়া লইয়া কল্যাণী ধীরে ধীরে কাছে আসিল, এবং বইখানি ও একটি ফাউণ্টেন পেন টেবিলের উপর নামাইয়া দিল

কল্যাণী। ছোড়দা এগুলো—বোধ হয় চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন।

মুটু চুপ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল

কল্যাণী। আমায় মাফ করুন মুটুদা।

হুট। মাফ? না না, মাফ চাইবার কোন প্রয়োজন তো নেই কল্যাণী।

কল্যাণী। এ লজ্জা রাখবার যে আমার জায়গা নেই হুটুদা।

হুট। লজ্জা তোমার একার নয় কল্যাণী, লজ্জা যে আমারও; সুশোভন তো শুধু তোমার ভাই নয়, সে আমার ছাত্র, আমি তার মাস্টার। (বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল) আর কিছু বলবে?

কল্যাণী। আমি বিদায় চাইছি দাদা, আমায় আপনি—। (ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল)

হুট। কেন কল্যাণী?

কল্যাণী। না।

প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল

হুট। দাঁড়াও কল্যাণী। বিমলা মনে ক'রে যে কথাটা বলেছিলাম, তার অর্দ্ধেকটা তুমি শুনেছ, বাকিটা শুনে যাও। আমি তোমায় ভালবাসি, সহোদরা ভগ্নীর মতই ভালবাসি। তাই তোমায় আমি বিদায় দিতে পারি না। আমার বাবা বলতেন, ব্রাহ্মণের ভগ্নী উপবীতের চেয়েও বড়—উপবীত থাকে গলায়, ভগ্নীর স্থান মাথায়।

কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

যদি কোন দিন মাটিতে প'ড়ে আঘাত পাও, গায়ে তোমার ধূলোর মালিন্য লাগে, তবে সেদিন জেনো, হুটুদা তোমার আদর্শচ্যুত হয়েছে, সে মরেছে।

ঠং করিয়া ঘড়িতে একটা শব্দ বাজিল

হুট। (ঘড়ি দেখিয়া) উঃ, এ যে সাড়ে এগারোটা! (উঠিল) ফার্স্ট আওয়ারেই যে রায় বেরুবে।

বিমলার প্রবেশ, সে এখন শান্ত

বিমলা। সাড়ে এগারোটা যে বেজে গেল। খাবার হয়েছে, স্নান কর।

মুট। ফিরে আসি, কোর্ট থেকে আগে ফিরে আসি বিমলা, রায় বোধ হয় এতক্ষণ বেরিয়ে গেল। মহাভারত! মহাভারত কোথায়?

বিমলা। সে তো পাগলের মত হয়ে রয়েছে, অনেকক্ষণ আগেই সে বেরিয়ে গেছে।

মুট। বেরিয়ে গেছে?

বিমলা। ভয় নেই, অরুণ তার সঙ্গে গেছে।

মুট। আমি চললাম বিমলা।

ত্রস্তভাবে প্রস্থান

বিমলা। এস ভাই ঠাকুরঝি, একটু জল মুখে দেবে এস।

কল্যাণী। দাদা ফিরে আসুন বউদি—এই তো কোর্ট, তিন মিনিটের পথ।

বিমলা। তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকবার জন্যে তো আমাকে এনেছ ভাই, আবার তুমি কেন কষ্ট করবে; এস, খাবে এস।

কল্যাণীর হাত ধরিয়া ভিতরে যাইতে উদ্যত হইল, এমন সময় বাহিরে ঢাক ও শিঙা বাজিয়া উঠিল। উভয়েই থমকিয়া দাঁড়াইল

বিমলা। এ কি! ঢাক কিসের? এই যে অরুণ। অরুণ!

অরুণ ও মহাভারতের প্রবেশ; মহাভারত উদ্‌ভ্রান্তের মত

অরুণ। মামলায় আমাদের হার হয়েছে মা।

মহাভারত। তাই গোপী মিত্তির ঢাক শিঙে বাজাচ্ছে মা।

বিমলা। ঢাক শিঙে বাজাচ্ছে!

মহাভারত। (চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া) একগাছা লাঠি—একটা দা—ঘরে কি তোমাদের কিছুই নাই খুড়োঠাকুর?

অরুণ। (মহাভারতকে ধরিয়া) না। ছি, মহাভারতকাকা!

বিমলা। কল্যাণী ঠাকুরঝি, তুমি ভাই মহাভারতকে ভেতরে নিয়ে যাও।

কল্যাণী। (মহাভারতের হাত ধরিয়া) এস মহাভারত, এস ভাই, ভেতরে এস।

মহা। ঢাক বাজাচ্ছে দিদিঠাকরুণ—

কল্যাণী। বাজাক এস, ভেতরে এস।

উভয়ের প্রস্থান

বিমলা। এইবার তুই যা অরুণ, ওদের বারণ ক'রে আয়।

অরুণ। বারণ করলেও শুনবে না মা।

বিমলা। ঢাক বাজাচ্ছে, শিঙে বাজাচ্ছে, ধেই ধেই ক'রে নাচছে। বারণ করলে শুনবে না ব'লে তুই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবি?

অরুণ। ওতে আমাদের অপমান হয় নি মা। নিজেদের অপমান ওরা নিজেরা ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করছে, জানিয়ে দিচ্ছে—ওরা কত বড় অত্যাচারী।

বিমলা। তোর দেহে কি রক্ত নেই অরুণ?

অরুণ। অন্যায়ের প্রতিরোধ অন্যায় দিয়ে করা যায় না মা।

বিমলা। খুব শিক্ষা পেয়েছিস যা হোক বাপের কাছে! কথায় কথায় কবিতা আওড়াবি, ইংরিজী আওড়াবি, আর পাথরের মত সহ্য করবি। আচ্ছা। (নিজেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উঁচু গলায় বলিল) কারা ঢাক বাজাচ্ছ তোমরা? কারা? শোন। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে—

গোপী মিত্রের প্রবেশ

গোপী। আজ্ঞে মা, প্রণাম।

ব্যঙ্গভরা ভক্তিতে হেঁট হইয়া নমস্কার করিল

বিমলা। তুমি গোপী মিত্তির?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ মা, বিবেচনা করুন, আপনাদের চরণের দাস।

বিমলা। এমন ক'রে আমার বাসার সামনে ঢাক বাজাচ্ছ কেন?

গোপী। আজ্ঞে মা, মামলায় আমরা জিতেছি কিনা, তাই বিবেচনা করুন, ঢাক শিঙে বাজিয়ে আপনাদের প্রণাম করতে এসেছি। বিবেচনা করুন, আপনারা হলেন কঙ্কণার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের বংশ, আপনাদের প্রণাম ক'রে আশীর্ব্বাদ না নিলে চলে?

বিমলা। আশীর্ব্বাদ?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ মা, বিবেচনা করুন, আশীর্ব্বাদ—

বিমলা। আশীর্ব্বাদ নিতে পারবে?

গোপী। দেখুন দেখি। বিবেচনা করুন, সেইজন্যেই তো এসেছি মা।

বিমলা। রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের শেষ দিনে ব্রাহ্মণে আশীর্ব্বাদ ক'রে রাজাকে ফল দিয়েছিল। সেই ফল থেকে বেরিয়েছিল তক্ষক সাপ। আমার আশীর্ব্বাদ থেকে যদি তেমনই তক্ষক সাপ বের হয় গোপী মিত্তির, তবে সে আশীর্ব্বাদ নিতে পারবে? মাথায় ক'রে নিয়ে যেতে পারবে তোমার বাবুর কাছে?

গোপী। (ভয়ে বিবর্ণ হইয়া) আজ্ঞে মা, বিবেচনা করুন; ওরে—ওরে —ওরে, থাম রে—ওরে—

দ্রুত প্রস্থান; সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে বাজনা থামিয়া গেল, পিছন হইতে একটা দা হাতে মহাভারতের প্রবেশ

বিমলা। এ কি, দা হাতে কোথায় যাবে মহাভারত?

মহা। আসছি মা, আসছি।

বিপরীত দিক হইতে স্নুটুর প্রবেশ

স্নুট। এ কি মহাভারত?

মহাভারতকে ধরিয়া ফেলিল

মহা। ছাড় দাদাঠাকুর, ছাড়। ছেড়ে দাও। ওই বেটা গোপে মিত্তিরকে আমি খুন করব। ছাড়।

নুট। ছি মহাভারত!

মহা। তুমি শোন নাই দাদাঠাকুর, ওরা ঢাক বাজাচ্ছিল, শিঙে বাজাচ্ছিল—

নুট। ডাকাতে মশাল রোশনাই ক'রে ডাকাতি করে, মানুষ অসহায় জীবকে বাজনা বাজিয়ে কাটে, কেটে নাচে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে মহাভারত। দাখানা ফেলে দাও।

মহা। কবে? কবে? কবে? আমি ম'রে গেলে তবে হবে?

নুট। অপেক্ষা কর মহাভারত, কিছুদিন অপেক্ষা কর। সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে; তবে কবে হবে, তা জানি না। কিন্তু তোমার ওপর অত্যাচারের প্রতিকার, তার দেরি নেই। (দাখানা কাড়িয়া ফেলিয়া দিল) বিমলা, আমার বাক্স বিছানা গুছিয়ে দাও দেখি।

বিমলা। সে কি, কোথায় যাবে?

নুট। অজ্ঞাতবাস বিমলা, অজ্ঞাতবাস। ওকালতি পড়তে যাচ্ছি আমি। আজ থেকে মোক্তারি আমি পরিত্যাগ করলাম। অন্যায়ের অত্যাচারের প্রতিকার করতে সর্ব্বক্ষেত্রে দাঁড়াবার অধিকার আমার চাই।

উভয়ের ভিতরে প্রস্থান

অরুণ। (সহসা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) O Lord, how long shall the wicked, how long shall the wicked triumph? Lift thyself up—thou judge of the earth—lift up!

মহাভারত। ভগবান! ভগবান!

ক্রমশ

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ি ভাড়া

'ড্যাঞ্চিরা'* বহরমপুরে যবে
ঢুকিতে লাগিল হু হু রবে
লক্ষ্মী বরপুত্রগণে . শুধালেন জনে জনে,
দুর্দ্দিনে তোমরা বল কেবা
বাড়ি-হীনে বাড়ি ভাড়া দেবা ?

শুনি তাহা জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
করজোড়ে কহে, মাতা, খালি হ'ল কলিকাতা,
সবে বাড়ি যোগাইয়া যাই,
এমন ক্ষমতা যে মা নাই।

কহিলা স্বয়ং মহারাজ,
আজি মা গো পেনু বড় লাজ,
যত বাড়ি ছিল খাড়া সবই হয়ে গেছে ভাড়া,
ভাঙাচোরা—তাও বাগ্‌দত্তা,
খালি বাড়ি নেই আর কোথা।

কহিল রংরাজ মারোয়াড়ী,
বাড়ির মতন ছিল বাড়ি,
জগৎশেঠের নাতি সেখানে রাখিত হাতী,
অগ্রিম কেরেয়া সহ তাহা
রুধিয়া রেখেছে মতি লাহা।

রহে সবে পরস্পর চাহি,
কোথাও কাহারো বাড়ি নাহি।
থমথম করে 'হল', লক্ষ্মীর নয়নে জল,
সভ্যদল ফ্যালফেলি চায় ;
নিরাশ্রয় আশ্রয় না পায়।

---

* মফস্বল শহরে কলিকাতা হইতে নবাগত বাবুদের 'Damn-cheap' বা 'ড্যাঞ্চি'-বাবু বলা হয়।

তখন কে আসে ধীরে ধীরে
বুট পায়ে গান্ধী-টুপি শিরে !
হল-ঘরে আলো নাহি, স্তব্ধ সবে দেখে চাহি,
সম্মুখে ফেরারী হাঁদুবাবু ।
পশ্চিমে তপন প্রায় কাবু ।

লক্ষ্মীর চরণরেণু ল'য়ে
হাঁদুবাবু কহিল বিনয়ে,
কাঁদে যারা বাড়ি-হারা আমার ভাড়াটে তারা,
সবাকার বাড়ি মিলাবার
আমি আজ লইলাম ভা[illegible] ।

শুনিয়া বিস্মিত সবে ভাবে,
এত বাড়ি হাঁদু কোথা পাবে ?
ম্যাজিস্ট্রেট, মহারাজ যে কাজে অক্ষম আজ,
লক্ষ্মী সাক্ষী কি কহিল হাঁদু ?
ফেরারী কি শিখে এল যাদু ?

হাঁদু কহে নমি সবা কাছে,
শুধু সেই বাড়িখানি আছে—
যে বাড়ি আমার নয়, তাই সে সবার হয়,
মন্ত্রী ভিক্ষু করে কাড়াকাড়ি,—
গলিপ্রান্তে বিরহিণী বাড়ি ।

পাই যদি তোমাদের দয়া
মোর আশা হইবে বিজয়া,
বোম-ভীত স্তম্ভিত যারা সকলেই পাবে ভাড়া,
সে বাড়ি একশ হয়ে আজ
ঘুচাইবে নগরীর লাজ ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অমীমাংসিত

কোন্ এক অখ্যাত মুহূর্ত্তে, দুই বন্ধু মহিম ও মহিউদ্দিন, অর্থশাস্ত্রের অর্থহীন ক্লাসটি মাটি করিয়া, কলেজ-রেস্তোরাঁর এক নিভৃত কোণে, উত্তেজিত মৃদু কণ্ঠে কি কি সব আলাপ করিয়াছিল ; এবং নাকি সেই মুহূর্ত্তটির উপরই ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বাংলার গৌরব 'বাঙালী সঙ্ঘ', যাহার মূল উদ্দেশ্য হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ তুলিয়া দিয়া ভারতের একটি প্রধান সমস্যার মীমাংসা করা।

যে দিন ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই দিন বিকালে কি একটা পার্কে নরনারীদের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল, দুই-একজন বালিকা পুষ্পমাল্য হস্তে ছুটিয়া আসিয়াছিল পর্য্যন্ত।

দুই মহির এক মহির উত্তপ্ত কণ্ঠ হইতে যে কথাগুলি তীরের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া শ্রোতাদের বক্ষে সজোরে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম এই—

আজ আমরা 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিয়া নিজেদের গলা ফাটাইতেছি, কিন্তু ইহা যেন ভগ্ন হস্ত লইয়া বক্সিং খেলিতে যাওয়া। না না, হস্ত আমাদের ভগ্ন নয়—অসংযুক্ত, এবং আমাদের সে অসংযুক্ত হস্তকে যুক্ত করিতেই হইবে। তাহা না হইলে, ইহা নিশ্চিত যে, স্বাধীনতা লাভ করা আমাদের পক্ষে একটা কল্পনাতীত বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের এই এত বৎসরের সকল সাধনা ও চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, এবং এই পথে চলিলে ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হইবে। কিন্তু আমাদের সংযুক্ত হস্ত অনায়াসে আমাদের কঠিন শৃঙ্খল মোচন করিতে সক্ষম হইবে, আমাদের ডুয়েট চীৎকারে ইংরেজদের রক্তবর্ণ কর্ণপটহ ছিদ্র হইবে। অতএব ভাই সকল—

পরের দিন বিকালে, দুই মহি পরস্পরের ভগিনীকে বিবাহ করিল। ফলে সংবাদপত্রগুলির রিপোর্টারদের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া গেল ; তাহারা মহিদের দরজায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইল, ক্যামেরা-ম্যানরা ফোটো লইল। 'আসমুদ্র হিমাচল' পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিল—আজ যে ইংরেজ জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছে, তাহার মূল কারণ কি ?…

প্রথমেই দুই মহি বাঙালীর জাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ফলে এই হইল যে, চোস্ত পায়জামায় তাহারা পা চারিখানি স্বচ্ছন্দ করিল, গায়ে চড়াইল পাঞ্জাবি ও কোট, এবং ধুতির পাড় উঠাইয়া মাথায় ঘুরাইয়া পরিল। দুই মহি আরম্ভ করিল এবং তাহাদের অগণিত সভ্যদল সেই আরম্ভকে অনুকরণ দ্বারা প্রচলিত করিয়া তুলিল।

তারপর তাহারা নজর দিল ধর্ম্মের প্রতি। অনেক মতভেদ হইল, অনেক প্রস্তাবনা আসিল। একদল বলিল, রাশ্যার পন্থা অনুসরণ ও অনুকরণ করা হউক। অবশেষে মহিদ্বয় চাঁদা তুলিয়া একটি সাধারণ ঘর নির্ম্মাণ করাইল, যাহার এক পার্শ্বে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং আর এক পার্শ্বে তৈয়ারি হইল ইমামের মঞ্চ।

এক পবিত্র সন্ধ্যায় একসঙ্গে ঘণ্টা বাজাইয়া পূজা এবং সমস্বরে উচ্চ কণ্ঠে নামাজ পড়া হইল। পুরোহিত ও ইমামের কার্য্য সাঙ্গ করিল দুই মহি।

তারপরে উঠিল জাতীয় সঙ্গীতের প্রশ্ন। মুসলমান মহি 'বন্দে মাতরম্' পেশ করিল, হিন্দু মহি তাহা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া বাস্কেটে ছুঁড়িয়া ফেলিল। ফেলিয়া কাগজ কলম লইয়া ভারতের জাতীয় সঙ্গীত লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। লিখিল—

আদাব ও নমস্কার করি, হে ভারতমাতা (সাপোজ্‌ড)
তোমারি চরণে—

কিন্তু আর লেখা হইল না। মহিউদ্দিন কাগজটা কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, রাগ করিয়া কহিল, পাগলামি রাখ, আমার কথাটা শোন। আমি বলি 'বন্দে মাতরম্'ই থাকিবে, তবে উহার খানিকটা আমরা বলিব, খানিকটা তোমরা বলিবে। যেমন 'বন্দে মাতরম্' বলিবে তোমরা, আর আমরা বলিব 'সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং'।

মহিম লাফাইয়া উঠিল, সজোরে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, কেয়া কথা, কেয়া কথা!

হঠাৎ একদিন পুলিসের সুনজর পড়িল। পুলিসের 'সুপারি' আসিলেন, পাইপ টানিতে টানিতে নধর ভুঁড়ি দোলাইতে দোলাইতে

সাঙ্গোপাঙ্গরাও পশ্চাতে আসিল। মহিদ্বয় করজোড়ে বিনীত কণ্ঠে কহিল, দোহাই তোমাদের সাহেব। আমাদের শান্ত নিরুপদ্রব সাধনায় বিঘ্ন ঘটাইও না। আমরা বুদ্ধের অহিংসায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। নন-ভায়োলেন্স আমাদের প্রধান মন্ত্র; তোমাদের হত্যা করিয়া পাপ সঞ্চয় করিব না। আমাদের উদ্দেশ্য অতি সরল, ভারতের লোকগুলিকে মানুষ করা। বোমা-পিস্তলের কারবার আমরা স্বপ্নেও করিব না; তোমরা নিশ্চিন্তে শ্যাম্পেন টানিতে থাক। বরঞ্চ তোমাদের রাজত্ব যাহাতে আরও দৃঢ় হয়, তাহারই চেষ্টা আমরা করিব।

সাহেব খুশি হইয়া হাত-ঝাঁকুনি সম্পন্ন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সাঙ্গোপাঙ্গরা মনের দুঃখ মনে রাখিয়াই সাহেবের গোড়ালি অনুসরণ করিল। লাঠিতে তৈল মালিশ বিফলেই গেল।

মহিদ্বয় হাসিল, নিম্নকণ্ঠে কহিল, আর কত বানর-বাজি? রুটি আর কত ভাগ করিবে? দাঁড়িপাল্লাই বুঝি এবার গেল।

যথাসময়ে দুই মহির সন্তান হইল, একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। নাম রাখা হইল—আশা ও ভরসা। দুই বন্ধুতে কথা হইল, আমরা যখন বাঙালী, সুতরাং আমরা বাঙালী নাম রাখিব। তবে তুমি যদি মুসলমানী নাম রাখ আমি আপত্তি করিব, এবং আমি যদি দেবদেবীর নাম রাখি তুমি আপত্তি করিবে।

আশা ও ভরসাকে লইয়া মহিদ্বয়ের দিন কাটিতে লাগিল।

একমাত্র আশা ও ভরসার স্থল 'বাঙালী সঙ্ঘ'কে লইয়া আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। উহা আমাদিগকে পূর্ণভাবে আশান্বিত করিয়াছিল। এইবার—(আমরা প্রায়ই পরস্পরে বলিতাম) এইবার আমরা ঠিক পথে অগ্রসর হইতেছি, স্বাধীনতার জয়ডঙ্কা ভারতশিরে অর্থাৎ আমাদের উন্নত শিরে বাজিল বলিয়া। সকলের মধ্যে একটা প্রচণ্ড সাড়া পড়িয়া গেল, সকলের মুখে—মহি মহি। মহি আর মহি আজ সমগ্র ভারতকে মহিমামণ্ডিত করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

তবু মনের এক প্রান্তে একটু খুঁতখুঁতি রহিয়া গেল, কারণ গো-মাংস সমস্যাটা আজও অমীমাংসিত পড়িয়া আছে। সব কিছুই তো হইল বাপু, এই নগণ্য ব্যাপারটি কেন ধামাচাপা থাকে? তোমরা তো আজকাল অনেকে হোটেলে-ফোটেলে লুকাইয়া গো-মাংসের কাবাব খাইতেছ, হয় সকলে গরু খাইতে আরম্ভ কর, নচেৎ গরু জিনিসটাকেই ভারত হইতে নির্ব্বংশ কর—আপদ-বালাই চুকিয়া যাউক। আমরা বিলাতী কণ্ডেন্সড দুগ্ধ খাইয়া থাকিব, শিশুরা গ্ল্যাক্সো পান করিবে।

কিন্তু মহিদ্বয় হাত নাড়িয়া কহিল, অধীর হইও না। সবুরে মেওয়া ফলে। আমরা খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া চাঁদ ও চরকাওয়ালা ভারতের জাতীয় পতাকার পানে তাকাইয়া চিন্তামগ্ন হইলাম।

পুষ্পে কণ্টক আছে, সঙ্ঘটিরও ছিল। তাহারা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার দল। মহিদ্বয় বৃদ্ধদের দাড়ি ও টিকি ধ্বংস করিল; বক্তৃতার চোটে বৃদ্ধাদের নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িল।

এইরূপে ক্রমেই আমাদের আশা ও ভরসা দৃঢ় হইতে লাগিল। মহিদের আশা ও ভরসাও বড় হইতে লাগিল।

কিন্তু এমন সময় অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। দুই মহি পরস্পরের সম্বন্ধ ঘুচাইল এবং মহিম ও মহিউদ্দিন নাম পুনরায় সাগ্রহে গ্রহণ করিল। আমরা স্তম্ভিত—বড় বড় দুই চক্ষু দিয়া জল ও পানি প্রবলবেগে বহিতে লাগিল।

কিছুদিন পর, ভগ্ন হৃদয়ে অতি কষ্টে ভিতরের ব্যাপার জানিতে পারিলাম। মিল হইল কি করিয়া জানা শক্ত, কিন্তু অমিল কি কারণে ঘটিল জানা শক্ত নয়।

বর্ষার প্রারম্ভে ঘরে ঘরে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে লাগিল, মহিদের ঘরেও দেখা দিল। আশা ও ভরসা একসঙ্গে আক্রান্ত হইল। দুইজনেরই অসুখ ক্রমে শক্ত টাইফয়েডে আসিয়া দাঁড়াইল, ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইল, মহিরা শঙ্কিত হইল, তাহারা বাঁচে কি না বাঁচে। মহিউদ্দিনের বউ কালীমন্দিরে পাঁঠা মানত করিল, ঘরে ধূপধুনা জ্বালাইয়া পূজা আরম্ভ হইল। মহিউদ্দিন মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে কহিল, উঁহু, ওসব চলিবে না। একজন বড় পীর ডাকিতেছি।

কিন্তু স্ত্রী বলিল, না, আমি পূজা করিবই। ভাল পুরোহিতও আনিতেছি।

পীর আমি ডাকিবই।—দৃঢ়কণ্ঠে মহিউদ্দিন উত্তর দিল।

ফলে পীর সাহেবের দাড়ি দেখা দিল, পুরোহিতের টিকি উঁকি মারিল। টিকি দেখিয়া দাড়ি খাড়া হইল, দাড়ি দেখিয়া টিকি কুঞ্চিত হইল, এবং দাড়ি ও টিকি দুই দিকে নিষ্ক্রান্ত হইল। আশা মরিল এবং মহিউদ্দিনের স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে দাদা মহিমের কাছে ফিরিয়া গেল।

ওদিকে মহিম পূজা আরম্ভ করিল, এবং ভগিনী আসিয়া জোর দিল। কিন্তু বউ কাঁদিয়া উঠিল, মাথা সঞ্চালিত করিয়া কহিল, ওগো, ওসবে কিছু হইবে না। আমি নামাজ পড়িয়া খোদার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি ভিক্ষুক ডাকাইয়া একটা গরু জবাই করিয়া ভোজ দাও।

গরু! মহিমের চক্ষু চড়কগাছে উঠিল এবং ভগিনী ফাটিয়া পড়িল। তারপর স্বামী-স্ত্রীতে কলহ-বিবাদ হইল, ভগিনীর নাচুনিতে ব্যাপারটা আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। ভরসা মরিল এবং মহিমের বউ ভাই মহিউদ্দিনের কাছে ফিরিয়া গেল।

তারপর কি কি সব হইল। দুষ্ট ছেলেরা ভারতের জাতীয় পতাকা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

আমি কেবলই ভাবি, টাইফয়েড-রোগের বীজাণু প্রথমে ভারত হইতে তাড়াইতে হইবে, না হইলে আশা ও ভরসাকে বাঁচানো যে দায়। হে আল্লা, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের বল দাও, হিকমত দাও, এই দোয়া ও প্রার্থনাই করিতেছি।

সৈয়দ অলিউল্লাহ

মানস-বাদল

সহসা বাদল নামিল আকাশে ফাগুন-দিনে
এস এস কাছে আরো কাছে এস প্রিয়তম,
দুজনার চোখে দুজনার ভাষা লইব চিনে
এস এস কাছে আরো কাছে এস প্রিয়তম।
কত দূর হতে এসেছে আকাশে মেঘের দল,
এনেছে মুক্তা-গর্ভ-সাগর-শীতল জল
মেঘের ছোঁয়ায় উন্মন হ'ল আকাশতল,
এস এস কাছে আরো কাছে এস প্রিয়তম।

পথের দুধারে অচল অটল সৌধশ্রেণী
শার্সির কাচ ভাঙে বুঝি বায়ু-দোলা লেগে
শয়ন-শিথিল-এলানো-কৃষ্ণ-কুটিল বেণী
মেঘ-সচকিত বধূরা জড়ায় মিছে রেগে!
ছুটে ছুটে আসে বন্ধ করিতে জানালাগুলি
ঠোঁটে হাসি চায় আকাশে আধেক ভ্রূকুটি তুলি
কাঁকনে চুড়িতে ঘন ঘন ওঠে প্রলাপ-বুলি
এস এস কাছে আরো কাছে এস প্রিয়তম।

হাওয়ায় ঝাপটে গাছগুলি পড়ে ঈষৎ বেঁকে,
নূতন করিয়া ঝরা শুরু হ'ল কাঁচা পাতা
অকাল-বাদল-ছায়া-আল্পনা কে যায় এঁকে
নবতর লাগে অতি পুরাতন কলিকাতা।
ফুটপাথে এসে জটলা পাকায় ছাত্রদল,
কোথা পাবে তারা কদম্ব-ঘন-কুঞ্জতল
বৃষ্টি-বিরাম কামনা করিয়া গনিছে পল
এস এস কাছে আরো কাছে এস প্রিয়তম।

হঠাৎ ঘূর্ণি-বায়ু লেগে ওড়ে বালুর কণা,
দ্রুত-বিলম্ব-ভ্রমণ-কাতর পথচারী
শীতল বাতাস মুখে লাগিতেই অন্যমনা
দেখে নভে আজ মেঘে মেঘে আয়োজন ভারী।
চিরিয়া চিরিয়া নারিকেলপাতা চিকণতর
আশ্রয়কামী কাকে ও শালিকে মুখর বড়
বৃষ্টির ছাঁট কুয়াশার জাল করিল জড়
এস এস কাছে আরো কাছে এস প্রিয়তম।

সহসা বাদল নামিল আকাশে ফাগুন-দিনে
ঝরঝর ঝরে অবিরাম জল গৃহচূড়ে
পুরানো নিশানা দেখিয়া কে পথ লইবে চিনে
সাদা পরদায় ঢেকেছে সকলি কাছে দূরে,
ঘোলা জলে ডোবা ফুটপাথ কারো লাগিছে ভালো,
বৃষ্টিতে ধুয়ে পিচ-ঢালা পথ আরো যে কালো
মেঘ চুঁয়ে চুঁয়ে গলে বিমর্ষ পাণ্ডু আলো
এস এস কাছে আরো কাছে এস প্রিয়তম।

এতদিন মোর জীবনের বনে ফাগুন ছিল
আনন্দ-ভরে কাটালেম মোর দিনগুলি
জানি না কখন কোন্ জন প্রাণে বিনির্মিল
সোনা ও রূপার তারে তারে গাঁথা ঘুলঘুলি।
ঘুমে জাগরণে পরশ নিয়েছি তৃপ্ত মনে
জলকণা জ'মে ওঠে নি কখনো নেত্রকোণে
চির-বসন্ত ছিল অনন্ত হৃদয়-বনে
এস এস কাছে আরো কাছে এস প্রিয়তম।

সহসা বাদল নামিল মানসে—আকাশে নহে,
এস এস কাছে আরো কাছে এস প্রিয়তম
দুজনার প্রাণে শুনিব আজিকে কি কথা কহে,
এস এস কাছে আরো কাছে এস প্রিয়তম।
কোথায় জানি না হয়েছে যন্ত্র বিকল যেন,
বিশ্বভুবন লাগিছে সহসা শূন্য হেন
লক্ষ্যবর্ত্তী তবু অলক্ষ্য বিরহ কেন
এস এস কাছে আরো কাছে এস প্রিয়তম।

উমা দেবী

প্রণাম

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশীতিতম জন্মদিনে পূর্ণিয়ায় অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত]

ধরণীর ধূলি-ঘূর্ণা আকাশের জ্যোতিষ্ক-উৎসব
যে দর্শনে সমমূল্য যে বিচারে সমতুল্য সব ;
মিতবাক, নম্রনত, শুদ্ধচিত্ত, আড়ম্বরহীন
আত্মার ঐশ্বর্য্য যেথা অন্তরের গুহাতলে লীন ;
নির্ব্বাক মহিমা যেথা ব্যর্থ করে বাক্যের বিক্রম,
নির্ব্বিরোধে জীবনের দীর্ঘ-পথ করে অতিক্রম
শান্ত মুখে যে সাধনা স্মিতহাস্য বিকিরণ করি,
সে সাধনা ভারতের : সমস্ত অন্তর মন ভরি
এ উৎসব-সভাতলে তাহারেই আজি নমিলাম—
ভারত-প্রতীক-পদে হৃদয়ের অর্ঘ্য সঁপিলাম।

"বনফুল"

সংবাদ-সাহিত্য

নানাবিধ হেকমৎ দেখাইয়া বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ আমাদের মায়া কাটাইয়া বিদায় লইতেছেন ; এই বৎসরকে আমরা "স্বুবর্ণ-বৎসর" বলিতে পারি। প্রথমত, সোনার দরের দিক দিয়া দেখুন, সোনার দর আজ ভরি-পিছু ছাপ্পান্ন টাকা ; সোনার এরূপ স্বর্ণমূল্য ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় নাই। দ্বিতীয়ত, বোমা। আশা করা যাইতেছে, ইনি ভাগ্যগুণে গা বাঁচাইয়া বিদায় লইতে পারিবেন। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যদি সন ১৩৪৮ সালের কাহিনী রক্তাক্ত অক্ষরে লিখিত না হয়, তাহা হইলে তাহা মহা ভাগ্যের কথাই বলিতে হইবে। জাপানের দৃষ্টি শুনিতেছি অষ্ট্রেলিয়া এবং রুশিয়ার দিকে পতিত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে, আগামী নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা মফস্বল-প্রেরিত পরিবারবর্গকে পুনরায় যথাস্থানে ফিরাইয়া আনিতে পারিব। তৃতীয়ত, মার্শাল ও মাদাম চিয়াংকাইশেক এই বৎসরে ভারতবর্ষের বক্ষে পবিত্র পদরজ স্পর্শ করাইয়া গেলেন। মনে হইতেছে, এই অসামান্য ঘটনায় স্বাধীনতার বীজ এই অভিশপ্ত মৃত্তিকায় উপ্ত হইয়াছে। সুতরাং চতুর্থত— ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাসের আশ্বাসবাণী মিঃ চার্চিলের কণ্ঠে শুনা যাইতেছে, এবং ভারতবর্ষের বহুবাঞ্ছিত সার্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্স্ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া এখানে আগমন করিতেছেন।

*   *   *

বৈচিত্র্যের দিক দিয়াও এই বৎসর সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যায়। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে যাহা তাল-নারিকেল বৃক্ষমাত্র ছিল, ১৩৪৮ সনে তাহাই বহু স্থলে নানা গুরুত্বপূর্ণ নাম লইয়া আকাশমুখী হইয়াছে ; পাড়ার ভুতো-ক্যাবলা-জাতীয় তরুণেরা আমাদিগকে বিপদে রক্ষা করিবার জন্য মহাসমারোহে বিভিন্ন কেন্দ্রে তাস খেলিয়া রাত্রিজাগরণ করিতেছে ; পাণ্ডুয়া ও তলাগুর বালি সস্তায় বস্তাবন্দী হইয়া দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকারে পরিণত হইতেছে এবং সর্ব্বোপরি বাংলা সাহিত্যে "ব্ল্যাক-আউট" অধ্যায় নামে একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করিবার

সুযোগ উপাস্থত হইয়াছে ; এই সকল নানা কারণে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দকে আমরা অত্যন্ত কাতর চিত্তে বিদায় দিতেছি।

*   *   *

১৩৪৯—যিনি আসিতেছেন, তাঁহার ধরনধারণ কীর্ত্তিকলাপ আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ; তিনি সনাতনী মতে চলিবেন, না, অন্য কোনও নূতন মত প্রচলন করিবেন, তাহাও আমরা জানি না ; গ্রাহকদিগের নিকট হইতে সম্বৎসরের চাঁদা লইয়া মাসে মাসে ছাপিয়া দিবার মত সাদা কাগজ যোগাইবার দায়িত্ব তিনি লইবেন কি না, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। মোটের উপর, অত্যন্ত সংশয়াকুল-চিত্তে আমরা তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি। তথাপি, আমাদের সকলের জীবনে তাঁহার আবির্ভাব সম্ভব হউক, ইহাই কামনা করি।

—

"ব্ল্যাকআউট"-সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী গত দোল সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

> কলিকাতা এখন ভারতীর রাজধানী, আর ক্ষিতিব না হোক ভারতবর্ষের প্রদীপ। কলিকাতা যদি ধ্বংস হয় ত এ প্রদীপ নিবে যাবে। তখন আমাদের মনের Black-out হবে। পলিটিকাল ও সাংসারিক হিসেবে কি পরিবর্ত্তন ঘটচে, সে কথা বলা বৃথা। যুদ্ধে হেরে ফ্রান্সের কি দুর্দ্দশা হয়েছে, তা আমরা জানিনে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত জানি যে, ফ্রান্সে সাহিত্যিকরা সব নীরব হয়েছেন। ফ্রান্সের আলো নিবে গিয়েছে।
>
> মনের মোড় ফেরানো অতি কঠিন। সুতরাং আমাদের পক্ষে ভবিষ্যতে সাহিত্যের চর্চ্চা করা অসম্ভব হবে। তাই কলকাতার আসন্ন বিপদে আমাদের মনও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তারপর মনের ভিতর আর যাই থাক, স্ফূর্ত্তি থাকবে না।

কথাগুলা সবই ঠিক এবং এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু যাহা ঠিক এবং

স্বাভাবিক, বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া রাজধানী কলিকাতায়, তাহা ঘটা সম্ভব নয়। চৌধুরী মহাশয় মাসিক 'রূপ ও রীতি'র সম্পাদক হইলেও সম্পাদকীয় দপ্তর অর্থাৎ প্রেরিত রচনার ফাইল লইয়া নিশ্চয়ই ঘাঁটাঘাঁটি করেন না। করিলে দেখিতে পাইতেন, এখানকার সাহিত্যিকেরা নীরব হন নাই, বরঞ্চ বিপরীত ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। ফলে আমরা আক্রান্ত ও উত্তেজিত হইয়া গত সংখ্যায় এত অধিক পরিমাণে "ব্ল্যাক-আউট" কবিতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি যে, বহু পাঠক বিচলিত হইয়াছেন। এবারে আমরা সভয়ে সেই দিক পরিহার করিয়াছি; শুধু মফস্বলীয় কবিদের সম্মানরক্ষার্থ "বাড়ি ভাড়া" বিষয়ক কবিতাটি প্রকাশ করিয়াছি।

"ব্ল্যাক-আউট"-সাহিত্য অন্যত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

১। মহানগরীর গণিকা বাত্রি নয়
বণিকের জতু-গৃহে,
আগুনের শিখা যার প্রজাপতি-দেহ
পুড়ে দেয় বার বার;
বারবার তার ভস্মে পৃথিবী ম্লান।

২। অতএব সেই রাজার হাজার
সেপাই-সান্ত্রী সাজলো।
দণ্ডক বন কাঁপিয়ে শতেক
তুরীর বাজনা বাজলো।
শম্বুক—সে কলির শূদ্র,
গৌরবরণ—হ'লদে,
—যাই হোক, সে স্বল্পভাষী।

৩। মরা নদী বাঁচো
ঢিলে রগগুলো ধনুর ছিলা।
শিকারী চিতার জ্বলজ্বলে চোখ
বনের পাশে।

পুরানো পাহাড়—
অনেক দিনের আগুন চাপা ;—
পাথুরে বাঁধন হঠাৎ ঢিলা।
মৌসুমী ফুল, জাপানী ফানুস
হাওয়ায় ফাঁপা।
মাটির মানুষ,—
নিরেট মানুষ,—
এবার আসে।

৪। তোমরা এলে ছন্নছাড়া !
কাঁকরপাতা সড়ক ধ'রে
কখন এলে লালচে ভোরে,
রক্ত পথের সঙ্গী হবার দাও ইসারা।

৫। ব্ল্যাক আউট শহরের বুকে—
জনহীন তৃষিত নগরী
আলোকের পিপাসায় সারারাত ধুঁকে।
আঁধারের কবরের মাঝে—
পিচ্-ঢালা রাজপথ ঝিমাইছে দু'খে।
আঁখি মুদি' খাড়া আছে ল্যাম্পপোষ্ট যত,
মানুষের হিংস্রতা পারে না সহিতে—
তাই বুঝি অন্ধকারে কাঁদে অবিরত।
আঁধারের অরণ্যে করে ছুটাছুটি
ঠুলিপরা যন্ত্রের দানব—
ছুটে চলা ধনিকের কার।
মরণেরে সাথে সাথে লয়ে
আকাশেতে ওড়ে বম্বার।

* * *

কিন্তু "ব্ল্যাক-আউটে"র চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী। সারা শহর জুড়িয়া যখন আত্মরক্ষার ব্যাকুলতায় বালির বস্তা পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিতেছে এবং ইঁটের "ব্যাফ্‌ল ওয়ালে"র ধাক্কায় তিমিরচারী পথিকের দ্রুত পথচারণ সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে, তখন রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-লাটুর এই লেত্তি-ভক্তটি "শ্যামলী"র আদর্শে মাটির দেওয়াল তুলিয়া মানস-বিমানাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। সহজ হইলেও এই পন্থা অভিনব। তিনি "বিজ্ঞাপনে" বলিতেছেন—

এই বইটার নাম মাটির দেয়াল।
হঠাৎ হয়েছিল খেয়াল
আখর আঁকতে
ধুলোয় ধসবার আগে থাকতে।
দুদণ্ড রাস্তার লোককে ডাকতে
মাটির আঁচড় কাটা এই মাটির দেয়াল।

এই আঁচড়গুলি যে বাঁদুরে, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। পরম-উপকারী কুইনিনের পিলের উপর মিশরের পিরামিড অথবা আগ্রার তাজমহল—যে ছবির ছাপই থাকুক না, জ্বরগ্রস্তের পক্ষে কুইনিনের কুইনিনত্বই আসল দেখিবার বস্তু। অমিয়বাবুর দেওয়াল খাঁটি মাটির।

* * *

সুতরাং, চৌধুরী মহাশয় যে নীরব হইবার কথা বলিয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহা খাটে না।

—

পৌষের 'রূপ ও রীতি' পত্রিকায় অধুনাবিলুপ্ত 'সমসাময়িক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার সান্যালের "ইংরেজ শাসনের পর বাংলা সাহিত্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে আমাদের চিন্তার খোরাক

আছে। মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাধনায় পুষ্ট বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গতি-প্রকৃতি অনেকেরই ভাবনার বিষয় হইয়াছে। নিছক পাগলামির দ্বারা বৈচিত্র্য সম্পাদনকে যাঁহারা অগ্রগতি বলেন, আমরা তাঁহাদের দলে নই। মজুরবাদ অথবা "নিপীড়িতেব ক্রন্দন" মাখাইয়াও যে বাংলা সাহিত্যকে প্রগতি সাহিত্যে উন্নীত করা হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার মত ফসিলত্বও আমরা অর্জ্জন কবি নাই। দিলীপবাবুব প্রবন্ধের শেষে এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার মত।—

> যে জিজ্ঞাসা, যে সজাগতা, এবং মানসিক উপভোগের জন্য ঐতিহ্য প্রয়োজন, তাহা পশ্চিমের সহিত সংঘর্ষের পর কোনও দিনই সম্পূর্ণ কবিয়া পাই নাই। পাই নাই বলিয়া সাহিত্যের কোনও স্থায়ী আদর্শ গড়িতে পারি নাই। ব্যক্তিগত উপভোগের পল্লব হইতে পল্লবে লাফালাফি করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছি। উপন্যাস লিখিতে গেলে তাই হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে পালাই, নয় অত্যন্ত রুগ্ন বা জীর্ণ মনের পরিবেশে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে বাস কবি। গ্রীক না জানিয়াও তাই গ্রীক পুবাণে মন ছাড়িয়া দিই। কবিতা লিখিতে বসিয়া কসরৎ দেখাই। সমালোচনা করিতে বসিয়া পরস্পরের পিঠ থাবড়াই। নাম দিই বহুবিধ কিন্তু প্রায় সমস্ত আধুনিক সাহিত্যে আমাদের চির-পলাতক বাঙ্গালী মনের সুষ্ঠু বিকাশ, যে মন রাখিতে জানে না, কারণ তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই, যে মন জন্মরোমাণ্টিক, যাহার ব্যসনের অবসান সেই দিন ঘটিবে, যেদিন এই জীর্ণ, মিথ্যা পরিবেশ, জীবনকে ফাঁকি দিবার এমন সুলভ অবকাশ, আর থাকিবে না। সেই দিন যতদিন না আসিবে আমরা সৌখীন বাঙ্গালী বুদ্ধিবিলাসী বাঙ্গালীর সাহিত্য গড়িতে পারিব না। এখন যাহা গড়িতেছি তাহার অধিকাংশ বাঙ্গালীর ত' নহেই, তাই সাহিত্যও নহে, এবং অনেক স্থলে সে সাহিত্যের বাহন বাঙ্গালা ভাষাও নয়।

এই "বাঙালীর অকাল নিদ্রায়" 'তরুণ' পত্রিকা (শিশিরিকা সংখ্যা) অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বাঙালীকে আহ্বান করিয়াছেন—

জাগ্রত তনু উন্নত করে
ডাকনা জননী বলে
প্রেমের নৃত্যে ব্যাকুল চিত্তে
দাঁড়াও মায়ের কোলে।

মায়ের কোল প্রেমের নৃত্য কতটা বরদাস্ত করিতে পারিবে, আমরা তাহাই ভাবিতেছি। তবে তনু উন্নত করার শক্তির যে বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ণিয়া এবং অন্যত্র গত ৪ঠা ফাল্গুন শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশীতিতম জন্মদিনে উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া বাংলা দেশের সাহিত্যামোদীগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। কিন্তু চরমতম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন 'বসুমতী' পত্রিকা! বিগত প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অন্তরালে একজন বিফলপ্রয়াস সাহিত্যিকের বীভৎসলোলুপ আর্ত্তনাদ অতিশয় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। লিখিত হইয়াছে—

> সম্মেলনের সভাপতি[কেদারনাথ]র অভিভাষণে ভাষার ঝঙ্কারের, ভাবমাধুর্য্যের, চিন্তাসম্পদের এমন দৈন্য আর কখনও পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। কেদারবাবু যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি কোন নূতন চিন্তার দানে সাহিত্য সমৃদ্ধ—সমবেত সদস্যগণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন না, তখন তিনি রোগশয্যা হইতে সম্মেলনের কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেই তো যথেষ্ট হইত। অন্য কোন প্রতিভাবান মনীষী সাহিত্যিক সম্মেলনের সভাপতি হইয়া তাঁহার চিন্তাধারা প্রচারের সুযোগ পাইতেন।

অন্য যে "প্রতিভাবান মনীষী সাহিত্যিকে"র নাম নিতান্ত বিনয়বশতই লিখিত হয় নাই, আমরা তাঁহার চিন্তাধারার সহিত বহুবার পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি। সম্মেলনের সভাপতি হইলে তাঁহার দম্ভ ও আস্ফালন প্রচারের সুবিধা হইত বটে, সাহিত্য হইত না। মনে পড়িতেছে, রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার কোন সভায় সদ্যলিখিত "গান্ধারীর আবেদন" পাঠ করিবার পূর্ব্বে কোনও জ্যেষ্ঠতাত সাহিত্যিকের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, কচি বাঁশে ঘুন ধরিলে লাঠি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বাঁশী হয় না। [ঠিক কথাগুলা অন্যরূপও হইতে পাবে।] সেই ঘুনধরা কচি বাঁশ আজ বুড়া বয়সে বাঁশী হইয়া বাজিবার স্বপ্ন দেখিতেছে—রবীন্দ্রনাথ এ দৃশ্য দেখিয়া যাইতে পারিলেন না!

—

ফাল্গুনেব 'পরিচয়ে'র "লক্ষণ" কবিতার প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

সমস্ত দৃষ্টিকে যদি বলি শুক্ল সুর।
তাবাব বোদ্দ‌ুর
তোলে চারা।
বহে রক্তে স্বর্ণধূলিধারা
চূর্ণ চূর্ণ প্রত্যক্ষ বিস্ময়।
অলীক হাওয়ায় লঘ্ লোকালয়।
আনত ঈষৎ ধ্যানতলে
জন্তু চলে;
জীবনে পাথরে গাছে নদীতটে বাড়িতে বাজারে
ঘনিষ্ঠ বিস্মৃতিচক্র আদিম সংসারে।
তরল আবাসী মাছ; মন পাখী
শূন্য বেয়ে ওঠে, মন আঁখি
দেখে,
কী দেখা সমস্ত মিলে বুঝিবে কে।

টুক্‌রো টুক্‌রো বস্তু রাখে গূঢ় তাল,
স্ফুরিত কঙ্কাল
হাসে হাড়ে হাড়ে পেয়ে মন্ত্র,
কোটি কোটি চৈতন্যে ষড়যন্ত্র।

ইহা লক্ষণ সন্দেহ নাই—কঠিন ব্যাধির লক্ষণ। শুধু "কোটি কোটি চৈতন্যের ষড়যন্ত্র" নয়, কোটি কোটি বুদ্ধের, কোটি কোটি যীশুখ্রীষ্টের, একজন রবীন্দ্রনাথের এবং একজন অ্যাণ্ড্রুজের বিরাট ষড়যন্ত্র!

হ্যারিসন রোডের উপর একবার একজন ভিখারীকে একটি সাধারণ মাটির হাঁড়ি বাজাইতে দেখিয়াছিলাম। ওস্তাদ বাজিয়ের হাতে সামান্য মাটির হাঁড়িই এমন মধুবর্ষণ করিতেছিল যে, রাস্তায় ভিড় জমিয়া যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ওস্তাদ লিখিয়ে শ্রীযুক্ত জগদীশ গুপ্ত ইতিপূর্ব্বে মানুষ-মেয়েমানুষের চরম করিয়া ছাড়িয়া দিয়া সম্প্রতি তাস-পাশা-খেলার মধ্যেই এমন "আদ্যি-রস" জমাইয়া তুলিতেছেন যে, দেখিলে তাক লাগিয়া যায়। নানা কারণে যাঁহাদের রচনা মামুলি হইয়া আসিয়াছে, তাঁহারা জগদীশ-বাবুর ধারা অনুসরণ করিলে উপকৃত হইবেন। ফাল্গুনের 'প্রভাতী' হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি—

বিপক্ষের নিবারণ প্রেমতোষের বাজে রঙের দশের উপর বিবি তুরুপ করিতেই প্রেমতোষ নিবারণের দুঃসাহস দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইল, বলিল, শালার আক্কেল দেখ! বিবিকে এনে ফেলেছে সবার সামনে! দুর্য্যোধন দুঃশাসনের ভয় নেই। বলিয়া তাসের বিবির সম্পর্কে সে এমন অশ্লীল উক্তি করিতে লাগিল যে-অশ্লীলতার ওদিকে আর অশ্লীলতা নাই।

নিবারণ বলিল, আমার বিবি সতী।

—আরে থাম শালা। সতী আমি ঢের দেখেছি। বলিয়া

প্রেমতোষ এমন অনেকগুলি স্ত্রীলোকের নাম করিল দেশে যাদের চরিত্র সম্বন্ধে দুর্ণাম আছে।

—কি দেবে দাও হে। নিবারণ প্রেমতোষের জুড়িদার হরিগতিকে তাগিদ দিল।

প্রেমতোষ বলিল, মাব টেক্কা; টেক্কার ওপর মার নেই। একটি মাত্র ফোঁটা কিন্তু বাবা গোখরোব বিষ। বিবি ত' অবলা, অল্পেই কাবু—সায়েব পর্য্যন্ত জব্দ ঐ একটি ফোঁটার কাছে। মার তা-'ই।

কিন্তু হরিগতির হাতে টেক্কা নাই; সে ছাড়িয়া দিল।

প্রেমতোষ বলিল, পারলিনে মারতে! গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, নারীকে নির্ব্বিবাদে যেতে দেওয়া ক্লীবত্ব। অর্জ্জুনকে তিনি নিজের বোন সুভদ্রার···পেলে ওরা পিঠ্‌টা!

বিপক্ষের অবিনাশ বলিল, হুঁ। ঘরের বিবি ঘরে তুল্‌লাম। তোকে দেব?

—

নানা সভাসমিতিতে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার শ্রোতা ও দর্শক হইবার সুযোগ পাইয়া বহু রকমের পড়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছে। ৯ই ফাল্গুনের 'দেশ' পত্রিকায় ("প্রতিশ্রুতি") নূতন কিছু দেখিলাম—

> বসু দম্পতির শয়নকক্ষ; ভোর ৭-৩৭ মিঃ (বেঙ্গল টাইম)। বাহির থেকে শোনা যাচ্ছে, পাশের বাড়ির মুক্ত বাতায়নে দশ-এগার বছরের এক মেয়ে কিঙ্কিণীর মত তারস্বরে পরীক্ষার পড়া পড়ছে।

আমরা শুনিয়াছিলাম, সাহারা মরুভূমিতে যাহারা উটপাখী ধরিতে যায় তাহারা আপনাদিগকে আকণ্ঠ বালিতে প্রোথিত করিয়া চীনাবাদামের মত শব্দ করিতে থাকে। চীনাবাদাম খাইবার লোভে উটপাখী নিকটে আসে এবং বেকুব বনিয়া ধরা পড়ে।

আমাদের বহু পাঠক ঠিক আধুনিক কবিতার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিবার জন্য মাঝে মাঝে আবেদন জানাইয়া থাকেন। আধুনিকতার সকল দাবি পূর্ণ করে, এরূপ কবিতা আমরা এতদিন সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি প্রকাশিত 'মৃত্তিকা' পত্রিকায় আজিজুর রহ ান "সহরের সন্ধ্যা" নামে যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহা আধুনিকতার দাবি প্রায় বজায় রাখিয়াছে; কবিতাটিতে মিল থাকাতে এবং উগ্র বৈদেশিক শব্দ না থাকাতে ইহার উৎকর্ষ সামান্য ক্ষুণ্ণ হইলেও মোটের উপর কবিতাটি ভাল। ইহার শেষাংশ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি।—

> শীতের সন্ধ্যা নর্দ্দমা ধোয়া ভাপ্‌সা ঠাণ্ডা বায়
> মন চাহে এক সুনিবিড় অবকাশ,
> হাতুড়ী শাবল কোদালের আর কয়লা-ঝুড়ির চাপে
> শ্রান্ত সহর করে যেন হাসফাঁস।
> নেমে এসো রাত, তুমি কী এনেছ দিবসের বিস্মৃতি
> এতোটুকু গাঁজা এতোটুকু ধেনো মদ!
> জীবনের ফাঁক ঢেকে দিতে চাই ছাতু আর চানাচুরে
> আগামী দিনের ওই হবে সম্পদ॥

হাতুড়ি, শাবল, কোদাল, কয়লা, গাঁজা, ধেনো মদ, ছাতু এবং চানাচুর—অল্প পরিসরের মধ্যে আধুনিকতার এত উপকরণ অন্যত্র দেখি নাই। ইহার সহিত মনের "সুনিবিড় অবকাশ" ও "দিবসের বিস্মৃতি" মিশ্রিত হওয়াতে আগামী দিনের কাব্যসম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

* * *

এই প্রসঙ্গে ফাল্গুনের মাসিক 'মোহাম্মদী'তে আধুনিক মুসলমান কবিদের জয়গান করিয়া লেখা হইয়াছে—

> বর্ত্তমান বিদেশের অনেক কবি এবং তাদের দেখাদেখি আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত কবি বাস্তবতার ওপোর জোর দিচ্ছেন খুব

বেশী। যে ভাবে যে জিনিষ তাঁরা দেখছেন, সে-ভাবেই সে-জিনিষ তাঁরা প্রকাশ করতে চাচ্ছেন, যদিও তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থতার লজ্জাতেই হচ্ছে পর্য্যবসিত। এ-বাস্তবতার মোহে প'ড়েই একজন লিখেছিলেন:

"হন্যে কুকুরের মতো ঘোলাটে আকাশ।"

এটা বাস্তববাদিতা হ'লো না, হ'লো বাস্তবকে বিকৃত করা—যথার্থ সত্যাশ্রয়ী হ'লে অবিকৃতভাবেই সত্যকে তিনি প্রকাশ ক'রতেন—কৃত্রিমতার প্রশ্রয় নিয়ে অশোভন শব্দের সংযোজনে কবিতাকে অশুচি ক'রে তুলতেন না। সমাজের ক্লেদপঙ্কিলতাকে ফুটিয়ে তোলাই নিশ্চয় বাস্তববাদিতা নয়,—চোখে যা' পড়ে এবং যে অবস্থায় চোখে পড়ে তাকে অখণ্ড রেখে প্রকাশ করাই বাস্তবতার মূল কথা।

—

'প্রবাসী' এবং 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার কৃপায় আমরা আর একজন যুদ্ধ-[বিশা]রদকে পাইয়াছি—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি শুধু যুদ্ধবিশারদই [নহে]ন—ভূগোল-বিশারদও। সমগ্র পৃথিবীর ভৌগোলিক "পরিস্থিতি" ইহার [নখা]গ্রে। উক্ত দুই পত্রিকায় ইহার রচনাগুলি সর্ব্বদাই বহুচিত্রপরিশোভিত [দেখি]তে পাই। যাহা বাস্তবে আছে, শুধু তাহার ফটোগ্রাফই ইহার সম্বল নয়, কল্পনার সামগ্রীরও ফোটোরূপ তুলিতে অভ্যস্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্চ মাসের [মডা]র্ন রিভিউ' পত্রিকার ২৭৭ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ ছবিটির উল্লেখ করিতে পারি। ছবিটি—"[Ch]ungking from the Sea"; মার্শাল ও মাদাম চিয়াংকাইশেকের কল্পনা [এখা]নে কেদারবাবুর কৃপায় বাস্তব রূপ লইয়াছে। আগামী মাসে আমরা যখন [গ্রীষ্ম]ের কষ্ট পাইব, তখন কেদারবাবু নিশ্চয়ই "Calcutta on the [Hi]malayas" চিত্র পরিবেশন করিয়া আমাদিগকে ঠাণ্ডা করিবেন!

—

ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষে' শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরীর "হ্লাদিনী" রস একটু চটচটে

ঠেকিতেছে। সম্ভবত ইহা কলিকাতা হইতে "অনাবশ্যক" মানুষ অপসার ফলে আমাদের মনের বিকারও হইতে পারে। কবি লিখিয়াছেন—

টিপ কপালে জ্বলে, মালা দুলিছে গলে,
কাঁপে সুচারু চুচুক, আঁটা কাঁচুলি তলে
থর থর থর থর মনোহর।
যত রঙিন আশা খোঁজে তনুতে ভাষা,
যেন কদম-কে র কত ফুটিছে খাসা
হরষায় ভরসায় বরষায়।

এই নিদারুন ফাগুনে "থর" এবং "কেশর" দেখিয়াই বিচলিত হইয়াছি হয়তো

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্ক 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ উল্লেখযে ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাংলার এই একটি মাত্র নির্ভরযে সমসাময়িক ইতিহাস ব্রজেন্দ্রবাবুর যত্নে ও চেষ্টায় সংগৃহীত ও প্রকা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে পরিশিষ্টে প্রদত্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি প্রে বাঙালী ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকের নিকট অতিশয় মূল্যবান বিবেচিত হই প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ও দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ মিলিয়া অর্দ্ধশতাব্দীর একটি সম্পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমাদের হস্তগত হইল।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগু
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত